সমরেশ বসুর

বাছাই গল্প

মণ্ডল বুক হাউস ।। ৭৮/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
আশ্বিন ১৩৬৫ সন
অক্টোবর ১৯৫৮ সন
প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল
৭৮/১ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদপট ও অলংকরণ
শ্রীগণেশ বসু
হাওড়া-৪
ব্লক
মডার্ন প্রসেস
কলেজ রো
কলকাতা-৯
প্রচ্ছদ ও আলোকচিত্র মুদ্রণ
ইম্প্রেসন্ হাউস
৬৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট
কলকাতা-৯
মুদ্রক
বংশীধর সিংহ
বাণী মুদ্রণ
১২ নরেন সেন স্কোয়ার
কলকাতা-৯।

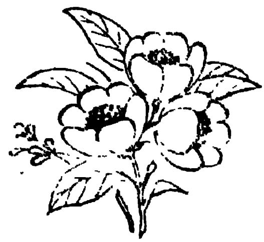
সূচি

BACHAI GALPA

By

SAMARESH BASU

বাছাই গল্প





স্বীকারোক্তি

…তার পরে ওরা আমাকে এস বি সেল-এ এনে ঢোকালো। বাইশে ডিসেম্বরের বেলা দশটা হবে তখন। আমার কাছে ঘড়ি ছিল না। শীতের বেলা দেখে, আর লালবাজার থেকে লর্ড সিন্‌হা রোড পর্যন্ত রাস্তার চেহারা দেখে আমার মনে হলো, তখন বেলা দশটাই হবে, যদিও একটা আচ্ছন্নতা আমাকে গ্রাস করেছিল। সারারাত্রি ঘুম হয় নি। লালবাজার হাজতের সেই ঘর, টিমটিমে অকম্পিত সেই আলো, চার দেওয়াল জুড়ে সেইসব বিচিত্র আঁকাজোকা হিজিবিজি লেখা, আর অর্ধোন্মাদ সেই বন্দী, যে আমার দিকে স্থির চোখে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিল, হেসে উঠছিল, বিড়বিড় করে বলছিল বা গুনগুন করে গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে এমন করে দেওয়ালের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, যেন ওখানে কোনো দেওয়াল নেই, একটা দরজা আছে, খোলা দরজা—যেখান দিয়ে সোজা বেরিয়ে যাবে। কিন্তু দেওয়ালের গায়ে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে স্থির নিশ্চল হয়ে যাচ্ছিল। তার পরে আস্তে আস্তে পিছন ফিরে অর্থাৎ হাজতঘরের দিকে ফিরে বক্তৃতামঞ্চের ওপরে দাঁড়াবার ভঙ্গি করে হাত তুলে তর্জনীটা শূন্যে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে ভুরু কুঁচকে চোয়াল শক্ত করে দাঁতে দাঁত চেপে আবার বিড়বিড় করছিল। ও যে কে আমি তা জানতাম না। পোশাক-আশাক মোটামুটি ভদ্ররকমের হলেও ও রাজনৈতিক বন্দী কিনা আমি বুঝতে পারছিলাম না। চোর কিংবা ডাকাত বা পকেটমার সেরকম কাউকে আমার সঙ্গে একই হাজতঘরে পুরে দেওয়া পুলিশের পক্ষে অসম্ভব কিছু ছিল না। কারণ ওরা জানত, তাতে আমার মনোবল আরো নষ্ট হবে, আমি আরো বেশি গ্লানি বোধ করব, মুক্তির ইচ্ছে আমার প্রবল হয়ে উঠবে। আর তা উঠলেই ওরা আমার কাছে যা জানতে চাইছে, ওদের ধারণা, তা সহজ হয়ে উঠবে।

এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পরশু ওরা তা-ই রেখেছিল। তিনটি ছোকরাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল যাদের দেখে আমার মনে হয়েছিল, ওরা যেন হাজতে আসে নি, কোনো চায়ের দোকানে আড্ডা মারতে এসেছে। ওরা বকবক করছিল, হাসাহাসি করছিল, খিস্তি করছিল, আবার নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও করছিল, এবং সে-সময়ে অশ্রাব্য উক্তিই শুধু করছিল না, কোমরের পরিধান শিথিল করে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নিম্নাঙ্গ দেখাচ্ছিল যাতে ক্রোধ এবং অবজ্ঞা অত্যন্ত উগ্র হয়ে ফুটে উঠছিল। স্বভাবতই আমার খুব খারাপ লাগছিল, অস্বস্তি বোধ করছিলাম, এটাও বুঝতে পারছিলাম, ওদের কোনো দোষ নেই, ওরা ওদের স্বাভাবিক

[১৯৪৯ সালে বে-আইনী ঘোষিত এক রাজনৈতিক পার্টির একজন সদস্যের বন্দী অবস্থায় লিখিত স্মৃতিচারণ থেকে উদ্ধৃত]

ব্যবহারই করছিল, এমনকি ওরা এও বুঝতে পারছিল আমি অত্যন্ত অস্বস্তি ও অশান্তি বোধ করছি, যে-কারণে আমার দিকে তাকিয়ে ওরাও একটু সংকুচিত হচ্ছিল, আড়ষ্ট বোধ করছিল এবং আমাকেই সাক্ষী মানছিল, 'দেখুন না বড়দা···' ইত্যাদি। ওদের কথা থেকেই জানা যাচ্ছিল বন্দরের কাছাকাছি কোনো জায়গা থেকে বে-আইনী আমদানী করা মালপত্র পাচার করার সময় ওরা ধরা পড়েছে। ইতিপূর্বেও ওরা কয়েকবার ধরা পড়েছে, কয়েক মাস করে জেলও খেটেছে। কোনো কিছুই নতুন নয়। তবু ধরা-পড়ার কারণগুলো আলোচনা করতে গিয়েই ওদের ঝগড়া হচ্ছিল। একটাই শুধু আশ্চর্য, আমাকে ওরা কিছুই জিগ্যেস করে নি, আমি কে, কী অপরাধে হাজতবাস করছি। প্রথম থেকেই ওরা আমাকে 'বাবু' বা 'বড়দা' এইরকম সম্বোধন করছিল। আমি কর্তৃপক্ষের কথা ভাবছিলাম, তারা কেন ছেলে তিনটেকে আমার ঘরেই ঢুকিয়ে দিয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হয় নি পুলিশের ওটা কোনো অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়, একটি সুচিন্তিত পরীক্ষা মাত্র। এটা যখনই বুঝতে পারলাম তখনই মনকে প্রস্তুত করে নিলাম এইভাবে যে আমি যেন কোনোরকম একটা প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাঝখানে রয়েছি। ভীষণ ঝড় বা ভয়ংকর ভূমিকম্পের মতো কোনো দুর্যোগের মধ্যে নয়, যেন দক্ষিণাঞ্চলের ভেড়ি-বাঁধের ওপর কোনো গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছি, আমার চারপাশে পাঁক কাদা নোংরা পশুর মৃতদেহ জোঁক আর কেঁচো পায়ের কাছে ঘোরাঘুরি করছে। আর আকাশ কালো, ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে, আমার কোথাও যাবার উপায় নেই। বৃষ্টির বা পাঁক কাদার বা জোঁক কেঁচোর কোনো দোষ নেই, সবই স্বাভাবিক এবং যা-কিছুরই দায়, সবই আমার জীবনের কার্যকারণের গতি-প্রকৃতির দ্বারা নির্ধারিত, যে গতি-প্রকৃতির দ্বারা আমি লোকালয়-বহির্ভূত ভেড়িবাঁধের ওপর একটি বিচ্ছিন্ন একক গাছের নিচে উপস্থিত। অতএব—

অতএব ছেলে তিনটির সঙ্গে হাজতে আমার সারাদিন ও রাত্রি একরকমভাবে কেটে গিয়েছিল,। তার জন্যে যে-সব কষ্ট, গ্লানি ও পীড়া আমাকে ভোগ করতে হয়েছিল, সে-সব আমি স্বাভাবিক বলেই মেনে নিয়েছিলাম। ওদের খিস্তিখেউড় অশ্লীল গল্প, পরস্পরকে নিম্নাঙ্গ প্রদর্শন এবং রাত্রে আলোকিত হাজতঘরের মধ্যেই কম্বলের আড়াল রাখবার চেষ্টা করে ওদের সমকামী আচার আচরণ হাসি ইশারা গোঙানি এবং আর্তনাদ সবই একটা স্বাভাবিক দুর্যোগের মতো ভাবতে চেষ্টা করছিলাম। আর যেহেতু মন অত্যন্ত ছোঁয়াচে রোগের মতোই অধিকাংশ সময় কোনো-কিছু দর্শনে স্মৃতির অন্ধকার দেওয়ালে এক-একটা ঝলক দেখতে পায়, সেইরকম কোনো কোনো সমকামিতার ঘটনা আমার মনে পড়ছিল। যেমন আমাদের শহরের স্কুলের মাস্টার প্রিয়তোষ আর ছাত্র খোকন, কিংবা—যাক, সে-কথা, অর্থাৎ আমাদের আশেপাশে সচরাচর যা ঘটে থাকে, সেইসব ঘটনা ও ঘটনার চরিত্রদের কথা আমার মনে পড়ছিল। এবং একসময়ে অন্ধকার টানেলের ভিতর দিয়ে এসে যেমন হঠাৎ-আলোর সামনে পড়া যায়, তেমনিভাবে নীরাকে আমার আলিঙ্গনে আবিষ্কার করেছিলাম—যে-আলিঙ্গন আমার স্ত্রীকে, সমাজকে, পার্টিকে এবং গভর্নমেন্টকে ফাঁকি দিয়ে অর্জন করতে হয়। আর নীরাকে মনে

পড়ায়, শেষরাত্রের দিকে যেটুকু বা আমার একটু ঘুমের আশা ছিল সেটুকু তিরোহিত হয়েছিল। যদিও তখন ছেলে তিনটি গভীর নিদ্রায় ডুবে গিয়েছিল। দোতলার হাজতঘর থেকে লালবাজারকে স্তব্ধ মনে হচ্ছিল, তবু তখন আর-একটা বন্দী জীবনের নানান পীড়া, গ্লানি, অস্বস্তি, অশান্তি আমাকে কাতর করছিল। এবং আবার নতুন করে একটা স্বাভাবিক দুর্যোগের কথা আমার মনে হচ্ছিল, যে-দুর্যোগ প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই ঘটে, আর আমার নিজেরই জীবনের কার্য-কারণের গতিপ্রকৃতির দরুন নিরুপায় অবস্থায় দুর্যোগ পার হয়ে যেতে হয়।

রাজনৈতিক মতবাদ যেমন একটি সৎ ও বলিষ্ঠ বিশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, নীরাকে ভালোবাসাও তেমনি এবং পার্টিকে অন্ধের মতো অনুসরণ করা বা ধর্মীয় গোঁড়ামির মতো মেনে নেওয়া একটা অসৎ দুর্বলতা, ভীরুতা, তেমনি এই সমাজের বৈবাহিক বা পারিবারিক নিয়ন্ত্রণগুলোকেও মেনে নেওয়ার মধ্যে পাপ লুকিয়ে আছে। তাই নীরার আর আমার মাঝখানেও শাসন, সন্দেহ, আইন, জেলখানা, পুলিশ-সুপার, ইন্সপেক্টর, ইনভেস্টিগেশন, স্বীকারোক্তি, জিজ্ঞাসাবাদ, ভয়-দেখানো, স্নায়ুকে খোঁচানো, সবই আছে। এবং সেখানেও নানান প্রক্রিয়ায় উত্ত্যক্ত করার ব্যবস্থা আছে।

অতএব সামগ্রিক মুক্তির সাধনায় আমার অস্তিত্ব নিয়োজিত, তাই বহুবিধ কল্পনা আমার আশ্রয়।

তার পরে গতকাল সকালবেলা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। অত্যধিক পান খেয়ে খেয়ে ছুঁচলো মোটা ঠোঁট, দাঁত নোংরা হয়ে গিয়েছে, কালো মুখ, মোটা লেন্সের চশমা, এইরকম মাঝবয়সী একজন অফিসার কতগুলি মামুলি প্রশ্ন করেছিল—যার জবাব আমি বহুবার দিয়েছি। নাম, ধাম, পেশা, পিতৃ-পরিচয়, বংশ-পরিচয়, পার্টিতে কত সালে এসেছি (পার্টিতে কোনোদিন আসিই নি, এই আমার জবাব ছিল), কোন্ কোন্ নেতাকে আমি চিনি, তারা কে কোথায় আছে (আমি জানি না, এই আমার জবাব) ইত্যাদি। কিন্তু অফিসারটি নিতান্ত যেন কর্তব্য করেই যাচ্ছিল, এমনিভাবে প্রশ্ন করছিল, অন্যমনস্কভাবে ফাইল উলটেপালটে দেখছিল, আর এক-একটা প্রশ্ন করছিল। আমার মনে হচ্ছিল, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কন্যাদায়গ্রস্ত।

ঘণ্টা-দুয়েক পরেই আমাকে সেন্ট্রির পাহারায় আবার লক-আপে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তখন সেই ছেলে তিনটে আর ছিল না। আমি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছিলাম। আধ-ঘণ্টা বাদেই তালা খোলার শব্দে ফিরে তাকিয়ে দেখেছিলাম, সেই অদ্ভুত চরিত্রের বন্দীকে ঢুকিয়ে দিয়ে গেল—যাকে আমার উন্মাদ বলেই মনে হয়েছিল, যদিও উন্মাদ অপরাধীদের জন্যে আলাদা গারদ আছে। লোকটার সঙ্গে আমার কোনো কথাই হয় নি। কথা বলবার যোগ্য পাত্র সে ছিল না। এমনও হতে পারে, পাগলামিটাই লোকটার ভান, হয়তো স্পাই, কাছ থেকে আমাকে নিরীক্ষণ করা বা অনুধাবন করাই তার কাজ। শুধু যে সরকারী গোয়েন্দাই হতে পারে তা নয়, পার্টির স্পাই হওয়াও বিচিত্র নয়। হয়তো পার্টিই এই লোকটিকে পুলিশের কাছে ধরা দিয়ে আমার সান্নিধ্যে আসার নির্দেশ দিয়েছে, আমার

গতিবিধি, মানসিক অবস্থা, স্বীকারোক্তি করি কিনা এইসব জানতে। কারণ পার্টির পরিচালকেরা জানে তাদের নীতি ও কৌশল সম্পর্কে আমার মতভেদ আছে। সরকারীই হোক আর পার্টিরই হোক স্পাইমাত্রকেই আমার যেন সরীসৃপ-জাতীয় জীব মনে হয়, আমি এদের কাছে কখনোই স্বচ্ছন্দ বোধ করি নে, কেমন যেন গা ঘিনঘিন করে, ভয় ও ঘৃণা হয়। আবার এমনও হতে পারে একটা পাগলকে সারা দিনরাত্রির জন্যে কর্তৃপক্ষ ইচ্ছে করেই আমার ঘরে ঢুকিয়ে দিয়েছিল সেই একই উদ্দেশ্যে, আমাকে উত্ত্যক্ত করে মানসিক ভারসাম্য হারাবার অবস্থায় নিয়ে যাওয়া।

লোকটার ভাবভঙ্গি ব্যবহার, মাঝে মাঝে কাছে এসে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকা, ফিসফিস করা, বিড়বিড় করা, ধপাস করে আমার গা ঘেঁষে শুয়ে পড়া এবং হাত দিয়ে আমাকে স্পর্শের উদ্যোগ করা, হঠাৎ হেসে ওঠা সব মিলিয়ে বিশ্রী উত্ত্যক্ত করেছিল। আমি চোখ বুজতে পারি নি সারারাতে। নানান রকম ভেবেছিলাম। লোকটা যদি আমাকে কামড়েই দেয় বা খামচে দেয়। কত কী-ই করতে পারত! গতকাল সন্দেহ আর উৎকণ্ঠায় আমার রাত্রি কেটেছে। মনে মনে আমি একটা দুর্যোগের কল্পনা করেছিলাম।

আজ ওরা আমাকে এস বি সেল-এ নিয়ে এল। আজ বাইশে ডিসেম্বর। আসন্ন বড়দিনের উৎসবের ছোঁয়া লেগেছে কলকাতায়, লালবাজার থেকে জীপে যেতে যেতে আমার মনে হচ্ছিল। যদিও কলকাতাকে আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। এমনিতেই কলকাতাকে আমার নীরক্ত মনে হয়। তার ওপরে আমার মনের মধ্যে উদ্বেগ ও দুশ্চিন্তা। আমার দু-পাশে সশস্ত্র প্রহরী। ড্রাইভারের পাশে একজন যুবক অফিসার, যে আমার সঙ্গে একটি কথাও বলে নি, ভালো করে তাকিয়েও দেখে নি। সে লুব্ধ দু-চোখ ভরে চৌরাঙ্গি এলাকাকে যেন গিলছে। আসন্ন বড়দিনের স্বপ্ন তার চোখে। আর, বিশেষ করে কলকাতার এই অংশটাকে আমার সব থেকে বেশি নীরক্ত ও প্রাণহীন বলে মনে হয়।

যদিও প্রশ্ন ও জবাব বিধিবহির্ভূত, তবু আমি জিগ্যেস করলাম, 'এখন কোথায় যাচ্ছি?'

প্রায় এক মিনিট বাদে, যখন জবাবের প্রত্যাশা প্রায় নিঃশেষ, তখন অফিসার মুখ না ফিরিয়েই বলল, 'এস বি অফিস।'

স্পেশাল ব্রাঞ্চের অফিস। জিগ্যেস করলাম, 'আবার আমি ফিরে যাব?'

জবাব: 'না, এস বি সেল-এ থাকতে হবে।'

লালবাজারেরটা লক-আপ। সেল শুনে জিগ্যেস করলাম, 'সেখানেও কি লাল-বাজারের মতোই?'

রাস্তায় একঝাঁক মেয়ের দিকে অফিসার তাকিয়ে ছিল। অন্য সময় হলে হয়তো আমিও মেয়েদের তাকিয়ে দেখতাম, খুশী হতাম। মেয়েদের ঝাঁকটা হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে চলেছে। হয়তো বেড়াতে কিংবা বড়দিনের বাজার করতে চলেছে। কিন্তু ওদের নিয়ে আমার চিন্তা বিস্তৃত হলো না। জবাবের প্রত্যাশায়

অফিসারটির ঘাড়ের দিকেই আমার দৃষ্টি।
মেয়েদের দলটা পার হয়ে যাবার পর জবাব এল, 'না, সেখানে এক-একজনের এক-একটা ঘর।'
কথাটা শোনামাত্রই মনটা খুশী হয়ে উঠল। এক-একজনের এক-একটা ঘর। সেখানে আর কেউ থাকবে না। কয়েকদিন লালবাজার লক-আপ-এ নানান ধরনের অচেনা লোকদের সঙ্গে থেকে, সবসময় বাতি জ্বালানো, প্রস্রাবের দুর্গন্ধ আর দেওয়ালের অশ্লীল লেখা, 'ও ছুঁড়ি, তোর দাঁড়কাকে গাল খাবলে খাবে' (সম্ভবত এটা কোনো গানের কলি), অনেক নাম, তারিখ, প্রধানত যৌন-বিষয়ক আনন্দের ব্যাখ্যা, অনেক গানের কলিও তাই এবং আনাড়ী হাতের একই বিষয়ের ছবি, দেখে দেখে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। আশ্চর্যের ব্যাপার এই, দেয়ালের অনেক লেখা এবং ছবিই পেন্সিলে বোলানো। অথচ পেন্সিল কোনো কয়েদীর কাছেই থাকা উচিত নয়। হাজতে থাকার সময় লজ্জা নিবারণের জামাকাপড় ছাড়া বন্দীর কাছে আর কিছুই থাকবার নিয়ম নেই। ধূমপান নিষিদ্ধ। লক-আপ-এর বাইরে গিয়ে খেতে হয়। ভিতরে কিছুই থাকবে না। এমনকি নিজের ঘড়ি আংটি টাকা-পয়সা সবই জমা দিয়ে দিতে হয়। এক টুকরো কাগজ থাকাও নিষেধ। বন্দী যাতে আত্মহত্যা করতে না পারে বা বাইরের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো ব্যবস্থা না করতে পারে, সেজন্যেই নাকি এত বিধিনিষেধ। এরকমই আমি শুনেছিলাম।
আমার জিগ্যেস করতে ইচ্ছে করল, সেই একলা ঘরটায় আমি ধূমপান করতে পারব কিনা, খবরের কাগজ দেখতে পাব কিনা—নিদেন কোনো বই, ছাপার অক্ষরে যে-কোনো জিনিস, যা পড়তে পারা যায় এবং জিজ্ঞাসাবাদের শাস্তি এবার শেষ হবে কিনা।
কিন্তু জিগ্যেস করার আগেই গাড়িটা লর্ড সিনহা রোডের একটা বাড়ির উঠোনে ঢুকে পড়ল। একটা গাছতলায় গাড়ি দাঁড়াতেই আমাকে নামতে বলা হলো। নামতেই প্রকান্ড পুরনো ধরনের বাড়িটার ভিতরে আমাকে অফিসারটি নিয়ে গেল। দিনের বেলাও সব ঘরেই আলো জ্বলছে। দেখলেই বোঝা যায়, দেয়াল খুব মোটা। উঁচু ছাদ আর বড় বড় ঘর। বাড়ির ভিতরটা বেশ কর্মমুখর। য়ুনিফর্ম আর সাদা পোশাক পরা অনেক লোক চলাফেরা করছে, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে কথা বলছে বা বসে বসে কাজ করছে। কারুর হাতে ফাইল, কেউ খালি হাতে। কোথাও তেমন সাজানো-গোছানো কিছু নেই। নিতান্তই যেন কাজ চলা গোছের টেবিল চেয়ার বেঞ্চ কোনো কোনো ঘরে রয়েছে। কোনো কোনো ঘর ফাঁকা। অবিশ্যি কোনো কোনো ঘরের দরজায় দামী পরদা, ভিতরে উজ্জ্বল আলোর ঝলকও দেখতে পেলাম। সম্ভবত বড় অফিসারদের ঘর সেগুলো।
একটা বাড়ি পেরিয়ে আবার একটা বাঁধানো উঠোন এবং সেখানেও কয়েকটা গাছ। গাছে পাখিরা জটলা করছে। আমার ভালো লাগল। লালবাজারের সেই দোতলার হাজতঘর থেকে বেরিয়ে এখানে এসে আমার মনটা খুশী হয়ে উঠল। সেখানে ঘরের ভিতর থেকে বারান্দার দিকে ঘিঞ্জি জালে ঘেরা ফাঁক দিয়ে একটা উঁচু বাড়ির মাথায় দু-তিন ফুট আকাশ দেখতে পেতাম মাত্র। ঘরের অন্যান্য বন্দীদের জন্যে

সেই ছোট্ট জালের হিজিবিজি-আঁকা আকাশ দেখবার অবকাশও কম হতো। এখানে উঠোনে শুকনো পাতা ছড়ানো। এখানে-ওখানে পাখির বিষ্ঠা। আমি এ-সবই দু-চোখ ভরে দেখলাম। চোখ তুলে গাছের দিকে তাকালাম। শুধু কাক শালিক নয়, কয়েকটা পায়রাও রয়েছে। যদিও উঠোনের ওপারেই পুব দিকে আর-একটা তিনতলা প্রকাণ্ড বাড়ি মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, তবু নীল আকাশ অনেকখানিই দেখা যায়। আর আকাশটার দিকে চোখ রাখতে আমার অবস্থা যেন ব্রীড়াময়ী সলজ্জ প্রেমিকার মতো হয়ে উঠলো। হয়তো আমার চোখে ঠাণ্ডা লেগেছে বা যে-কোনো কারণেই হোক, এত ঔজ্জ্বল্য আমার চোখে সইছে না, তাই চোখের পাতা বুজে যাচ্ছে। অথচ প্রাণভরে দেখতে ইচ্ছে করছে। এস বি সেল কি এই তিনতলা বাড়িতেই ? আমি কি এখানেই থাকব ?

—এই দিকে।

তিনতলা বাড়ির একটা দরজার কাছ থেকে অফিসারটি আমাকে ডাকল। বাড়ির ভিতরটা অন্ধকার দেখাচ্ছে। আমি ভিতরে ঢুকলাম। এ-বাড়িটাও পুরনো। হয়তো শতাধিক বছর বয়স হবে। ভিতরটা কনকন করছে ঠাণ্ডায়। বাড়িটার বুড়ো বয়সের গন্ধ পর্যন্ত টের পাওয়া যায়। মেঝের ঠাণ্ডা যেন আমার জুতোর সোল ফুঁড়ে স্পর্শ করছে। গায়ের চাদরটা আমি আর-একটু ভালো করে জড়ালাম। প্রায় আধো-অন্ধকার এক-একটা ঘর দিয়ে অফিসারকে অনুসরণ করে যেতে লাগলাম।

এখানেও সশস্ত্র ও নিরস্ত্র, য়ুনিফর্ম ও সাদা পোশাক পরা কর্মচারীরা চলাফেরা করছে, কথাবার্তা বলছে। আগের বাড়িটার মতো ভিড় এখানে নেই। আর একমাত্র বৈশিষ্ট্য, এখানে কোনো কোনো ঘরের দরজা বন্ধ, এবং বন্ধ দরজার সামনে একজন করে বন্দুকধারী প্রহরী। আগের বাড়িটাতে আমাকে কেউই তাকিয়ে দেখে নি। এখানে অনেকেই আমাকে তাকিয়ে দেখল। আমার মনে হলো, এই তাকিয়ে দেখার মধ্যে একটা শিকারীর তীক্ষ্ন অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি রয়েছে। আমাকে দেখার পর প্রত্যেকেই যুবক অফিসারটির সঙ্গে চোখাচোখি করছে। সেই দৃষ্টি বিনিময়ের মধ্যে তাদের যে কী নিঃশব্দ কথার আদান-প্রদান হচ্ছে, আমি বুঝতে পারলাম না। একটা-কিছু কথা আদান-প্রদান হচ্ছে, সেটা অনুমান করা যায়।

এ-বাড়ির আবহাওয়া একটু যেন অন্যরকম। ঠিক নিশ্চুপ নয়, অথচ একটা স্তব্ধতা যেন বিরাজ করছে। এক-একজনের মুখ কেমন একটা ক্রুর উত্তেজনায় ঝলকাচ্ছে। কেন কে জানে। যেতে যেতে আমার সামনেই হঠাৎ একটা বন্ধ ঘরের দরজা খুলে গেল। একজন খুব দ্রুত বেরিয়ে গেল সেই ঘর থেকে। সান্ত্রী দরজাটা টেনে দেবার আগেই চকিতে আমার চোখে পড়ল, ঘরের মাঝখানের টেবিলে একজন যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছে দু-হাত ছড়িয়ে, আর একটা কালো কম্বল টেবিলের ওপর থেকে মেঝেয় লুটোচ্ছে। আমি দরজাটা পার হয়ে যেতেই অন্য দিক থেকে আর-একটি লোককে তাড়াতাড়ি আসতে দেখলাম। তার চোখে চশমা, গায়ে ওভার-কোট, কোটের পকেট দুটো যেন অনেক মালপত্রে মোটা হয়ে আছে। আর হাতে স্টেথিস্কোপ। মনে হলো, লোকটা ডাক্তার। দেখলাম, সে ওই ঘরটাতেই গিয়ে

ঢুকল।

আমার গতি সম্ভবত শ্লথ হয়ে এসেছিল। আমি পিছন ফিরে তাকিয়ে ছিলাম। আমার কাঁধে একটা ঠেলা লাগতেই দেখলাম, অফিসারটি আমাকে আঙুল দেখিয়ে পথনির্দেশ করছে। ভ্রূকুটি বিরক্তি তার মুখে।

আমি তাকে অনুসরণ করে দোতলার সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম। আমার চোখের সামনে টেবিলের ওপর সেই মূর্তিটা ভাসছে। আর ডাক্তারের দ্রুত আগমন ভুলতে পারছি না। কোনো অসুখবিসুখের ব্যাপার নাকি? না কি স্বীকারোক্তির জন্যে··· ? দ্রুত বেরিয়ে যাওয়া সেই লোকটির চেহারা মনে করতে চেষ্টা করলাম। প্রকান্ড চেহারা, উসকোখুসকো চুল, হাতা গোটানো, লোমশ-বুকখোলা শার্ট, আর হাতে ঝোলানো কোট। লোকটা কি স্বীকারোক্তি আদায় করার জন্যে ওকে মেরেছে? যাকে এক মুহূর্তের জন্য খোলা দরজা দিয়ে আমি দেখতে পেলাম, টেবিলের ওপর লুটিয়ে পড়ে আছে? বেত দিয়ে মেরেছে, না কি কম্বল চাপা দিয়ে ভারী রুল দিয়ে পিটিয়েছে? কারণ একটা কালো কম্বলও টেবিল থেকে মেঝেতে লুটোতে দেখলাম। আর কম্বল জড়িয়ে মারার পদ্ধতি কলকাতা পুলিশের আছে। শুনেছি তাতে দেহে কোনো দাগ হয় না। অথচ প্রহার ও পীড়নের সুবিধে হয়।

বন্দীর আঘাত কি খুব বেশি হয়েছে, অজ্ঞান হয়ে গিয়েছে, তাই তাড়াতাড়ি গিয়ে ডাক্তার পাঠিয়ে দিল?

—দাঁড়ান।

আমাকেই বলা হলো। ওপরে উঠেই বাঁ দিকে টেবিলের সামনে চেয়ারে একজন ফর্সা মোটা মাঝবয়সী লোক বসে ছিল। আমাকে যে নিয়ে এলো সেই অফিসারটি নিচু হয়ে নিচু গলায় কী যেন বলল মোটা মাঝবয়সীকে। মোটা মাঝবয়সী একবার আমার দিকে তাকিয়ে তার হাতের পেন্সিল দিয়ে এক দিকে নির্দেশ করল। অফিসারটি আমাকে ডাকল, 'আসুন'।

অনুসরণ করলাম। সামনেই ডান দিকে পর পর কয়েকটি দরজা। একটা ভেজানো দরজা ঠেলে আমাকে ভিতরে যেতে নির্দেশ করে সে বলল, 'আপনি একটু বসুন।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'এটা কি সেল?'

'না।' বলেই সে চলে গেল।

একজন সান্ত্রী এসে দাঁড়াল এবং দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। এটা সেল নয়। একটি টেবিল, দুটি চেয়ার, এই মাত্র আসবাব। ঘরের মেঝে পুরনো, দেয়ালও তাই। ঘরের মধ্যে যেন দলা দলা শীত জমে ছিল। ঢোকা মাত্রই তারা আমাকে জড়িয়ে ধরল। আমার গায়ের মধ্যে কাঁটা দিয়ে উঠল, কেঁপে কেঁপে উঠল, এবং হঠাৎ শিরদাঁড়া শিউরিয়ে ছলাৎ করে যেন এক-ঝলক রক্ত উঠে এল আমার মাথায়। স্বীকারোক্তি! আবার স্বীকারোক্তি!

এটা জিজ্ঞাসাবাদের ঘর। অবিকল সেই নিচের ঘরটার মতোই, যে-ঘরে সেই বন্দী পড়ে আছে। আমার শীতের কাঁপুনিটা বোধহয় এই কারণেই, ওই একটি মুহূর্তের

দুশ্যের জন্যেই। আমাকেও হয়তো স্বীকারোক্তির জন্যে…
একটাই মাত্র জানালা আছে ঘরটিতে। দেয়ালের অনেক উঁচুতে আমার মাথা ছাড়িয়ে। শুধু আকাশই দেখা যায়। আমি একটা চেয়ারে বসলাম। দাঁড়াতে পারছি না, ভীষণ শীত করছে, কাঁপুনিটা বুকের কাছে উঠে এসেছে। হাতে পায়ে তেমন যেন বল নেই। পা তুলে টেবিলটা চেপে ধরে, শক্ত হয়ে, গুটিশুটি হয়ে বসলাম।
তার পরে প্রথমেই আমার মনে পড়ল, আমার চুলের মুঠি আমার বাবার হাতে, ভীষণ লাগছে। গাল দুটো জবালা করছে থাপ্পড়ের ঘায়ে। বাবার খালি গা, পেশল শক্ত শরীর ও ক্রুদ্ধ মুখটা মনে হচ্ছে বাঘের থেকে ভয়ংকর, সিংহের থেকে হিংস্র। গলায় হিংস্র জিজ্ঞাসা : 'বল্, ইস্কুল পালিয়ে কোথায় গেছিলি? নৌকো বাইতে? মাছ ধরতে? বল্ বল্ বল্। তা নইলে খুন করব আজ তোকে।'
তার পরেই মনে পড়ল, ঢাকা শহরের সেই প্রায়ান্ধকার গলিটার কথা, যেখানে মাত্র একটি কেরোসিনের লাইটপোস্ট ছিল, এবং তিনজন বন্ধু আমাকে ঘিরে ছিল। পার্টির বন্ধু। আজকের এই পার্টি নয়, অন্য পার্টি, সশস্ত্র গুপ্ত বিপ্লবী পার্টি। তিনজনেরই চোখমুখ ভীষণ নিষ্ঠুর আর হিংস্র দেখাচ্ছিল। সকলেই আমরা সমবয়সী, ষোলো সতেরো আঠারোর মধ্যেই সকলের বয়স। বন্ধু তিনজনের জিজ্ঞাসা, আমি রায়বাহাদুর বিরাজমোহনের বাড়ি বেড়াতেই যাই কি না, কেন যাই এবং বিরাজমোহনের নাতনী অলকাকে আমি সমিতির কথা বলেছি কি না।
'আমরা জবাব চাই।' ওরা তিনজনেই রুদ্ধশ্বাস ক্রুদ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করল।
বিরাজমোহনকে আমি কোনোদিনই দেখি নি, কিন্তু তাঁদের বাড়িতে যাই। এই যাওয়াটা নিষিদ্ধ, কারণ বিরাজমোহন পার্টির বিচারে বিশ্বাসঘাতক, শত্রু। আমি তাঁর কাছে যাই না, তাঁদের বাড়ির ছেলেমেয়েদের কাছে যাই, কারণ ভালো লাগে, তারা সকলেই খুব ভালো। বিরাজমোহনের নাতি-নাতনী বলে তাদের কোনো দোষ নেই, তারা বিশ্বাসঘাতক নয়। আর অলকার সঙ্গে আমার প্রেম (অন্তত সেই বয়সে, সেটাই আমাদের বিশ্বাস ছিল। অলকার বয়স তখন বারো, দেখতে বেশ সুন্দর ছিল, আমরা হাতে হাত ধরতাম. অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'আগুন নিয়ে খেলা'র নায়ক-নায়িকার মতো চুমো খাবার চেষ্টা করতাম, ইত্যাদি), তাকে আমার জীবনের সব গোপনীয়তাই প্রকাশ করে দিই। বিশ্বাস করি বলেই বলেছি। পার্টির বন্ধুরা ঠিক প্রশ্নই করেছিল, তারা ঠিক সন্দেহই করেছিল। কিন্তু ওরা আমার এবং অলকাদের ওপর অবিচার করছে, অন্যায় করছে, তাই আমি অস্বীকার করলাম, 'এ-বিষয়ে কিছুই জানি না।'
প্রথমে নরেশ দুম করে একটা ঘুষি মারল আমার চোয়ালে। বলল, 'এখনো সত্যি কথা বল্।'
'জানি না।'
সঙ্গে সঙ্গে তিনজনেই মারতে আরম্ভ করল। বলতে লাগল, 'ট্রেইটার! স্পাই। ওকে খুন করে বুড়িগঙ্গায় ফেলে দিয়ে আসতে হবে।'
আমার নাক দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। এমন সময়ে কারা যেন গলিতে

ঢুকল। লোকজনের সাড়া পেয়ে বন্ধুরা অন্ধকারে দৌড়ে কে কোথায় চলে গেল। আমিও হাঁপাতে হাঁপাতে একদিকে চলতে লাগলাম। লোকজনের কাছে বাইরে আমি কিছু জানাতে চাই না। যদিও ওরা নিশ্চয়ই লক্ষ রেখেছিল, আমি কোথায় যাই। আমি বুড়িগঙ্গার ধারেই গেলাম। কারণ জল দিয়ে মুখ-চোখ ধোবার দরকার ছিল।

এর পরেই আমার মনে পড়ল, আমার স্ত্রী আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমার বুকের কাছে জামাটা সে খামচে ধরে আছে। হিংস্র রাগে ওর চোখ, ওর মুখ জ্বলছে। আমি সিঁড়ির কাছে, অদূরেই বাড়ির ঝি ঘর মুছছে ন্যাতা বুলিয়ে, যদিও তার হাত ঠিক কাজ করতে পারছে না, নত মুখ, নত চোখের দৃষ্টি, এদিকে এবং আমার মা ঘরের ভিতর থেকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন। স্বীকারোক্তির জন্যে ও আমার জামায় হ্যাঁচকা টান মেরে ফুঁসে উঠল, 'বল, কাল তুমি নীরার সঙ্গে দেখা করেছিলে কিনা।'

আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ওর চেহারাটা আরো ভয়ংকর হয়ে উঠল। আমাকে একটা ধাক্কা মেরে বলল, 'বল, ওকে তুমি ভালবাসো? কেন ভালবাসো? বল বল বল।'

ওর কষ্ট, কষ্টের জন্যে হিংসা, হিংসা থেকে রাগ, রাগ থেকে ঘৃণা এ সবই আমি বুঝতে পারছি, এবং নীরাকে আমি ভালবাসি, নীরার সঙ্গে দেখাও করে থাকি। কিন্তু কেন, এর জবাব, ছেলেবেলায় ইস্কুল পালানোর মতোই, অলকাদের সঙ্গে মেশার মতোই, এবং আজকের এই বিপ্লবী পার্টিতে যোগ দেবার মতোই অপ্রতিরোধ্য ও কোনো ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। আমি চুপ করেই রইলাম, জামাটা ছাড়িয়ে নিতে চাইলাম।

ও একটা অস্বাভাবিক ক্রুদ্ধ স্বরে চিৎকার করে উঠল, আর দু-হাত দিয়ে আমার জামাটা ছিঁড়ে ফালা করে দিল।

এবার আমার মনে পড়ল, পার্টির লোকাল অ্যাকশন কমিটির তলব। মাত্র মাস-দুয়েক আগের কথা, অ্যাকশন কমিটি আমাকে ডেকে পাঠাল। অ্যাকশন কমিটি মানে, পার্টির আর্মস অ্যামুনিশন যাদের তত্ত্বাবধানে, যারা শত্রুকে চিহ্নিত করে ও পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেয় আর কর্মীদের অপরাধের বিচার করে।

সেই এক জনবিরল লোকালয়, পুরনো বাড়ির দোতলা, প্রায়ান্ধকার ঘর। পাথরের মূর্তির মতো নিরেট শক্ত মুখ নিয়ে পাঁচজন বসে আছে। অ্যাকশন কমিটি। ক্যুরিয়র আমাকে পেঁাছে দিয়ে গেল, বাইরে থেকে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিল। আমি অ্যাকশন কমিটিকে পার্টির নিয়মতান্ত্রিক অভিবাদন করলাম। কিন্তু কেউই প্রত্যভিবাদন জানাল না। আমাকে শুধু তাদের মুখোমুখি বসতে ইঙ্গিত করা হলো।

মিহির, অ্যাকশন কমিটির নেতার এই ছদ্ম নাম, যার স্মার্টনেস, সাহস, চেহারা, বাক্‌ভঙ্গির খুবই নাম আছে পার্টির মধ্যে। বোনাপার্ট বলে সবাই যাকে আদর করে, কারণ তার চেহারার সঙ্গে নাকি নেপোলিয়ানের বিশেষ সাদৃশ্য আছে, এবং জিমনাসিয়ামের ক্রীড়ায় বেশ পটু ও স্বভাবতই তার শার্ট-খোলা বুকের ও চলা-

বসার ভঙ্গি দৃষ্টি-মুগ্ধকর, যার চোখ তীক্ষ্ন ঈগলের মতো, আর একদম হাসে না; যেটা নিয়ে সবাই বিস্মিত প্রশংসায় ও শ্রদ্ধায় স্তব্ধ, কারণ মিহিরকে কেউ হাসতে পর্যন্ত দেখে নি। আমার ধারণা, মিহির আত্মসচেতন, অনেকটাই ভঙ্গিসর্বস্ব অ্যাডভেঞ্চারার। সে-ই আমাকে জিগ্যেস করল, 'উম্-ম্ম্—হ্যাঁ, কমরেড। অ্যাকশন কমিটি আপনার কাছে জানতে চাইছে, ধ্রুবকে আপনি কোনো শেলটারের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন কিনা। তার আগে জানতে চাই, পি সি এগারো-শো বাই বারো আট উনপঞ্চাশ নম্বরের সার্কুলার আপনাদের সেল-এ পৌঁছেছিল কিনা, এবং আপনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন কিনা।'

মিহিরের চোখ থেকে যেন একটি ঘৃণামিশ্রিত বিদ্রূপের ঝিলিক আমাকে হানল, এবং বাকি সকলেরই তাই।

মিহির যা-যা জিগ্যেস করল, সবই সত্যি। গোপন সার্কুলারে ঘোষণা করা হয়েছিল: 'ধ্রুবকে কতকগুলি বিশেষ কারণে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। পার্টির বিশেষ স্বার্থে কারণগুলি এখন ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সভ্যদের সবাইকে জানানো যাচ্ছে, ধ্রুবর সঙ্গে যেন কেউ কোনোরকম সম্পর্ক না রাখেন, এমনকি বাক্যালাপ না করেন, করলে পার্টিবিরোধী কার্যকলাপের জন্যে তাঁকেও শাস্তি পেতে হবে, ইত্যাদি।' আমি সে-সার্কুলার পাঠ করেছিলাম, কিন্তু ধ্রুবকে আশ্রয়ও সত্যি দিয়েছিলাম। কারণ আমি জানতাম, প্রকৃত দেশপ্রেমিক, বিশ্বাসী সৎ পার্টি-জান, চিন্তাশীল, বিবেকবান ধ্রুবর সঙ্গে জেলার একজন নেতা ও অ্যাকশন কমিটির মিহিরের ব্যক্তিগত বিরোধের ফলে তাকে পার্টি থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা চলছিল। তাকে স্পাই আখ্যা দেবার ষড়যন্ত্র চলছিল, এবং সেটা কার্যকরীও করা হয়েছে। অথচ ধ্রুব একজন আন্ডারগ্রাউন্ড কর্মী, পুলিশ তার জন্যে হন্যে হয়ে ফিরছে। এ-অবস্থায় তাকে পার্টি থেকে বের করে দিয়ে নির্দেশ দেওয়া হলো, আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে সে বেরিয়ে পড়ুক। অর্থাৎ পুলিশের হাতে চলে যাক। পার্টি থেকে বহিষ্কার মানেই আন্ডারগ্রাউন্ডের আশ্রয় তাকে ছেড়ে দিতেই হবে। তাহলেই পুলিশ তাকে ধরতে পাবে, এবং ধরলেই, যেহেতু ধ্রুব একজন নেতৃস্থানীয় কর্মী, পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হবার আগে যে প্রকৃতই একজন জননেতা ছিল, তাকে পুলিশ নানানভাবে পীড়ন করবে কথা আদায় করবার জন্যে। এক দিকে পার্টি থেকে বহিষ্কার, অন্য দিকে পুলিশের পীড়ন, দুইয়ে মিলে স্বভাবতই মানসিক শক্তিতে ভাঙন ধরতে পারে, স্বীকারোক্তিও করে ফেলতে পারে।

এ-অবস্থায় ধ্রুব আমার কাছে এসেছিল। পার্টির আন্ডারগ্রাউন্ডের আশ্রয় ছেড়েই সে আমার শরণাপন্ন হয়েছিল, কেঁদে ফেলেছিল, এবং বলেছিল, 'আমি আত্মহত্যা করতে পারি, তবু পুলিশের কাছে ধরা দিতে পারব না। মিহির আর যতীন (জেলা কমিটির নেতা) প্ল্যান করে আমার এই সর্বনাশটা করছে, তারা আমাকে পুলিশের হাতে তুলে দিতে চাইছে। অথচ বিশ্বাস কর, কোনোরকম নেতৃত্বের মোহ আমার নেই, আমি শুধু কোনো কোনো ক্ষেত্রে ওদের কর্মপদ্ধতির সমালোচনা করেছিলাম। ওরা সেটা সহ্য করতে পারছে না বলেই আমাকে এভাবে বের করে দিচ্ছে।'

সৎ ধ্রুবকে আমি দেখলাম, সে অসহায়। আমি তাকেই বিশ্বাস করি। মিহিরের অতীতকে আমি জানি না, তাকে ওপর থেকে আমাদের এলাকায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, সে বাইরে থেকে এসেছে। আমি ধ্রুবকে চিনি, বুঝি, বিশ্বাস করি এবং তাকে এভাবে ক্ষুধার্ত নেকড়েদের মুখে এক-টুকরো মাংসের মতো আমি ছুঁড়ে দিতে পারি না। আমি তাকে আশ্রয় দিয়েছি, কিন্তু আমার উপায় নেই, অ্যাকশন কমিটির কাছে আমাকে অস্বীকার করতেই হবে। স্বীকার করলে আমার ওপর নির্দেশ অমান্যের শাস্তি নেমে আসবে তো বটেই, ধ্রুবকেও বাঁচানো যাবে না। এখন এই অ্যাকশন কমিটির কাছে বিশ্বস্ত থাকা বিবেকহীন দাস মনোবৃত্তি ছাড়া আর কিছু নয়। আমি বললাম, 'সেই সার্কুলার আমি পড়েছি। ধ্রুবকে আমি আশ্রয় দিই নি।'

অ্যাকশন কমিটির নিরেট মুখগুলো পরস্পরের দিকে একবার চোখাচোখি করল ; মিহির তার বাক্যবাণ প্রয়োগ করল। হেসে ঘাড় কুঁচকে বলল, 'আপনার মতো একজন খাঁটি কমরেড পার্টির কাছে মিথ্যে কথা বলবে এটা আশা করা যায় না।'

মিহির জানত তার এই ভঙ্গিটা অপরের পক্ষে খুবই ক্রোধের উদ্রেক করে। আমি শান্তভাবেই বললাম, 'আমি মিথ্যে বলি নি।'

'যদি প্রমাণ হাজির করা যায় ?'

'তাহলে তো কোনো কথাই নেই।' আমি জবাব দিলাম।

অ্যাকশন কমিটির পাথুরে মুখগুলো তীক্ষ্ন ধারে ঝলকাতে লাগল, চোখগুলো অঙ্গারের মতো জ্বলতে লাগল। ঘৃণায় হিংস্র দেখাল। সব থেকে কমবয়স্ক যে, যার টেক্ নাম পি পি, সে শাসিয়ে উঠল, প্রমাণ হলে মনে রাখবেন, আপনাকেও ধ্রুবর মতোই পার্টি থেকে বের করে দেওয়া হবে।'

'জানি।' আমি দৃঢ়তা প্রকাশ করলাম।

বিকাশ (ছদ্মনাম) নিষ্ঠুর মুখে, কঠিন গলায় বলল, 'শুধু বের করেই দেওয়া হবে না, তার চেয়েও কঠিন শাস্তি—'

বাকিটা তার চোখের আগুনে ও দাঁতে দাঁত ঘষাতেই বোঝা গেল। ওরা অ্যাকশন কমিটির লোক, হয়তো ওদের প্রত্যেকের কাছেই রিভলভার রয়েছে। ওরা ইচ্ছে করলে আমাকে—

'গত শুক্কুরবার—' মিহিরের দৃঢ় গম্ভীর ও নাটুকে গলা বেজে উঠল, 'গত শুক্রবার রাত্রি সাড়ে-এগারোটা নাগাদ ধ্রুব আপনার কাছে যায় নি ?'

কথাটা মিথ্যে নয় এবং খবরটা কমরেড রেবার (আমার স্ত্রী, পার্টির সভ্যা, অত্যন্ত বিশ্বস্ত, স্ত্রীলোক মাত্রেই যা হয়ে থাকে ভালবাসা ও ধর্মের বিষয়ে যুক্তিতর্কহীন, যদি ধর্ম মানে, এবং বর্তমানে পার্টি, আমার মতে ধর্মীয় দল ও আচার-অনুষ্ঠানের পর্যায়ে পৌঁছেছে, যুক্তি তর্কবোধ বুদ্ধিহীন অলৌকিক বিশ্বাসে আত্মদানে উন্মুখ, আমার স্ত্রী একজন সেইরকম বিশ্বস্ত কমরেড, এবং বিশ্বস্ততার মূলেও ভাল-বাসায় যেহেতু আহত, সে ফণিনীতুল্য) কাছ থেকে শুনেছে।

আমি তবু বললাম, 'না।'

'তাহলে কমরেড রেবা মিথ্যে বলেছেন ?' মিহির বলল বেশ বিদ্রূপের ঢেউ দিয়ে,

একটু অ্যাসিড-হাসির জ্বালা ছিটিয়ে। যেন এর পরে আর আমার স্বীকারোক্তি না করে উপায় নেই। আমি অবশ্য রেবাকে অনুরোধ করেছিলাম, যেন সে এ-খবর পার্টিকে না দেয়। কিন্তু দিয়েছে।

বললাম, 'যদি তিনি বলে থাকেন তবে মিথ্যেই বলেছেন।'

মিহির গর্জন করে উঠল, 'কমরেড, সাবধান, আপনি আর-একজনকে মিথ্যেবাদী করছেন।'

'আমি মিথ্যে বলি নি।'

'শাট্ আপ্ লায়ার।' পি পি ক্রুদ্ধ স্বরে গর্জে উঠল, নিজের উরুতেই একটা ঘুষি মারল।

আর তার মাঝখান থেকে আহত বাঘের মতো গর্জিত গোঙানি ভেসে উঠল মিহিরের গলায়, 'আপনি সেই রাত্রেই একটা চিঠি লিখে, টাকা দিয়ে ওকে কোথাও পাঠিয়ে দেন নি?'

'না।'

'এই ঘৃণ্য মিথ্যে বলার পরিণাম আপনি জানেন?'

'আমি মিথ্যে বলি নি।'

মিহির অসহায় আক্রোশে কী করবে ভেবে পেল না। তার সবল পেশল হাত, মস্ত বড় থাবা অন্ধশক্তিতে কয়েক মুহূর্ত মোচড়াল। তার পরে হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'ডিসল্ভ্ দিস্ মিটিং, একে আজ চলে যেতে দিন। আমাদের সিদ্ধান্ত একে পরে জানানো হবে।'

পি পি বা বিকাশের চলে আসতে দেবার ইচ্ছে ছিল না। তবু সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না।

আমি বললাম, 'যেতে পারি?'

মিহির বলল, 'নতুন সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত।'

আমি চলে এলাম। তখনো আমার ছেলেবেলার কথাই মনে পড়েছিল, কৈশোরের যৌবনের ইস্কুল পালানো, অলকাদের সঙ্গে মেশা, নীরাকে ভালবাসা, ধ্রুবকে আশ্রয় দেওয়া এবং—

দরজাটা খুলে গেল। স্বীকারোক্তি। কালো গগল্স্ পরা রাশভারি লোকটি পিছন ফিরে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দিল। বগলে একটা ফাইল। এবার জিজ্ঞাসাবাদ। কিন্তু সেই শিরদাঁড়া-শিউরনো শীতটা এখন আমার আর নেই। ঘাড়ে গর্দানে স্থূলে পেশল লোমশ লোকটি এক টানে গায়ের কোটটা খুলে ফেলল। ফাইলটা টেবিলে রাখল। মোটা স্বর শোনা গেল, 'এখানে এসে আপনার বডি সার্চ হয়েছে?'

'না।'

'দাঁড়ান।'

দাঁড়ালাম। লোকটা আমার শূন্য পকেটগুলো, কোমর, পেট, চাদর ঝেড়ে দেখে নিল।

'বসুন।'

বসলাম। গগল্‌স্‌টা খুলল সে। চোখের পাতায় লোম নেই, কোলগুলো রক্তাভ, অনেকটা কাঁচা ঘায়ের মতো। চেয়ারে বসে ফাইলের পাতা উলটে যেতে লাগল, আর মোটা স্বরে হুম্‌ হুম্‌ করতে লাগল। তার পরে আচমকা জিগ্যেস করল, 'কিছু বলবেন, না বলবেন না ?'

'কোন্‌ বিষয়ে ?' আমি বললাম।

লোকটা শব্দ করল, 'হুম্‌ !'

মোটা ঠোঁট দুটো চেপে বসল ওর। তার পরে সেই রক্তাভ চোখ দুটি তুলে নিষ্পলক তাকাল আমার দিকে। লোকটার মুখটা যেন ফুলে উঠছে, চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে। আর আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল, ধলেশ্বরীতে ঝড় উঠব-উঠব করছে, আকাশ কালো হয়ে উঠছে, বায়ুকোণে চিকুরহানা বাজের দূর গর্জন। ছোট নৌকো, আমি আর মা যাত্রী, গন্তব্য মামাবাড়ি, একমুখ দাড়িওয়ালা মাঝি পবন। মা আমাকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে বুকের কাছে। চোখে আতঙ্ক। ডাক দিল, 'পবন !'

পবন তখন হাঁক দিচ্ছিল, 'রও হে, আর দশ ঠেলা !'

সে ঝড়কে বলছিল, আর দশবার হাল ঠেললেই তীরে পৌঁছুবে। নৌকোটা অসম্ভব দুলছিল বাতাসে নয়, পবনের হালের চাড়ে।

'গুরু গুরু গুরু !' মা বলছিল।

'কোন্‌ বিষয়ে, অ্যাঁ ?' লোকটা গোঙানো সুরে উচ্চারণ করল। ঘেয়ো রক্তাভ চোখগুলো অপলক।

একটা আর্তনাদের স্বর ভেসে এল ধলেশ্বরীর তীর থেকে, আর গাছগুলো নুয়ে পড়ল। ঝড়ের আঘাতে পৃথিবীর আর্তনাদ ওটা।

'আর একটুখানি, আই দ্যাওয়া !' পবন চিৎকার করল আবার।

লোকটা ভ্যা-ভ্যা করে হেসে ফেলল।

পবন ঝপাং করে লাফ দিল জলে। চিৎকার করল, 'ডরাইয়েন না মা, বুক জলে।' নৌকোর কাছি পবনের হাতে।

লোকটা বলল, 'আমরা যেমন জিগ্যেস করি, আপনারা সবাই সেরকমই জবাব দেন। সত্যি বলছি, আমি টায়ার্ড, টায়ার্ড। কোনো মানে হয় না, রোজ রোজ সেই একই কথা। জানা কথাই তো বাপু, আপনারা কেউ কিছু বলবেন না। নিন, সিগারেট খান।...কোনো জীবনেই সুখ নেই মশাই। বিপ্লব করেই বা কী সোনার রাজত্ব তৈরি করবেন আপনারা। ইংরেজ আমলে আমরাও অনেক কিছু ভেবেছিলাম। বসুন, আসছি।' কোটটা তুলে নিয়ে ফাইলটা হাতে করে লোকটা চলে গেল। দরজাটা টেনে দিয়ে গেল।

একটা দুর্যোগ গেল। হয়তো আর-একটা দুর্যোগ আসবে, তার পরে আর-একটা, তার পরে...। জীবনব্যাপী দুর্যোগ। তাকে রোধ করা যায় না। যে-বিশ্বে বাস, সেই বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যেই দুর্যোগের নানান কার্যকারণ ইন্ধন, এবং আমি কেন দুর্যোগের মাঝখানে, এর একমাত্র কারণ, আমি যে-কারণে ছেলেবেলায় ইস্কুল পালিয়েছিলাম, আরও কৈশোরে চোদ্দ বছর বয়স হবে তখন, বিধবা বীণাদির

গোপন চিঠি অমরদাকে পে'ছে দিয়েছিলাম, সেই বিষণ্ণ যুবতী বীণাদি পাড়ার ক্লাবের নেতা লাইব্রেরি-স্রষ্টা অমরদাকে ভালবাসতেন, এবং দু-জনের দেখা-সাক্ষাৎ বারণ হয়ে গিয়েছিল, বীণাদির অভিভাবকেরা বীণাদিকে বেরুতে দিতেন না, পাড়ার সব বয়স্ক মানুষেরাই যেন এই দু-জনের বিরুদ্ধে একটা যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, একটা ফ্রন্ট তৈরি করেছিল, পাহারা দেওয়া, গোয়েন্দাগিরি করা, নোংরা রসিকতা ও কুৎসিত কথা বলা, আর স্বভাবতই আমাদের অভিভাবকেরাও ক্লাবে যেতে নিষেধ করেছিল, অমরদার সংস্রব বিষবৎ ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিল, স্বাভাবিকভাবেই আমরা সেটা অন্যায় মনে করেছিলাম, এবং ওই বয়সে হৃদয়ের সকল আবেগ ও সমর্থন অমরদা ও বীণাদির পক্ষে ছিল। আমি বীণাদির চিঠি অমরদাকে পে'ছে দিয়েছিলাম এবং অমরদার চিঠি বীণাদিকে, আর সেই পে'ছে দিতে গিয়েই ধরা পড়েছিলাম, যদিচ বামাল নয়, তার পরেই আমি রক্তাক্ত, দাদার একটি ঘুষিতেই কষের দাঁত নড়ে গিয়েছিল, বাবার ছড়ির দাগ আমার শরীরটাকে চিতাবাঘ করে তুলেছিল, আর মায়ের ক্রুদ্ধ প্রশ্ন, এখনো বল্, অমরের চিঠি বীণাকে…?'

'না।'

'উঃ ভগবান, এই ছেলেটাকে কেন আঁতুড়েই মুখে নুন পুরে দিই নি।' দুঃসহ রাগে ও ঘৃণায় মা চিৎকার করে উঠেছিল।

আর আমি মনে মনে বলেছিলাম, 'হে ভগবান, বীণাদি আর অমরদা যেন ধরা না পড়ে।' এবং তখনো সেই একই দুর্যোগ…

দরজাটা আবার খুলে গেল। অন্য একজন ঢুকল। সেই ফাইল হাতে। ধুতি পরা, শার্টের ওপরে কোট। চেয়ারে এসে বসল। পকেট থেকে কতগুলো কাগজ বের করে দেখল। একবার আমাকে তাকিয়ে দেখে বলল, 'আমি যা পড়ে যাচ্ছি, সেগুলো আগে শুনে যান, কোথাও না মিললে আমাকে বলবেন।…সালে পার্টিতে জয়েন, সময়ে লোকাল কমিটিতে উত্তীর্ণ, সন্দেশখালির কৃষক সম্মেলনে যোগদান, মেটিয়াবুরুজে…তারিখে উত্তেজক বক্তৃতাদান, গান ফ্যাক্টরিতে গুপ্ত সমিতি গড়ে তোলা, রেলওয়ে ছাব্বিশ নম্বর গেটের ওপারে পার্টির আর্মস সরিয়ে নিয়ে যাওয়া…'

লোকটা একটা কথাও মিথ্যে বলছিল না, তারিখ বা সময়, একটাও ভুল বলছিল না। যেন আমারই কোনো সহকর্মী, সর্বক্ষণের সঙ্গী, কতগুলো গোপন ও প্রকাশ্য ঘটনা বলে চলেছে। বলে চলেছে, 'অ্যাকশন কমিটির সঙ্গে আপনার যোগাযোগ ছিল।…তারিখে, এবং…তারিখে ও…তারিখে কমিটির সঙ্গে যোগাযোগ হয়েছে, তারিখে গণপৎ সিং-এর কাছ থেকে এক ব্যাগ ক্যাকার নিয়ে সাত নম্বর সেলকে দিয়েছেন (আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! লোকটা হয়তো এর পরে বলবে রেবার সঙ্গে আমার কবে ঝগড়া হয়েছে, নীরার সঙ্গে আমি কোথায় কখন দেখা করেছিলাম), প্রাদেশিক কমিটির আরতি দত্তকে নিয়ে…তারিখে রাত্রে ফিটনে করে পার্কসার্কাস থেকে বালিগঞ্জ স্টেশন (অসম্ভব ! এই বিষম সত্যি শুনে নিজেকেই অবিশ্বাস করতে

ইচ্ছে করছে), এবং সেখান থেকে···ইত্যাদি।'
লোকটা সত্যি ঘটনা বলে যেতে লাগল, আর ছোট ছোট তীক্ষ্ণ চোখ তুলে আমাকে দেখতে লাগল। আমি সেই যে ভাবলেশহীন মুখে তার দিকে তাকিয়ে ছিলাম, কথাগুলো শুনতে শুনতে আর আমার কোনো ভাবের সঞ্চার হলো না। বিস্ময়কে যথাসম্ভব রোধ করে আমি ধরেই নিলাম, আমার মুখের সামনে একটা আয়না ধরা হয়েছে, এবং বলা হচ্ছে, দেখুন আপনার ঠোঁটের ওপর ডান দিকে একটা তিল, বাঁ কানের পাশে ছোট একটি কাটা দাগ, নাকটা···চোখ দুটো—ইত্যাদি। আর আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, না, না, না। ওটা আমি নয়, ওটা আমার মুখের ছায়া নয়: না না না—
'তাহলে সবই মিলছে, সবই সত্যি ?'
'কিসের ?'
'এই আমি যা যা বললাম ? আপনি যখন কিছুই বললেন না, তখন সবই মিলে গেছে নিশ্চয়।'
আমি বললাম, 'এসব আমি কিছুই জানি না।'
'লায়ার! একটা আচমকা গর্জনের সঙ্গে টেবিলের ওপর প্রচন্ড মুষ্ট্যাঘাত পড়ল। মনে হলো, গত শতকের পুরনো ঠান্ডা ঘরটা কেঁপে উঠল। একটা জ্বলন্ত মুখ, ক্রোধে ও ঘৃণায় আরক্ত। চোয়ালের হাড় কঠিন।
আমি অনেকটা অসহায় বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম। একটাই মাত্র মন্ত্র জপ করতে লাগলাম, না না না, না না না, না না না। এবং লর্ড সিন্হা রোডের এই ঘরে আমি ঝিঁঝির ডাক শুনতে পেলাম।
ভীষণ স্তব্ধ মনে হলো কয়েকটি মুহূর্ত। তার পরেই লোকটির নিচু স্বর শোনা গেল। নিচু কিন্তু অনেক বেশি হিংস্র। জ্বলন্ত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে ইংরেজীতে বলল সে, 'বাট আই উইল নট স্পেয়ার উই। আই উইল রীড এগেন, হিয়ার অ্যাটেন্টিভ্লি অ্যান্ড দেন আনসার।'
লোকটা আবার সেই কাগজ পড়ে যেতে লাগল। কিন্তু এবার আমি আর শুনছিলাম না। ওর পড়ার চেয়ে দ্রুত এলোমেলো বহু ঘটনা ও গলার স্বর আমাকে ঘিরে ধরল। অ্যাকশন কমিটি; মিহির: 'এই দেখুন কমরেড রেবার চিঠি, তিনি সম্পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। ধ্রুব কী ভাবে, আপনার কাছে কখন এল, কী বলল, আপনি কী বললেন, কী করলেন। আপনি এখনো স্বীকার করুন।'
রেবা: 'এই যে সেই চিরকুট, নাম না থাকলেও নীরার হাতের লেখা আমি চিনি। মিথ্যুক। এখনো বল, তাহলে তুমি ওর সঙ্গে বাসুলি বিলের ধারে দেখা করেছিলে ?' ছেলেবেলা; বাবা: 'সতি কথা বল্, ইস্কুল পালিয়ে নৌকা বাইতে গেছিলি ?' কৈশোর; সমিতির বন্ধুরা: 'বল্, অলকাকে কি তুই সমিতির কথা বলেছিস ?' '···অ্যান্ড দেন আনসার।'···
'আনসার, আই স্যে আনসার।' আবার একটা ঘর-কাঁপানো ক্রুদ্ধ গর্জন এবং টেবিলের ওপর প্রচন্ড মুষ্ট্যাঘাত।
আমি আমার সামনে দেখলাম, একটা রক্তাভ অঙ্গার মুখ, চিতার ক্রুদ্ধ চোখ। এবং

আমি দেখলাম, ঘর কাঁপছে। ভেজা বিছানা থেকে আমি ঘুমন্ত লাফ দিয়ে উঠলাম। দশ বছরের আমি, জলে ভেসে যাওয়া মেঝেয়, অন্ধকার ঘরে দাঁড়িয়ে বাবার চিৎকার শুনলাম' 'ঘরের বাইরে চল ফেলু (আমার মায়ের নাম), ছেলেদের নিয়ে ঘরের বাইরে চল, পশ্চিমের চাল উড়ে গেছে।'...আমার বুকের মধ্যে ভীষণ কাঁপছিল। ঝড়ের গর্জন আর তার দাপটে টিনের চাল যেন ভয়ে ককিয়ে কাঁদছিল। বিদ্যুৎঝলকে চোখ অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মায়ের আঁচল ধরে আমি খোলা দরজা দিয়ে নতুন পাকা ঘরের দিকে চললাম। মস্ত বড় উঠোনটা বাতাসে বৃষ্টিতে বিজলী-হানাহানিতে তোলপাড় হচ্ছিল। মায়ের একটা হাত আমার কাঁধে এসে পড়ল। সেইদিকে চোখ রেখে আমার সামনে আমি অঙ্গার-মুখ আর চিতা-চোখ ভেসে উঠতে দেখলাম। তার গর্জনের জবাবে, আমি ভিজতে ভিজতে নতুন পাকা ঘরের দিকে যেতে যেতে বললাম, 'জানি না। আমি এসবের কিছুই জানি না।'

আমার মুখে থুতু ছিটকে লাগল, আর কানের কাছে গর্জন শোনা গেল, 'কী করে জানতে হয় আমি শিখিয়ে দেব। আই উইল টীচ ইউ, ইউ লায়ার, কাওয়ার্ড। একটা সত্যি কথা যে বলতে পারে না, সে করবে বিপ্লব! কাপুরুষ দখল করবে রাষ্ট্র ক্ষমতা! থু থু...'

সম্ভবত লোকটা পান খায়, আর সুগন্ধি জর্দা, কারণ ছিটকানো থুতুতেই তা অনুমেয়। আমার গা টা ঘুলিয়ে উঠল। তবু হাত পা শক্ত করে, ঝড়ের দাপটের মধ্য দিয়ে কাঁচা উঠোনের কাদা মাড়িয়ে, মায়ের হাতের স্পর্শে, নতুন পাকা ঘরের দিকে এগিয়ে বললাম।

দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। আমার সামনের চেয়ারটা শূন্য। কয়েক মুহূর্তের জন্যে আমার ভিতরটাও শূন্য বোধ হলো। অবসাদের নিঝুমতায় যেন ডুবে গেলাম। কিন্তু শীতবোধ আর একটুও ছিল না। এবং হঠাৎ আমার হাসি পেতে লাগল গর্জিত গালাগালগুলোর কথা মনে করে,.লায়ার, কাওয়ার্ড। তবু লোকটা আশ্চর্যজনকভাবেই, সন্দেহজনক বিস্ময়করভাবেই আমার পার্টিজীবনের গোপন খবরগুলো জেনেছে যা দিয়ে ভিতরের সত্যটাকে ঘায়েল করতে চেয়েছিল। ভিতরের সত্য যা আপেক্ষিক অথচ ধ্রুব, যা কোনো নিয়মাধীন নয় অথচ একটা সুকঠিন নিয়মের প্রেমে আবন্ধ, যা অথৈ, ছোঁয়া যায় না।

কতক্ষণ একলা বসেছিলাম জানি না। আমার ভিতরে ভিতরে একটা প্রতীক্ষা ছিল সেই লোকটা আবার আসবে।

দরজাটা খুলে গেল। আবার—। না, একজন য়ুনিফর্ম পরা লোক। আমাকে ডাকল, 'আসুন।'

উঠে আমি লোকটাকে অনুসরণ করলাম। যে পথে এসেছিলাম সেই পথেই সেই সিঁড়ি দিয়েই আবার চললাম। সিঁড়ি দিয়ে নেমে অন্য দিকে গেল লোকটা। পুরনো বাড়িটা থেকে বেরিয়ে আবার একটা সুন্দর সাজানো বাগানে এসে পড়লাম রঙিন ফুল সবুজ ঘাস খোলা আকাশ শীতের রোদ সব মিলিয়ে আমার ক্ষুধার্ত চোখ দুটি টনটনিয়ে উঠল। জল এসে পড়ল।

বাঁ দিকের উঁচু পাঁচিল ঘেঁষে আমি লোকটাকে অনুসরণ করছিলাম। সব দিকেই

পাঁচিল, পাঁচিলের ওপরে কাঁটাতারের ফেন্সিং, তাতে লতা জড়ানো। সবুজ ঘন লতায় কাঁটাতার ঢাকা। সত্যি, শিল্পীদের দোষ নেই, যারা কাঁটাতারকে বইয়ের মলাটে ফুলের মতো আঁকে। ওতে বৈদ্যুতিক শক্তি যুক্ত থাকলে লতাগুলো বোধহয় মরে যেত।...কিন্তু রোদটা কি নিবিড় সুখের মতো গায়ে জড়িয়ে যাচ্ছে, শরীরের ভিতরে ঢুকছে। চাদরটা আলগা করে দিলাম, বুকে যদি একটু রোদ লাগে। আর এই সবুজ, এই ফুল, হোক পাঁচিলে ঘেরা (পাঁচিল কোথায় নেই ? একমাত্র সেই অর্থে সত্য ছাড়া, যে আত্মার অস্তিত্ব, যার নিষেধের কোনো সীমা নেই, অথচ সীমাহীন স্বাধীন), তবু তাদের চরিত্র বদলায় নি। তারা যা, তাই আছে।

য়ুনিফর্ম-পরা লোকটি দাঁড়িয়ে পড়ল। আমিও দাঁড়ালাম। বাগানটা শেষ, পাঁচিলটা কাছেই দেখলাম, বাঁ দিকের পাঁচিলের পাশ দিয়ে দুটো সিঁড়ির ধাপ উঠে একটা গলি চলে গিয়েছে। বাইরে থেকে সহসা কিছুই বোঝা যায় না। সরু গলি, অন্ধকার, কিন্তু মাথা-ঢাকা ছাদে আলো জ্বলছে। দুটো ধাপের ওপরেই গলির মুখে লোহার গরাদের দরজা। দরজায় একজন বন্দুকধারী সান্ত্রী। আমার সঙ্গের লোকটির নির্দেশে সান্ত্রী লোহার গরাদ খুলে দিল। লোকটি আমাকে ভিতরে অনুসরণ করতে বলল। আমি ঢুকে অনুসরণ করলাম। এইমাত্র দিন অন্তর্হিত, আমি যেন রাত্রির বুকে প্রবেশ করলাম।

বাঁ দিকে দেয়াল, মাথাটা ছাদ-আঁটা, ডান দিকে লোহার গরাদ দেওয়া পর পর কয়েকটা খাঁচার মতো ঘর। একেবারে শেষ ঘরটার কাছে গিয়ে আমার সঙ্গের লোকটি দাঁড়াল। সান্ত্রী আমাকে ডিঙিয়ে খাঁচার গরাদের তালা খুলল।

য়ুনিফর্ম-পরা লোকটি আমার দিকে একবার তাকাল আর গলিটার শেষ দেয়ালের গায়ে জলভরা চৌবাচ্চা দেখিয়ে বলল, 'এখানে চান করে নিতে হবে। সেলের মধ্যে খাবার দিয়ে যাবে। একটা সিগারেট যদি ইচ্ছে হয়—'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই বের করল সে। সেলে ঢোকবার আগেই ধূমপান করে নিতে হবে। বুঝলাম, এগুলো এস. বি. সেল। সিগারেট নিয়ে ধরিয়ে, আমি পিছন ফিরে গলির বাগানের দিকে তাকালাম। এখনো সবুজ, এখনো সিগারেটের নিবিড় নেশা। ভেবেছিলাম, লালবাজারের লক-আপ থেকে এস. বি. সেল ভালো হবে। ভালো হবে। কোথায় গেল সেই পাগলটা, সেই উদ্ধত ছেলে-গুলো। ওরা এখানে আসবে না।

মনে হলো, মুহূর্তেই সিগারেট পুড়ে শেষ হয়ে গেল। সেলের গরাদ খুলে গেল। আমি ভিতরে ঢুকলাম। সান্ত্রী তালা বন্ধ করে দিল। তার পর দু-জনেই চলে গেল। নৈঃশব্দ্য নেমে এল, গভীর নৈঃশব্দ্য।

সামনে দেওয়াল, পিছনে ডাইনে বাঁয়ে দেওয়াল। মাথার ওপরে একটি অকম্পিত স্থির আলো। লোহার খাট, একটা তোশক আর কম্বল। খাটের বাইরে ফুট-তিনেক ঠাণ্ডা মেঝে। চওড়ায় ফুট-তিনেক, লম্বায় আট কি দশ।

আমি খাটের ওপর বসলাম। কোনো শব্দ হলো না। ক্লান্তি বোধ করছিলাম। আস্তে আস্তে শুয়ে পড়লাম কাত হয়ে। কোনো শব্দ হলো না। হলদে আলোয় তাকিয়ে থাকতে পারছি নে। চোখ বুজলাম। নৈঃশব্দ্য, গভীর গাঢ় নৈঃশব্দ্য আর

অন্ধকার।
এ সবই আমার চেনা, আমার জানা, এই দুয়ারবন্ধ বন্দিত্ব, এই একাকিত্ব, এই নৈঃশব্দ্য, এই অন্ধকার। একমাত্র তফাত, এটা এস. বি. সেল। এসব ঘোচাবার জন্যেই কি একদা ইস্কুল পালাই নি? ছেলেবেলায় এই বন্দিত্ব এই একাকিত্ব ঘোচাবার জন্যেই কি দুঃসাহসী অবোধ মন নিয়ে ছোট ডিঙিতে করে বর্ষার দুরন্ত নদীর বুকে ভেসে যাই নি? তার পরে সমিতিতে অলকাদের সঙ্গে মিশতে যাই নি? তার পরে রেবাকে বিয়ে করি নি? তার পরে বিপ্লবী পার্টিতে আসি নি? তার পরে নীরার কাছে ছুটে যাই নি? সারাজীবন ধরে এই বোধই কি রূপান্তরের পথে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে না?
আরো কি ছুটিয়ে নিয়ে যাবে না? এই বোধই কি সমষ্টির সঙ্গে জীবনকে ভাগ করে ভোগ করার বাসনাকে বাধ্য করে নি? যারা কোথাও ঠেকে গিয়েছে তাদের বোধ একটা কোথাও নিঃশেষে মুছেছে। আর মিথ্যুকেরা উত্তরণের কথা বলে, কারণ একাকিত্ব কখনো নিষ্ক্রিয় থাকে না, বন্দিত্ব কখনো নিশ্চেষ্ট থাকতে পারে না।
এই এস. বি. সেলের থেকে সেই একাকিত্ব কি আরো ভীষণ নয়? আরো ভয়ংকর নিষ্ঠুর মর্মান্তিক নয়? এবং আরো সুন্দর ও মধুর? জ্ঞান মুক্তি ও মৈত্রীর নতুন নতুন চাবিকাঠির সন্ধান যে দিয়েছে। এই তো আমার জপ, আমার আহ্নিকের আচমন।
লোহার গরাদ ঝনঝনিয়ে উঠল। আমি তাকালাম। সান্ত্রী। সে আমাকে নাইতে বলল। তালা খুলে দিল। স্নান করার দরকার ছিল কিন্তু কোনো সরঞ্জামই ছিল না। অথচ নাক দিয়ে রক্ত পড়ছে। এখন শুকিয়ে ড্যালা পাকিয়ে রয়েছে। স্নান না করে উপায় ছিল না। তাছাড়া গলির বাইরে সবুজ লন আর ফুলের বাগান দেখতে পাব স্নান করতে গেলে। তাই অগত্যা নগ্ন হয়ে চৌবাচ্চার কাছে গেলাম। জল তোলবার কোনো পাত্র ছিল না। সান্ত্রী তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল আর খইনি বানাতে লাগল। আমি সেই দিকেই মুখ করে আঁজলা আঁজলা জল তুলে গায়ে মাথায় ঢালতে লাগলাম। নইলে বাইরেটা, দিনটা দেখা যেত না। দৈহিক প্রশান্তি আমার দেহে সংগীত করতে লাগল যেন।
আবার গরাদ বন্ধ। গা শুকোবার আগেই জামাকাপড় পরে নিলাম। তার পরে একটা লোক এসে গরাদের নিচের কয়েক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে খাবার দিয়ে গেল। মাছ ভাত দই। বোধহয় কাছেই কোনো হোটেলের সঙ্গে অফিসের ব্যবস্থা আছে। এখানে যে-ক'জন বন্দী থাকতে পারে তাদের জন্যে নিশ্চয়ই কোনো রান্নাঘরের ব্যবস্থা নেই।
কিন্তু ঘুম এল না। কেবলই মনে হতে লাগল এই গাঢ় নৈঃশব্দ্যের মধ্যে কী-একটা শব্দের প্রতীক্ষা যেন আমার ভিতরে মাথা কুটছে। কী সেটা? গরাদের তালা খোলার শব্দ? আবার আমাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্যে ডাকতে আসবে তাই?
না। কেউ আর এদিকে অনেকক্ষণ এল না। আমি উঠে পায়চারি করতে যেতেই থমকে গেলাম। বাজছে, সেই শব্দটা বাজছে! যার প্রতীক্ষা করছিলাম আমি, সেই

ঝিঁঝি ডাকছে। মানুষ যাই বলুক নিজের হৃদ্‌স্পন্দনের সঙ্গে বিশ্বনিরন্তরতার একটা সম্পর্ক সে খোঁজে।

পরদিন আমাকে সেই বাড়িতে দোতলার সেই ঘরটায় ডেকে নিয়ে গেল। সকাল থেকে বেলা বারোটা পর্যন্ত দফায় দফায় চারজন জিজ্ঞাসাবাদ করল। বেলা তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত দু-জন।

তার পরের দিন একই নিয়মে আটজন।

তারও পরের দিন, সারাদিন কেউ আমাকে ডাকতে এল না। অবাক হলাম, ছুটিও অনুভব করলাম। সন্ধ্যা সাতটাতেই রাত্রের খাবার দিয়ে দেয়। আমি তারই প্রতীক্ষা করছিলাম। কিন্তু গরাদের তালা খুলতে দেখে অবাক হলাম। কারণ খাবার তলা দিয়েই দেয়। তালা খোলার পর দেখলাম একজন য়ুনিফর্ম-পরা অফিসার, কোমরবন্ধে রিভলভার। বাইরের থেকেই তর্জনী নেড়ে আমাকে মোটা গলায় ডাকল, 'আসুন।'

আমি চাদরটা জড়িয়ে তাকে অনুসরণ করলাম। গলির বাইরে এসে দেখলাম অন্ধকার নেমেছে। বাগানে কোনো আলো নেই। সবুজ লন বা ফুল বা কেয়ারি কিছুই স্পষ্ট দেখতে পেলাম না। সেই পুরনো দোতলা বাড়িটাকে অন্ধকারই মনে হলো। রোজকার দেখা বাড়িটা এখন যেন স্তব্ধ দৈত্যপুরীর মতো মনে হলো।

দরজার ভিতর দিয়ে ঢুকে সামনের ঘরটায় স্তিমিত আলো দেখতে পেলাম। অফিসারকে অনুসরণ করে আমি সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠলাম। সিঁড়িতেও তেমনি স্তিমিত আলো, নিজের ছায়াতেই অন্ধকার লাগে। ওপরের আলোও সেই-রকম। এবং সেই একই ঘরের মধ্যে আমাকে ঢুকতে বলা হলো। রাত্রে আমি কখনো এই ঘরে ঢুকি নি। দেখলাম এই ঘরের আলো একটু জোরালো। আমাকে বসতে বলা হলো। বসলাম। অফিসার দরজাটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

জিজ্ঞাসাবাদ! নতুন পদ্ধতি। এই কথা আমার মনে হলো। কিন্তু আমার শীত করছে না একটুও। আমি প্রস্তুত হবার জন্যে বসলাম।

দরজা খুলে গেল। দেখেই চিনতে পারলাম সেই লোক। একটা কম্বল তার হাতে আর কম্বলের মধ্যে একটা-কিছু, মোটা ডাণ্ডা হতে পারে, সবসুদ্ধই সে টেবিলের ওপর রাখল। ডান হাতে সেই ফাইল, রিপোর্টস। এ সেই লোক যাকে আমি প্রথম দিন একটা ঘর থেকে রেগে বেরিয়ে যেতে দেখেছিলাম, যে-ঘরের মধ্যে একজনকে হাত ছড়িয়ে উপুড় হয়ে টেবিলের ওপর পড়ে থাকতে দেখেছিলাম।

পরমুহূর্তেই লোকটা আমার চোখে হারিয়ে গেল। অনেক দৃশ্য ও স্বর আমার দৃষ্টি ও শ্রবণকে ঘিরে ধরল। এবং অ্যাকশন কমিটির শেষ আহ্বানের দৃশ্য ও ঘটনা আমাকে টেনে নিয়ে গেল। ওরা কখনো এক জায়গায় বারে বারে দেখা করে না। সেই অন্য জায়গা। কমিটির সকলের চোখেই দেখলাম নিষ্ঠুর ক্রূর বিদ্রূপের হাসি।

মিহিরের হাসিটা প্রকৃতই নায়কোচিত। চেহারাটিও। আমি যদি ওকে না চিনতাম

তবে সেদিনের মূর্তি দেখে সত্যিই মুগ্ধ হতাম। একাধারে বিজয়ী যোদ্ধা ও দার্শনিকের মতো মনে হচ্ছিল ওকে। অথচ করুণা ও দয়া দেখাবার অঙ্গীকারও রয়েছে যেন চোখের হাসিতে।

ওর হাতে একটা চিঠি ছিল। বলল, 'আজ আমি শুধু এই চিঠিটাই পড়ব, তার পরে আপনার যা বলবার থাকে বলবেন।'

আমার মনে হলো চিঠিটা ধ্রুব লিখেছে, সে স্বীকারোক্তি করেছে আমার সাহায্যের কথা। দেখলাম, সকলের চোখগুলোই বিদ্যুৎঝলকে আমাকে যেন তাড়িতাহত করতে চাইছে। কিন্তু যদি ধ্রুব লিখেই থাকে—

মিহির বলল, 'পড়ছি।' বলে সে পড়তে আরম্ভ করল :

মাননীয়েষু—

মিহিরবাবু, একটু ভেবে আপনাকে সব সত্যিকথা জানাতে পারব কিনা বলেছিলাম। যদিও আপনাকে আমি আগে কখনো দেখি নি, শুনেছি মাত্র আপনার কথা। আপনাদের পার্টি সম্পর্কে আমার তেমন কোনো ধারণা ছিল না। একমাত্র অনলের (আমার নাম) মুখেই যা শুনেছি। সে একজন বিশেষ কর্মী তাও জানি। আপনার সঙ্গে রেবাদিকে (আমার স্ত্রী) দেখে অবাক হয়েছিলাম ; ভয় পেয়েছিলাম, রেবাদি বোধহয় আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে এসেছেন।

যাই হোক, আপনার সঙ্গে কথা বলে আমি সত্যি অভিভূত হয়েছি। পার্টির প্রতি, তার বৈপ্লবিক কর্মপদ্ধতির প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাকে আপনি বাড়িয়ে দিয়েছেন। আমি বুঝতে পেরেছি অনল ভুল করেছে। সে আমাকে ভালোবাসে, তাই কখনো মিথ্যে কথা বলে না। ধ্রুবর মতো লোককে ক্ষমা করা যায় না। পার্টির, বিপ্লবের এবং অনলের মঙ্গলের জন্যেই আপনাকে আমি তাই জানাচ্ছি অনল সত্যি ধ্রুবকে আশ্রয় দিয়েছে। আমাকে অনল নিজেই সেকথা বলেছে। আমার সঙ্গে তার সব কথাই হয়। আমি সঠিক স্মরণ করতে পারছি না কার আশ্রয়ে ধ্রুবকে ও পাঠিয়েছে। তবে মুর্শিদাবাদে কোনো বন্ধুর কাছে পাঠিয়েছে এই পর্যন্ত মনে আছে। অনল ধ্রুবকে অনেকগুলো টাকাও দিয়েছে। এবং একদিন পার্টির এই সন্ত্রাসবাদী নীতির পরিবর্তন হবে অনল এই বিশ্বাসেই ধ্রুবকে আবার ফিরিয়ে আনবে বলেছে।

আপনার কথায় আমার সম্যক উপলব্ধি হয়েছে অনলকে আমার ঠিক পথে ফিরিয়ে আনা উচিত। আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন। ইতি—

নীরা

নীরা, নীরা লিখেছে। চিঠিটা আমার হাতে নেবার দরকার ছিল না। ওই কাগজ এবং হাতের লেখা আমার রক্তের সঙ্গে পরিচিত।

চিঠিটা পড়ার পর অ্যাকশন কমিটি নিষ্পলক তীক্ষ্ম চোখে তাকাল। মিহির হেসে বলল, 'বলুন।'

আমি বললাম, 'আমি এসবের কিছুই জানি না।'

বোধহয় বজ্রপাত হলেও ওরা এত চমকাত না। মিহির বলে উঠল, আপনি নীরাকেও অস্বীকার করছেন ? সে আপনার—

আমি চুপ করে রইলাম। আর আমার প্রেমে আদুরে হয়ে ওঠা সেই মুখখানি মনে পড়ল।

মিহির গর্জে উঠল, আপনি নীরাকে এসব বলেন নি ?'

'না।'

'তাহলে নীরাও মিথ্যে বলছে ?'

'তাই দেখছি।'

মিহিরের 'লায়ার' চিৎকারটা আমার কানে বেজে ওঠবার আগেই টেবিলের ওপর কম্বলটা নড়ে উঠল, ভিতরের ডাণ্ডাসহ সেটা একটা মোটা থাবায় উঠল এবং মোটা গোঙানো স্বরের কী-একটা কথার সঙ্গে লোকটা আমার সামনে এসে দাঁড়াল। কী শুনতে পেলাম বুঝলাম না, খালি বললাম, 'আমি জানি না।'

তারপর···



দুই বন্ধু

তোকে আমি শো'রের বাচ্ছা বলেছি।

যাকে বলল, তার একটি নিশ্বাস পড়ল ফোঁস করে।

যে বলল, তার সামনের দাঁতগুলি নেই। গতকাল রাত্রের এক চিমটি তামাক পাতা ছিল তার নিচের মাড়িতে গোঁজা। সেটুকু চুষছে এখনো। লালা গড়াচ্ছে তার বাসি মাংসের মতো চোপসানো ফাটা ঠোঁটের কষ দিয়ে। ভোরের আলোয় কী যেন খুঁজছে মাটিতে হাতড়ে হাতড়ে।

আবার বলল, বুড়ো, তোকে আমি গাঁদধড়ের বাচ্ছা বলেছি।

বুড়োর আবার একটি নিশ্বাস পড়ল ফোঁস করে। কালো গলিত পাঁকের মতো থলথলে নিচের ঠোঁট তার ঝুলে পড়ল। দেখা গেল, বুড়োর দাঁত নেই একটিও থলথলে কালো মাড়িতে।

যে বলল. সে যেন ডুব দিয়ে উঠেছে মানুষডোবা পাঁক থেকে। দলা দলা পাঁক গাড়িয়ে, ঝুলে পড়ছে সর্বাঙ্গে। কিন্তু, ওগুলি পাঁক নয়, গায়ের মাংস আর চামড়া। লোল-শিথিল শরীর বুড়োর, মনে হচ্ছে ওইরকম। চোখ দুটি গলা গলা, একটু সাদাটে। নজর যে বিশেষ নেই, তা বোঝা যাচ্ছে। খানিকটা ন্যাকড়া আছে গোঁজা তার কোমরে। তাতে লজ্জা ঢাকে নি, বুড়ো যেন অচেতন শিশু হয়ে উঠেছে।

সামনে একটি হেলে-পড়া ভাঙা-বেড়া ঘর। মাথা নিচু করে, পাহাড়ের মতো দাঁড়িয়ে আছে বুড়ো। উপুড় হয়ে, হামা দিয়ে কী খুঁজছে বুড়ো। আবার বলল, তোকে আমি হারামী বলেছি, যা আমার দিল চেয়েছে। কখনো গোঁসা করে বলেছি, আবার সোহাগ করে বলেছি। এটা তামাম দুনিয়ার নিয়ম, একজনকে সে সবকিছু বলে। আমার বুড়িকে বলেছি, ব্যাটাকে বলেছি। কিন্তু ওরা যা, তা-ই থেকে গেছে। তুই যে ছেরুয়া, সেই ছেরুয়াই আছিস। তাই না?

ছেরুয়া বুড়োর পাহাড়ে-শরীর আকুঞ্চিত হলো একবার। পিচুটিগলা চোখ দুটি উদ্দীপ্ত হলো আরো। আর একটি নিশ্বাস পড়ল ফোঁস করে।

বুড়ো বলল, তবে। তুই আজ ফের তুক করেছিস। আমি লাঠি খুঁজে পাচ্ছি না। তুই যেদিন তুক করিস, সেইদিনই আমার লাঠি হারিয়ে যায়। হাঁ, তোকে আমি গালমন্দ করি। পেটাই ওই লাঠিটা দিয়ে। আমার বুড়িকে পিটিয়েছি. ব্যাটাদের পিটিয়েছি, আর তোকে আজো পেটাই। কেন? না আমাকে একজন পেটায়। এটা দুনিয়ার নিয়ম। বুড়ো, তুই ভয় পাচ্ছিস মিছে। তোর তুক তুলে নে, লাঠিটা আমাকে বার করে দে।

ছেরুয়া বুড়োর সারা শরীর আকুঞ্চিত হলো আবার ঘন ঘন। দন্তহীন কালো

মাড়ির পাশে, ফাটা কালো জিভ দিয়ে নাক চেটে নিল একবার।

বুড়ো তখন ঢুকেছে বুড্ঢার পায়ের তলায়। বলল, পেয়েছি। তোরই পায়ের তলায় রয়েছে।

বুড্ঢার পায়ের তলা থেকে বেরিয়ে এসে, লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়াল বুড়ো। চোপসানো ঠোঁটের পাশ দিয়ে আবার গড়িয়ে পড়ল খানিকটা লালা। হাঁপ ধরে গেছে। সামলাতে হলো খানিকক্ষণ সেই বাসি তামাকপাতাটুকু চুষে। যেন মাথা থেকে পা পর্যন্ত, চুষছে সারা দেহটাই। বলল, বুড্ঢা, তোর তুক টেকে না। কেন না, তুই ছেরুয়া। আমি মানুষ।

বুড্ঢার গলনালী থেকে একটা চাপা শব্দ বেরুল, আঁ।

হাঁ। আর এই লাঠিটা আমার দরকার। তোকে আর আমাকে দুজনাকেই চালাবার জন্যে দরকার।

বুড়ো তাকাল সামনের দিকে। কেউ নেই। সবাই বেরিয়ে গেছে সেই ভোররাত্রে। মেয়ে-পুরুষ গাড়ি বলদ-ছেরুয়া, টিন-বাঁক-বুরুশ, সব চলে গেছে ধাওড়া থেকে। শুধু শুয়োর চরছে, বুড়ি বাচ্চারা ঘুরছে, বসে আছে।

বিষকাটারির ঝাড় আর ডোবা ছড়িয়ে আছে শুয়োরের জন্য। দূরের উঁচুনিচু টিলাগুলি পাহাড় নয়। কাগজকলের রাবিশ ফেলে ওইরকম হয়েছে। যেন সাদা পাথরের স্তূপ। তারপর একরাশ সবুজ লকলকিয়ে উঠেছে বাঁশঝাড় বেয়ে। আমজাম-নারকেলের সারিতে। তার ওপারের আকাশে দেখা দিয়েছে একটু রক্তাভা।

বুড়ো বলল, সবাই চলে গেছে। আগে আমিও যেতাম, বুড্ঢা, তুইও যেতিস্। এখন দেরি হয়ে যাবে। আমরা দুজনেই বড়ো হয়ে গেছি। এবার চল।

বুড্ঢা সামনের পা'টি তুলল একবার। বাড়াতে পারল না। আবার তুলল, পারল না।

বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে সেখানেই। এগুতে পারছে না। দুজনেরই কালো দন্তহীন মাড়ি বেরিয়ে পড়ল। বিলুলিত হলো দুজনেরই শরীর।

এটা আমাদের মনের ভয়। আমরা দুজনেই ভয় পাচ্ছি। আমাদের বুকের মধ্যে বসে কারা দাপাদাপি করছে, ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু আমরা বেঁচে আছি এখনো, রুটি বিচুলী খাই। তাই আমাদের যেতে হবে। কাজ করতে হবে। বুড়ো প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল, ছেরুয়া বুড্ঢা!

সেই চিৎকার শুনে বুড্ঢা দুপা এগিয়ে গেল। বুড়োও এগিয়ে এল।

দুজনেরই চোখ দুটি সমান গোল। একই রকম পিচুটি আকীর্ণ গলিত সিক্ত চোখ। চিৎকার করেছে বুড়োই। কিন্তু দুজনেরই মনে হলো যেন আর কেউ হাঁক দিয়েছে। দুজনেই এগিয়ে গেল ঘরের পিছন দিকে।

সেখানেই রয়েছে মিউনিসিপালিটি ভাগাড়ের পুরনো গাড়িটা। গাড়িটা ঝরঝরে হয়ে গেছে। ভেঙে, মরচে পড়ে হা-হা করছে চারদিক। জোয়ালের কাঠ খেয়েছে পোকায়। চাকা দুটি টালমাটাল আছে একরকম। তেল পড়ে না আর হুইলে, চলে কেঁদে ককিয়ে। এখন আর কোনো নম্বর বহন করে না গাড়িটা। ওটার আর কোনো অস্তিত্ব নেই মিউনিসিপালিটির খাতায়।

কারুর নেই। বুড়োরও নেই।

একদিন ছিল। আমার নাম ছিল গাড়ি-টানাদের হাজিরা খাতার সকলের ওপরে। আমি ছিলাম সর্দার, নাম ছিল বটুয়া। তখন ছিলাম মানুষ। এখন বুড়ো। আমার নাম গেছে খারিজ হয়ে। কিন্তু এখনো আমি কাজ করি, তাই আমাকে খাবার জন্যে কয়েকটা টাকা দেয় মিউনিসিপালিটি থেকে। তাই নিয়ে আমাকে খাওয়ায় শেখো মরদের বউ।

গাড়িটাকে দেখলে মনে হয় না চলে। জোয়ালটার ভার বেশি নেই। কিন্তু বুড়োকে তুলতে হয় কাঁধ দিয়ে। তুলে ডাকে, বুড্ঢা আয়।

বুড্ঢা তাকাল উদ্দীপ্ত গলিত চোখে। ছানি পড়েছে, বুড়োর মতোই কালো মণি দুটো ঘষা কাচের মতো সাদা দেখাচ্ছে। তার পাশে লাল জায়গাটুকুতে ভয় কাঁপছে থরথর করে। বিশাল কালো শরীরটা আর সম্মুখভেদী শিং দুটি যেন পাথর হয়ে গেছে। নড়ছে না, কান দুটি কাঁপছে শুধু। এখনি হড়হড় করে লালা ঝরছে নাক দিয়ে।

বুড়ো আবার চিৎকার করে উঠল, আয়।

বুড্ঢা দুবার চেষ্টা করল। সামনের পা দুটো যায় তো, পিছনের দুটো আসে না। তারপর পাছার ধাক্কায় যেন এগিয়ে দিল সামনেটা। ঢুকল জোয়ালে। বুড়ো বলল, হাঁ। তুই বুড়ো হয়েছিস্, তবু ভয় পাস। এবার চল।

হাজিরা নেয় না আর বুড়োর। তবু বুড়ো হাজিরা দিয়ে যায় একবার মিউনিসি-পালিটিতে।

চাকাতে টান পড়তেই কে যেন কেঁদে উঠলো বুড়ো-গলায়, আঁ হো আঁউ···

বুড়ো বলল, হাঁ।

ওটা বুড়োর অভ্যাস। বুড্ঢার সঙ্গে কথা বলতে বলতে এদিক ওদিক দেখতে দেখতে, চাকা দুটি এক পাক খায়, আর ক‍ঁকায়, আঁ হো আঁউ···

বড়ো বলে, হাঁ।

অর্থাৎ ঠিক চলছে।

শব্দটা শোনা মাত্রই, আশেপাশে শুয়োরগুলি উঠল ফোঁসফোঁস করে। একদল বাচ্চা উঠল ছড়া কেটে চেঁচিয়ে,

ছেরুয়া ছেরুয়া ছেরু—য়া
তোকে তেল মাখাব কেড়ু—য়া।

বড়ো বলল, হাঁ, তেল মাখালে ছেরুয়া খুব তাগদে হয়। তোকে আমি মাখাতে পারি নি। কেন না, আমি নিজে কোনোদিন মাখতে পাই নি। তোর নাম ছিল আমার সঙ্গে, মিসিপালটির এক খাতায়। বটুয়া সর্দার, এক গাড়ি, এক ছেরুয়া।

তুই ছিলি পাঁড়া, হতে পারতিস ভঁইসা। কিন্তু ভঁইসা গাড়ি টানে না, চাষ করে না, শুধু জন্ম দেয়, ঘোরে ভঁইসীর পিছে পিছে। সামনে কোনো ভঁইসা এলে সে লড়ে। হয় মরে না হয় মারে। মানুষ তোর কাছ থেকে জন্ম দেওয়ার মরদ-পানাটা নিয়েছে ছিনিয়ে, তাই তোকে বলে ছেরুয়া। তুই জানিস না, এই দুনিয়া কাজের জন্যে তোর কাছ থেকে কী ছিনিয়ে নিয়েছে। যে সময়ে নিয়েছে, তখন

তোর কিছু করার ছিল না। আমার নিলে, আমারও থাকত না।

দুধের দাঁত সবকটা পড়ার আগে তুই কাজে লেগেছিলি। এখন তোর জোয়ান বয়সের দাঁত নেই একটাও। আমার মতো বুড়ো। তখন ছিলি আমার বুকে বুকে, এখন কাঁধে কাঁধে। ঠিক বুড়ো যখন ছিলি, তখন ছিলি হাড্ডিসার। এখন তুই বুড়ো নোস, তারও বাইরে। এখন ফুলে হয়েছিস ঢোল, পাগুলো হয়েছে সরু কাঠি। তাই তোর নামটাও গেছে খারিজ হয়ে। এক আঁটি বিচুলী তোকে দেয় মিসিপালটি। কেন না, তুই কাজ করিস এখনো আমার সংগে। এইটা নিয়ম।

ছেরুয়া, ছেরুয়া ছেরু—য়া।

একটু একটু করে হারিয়ে গেল পিছনে বাচ্চাদের চীৎকার। সামনে রাস্তা। বৈশাখী সূর্য উঠে এসেছে খানিকটা। এর মধ্যেই ছড়াচ্ছে উত্তাপ।

বুড়ো চাকা গোঙাচ্ছে আঁ হো আঁউ···

বুড়ো বলছে, হাঁ।···থামিসনে বুড়ো, চল। যেতে হবে বহু দূরে। ঘুরতে হবে অনেক রাস্তা। ওই বুড়ো চাকা দুটো ডাকে, আমি ভাবি, তুই ডাকিস। বেলা যত বাড়ে, তত মনে হয়, ওটা আমারই গলা, আমিই ডাকি। আসলে ওটা আমাদের তিনজনের। তোর, আমার, গাড়িটার। তিন খারিজের বেঁচে থাকাটা ও জানান দিয়ে যায় সবাইকে।

বুড়ো সারা মুখ কাঁপিয়ে চুষছে তামাকপাতা। বাসি পাতার স্বাদ নেই আর। কাগজের মতো পানসে হয়ে গেছে। মাড়িতে মাড়িতে ঘষেও একটু রস পাওয়া যাচ্ছে না। তাই গিলতে ইচ্ছে করছে না, লালা গড়িয়ে পড়ছে কষ দিয়ে।

বুড়োর নাক থেকেও গড়াচ্ছে লালা। চলছে খুব আস্তে। এক পা ফেলে আর এক পা টানতে সময় লাগে। হাড়ে হাড়ে জং ধরে গেছে। পা তুলতে গেলে হাঁটু বাঁকে না, খাড়া হয়ে থাকে।

বুড়োর পা ফেলাটা বোঝা যায়, যখন চাকা দুটো আঁ বলে খানিকক্ষণ থামে। তারপর হো বলে আবার থামে। পরে, হঠাৎ আঁ—উ শব্দটা সবচেয়ে তীব্র হয়ে ওঠে। তখন পিছনের পা দুটো যায়।

বুড়ো বলে, হাঁ। আমি ওই ডাক শুনি। আর দেখি একটা পাহাড় চলেছে আমার পাশে পাশে। একটা কালো পাহাড়, বাঁয়ে ডাইনে হেলে, ঢেউ দিয়ে চলেছে। পাছায় তার বড় বড় পাথরের চাংড়া আছে খোঁচা খোঁচা হয়ে। তারপর উঁচু পাহাড়ের কোলে যেমন থাকে সমান জমি, তেমনি চলে গেছে তার পিঠ। আমার বুড়ো ছেরুয়া। ওর শিং দুটো আমার হাতের চেয়ে বড়। কখনো মনে হয়, একটা পেল্লায় কালো মেঘ চলেছে আমার পাশ দিয়ে।

কত বড়। তার পাশে, লাঠি হাতে আমি। মেঘ বল, পাহাড় বল, ওকে চালাই আমি। অথচ আমাকে দেখা যায় না ওর আড়ালে। দেখে নিশ্চয়ই ভগবান হাসে। কিন্তু চাকা কেন ডাকছে না। বুড়ো!

সামনের রাস্তাটি, নর্দমার কালভার্টের জন্য একটু উঁচু হয়ে উঠেছে। বুড়ো ঠেলছে, উঠতে পারছে না।

পারবি বুড়ো, পারবি। রোজ পারিস, আজও পারবি। আজ, হ্যাঁ আজ কি হয়েছে

আমারও। আমারও মনে হচ্ছে, আমি যেন আমার গাঁয়ের সেই পাহাড়ের মন্দিরটার সামনে এসেছি। ওইখানে মহাদেব আছে। এত উঁচু তো মনে হয় নি কোনোদিন এ রাস্তাটা। আমার হাঁটুর শিরে টান ধরছে। দুহাতে আমাকে লাঠি ভর দিতে হচ্ছে! তোকে আমি ঠেলতে পারব না।

ঠিক যাব, বুড়ো, এটা আমাদের মনের ভয়। আমরা দুজনেই বুড়ো হয়ে গেছি। ছেরুয়া বুড়ো! আঁ…আঁ…আঁ হো…আঁউ…

হাঁ।…এইটা ভগবানের হাসি, ওই রাস্তাটা। আমি দেখেছি ভগবানের হাসি। আমার প্রথম ছেলেটা মরবার আগে যখন ধনুকের মতো বেঁকতে লাগল মেঝের পড়ে, দেখলাম ভগবান হাসছে। ধাওড়ার মারামারিতে যেদিন রামু চামলুর মাথাটা কোদাল দিয়ে ফাঁক করে হাঁ করে তাকিয়ে রইল, দেখলাম ভগবান হাসছে। কেন, শেখোর বাচ্চাটার পাতের ভাত যখন শো'রে এসে কপকপ খেয়ে ফেলতে থাকে আর বাচ্চাটা কাঁদে, আমি দেখি ভগবান হাসে। দিব্যি করে বলছি, দেখেছি। বুড়ো, তুই দেখতে পাস না।

শিউরে উঠল একবার বুড়োর সারা গায়ের চামড়া। ল্যাজটা আন্দোলিত হলো বারকয়েক। ঘাড়ের কাছে কয়েকগাছি চুল উড়ছে ফুরফুর করে।

বুড়ো বলল, তুই ঠিক দেখতে পাস। তুই আমাকেই তুক করিস, যাতে আমি কিছুতেই উঠে না দাঁড়াতে পারি। মিছে তুক করিস। দুনিয়ার নিয়মের কাছে তুক চলে না।

রাস্তা ঘিঞ্জি হচ্ছে, শহর বাড়ছে। দোকানপসার ছেঁকে ধরছে রাস্তার দুদিক থেকে। সূর্য হাসছে দপদপিয়ে। বাতাস হালকা লাগছে একটু একটু। রাস্তাটা তাতছে ধীরে ধীরে। ধুলো উড়ছে থেকে থেকে।

গাড়ি-ঘোড়া-ভেঁপু। থামিস নে বুড়ো, এসবই তোর চেনা। মোটরের ড্রাইভার তোকে খিঁচোবে, রিকশাওয়ালা গালাগাল দেবে, বাচ্চারা ঢিল মারতে পারে, দল বেঁধে ভেংচাবে, আঁ হো আঁউ!—হাঁ। সে শুধু তোকে নয়, গাড়িকে নয়, আমাকেও।

থামিস্ নে। রাস্তাটা তো বেশ আলকাতরা-ঢালা পেয়েছিস, চলে চল্। ওই দেখা যায় মিসিপালিটির অপিস। ওই লাল টকটকে ফুল, উড়ছে বাতাসে। তোর ভয় পাবার কিছু নেই, ওগুলি রক্ত নয়; ফুল। মনে হয়, যেন মাটির তলে আছে অনেক রক্ত, গাছে গাছে ফুটেছে বিন্দু বিন্দু হয়ে। তারপর ঝরে যাচ্ছে মাটিতে। সবাই ঝরে যায় একদিন।

এটা নিয়ম।

দাঁড়াল এসে মিউনিসিপ্যালিটির ফটকের সামনে। সেখানেই দাঁড়িয়েছিলেন স্যানিটারীবাবু সাইকেলে হেলান দিয়ে। বললেন, আজও তুই বেরিয়েছিস্ বুড়ো।

কী আশ্চর্য কথা। ফোক্লা মাড়িতে, বলিরেখাঙ্কিত শিথিল গালে বুড়ো হাসল। কথা বলতে গিয়ে জড়িয়ে যাচ্ছে জিভ। মাঝে মাঝে এই রকম হয়। তোমার হাত. তোমার পা, তোমার চোখ জিভ তোমার কথা শোনে না।

জিভটাকে স্থির করে রাখল বুড়ো এক মুহূর্ত। লালা মুছে নিল হাতের চেটোয়।

তারপরে বলল, হাজিরা দিতে হবে না ?
বাবু বললেন ভ্রূ কুঁচকে, হাজিরা দিতে হবে ?
হাঁ। তুমি যখন বাইরে আছ বাবু, হাজিরাটা নিয়ে নাও।
নিয়ে নিলুম।
হাঁ। ফিরে যাওয়ার সময় বুড়োর বিচুলী নিয়ে যাব।
নিয়ে যেও।

বাবু!
বল।
একটু দাওয়াই দিতে হবে।
কার ? তোর ?
না, বুড়োর।
স্যানিটারীবাবু তেলচিটে টুপিটা মাথা থেকে খুলে, হেসে উঠলেন হা হা করে। তারপর ভারি অবাক হয়ে তাকালেন বুড়োর দিকে। বললেন, বুড়োর পেটটা তো রেলইঞ্জিনের মতো হয়েছে।
হাঁ।
কি খায় ?
মিসিপালটির বিচুলী!
তাই খেয়ে এত বড়ো হয়েছে পেটটা ?
না। ফুলে যাচ্ছে রোজ, একটু একটু করে।
স্যানিটারীবাবু তাকিয়ে দেখলেন, বুড়োরও হাত পা ফুলেছে, মুখ ফুলেছে। বললেন, তুইও তো ফুলে গেছিস্।
বুড়ো ভাবল, তা হতে পারে। এ সময়ে সবাই ফোলে।
বিশ্বের এক বিচিত্র বিস্ময় যেন দেখছেন স্যানিটারীবাবু। একবার দেখেন বুড়োকে, আবার একটু ফিরে দেখেন বুড়োকে। বললেন, গুঁতোবে না তো রে। যে কালা-পাহাড়, যেমন চাউনি। আর যা শিং বাবা।
না। ও যে ছেরুয়া। বয়েসকালে একটু আধটু বাগাতো। ওর আসল জিনিস থাকলে, আপনাকে ওইরকম কাছে ঘেঁষতে দিত না। এতক্ষণে আপনার লাশ বাড়িতে রেখে আসতে হ'ত।
উল্লুক।
হাঁ বাবু।
কি দাওয়াই দিতে হবে।
দুটো দাওয়াই। বুড়োর তেরোটা ঘা হয়েছে বাবু।
গুণে রেখেছিস ?
হাঁ। এই যে, লাল দগদগে ফটকের এই ফুলের মতো। এক—দুই—তিন…মাছি ধরেছে। বুড়ো এখন আর তাড়াতে পারে না।
আর কিসের দাওয়াই ?
ওর শরীরের সব কব্জাগুলো জং ধরে গেছে। একটু মালিশ চাই।

মালকোঁচা-দেওয়া স্যানিটারীবাবু টুপি হাতে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইলেন বুড়োর দিকে। বললেন, ওই দাওয়াইগুলো নিজের জন্যে চাইনে ?

বুড়োর ভয়, বুড্ঢা তার আগে মরবে। সেইজন্যে বাঁচিয়ে রাখতে চায় ! নিজের জন্যে চায়। বলে, এটা দুনিয়ার নিয়ম। বলল, না।

স্যানিটারীবাবু মনে মনে বললেন, ব্যাটা এই ফটকেই না পড়ে এখুনি মরে।

বললেন, আচ্ছা যা, নিয়ে যাস।

বাবু, একটা বিড়ি দাও।

দিলেন একটি বিড়ি। বুড়ো সেটি ভেঙে, ছোট্ট এক টুকরো ফেলে দিল কষে। একটু নেশা চাই।

এসবই রোজকার ব্যাপার। বুড়ো বলল, বুড্ঢা, দাওয়াই বাবু দেবে না, ওইরকম বলে। চাকায় একটু তেল, তোকে একটু দাওয়াই। কিন্তু তার দাম আছে। খারিজের খাতায় ওগুলো নেই। আমি জানি। তবু কেন বলি। বলতে হয়, কেন না, আমি মানুষ।

সূর্য ক্রমে প্রচণ্ড হচ্ছে। চোখে আগুন, জটায় হলকা। মহামেদিনী কাঁপছে দাব-দাহের ভয়ে।

তবু মানুষ ঘুরছে, পুড়ছে। ধুলো উড়ছে, মানুষ চোখমুখ ঢাকছে। আঙিনায় বারান্দায় সব জায়গায় তৈরী করছে ছায়া।

কিন্তু বুড্ঢা, আমাদের এসব দেখলে চলবে না, যেতে হবে আমাদের। চল্।

কাঁপছে এখনি বুড্ঢার নাসারন্ধ্র, ফুটো দিয়ে ঝরছে ঘাম। পিচুটি-গলা ভয়ার্ত চোখে গড়াচ্ছে জল। বুড়ো দেখল, শিংএর গোড়ায় পোকা কিলবিল করছে বুড্ঢার। তাই কাক বসেছে মাথায়। ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে পোকা।

বুড়ো, থামলে চলতে পারবি নে। আমাদের যেতে হবে দূরে।

আমরা কোথায় যাব ? আমরা যাব ভাগাড়ে।

বুড্ঢা শূন্য চোখে দূরে তাকিয়ে নিশ্বাস ফেলল ফোঁস করে।

ভয় পাচ্ছিস্ বুড্ঢা। কিন্তু এইটা আমাদের কাজ।

আমরা টহল দেব আমাদের এলাকাটা। যার নাম মিসিপালটির ওয়াড। পথে পথে পড়ে থাকবে যত মড়া, সবাইকে তুলে দিয়ে আসব ভাগাড়ে। এইটা আমাদের কাজ। কুত্তা, বেড়াল, ছাগল, গরু, ভইসী, ভইসা, ছেরুয়া…

তুই ভয় পাচ্ছিস বুড্ঢা। মিছে ভয় তোর। সবাই যায়। কেউ যায় ভাগাড়ে, কেউ শ্মশানে, কেউ কবরে। কিন্তু যেতে হয়। আমাকেও যেতে হবে একদিন শ্মশানে। তোকেও যেতে হবে একদিন ভাগাড়ে। আমি সঙ্গে যাব না, কেননা, তুই মরে গেলে, তোকে নিয়ে যাব কেমন করে।

তুই মিছে ভয় পাচ্ছিস। এ দুনিয়ায় এলে, থামবার জো-টি নেই, যেতেই হবে। এইটা নিয়ম।

আমাকে পোড়াবে, তোকে খাবে শকুনে। কিন্তু আমরা সেটা জানতে পারব না। চল্।

চলে না। বুড্ঢার গলিত মাড়ি ঝুলে পড়ছে। তেমনি তাকিয়ে আছে ভয়ার্ত

ব্যাকুল চোখে, দীপ্ত রোদের দিকে।

বুড়োর মনে হলো, গরম বাতাস তাকে ঠেলে দিচ্ছে ফটকের দিকে।

আজ বড় দম নিতে হচ্ছে। ঠেলতে হচ্ছে বারবার, চাড় লাগছে হৃৎপিণ্ডে। ছেরুয়াটা তুক্ করছে নাকি। মনে হচ্ছে যেন, ভগবান হাসছে।

বুড়ো প্রাণপণে চিৎকার করে উঠল, এই শো'রের বাচ্ছা, শুনতে পাচ্ছিস।

কে যেন হেসে উঠল হা হা করে। হাঁ, এমনি করে সবাই হাসে। ভয় দেখাচ্ছে আমাকে। আবার চিৎকার করে উঠল, ছেরুয়া—বুড্ঢা!……

আঁ—আঁ হো আঁউ!

হাঁ। তিন খারিজে ডাক ছেড়েছে।

দুজনেরই ছানিপড়া চোখ ধাঁধিয়ে যাচ্ছে রোদে। বড় রাস্তা পার হয়ে পড়ল পাড়ার মধ্যে। বাচ্চারা লাগল আবার পিছনে। কে একটা মরা ইঁদুর ছুঁড়ে ফেলল ভাঙা গাড়িতে, 'নে নিয়ে যা ভাগাড়ে।'

হাঁ। কিন্তু বাচ্চারা, তোরা চড়িসনে। এ গাড়ি ভাগাড়ে যায়। ওটা কী রাস্তার কিনারে? মরা কুত্তা? না, ছেঁড়া বালিশ। ওটা ভাগাড় যাবে না ছেরুয়া, শুঁকে শুঁকে যা, যত মরার জঞ্জাল, সব নিয়ে যেতে হবে।

যদি সারা এলাকায় না পাই, তবু যেতে হবে। কেন? না, যদি সীমানার বাইরে কেউ পড়ে থাকে ভাগাড়ের জীব, তাকে ফেলে দিতে হবে ভাগাড়ে। তাই রোজ যেতে হয়। এটা আমাদের ডিপটি, অর্থাৎ কাজ।

আমরা জন্ম থেকে মরণে যাই। আঁতুড় থেকে ভাগাড়ে। এখানে সবাই বিয়োয়। ওই বউটা, ওই ভঁইসীটা, ওই কুত্তীটা। এই পথে রোজ আমাদের যাওয়া-আসা। রোজ দেখি, জীবনটা চলে অষ্টপ্রহর। মিছে তোর ভয় বুড্ঢা, সামনে চল।

সামনে বাঁক। আবার বাঁক। ছেরুয়ার বুড়ো পিঠের শিরদাঁড়া বাঁকে না। অনেকখানি জায়গা নিয়ে মোড় বেঁকতে হয়। বেধে যায়, পিছুতে হয়, আবার সামনে।

পথ এই রকম। বাঁকা…বাঁকা…বাঁকা! অনেক খানা-খাদ পাবি বুড্ঢা, খবরদার! নেমে পড়িস নে। ওরা তোকে ডাকবে পরান জুড়োতে। জুড়োলে আর পারবি নে যেতে।

চাকার শব্দ ক্রমে বিলম্বিত হচ্ছে একটু একটু করে, সুদীর্ঘ নিঝুম দুপুরের বিলম্বিত লয়ের মতো।

মাথা নুয়ে পড়ছে ছেরুয়ার। পেটের দিকটা আরো ফুলছে যেন। মাছি ভরে গেছে ঘায়ে। হড়হড় করে লালা গড়াচ্ছে।

বুড়োর বুকের মধ্যে বিদ্যুতের চমক লাগছে।

কেন, কি হয়েছে আমার। উরুতের শিরায় টান পড়ছে আমার, তামাক পাতাটুকু বেরিয়ে পড়তে চাইছে কষ বেয়ে। আমার ঘাম ঝরছে। কেন, আমার তো ঘাম ঝরে না আর।

খং করে কী বেজে উঠল। বুড্ঢার সম্মুখভেদী শিং-এর ঠোকা লেগেছে লাইটপোস্টে।

বুড্ঢা ডাইনে বেঁকে চল। এখন কানা হলে চলবে না। একি তোর চোখ কোথায়?

ভয়ে উলটে ফেলেছিস। তোর চোয়াল দুটো লালায় হড়কে যাচ্ছে। থামিস নে বুড়ো। আগুন উঠছে জমি থেকে। তুই খারিজ ছেরুয়া, খুরে তোর নাল লাগানো হয় নি অনেক দিন। আমার নাগরা কবে ছিঁড়ে গেছে। পুড়ছে পায়ের তলা। সামনে আর একটি পাড়া। শেষ পাড়া। ওটি ডোমপাড়া। বুড়ো, রোজ তোকে অভিশাপ দেয়। তুই মলে ওরা চামড়াটা ছাড়িয়ে নেবে। নেবে নেবে, তুই চোখ বুজে পার হয়ে চল। ওরা ছুরি শানাচ্ছে, হাসছে, দেখছে তুই কবে মরবি। চাকার ডাক শুনতে পাচ্ছিনে কেন। বুড়ো!

বুড়োর মাথার উপরে চলে গেছে জোয়াল। ফোঁসফোঁস করছে। যেন কোনো শত্রু ওর সামনে এসেছে, তাই দাঁড়িয়েছে রুখে। কিন্তু বুড়ো জানে, ও ভয় পাচ্ছে, বুড়োকে তুক্ করছে।

এই গাঁদ্‌ধরের বাচ্ছা!

লাঠি তুলল বুড়ো। ছেরুয়ার পেছনের পায়ে শিরে টান পড়েছে, এগুচ্ছে না বুঝি।

বুড়ো মারল লাঠি দিয়ে। একবার, দুবার, তিনবার, বারবার।

আমাকে মারতে হয়। প্রাণপণে মারতে হয়। না মারলে আমি চলতে পারব না! তুই আমার ছেরুয়া। ওরে শো'রের বাচ্ছা, মরে গেলেও তোকে মারব। মারব। ভীরু, মরণে তোর ভয়!

মারতে লাগল ঠাসঠাস করে।

ছেরুয়ার চোখ দুটো প্রকান্ড হয়ে উঠল। গলগল করে ঝরে পড়তে লাগল জল।

এই…এই…এই!

দুটো ডোম এল। কেন মারছ এত। অবলা জীব।

বুড়ো দেখল, হাতে ওদের ছুরি আছে নাকি। মরলে ওরা ছুরি নিয়ে আসত।

মারতে লাগল বুড়ো। ডাক দিল, ছেরুয়া বুড়ো।…

আঁ—হো—আঁউ!

হাঁ।

বুড়ো তাকাল ডোম দুটোর দিকে। কিন্তু নিজে চলতে পারছে না। বলল, এই তোর তুক্। তুই এমনি করে আমাকে মারবি। এমনি করে।

বাতাস পাক খাচ্ছে, তপ্ত বাতাস। হাঁপাচ্ছে বুড়ো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আর চাকার লয়ে তাল দিচ্ছে, হাঁ। এবার তুই চল বুড়ো নইলে তোকে মার খেতে হবে। এখনো বেঁচে আছিস, চলতে হবে!

ফাটা থ্যাবড়া ঠোঁট বুড়োর ঝুলে পড়েছে। রোদ পড়ে, জিভটা দেখাচ্ছে সাদা। বুড়ো এগোল লাঠি ভর দিয়ে। কোমরের ন্যাকড়াটা অনেকখানি স্থানচ্যুত হয়েছে। বুড়ো এখন শিশু দিগম্বরের শামিল।

কাছে এল বুড়োর। মস্ত বড় কালো পাহাড় ঢেউ দিয়ে চলেছে। হাত দিল বুড়োর গায়ে।

সামনে মাঠের পথ। ওই রেল লাইন। তার ওপারে ভাগাড়। বৈশাখের রুদ্র কটাক্ষে কাঁপছে থরথর করে।

পেটটা যেন ফুলে ফুলে উঠছে বুড়োর। মাথাটা ঠেলে ঠেলে, তুলে তুলে এগুতে হচ্ছে। যেন পাহাড়ের খাদ থেকে, শিং-খোঁচা চুড়ো ঠেলে ঠেলে উঠছে। নাকের লালা সুতোর মতো গড়িয়ে পড়ছে মাটিতে, হলদে ফেনায় ভরে যাচ্ছে থলথলে কালো পাঁকের মতো কষ। চোখে জল।

তুই কাঁদছিস বুড়ো। কাঁদিস নে।

বুড়ো হাতের চেটো দিয়ে মুখ মুছল। বুকে একটা হাত রাখল।

কাঁদিস নে বুড়ো। বুড়োদের কাঁদতে নেই।

কালো মেঘের মতো বড় হয়ে উঠছে ছেরুয়াটা। মস্ত বড়, দলাপাকানো বিশাল কৃষ্ণ জলধর। ঠিকরে পড়ছে চোখ। জল পড়ছে কোণ দিয়ে।

বুড়ো, চার বছর বয়সে তুই এসেছিলি আমার কাছে। তখন তোর দুধের দাঁত সব পড়ে নি। আজ তোর বয়স হলো, এক কুড়ি আট। ছেরুয়া হিসাবে তুই আমার চেয়ে বুড়ো। পঁচিশ বছর ছেরুয়ার অনেকখানি। তুই এককুড়ি আটে পড়লি, তুই কেন কাঁদিস। তোর কেন মরণের ভয়।

তুই যেবারে এলি, তখনো আমি জোয়ান। আমার বুড়ির তখনো অনেক রং। তিনটে বাচ্চার মা হয়ে গেছে তখন। তবু, চোখে চোখ পড়লেই, মেয়েমানুষটার নজর আড় হয়ে যেত। চলত বকনা ভঁইসীর মতো, আঁট ছিল ওইরকম। বাচ্চা-গুলি ওর মরে যেত, আর ছুটত আমার পিছে পিছে। কেঁদে কেঁদে সোহাগ জানাত। জানতাম, বাচ্চা চায়। আমার মরদের শোক, ভাবতাম থাক, কি হবে আর! ওর মন মানত না। খালি কিনা খাঁ খাঁ করত। ভরে রাখতে চাইত। সবাই চায় ভরে রাখতে। ও ছিল এই এলাকার ঝাড়ুদারনী। কাজ ফাঁকি দিয়ে আসত ছুটে ছুটে।

একদিন পড়েছি এই মাঠের পথে। বউটা এল। এল তুমুল জল মাথায় করে। সেই প্রথম, আমি এই গাড়িটায়, বুড়ো, তোর গাড়িতে চাপলাম, বউয়ের কথায়। লোকজন নেই, ফাঁকা। তার উপরে বিষ্টি। ও তাকাতে লাগল ঘন ঘন, বিজলী-হানা চোখে। বিজলী হানল ওর ফুলে-ওঠা নাকের পাটায়। আর কোমরে একটা এমন মোচড় দিয়ে বসেছিল। ও নয়, মরা ছেলের শোকটা-ই ওইরকম খেলার বেশ ধরে খেলছিল! আমি দেখলাম। কী বিষ্টি বুড়ো, তুই তখন জোয়ান ছেরুয়া। জল পেয়ে ছুটেছিস মহানন্দে। তখন তোর কোনো ভয় ছিল না।

আমি বউটাকে আদর করলাম। ভালবাসলাম। তখন আমার একবার আবার মনে হয়েছিল, ভগবান হাসছে।

বুড়ো, শব্দ নেই কেন বুড়ো চাকার।

কিন্তু কালো মেঘটা তো ঠিক ভেসে চলেছে চোখের উপর দিয়ে। লাল দাগ রেখে চলেছে। ফেনা লালা গড়িয়ে, গলার তলা দিয়ে পা বেয়ে পড়ছে। একটা চাপা কাশির শব্দ যাচ্ছে শোনা।

বুড়ো, তুই কি মুখ থুবড়ে পড়ছিস? তোর মাথা, পেল্লায় শিং দুটো নুয়ে পড়ছে কেন? তুই কি চলছিস না? চোখ দুটো তোর এত চকচক করছে কেন?

আঁ-আঁ হো আঁউ।

হাঁ।···চলছে। আমি শুনতে পাচ্ছি না বোধহয়। কেন? রেললাইন পার হয়েছে। ওই যে দেখা যায় কালো কালো সারি সারি—ওরা শকুন। এই গাড়িটাকে, মানুষ আর ছেরুয়াটাকে ওরা চেনে। তাই ছুটে আসতে লাগল কাছে।

ও! ওইজন্যে বুড়ো তোর চোখ ওইরকম দেখাচ্ছে। ভয় পাচ্ছিস। নিশ্বাস ফেলছিস ঘন ঘন। মাথাটাকে তুলছিস। আমি দেখছি, পাহাড় উঠছে সমুদ্রের তলা থেকে। ভয় নেই বুড়ো, ওরা চেনা।

ভয়ংকর দুর্গন্ধ। হাড্ডি আর জানোয়ারের দাঁতসুদ্ধ চোয়ালে ছড়ানো ঘাস-পোড়া মাটি। শকুনের বিষ্ঠায় আস্তীর্ণ সর্বত্র। মাংসখেকো কালো পিঁপড়ে থিকথিক করছে।

বাতাস এখানে ঘূর্ণি বাতাসে ডাক ছেড়েছে। সূর্যের রক্তচক্ষুর দৃষ্টি এখানে ছাই করতে চাইছে পুড়িয়ে।

বুড়ো, সেই একদিন চেপেছিলাম গাড়িতে। আর একদিন, দশ মাস বাদে চেপে-ছিলাম। ভরা পেটে ব্যথা নিয়ে বউটা এসে উঠেছিল গাড়িতে। গাড়িতে একটা মরা গাই, তার পাশে আবার বুড়ি কাতরাচ্ছিল। এইখানে এসে দেখলাম, বউটার একটা ছেলে হয়েছে।

ছেরুয়া বুড়ো, এই সংসার কী অদ্ভুত। দুনিয়ার আঁতুড়ঘরের কোল দিয়ে আসি মরার আসরে। সেইখানেও আঁতুড়ঘর করে গেল বউটা। আমার সেই ব্যাটা আছে বেঁচে। থাকে ভিনদেশে। গাড়ি টানে। জোয়ান বউ, তার এখন দুটো বাচ্চা। তুই সব জানিস বুড়ো, সে আমাকে নিতে চেয়েছিল। কিন্তু আমরা তিন খারিজে হয়ে গেছি একত্রে। বুড়ো, তুই আমার ভাই, আমার বন্ধু। তোর কেন ভয়? তুই কাঁদলে আমায় কাঁদতে হবে।

আগুন গলে গলে পড়ছে আকাশ থেকে। শকুনগুলি থেমে গেছে আসতে আসতে। কৌতূহলী উৎসুক চোখে দেখছে চেয়ে চেয়ে।

বুড়োর নাল কাটছে বুড়োর মতোই। বুড়ো কাঁপছে থরথর করে। ঘন ঘন নিশ্বাসে দেখছে শকুনের দিকে। পায়ে ধরছে কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ে।

বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে গাড়ির চাকা ধরে। আর একহাতে হাতড়াচ্ছে মরা ইঁদুরটা। তুলে ফেলতেই মুখে করে নিয়ে গেল একটা শকুন।

চল্ বুড়ো। কিন্তু, তুই এত বড় হচ্ছিস কী করে। কী করে! বড় হচ্ছিস, মস্ত বড়, কালো পাহাড় হয়ে আকাশে উঠছিস। বুড়ো! তুক করছিস তুই আবার। একি, ভাগাড়ের চেয়েও বড় হয়ে যাচ্ছিস। থাম, নইলে মরবি পিটুনি খেয়ে। ফিরে চল।

চল।

লাঠিটা পড়ে গেল বুড়োর হাত থেকে।

কেন?

চাকাটা চলে যাচ্ছে আপনি-আপনি।

কেন?

বুড়ো পড়ে গেল মাটিতে। চিত হয়ে পড়ল। গনগনে সূর্য জ্বলছে বুড়োর

চোখে বিড়ির টুকরোটা লেগে গেছে কষে।

বুড়ো, আমি তোকে ছাড়া কিছু দেখছি না। আমি দেখছি, সারাটা আকাশ ভরে তুই। আমি ভয় পাচ্ছি নে। দেখছি, তোর হাসি। এতদিন ভেবেছি, ভগবান হাসছে। এখন দেখছি সে তোর মুখে।

বুড়ো উঠল না আর। ছেরুয়াটা ছানিপড়া চোখে অবাক হয়ে দেখল বুড়োকে। দেখল শকুনগুলিকে। তারপর ঠেলতে লাগল নিজেকে।

আঁ……আঁ-হো আঁউ!

বুড়োর মনে হলো, বুড়ো বলছে, হাঁ।

হাঁ। আমি পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি বুড়ো, আঁ হো—আঁউ। হাঁ। শুনছি…এখনো শুনছি।

বুড়ো এগিয়ে গেল। তারপর পাক দিয়ে ঘুরে এসে দাঁড়াল বুড়োর কাছে। মুখোমুখি। জোয়ালসুদ্ধ মুখটা নামিয়ে নিয়ে এল। ওর লালায় ভরে দিল বুড়োর মুখ।

দুটি চোখে দারুণ ভয়ার্ত অসহায়তা। দাঁতহীন কালো থলথলে মাড়ি বেরিয়ে পড়ল বিরাট হাঁ থেকে। চোয়াল কাঁপছে, ফোঁসফোঁস করছে। পেটটা ফুলে ফুলে উঠছে। মোটা কালো জিভটা বের করে বুড়োর নাকের কাছে নিয়ে চাটল একবার।

তারপর ফিরে তাকাল দূরের পথে। চোখ দুটি ভরে উঠেছে জলে।

বুড়োকে না মাড়িয়ে পার হলো চার পায়ে। ঠেকে গেল চাকা দুটি বুড়োর গায়ে। ভাঙা গাড়ির চাকা, তবু চাকা। আর ভারি।

বুড়ো টানল।

আঁ……আঁ……আঁ হো আঁউ!……

বুড়োর বুক আর পায়ের ওপর দিয়ে চলে গেল চাকা দুটি।

রৌদ্রের দাবদাহ কথা বলছে ঘূর্ণি বাতাসের গোঙানিতে।

বুড়ো অনেকখানি গেল, অনেকক্ষণ ধরে। চেনা পথ। রেললাইন পেরিয়ে আবার দাঁড়াল।

যেতে পারছে না। কেউ যে চালাচ্ছে না। মারছে না, কথা বলছে না, তিন খারিজের একটা নেই। বোধহয় ভাবছে, উঠে আসবে আবার।

ফিরে দাঁড়াল। ছানিপড়া চোখে তাকিয়ে দেখল, কালো কি কতকগুলি হেঁটে ফিরে বেড়াচ্ছে নড়েচড়ে বুড়োকে ঘিরে।

যেতে পারছে না বুড়ো। ভয়ার্ত ব্যাকুল চোখ দুটি তুলে, কাঁপতে লাগল দাঁড়িয়ে। হাঁ করল কাঁপানো চোয়ালে। অস্ফুট শব্দ বেরুল, আঁ—।

আরোগ্য

নটীর-হাটের এই স্টেশনের সামনেটিতে দাঁড়িয়ে থাকি রোজ। সকাল-দুপুরে বিকেলে-সন্ধ্যায়-রাত্রে-মধ্যরাত্রে। কখনো সজ্ঞানে আসি, কখনো নিশির টানে। না এসে পারি নে।

নটীর-হাট যেন এক অদৃশ্য পাঁচিলে ঘেরা, ছন্নছাড়া কোনো এক আদ্যিকালের নগরী। সবই তার পুরনো, প্রায় প্রাচীনের পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। বাড়িঘর, রাস্তা-ঘাট, তাবৎ বাসাড়ে-বাসিন্দে-অধিবাসী, মন্দির-বিগ্রহ-ধর্মশালা, সবই। নতুন উঠেছে যেগুলি, সেগুলি যেন পুরনো ছেঁড়া ধুলোমাখা কাগজের স্তূপে কয়েক-খণ্ড নতুন কাগজ। চোখ পড়েও পড়ে না। বাসু পুরুতের গলিটি এখনো আছে ঠিক তেমনি। আছে তার শেওলা-ধরা, বেঁটেখাটো নিচু একতলা দোতলা বাড়ি-গুলি, এবড়োখেবড়ো রাস্তাটি, খোপে খোপে বংশপরম্পরায় সেই শালিকেরা, আর সেই একই গোত্রের মেয়েরা, যাদের চেহারা ও নাম বদলায় প্রায়ই, দলে দলে যায় আর আসে। কিন্তু সন্ধ্যাকালে সবাই রং মাখে, সাজে, এসে দাঁড়ায় রাস্তার দরজায়। নটীর-হাটের একেলে পৌরকর্তারা রাস্তাটির নাম করে দিয়েছেন 'সাহিত্য-সম্রাট-ভ্রাতা রোড'। কেমন একটু কানে লাগে খট করে। কে সেই সাহিত্য-সম্রাট, কে তার ভ্রাতা কে জানে। ভ্রাতার নাম না থাকাটাও বড় বিচিত্র, কিন্তু এইটিই বিশেষত্ব নটীর-হাটের। কেননা, ও নামে তো কিছুই যায় আসে না, রাস্তাটা যে নটীর-হাটের মজ্জায় মজ্জায় বাসু পুরুতেরই গলি। আর ঠিক এমনি গলি এত আছে নটীর-হাটের এই সোয়া বর্গমাইলের চৌহদ্দিতে···যাক্, প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি।

বছর যাটেক আগেও পশ্চিমে গঙ্গাই ছিল নটীর-হাটের সদর দেউড়ি। এখন এই স্টেশন। পুরনো সদর এখন খিড়কি-দোর। যত রাজ্যের যাওয়া-আসা এখানে। শুধু শহর নয়, মনে হয়, স্টেশনের এখানটা যেন সেই অলক্ষিত পাঁচিলঘেরা নটীর-হাটের সুউচ্চ সর্বোচ্চ চিলে-কোঠাখানি। এখান থেকেই দেখা যায় নটীর-হাটের সব অন্দর ও অন্ধকারের ঘটনা, শোনা যায় স্পষ্ট অস্ফুট সব কলকাকলি।

এই চিলে-কোঠাখানি আমার খেলাঘর। এর অগুনতি ঘুলঘুলিতে আমি সকৌতুক অস্থির চোখ নিয়ে ছুটে বেড়াই। তার মধ্যে একটি ভুল সম্প্রতি ধরা পড়েছে। আমি অনুভব করেছি, এ শুধু আমার খেলাঘর নয়, আমার যত শিক্ষা গোড়া বাঁধার এটি তার একটি স্কুলও বটে।

জন্ম-মৃত্যু, বিবাহ-শ্রাদ্ধ, পাপ-পুণ্য, কলঙ্ক-অকলঙ্ক, নটীর-হাটের যত প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য ঘটনার ঢেউ শেষপর্যন্ত আছড়ে এসে পড়ে এখানেই। স্টেশনের সামনে

এই এক-শ দেড়-শ গজের নানান ভিড়ের মধ্যেই। নটীর-হাটের এই প্রবেশমুখে, যত চেনা-অচেনার যাওয়া-আসার পথের ধারে।

ওই যে লাঠি হাতে, চটি পায়ে, চাদর গায়ে বুড়ো মানুষটি চলেছেন, তাঁর শিখায়-বাঁধা কাঠগোলাপ, উনিই হলেন নটীর-হাটের চক্রবর্তীদের বারো শরীকের এখনকার দিনের সবচেয়ে প্রবীণ। আমার সঙ্গে দেখা হলেই বলেন, "নটীর-হাটের কথা বলছ তো? না, আমরা এখানকার সবচেয়ে পুরনো বাসিন্দে নই। রামকুণ্ডুকে চেন তো, এখানে যার সতেরখানা বাড়ি আছে? তাকে সব দিয়ে গেছে উলুপী বারুণী। গদাই সাধুখাঁকে চেন? যার সাতটা ইঁট-কাঠের গোলা, পেট্রোল-পাম্প, সিনেমা আছে? সে পেয়েছে তার ঠাকুরদার কাছ থেকে সৌরভীবালার সম্পত্তি। অধর পালকেও চেন, লোহা আর সোনা দুই-ই তার অনেক। সে ভোগ করছে সুখদার দান। এই পাল, কুণ্ডু, সাধুখাঁদের দেশ নটীর-হাট। অবিশ্যি সবাই পরের সম্পত্তিতে বড়লোক নয়, নিজেরও আছে অনেকের। ব্যবসাটা ওদেরই একচেটে।"

"কিন্তু ওই উলুপী বারুণী, সৌরভীবালা, সুখদারা কারা?"

"ওরা সেকেলে নটী, অর্থাৎ বেবুশ্যে। নটীর-হাটের আদিবাসিনী। তবে শোনো, তখন সেই…"

থাক, প্রসঙ্গান্তরে চলে যাচ্ছি আবার। যদি ওঁকে জিজ্ঞেস করা যায়, কিন্তু এত ব্রাহ্মণ-বসতি হলো কী করে, ফোকলা দাঁতে হেসে বলেন, ধর্মের কলে।

উনি বেশি বলেন নি। ধর্মের কলটা বাতাসে কিংবা আর কিছুতে নড়ছিল, সেটা ধরা পড়েছে আমার চিলেকোঠার ঘুলঘুলিতে। তাহলে চক্রবর্তীদের ইতিহাস…

সেসব থাক্। ওই ঘোড়ার গাড়ির ভুলু গাড়োয়ান যেদিন ওর আগুনের মতো ষোড়শী বউ ঝুনিয়াকে নিয়ে এল প্রথম…থাক সেসব।

ওই যে যাচ্ছেন ফণীন্দ্র ঘটক, তাঁর পরমাসুন্দরী সাত মেয়ের কথা…না, সেটি এখন নয়।

গজেন্দ্রগমনে যাচ্ছে পথের মাঝখান দিয়ে ধবধবে ফর্সা মেদবহুলা বাড়িউলী সুখবালা, গোটা মালপোঁতা পাড়াটা ওর নিজেরই। ওর গায়ের ভাঁজে ভাঁজে আছে নটীর-হাটের আদি ইতিকথা। তের বছরের মেয়ে যেদিন প্রথম এল…থাক, সেই অপ্রাসঙ্গিক কথাই এসে যাচ্ছে বারবার। তা হলে মালপোঁতা পাড়ার অজ্ঞাতকুলশীল শিরীশ কেমন করে কার্তিক হালদারের মেয়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল, সে কথাও বলতে হয়।

আর ওই যে যাচ্ছে সুধারাণী বন্দ্যোপাধায়, নটীর-হাটের হাল-কলেজের ছাত্রী, ওর কিংবা অধ্যাপক ত্রৈলোক্যনাথ গুপ্ত কিংবা কৃষ্ণপ্রিয়া স্কুলের মাস্টার রেণুপদ নাথের জীবন-বৃত্তান্ত সামান্য জিনিস নয়। কোন্‌টা সামান্য। নটীর-হাটের এম-এল-এ অথবা শ্রমিক-নেতা, সাহেব—সাহেবকুঠি, ক্লাব, সাহেবদের পরকীয়া প্রবৃত্তি—কিছুই যাবে না ফেলা।

আমি তো আজকে এসব বলতে বসি নি। তবু যে বলতে হলো, তার কারণ, যা বলব, তা নটীর-হাটের বৃন্তছেঁড়া একটি কুসুমের মতো। তাই এত কথা।

আমার ঘুলঘুলি দিয়ে দেখতে পাচ্ছি অবনীকে। তার বিষয়ই হচ্ছে নটীর-হাটের সবচেয়ে হালের ঘটনা। সে ঘটনা নিয়ে নটীর-হাটে অনেক আলোড়ন হয়েছে। অবনীকে দেখলে এখনো যেন আলোড়নের ছায়া লোকের চোখে ফুটে ওঠে।

স্টেশন থেকে নেমে, কোনোরকমে একটি টুথপেস্ট কিনে অবনী হনহন করে চলেছে বাড়ির দিকে। ওর চীনা-বাড়ির চিকন মসৃণ মোটা সোলের জুতোর শব্দ শুনলেই বোঝা যায়, খুশিতে ডগোমগো কুরঙ্গটা যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে।

নটীর-হাটের মধ্যে বাছা সুন্দর কয়েকটি ছেলের মধ্যে ও একটি। চোখা নাক, টানা চোখ, রক্তাভ ঠোঁট আর ধবধবে ফর্সা রং, কিন্তু একেবারেই উন্নাসিকের মতো দেখায় না। মাথার চুল কোঁকড়ানো নয়, বড় বড় কয়েকটি ঢেউয়ে যেন একটি বিহ্বল অবসাদ চুলের বিন্যাসে। সেটিও বিচিত্র একটি সৌন্দর্য। এমনিতেই অবনী সুন্দর, তার উপরে নিপুণ হাতে টাই বেঁধে, কোট চাপিয়ে যখন বেরোয় ওর সেই সাবলীল ভঙ্গিতে, তখন পুরুষের ভিড়ে পুরুষ দেখেও তাকিয়ে থাকতে হয় একটুক্ষণ। ইংরেজীতে অনার্স নিয়ে সে বি-এ পাস করেছে। তারপর তেইশ বছর বয়সেই একটা ভালো চাকরি পেয়ে গেছে বিলিতি মার্চেণ্ট অফিসে।

আমি দেখছি, অবনী যাচ্ছে। দক্ষিণ দিকে খানিকটা গিয়ে বেঁকে গেল পুবে। তারপর আবার দক্ষিণে, পুবে আবার, দাঁড়াল গিয়ে সেই বাড়িটার সামনে। সেই মান্ধাতার আমলের বাড়ি, যেটা প্রায় বিঘে দুয়েক জমি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শতাব্দীর উপরে। এ-বাড়ির খ্যাতি শুধু নটীর-হাটে নয়, সারা বঙ্গে। নাম বললে সবাই চিনি চিনি করে উঠবে, তাই পরিচয়টা চাপা থাক। অবনী এই বাড়ির বিখ্যাত বংশের ছেলে।

আমি ওকে আজও দেখছি, আরম্ভ করেছি তিন বছর আগে থেকে। তখন ওর চাকরি-জীবন শুরু হয়ে গেছে। তিন বছর আগে, সেদিনও সন্ধ্যাবেলা ঠিক এমনিভাবে এ বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল অবনী। কিন্তু থমকে দাঁড়াল সেকেলে বাড়িটার গজাল-মারা সদর-দেউড়ির সামনে। ইলেকট্রিক নেওয়া হয়েছে, তবুও বাড়িটার গা থেকে পিদিম-হ্যারিকেনের রেশ ঘুচতে চায় না। দেউড়ির আলোয় মনে হয়, গত শতাব্দীর সেই ভুতুড়ে আলোটাই যেন জ্বলছে। সামনে পোড়ো উঠোন আর ভাঙা ঠাকুরদালান, ওখানটা অন্ধকার। পাঁচ শরিকের যাওয়া-আসার পথ, তাই কেউ তার ভাগের সামান্য মিটার ওখানে খরচ করতে রাজী নয়। ইঁদুর ছুঁচো ব্যাঙ ছাড়া সাপও থাকতে পারে, আছেও। তবু।

—উঠোনের বাঁ দিকে যে ঘরগুলিতে আলো দেখা যায়, ওগুলি অবনীদের। বাবা, মা, ভাই, বোন সব মিলিয়ে সংসার ওদের, এখনও পুরনো বংশ হিসেবে খুবই জমাট।

—অবনী থমকে দাঁড়াল। ওদিকটায় ও যেতে চায় না। কার্তিক মাসের হেমন্ত-জ্যোৎস্নায় এখনও কোথায় শরতের সোনার আভাস রয়ে গেছে একটু। তার উপরে হৈমন্তিক কুয়াশা-কুহকের একটু রেশ নির্বাক কৌতুকে রয়েছে চেয়ে। যেন পোড়ো উঠোন আর ঠাকুরদালানে ঘাপটি মেরে বসে আছে কারা আলো-আঁধারিতে।

অবনী যেতে চায়, ওদের ঘরগুলি পেরিয়ে, ন-জ্যাঠামশাইয়ের পরিত্যক্ত মহলটায়।

কিন্তু ঘরের লোকে দেখে ফেলে, সেই ভয়। উঠোনে ঢুকে, বাঁদিকে উপরে ওঠার সিঁড়ি। কিন্তু ভাঙা। উপরে এখন আর মানুষ ওঠে না। যে-কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে হুড়মুড় করে। এই ভাঙা সিঁড়ি দিয়ে উঠে, একটি চোরা সিঁড়ি আছে পিছনের মহলে যাবার। কিন্তু…এগিয়ে গেল অবনী পা টিপে টিপে। পায়ের চাপে সিঁড়িগুলিই দুরদুর করে, কিংবা ধুক্‌ধুক্‌ করে নিজের বুক, ঠিক ধরতে পারে না অবনী। অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে, সবে মাত্র চোরা-সিঁড়ির শেষ ধাপটায় এসেছে এমন সময় অস্ফুট আর্তনাদ শুনে থমকে গেল। দেখল, সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে ভয়ে জড়োসড়ো ললনা। চিনতে ভুল হয় নি, তাই।

অবনী তাড়াতাড়ি বলল, "আমি, ললনা, আমি অবনী।"

—ললনা কাঁপছিল। আর একটি শীৎকার দিয়ে ও অবনীর বুকের কাছে ঘেঁষে এসে ত্রাস-ফিসফিস গলায় বলল, "ম্মা গো! কী ভয় যে পেয়েছিলুম!"—এখানে কী করে এলে?"

"ওধারের পুরনো সিঁড়ি দিয়ে!"

"কী সর্বনাশ। যদি সাপ-খোপ—"

ললনার কথার উপরেই অবনী ঠোঁট চেপে দিল।

ললনা বলল, "এত ভয় কিসের যে, এমন খারাপ পথ দিয়ে এলে?"

অবনী বলল, "মার চোখে যে সন্দেহটা দেখা দিয়েছে, সেটা চাপা দেবার জন্যে। সামনে দিয়ে এসে তোমাদের দোর ঠেলতে হবে না। ভাববে, তবু ছেলেটা একদিন ললনাদের ওদিকে যাওয়া কামাই দিয়েছে।"

ভয় ছিল না ললনার বাবা-মাকে। ওরা এ-বাড়ির লোক নয়, দুর্গতির দায়ে কলকাতা থেকে এসে আশ্রয় নিয়েছে আজ ছ মাস। অবনীর ন-জ্যাঠামশায়রা প্রায় দু-পুরুষ ধরে আছেন কলকাতায়। নটীর-হাট থেকে মুছে গেছেন তাঁরা। কিন্তু শরিকানার ভাগটুকু খালি রাখতে হয় যে। তাই, এখন এসে আশ্রয় নিয়েছেন ন-জ্যাঠামশায়ের ভায়রাভাই, অর্থাৎ ললনার বাবা। ভদ্রলোক নিজের জীবনটা মামলার বাজি খেলে হেরে গেছেন নিজের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর কাছে। সব হারিয়ে এসেছেন, আর কারও নয়, ভায়রাভাইয়ের পোড়োভিটায়। ইতিমধ্যেই নটীর-হাটের মার্কেটে বেশ খাপ খাইয়ে নিয়েছেন নিজেকে। মনে হয়, ঠিক নটীর-হাটের আদিবাসিন্দা যেন। প্রায় প্রতিদিনই নানান পার্টির সঙ্গে যান মহকুমা আদালতে, সাক্ষী হিসেবে। হক কথা না বলুন যুধিষ্ঠিরের বিকিকিনির হাটে বিকোচ্ছেন মন্দ নয়।

সে-কথা যাক। ভদ্রলোকের কিছু না থাক, রূপ ছিল ঘরে একরাশ। নিজের মধ্যবয়সী স্ত্রী থেকে তিন মেয়ে সব কটি শুধু রূপ নয়, অপরূপ। একটা ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মতো, যেন বৈশাখের তপ্ত বাতাসে শিয়রে রাখা অগ্নিশিখা। অবনীর মায়ের মনের কথায়—পোড়োবাড়িটায় যেন কতকগুলি নাগিনী ঘুরছে কিলবিল করে।

আমি আমার চিলেকোঠার ঘুলঘুলি থেকে দেখতে পাই, নটীর-হাটের যত বাদলা-পোকাগুলি পড়ন্তবেলায় যায় অবনীদের নির্জন পাড়াটায়। দেখে ভাবি বাদলা-পোকা শুধু আগুনে পোড়ে না, সুযোগ পেলে তাদের সাপেও সাপটে দেয়

টপাটপ।
ওই একরাশ রূপের একটি বড় মেয়ে ললনা। অবনীর পাশে, একটি সুদৃশ্য সোনার হারের সুন্দর লকেটের মতো। সু-গৌরী, একহারা, কিন্তু একটি আশ্চর্য ধার ওর দেহ-লাবণ্যে। খর চোখে দীপ্ত দুটি তারা। যে দিকে চায়, সেখানেই দাগ দিয়ে দেয় একটু। কিন্তু রক্তাভ ঠোঁট দুটি কেমন যেন বিলিতী পুতুলের মতো বিহ্বল আবেশে ফুলো ফুলো। তার উপরে, এই অভাবের মধ্যেও ললনা সজ্জা পটীয়সী। প্রথম যেদিন চোখে চোখ পড়ল, দাগ পড়ে গেল অবনীর বুকে। তারপর শিকড় গাড়তে গাড়তে, জড়িয়ে ধরল আষ্টেপৃষ্ঠে।
ললনার বাবা-মা এসব দেখেও দেখেন নি। কিন্তু দেখতে ভোলেন নি অবনীর বাবা-মা, ভাই-বোন, আরও পাঁচ শরিকের খুড়ো-জ্যাঠা-দাদারা। প্রথমে কানাকানি, তারপরে ফিসফাস, তারও পরে গুঞ্জন। কিন্তু এই দু বিঘে পুরনো বাড়িটার ভিতরেই যত। পারিবারিক ব্যাপারটা কেউ বাইরে টেনে নিয়ে যান নি।
অবনী একটু সাবধান হওয়ার চেষ্টা করল। তাই অন্ধকারে, ভাঙা পরিত্যক্ত চোরা-সিঁড়ি দিয়ে, গোখরোর খোলস মাড়িয়ে এই দুঃসাহসিক অভিসার।

ধরা পড়ে গেল সেটাও। আন্দোলন উঠল সারা বাড়িতে।
কিন্তু এই দুজনের আন্দোলন তার চেয়ে অনেক বেশি। গোটা বাড়িটা এঁটে উঠতে পারল না। ওরা দুজনে হলো আরও বেপরোয়া। মাঝখান থেকে ছলনা-টুকু গেল। অবনী সোজাসুজি নিজেদের উঠোন পেরিয়েই যাতায়াত করতে লাগল ললনাদের মহলে।
অবনীর মা রান্নাঘরে ভাত দিতে এসে, অভিমান-ক্ষুব্ধ গলায় বললেন, "এসব কী হচ্ছে। তুই না বড় ছেলে এ-ঘরের। তবে যা খুশি তাই কর, আমি যাই কিছু দিন দাদার বাড়ি।"
অবনী বলল, "তার চেয়ে তোমরা থাক, আমিই চলে যাব।"
মনে মনে ভয়ে বিস্ময়ে শিউরে উঠে চুপ করে রইলেন অবনীর মা। ঘর ছাড়তেও ছেলে রাজী আছে তবে!
বাবা তো মুখে একেবারে কুলুপকাঠিই এঁটেছেন। এখন চেয়েও দেখেন না। অবনীর রোজগার ছাড়া সংসার চলবে না, ওঁর মুখে-চাবির ওইটিই কারণ। যদিও জানেন, ছেলে তাঁর বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, রূপে, ব্যবহারে ও কথায়, গোটা নটীর-হাটে প্রায় বেজোড়।
সব জানে, কিন্তু প্রাণ মানে না অবনীর। ললনার চোখের তারা ওকে টেনে নিয়ে যায়। সাড়া পড়ে গিয়েছে রক্তে, তাকে কী দিয়ে আটকে রাখবে অবনী!
রক্তে দোলা লেগেছে ললনারও। একটু দেরি হলে ঝড় ওঠে তার দু চোখে। অবনী কাছে এলেই, দু চোখে আলো জেবলে যেন আরতি করে। ঠোঁট দুটি আর একটু ফুলিয়ে বলে, "এত দেরি করলে যে?"
"দেরি কোথায়? পাঁচ মিনিট তো।"
"ওইটুকুই অনেকখানি।"

অবনী অবাক বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে ললনার রূপ দেখে ডুবে যায়। তারচেয়ে বেশি ললনা। অবনীকে বলে, "তুমি যখন আমার রূপের প্রশংসা কর, মনে হয় ঠাট্টা করছ।"

"কেন?"

"নিজের রূপটা বুঝি তাকিয়ে দেখ না?"

দেখে, কিন্তু সেটা স্বীকার করার মতো অবিনীত নয় অবনী। বলে, "পুরুষের আবার রূপ!"

ললনাও কথা জানে। বলে, "হ্যাঁ, সেটা বলার জিনিস নয়, মনে মনেই জানি। তা ছাড়া তোমার কত গুণ! তোমার পায়ের যুগ্যিও নই আমি।"

অবনী বলে, "তা ঠিকই। কেননা, তুমি যে বুকের যুগ্যি।"

"আহা, ইয়ার্কি!"

কখনও বলে, "আচ্ছা, তোমার হাতের লেখাটা তুমি কি দিয়ে লেখ?"

অবনী হেসে বলে, "কেন, হাত দিয়েই।"

"তোমার হাতে তবে ছাপাখানার মেশিন বসানো আছে। আশ্চর্য! কী সুন্দর তোমার হাতের লেখা!"

কথাটা ঠিক। অফিসে বড়সাহেব থেকে আর্দালীটি পর্যন্ত তার হাতের লেখায় মুগ্ধ। তার ইংরেজী ড্রাফ্ট না হলে ছোটসাহেবের মন ওঠে না। নটীর-হাটের ও অফিসের বন্ধুদের অনেকের ইংরেজী চিঠি লিখে দেওয়ার দায়টা সে সানন্দে নিয়েছে।

অবনী ললনাকে টেনে নিয়ে যায় বাড়ির পিছনের উঠোনের নির্জনে। বলে, "আমার লেখার চেয়ে তোমার কথা যে আরও সুন্দর।"

কিন্তু দেখা যায়, জিতটা শেষপর্যন্ত ললনার। কেননা অবনীর চেহারা, পোশাক, গুণ সবই অতুলনীয়। ললনার বেলায় ললনা নিজেই মুখথাবাড়ি দেয় অবনীকে। যদিও ললনা ক্ষীণ রেখায় কাজল টানতে গিয়ে চোখের ধারটা বাড়িয়েই ফেলে বেশি। কাঁধকাটা লাল জামাটার উপরে শাড়িটা এলিয়ে দিতে গিয়েও কষে জড়িয়ে ফেলে কোমরে। তাতে তার যৌবন যেন কী এক সর্বনাশ ও রহস্যের মতো বিচিত্র-ময়ী হয়ে ওঠে।

এমনি করে কেটে গেল আরও ছ'টি মাস—কখনও ভাঙা-সিঁড়ি ভেঙে নড়বড়ে দোতলার ঘরে, কখনও পিছনের উঠোনের হাসনুহানার তলায়, ঘোর সন্ধ্যায়, খিড়কি দোর খুলে, লতাজঙ্গলে আবৃত পরিত্যক্ত বাগানে।

বাড়িতে সকলের অস্বস্তি। নটীর-হাটের মানুষরা নিশ্চিন্ত। সদরে কোনো সাড়াই নেই।

আমি ভাবি, তারপর? ঘুলঘুলি দিয়ে মাঝে মাঝে একটি লোককে আসতে দেখেছি ললনাদের বাড়িতে। বয়স হবে প্রায় পঁয়তাল্লিশ। ললনারা ডাকে বসন্ত-কাকা বলে। বাড়ি কলকাতায়, অবস্থাপন্নও বটে।

বসন্তকাকা একদৃষ্টে চেয়ে দেখেন ললনাকে। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বলেন,

"নটীর-হাটে আছ তাহলে ভালই।"
"যেমন দেখছেন।"
"দেখতে খুব ভালো নয় অবিশ্যি. মনে হয় অন্তরে অন্তরে ভালই।"
ললনা কোনো জবাব দেয় না। মাথা নিচু করে, আঙুলে ফাঁস জড়ায় আঁচল দিয়ে। বসন্তকাকা শান্ত মানুষ, চোখ-খাবলার মতো তাকিয়ে থাকেন ললনার দিকে। বলেন, "মাসখানেকের মধ্যেই বাড়িটা বোধহয় কেনা হয়ে যাবে। আলিপুরের সেই বাড়িটা।"
অবনী জিজ্ঞেস করে ললনাকে, "উনি কে?"
"বসন্তকাকা।"
"আপন কাকা?"
"না, বাবার বন্ধু।"
এ-কথা সে-কথার পর আজকাল অবনী বলে প্রায়ই, "বাড়ির লোকেরা না বিয়ে দিলে আমরা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করতে পারি।"
অবনীর এ-কথার উপরে ললনা শুধু ওর বিলিতী পুতুলের মতো রক্তাভ ঠোঁট দুটি দেয় তুলে। অবনীর অসাড় অনুভূতিতে চাপা পড়ে যায় সিদ্ধান্তটা।
তারপর আমি দেখলাম আমার এই চিলেকোঠার ঘুলঘুলি দিয়ে, আসল সিদ্ধান্তটা বয়ে নিয়ে এলেন বসন্তকাকা। অবনী তখন অফিসে গেছে। বসন্তকাকা একেবারে লরি নিয়েই এসেছেন কলকাতা থেকে। ললনাদের মালপত্র উঠল তার মধ্যে। মাল-পত্র সামান্যই। ললনার মা-বাবা-বোনেরাও উঠল বসন্তকাকার সঙ্গে।
ললনা ওঠবার আগে অসঙ্কোচে এল অবনীদের উঠোনে, একেবারে অবনীর ঘরে। একটি খাম রাখল টেবিলে, তারপর অবনীর মাকে প্রণাম করে, বসন্তকাকার হাত ধরে লরিতে গিয়ে উঠল।
নটীর-হাটের একটি বিশেষত্ব, মানুষ যেমন আসে, তেমন ফিরে যেতে পারে না। নটীর-হাটের স্মৃতি নিয়ে গেল ললনা।
সন্ধ্যাবেলা যখন নটীর-হাটের সদরে আমি শুনতে পেলাম অবনীর পদশব্দ, সাহস করে উঁকি দিতে পারলাম না ঘুলঘুলি দিয়ে।
বাড়ি এসে ন-জ্যাঠামশায়ের উঠোনের দরজাটা সপাটে খোলা দেখে অবাক হয় অবনী। অন্ধকার দেখে আরও অবাক।

ঘরে এসে খাম দেখে খুলে ফেলল। চিঠিতে লেখা ছিল, "বসন্তকাকা আমার নামে একটি বাড়ি কিনেছেন আলিপুরে। আমরা এখন থেকে সেখানেই থাকব। আমাদের পুরনো সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার জন্যে বাবাকে সাহায্য করবেন বসন্ত-কাকা।... নটীর-হাটের স্বর্গবাসে এইটুকু বুঝে গেলাম, সংসারে এখনও কত ভালো মানুষ আছে, কত সুখ ও সৌন্দর্য আছে।—ললনা।"
অবনী চিঠি রেখে, হাত মুখ ধুয়ে বলল, "মা খেতে দাও।"
যেন কিছুই হয় নি, এমনি একটি ভাব করে বলল অবনী। কেবল ওর সুন্দর প্রসন্ন মুখের ভ্রূ ঠোঁট আর নাকের পাশে কয়েকটি সুগভীর রেখা দেখা দিল।

আমার ঘুলঘুলিতে ধরা পড়ল, অবনীর চোখে মুখে ওগুলি বিদ্রূপের চিহ্ন। নিঃশব্দে সব কিছুকেই সে বিদ্রূপ করছে।
তারপর মাসখানেক বাদে, অফিসে ছোটসাহেব প্রথম ওকে ডেকে পাঠালেন নিজের ঘরে। একটি কাগজ দেখিয়ে বললেন, "এটা কার হাতের লেখা, অবনী?"
'আমার।"
ছোটসাহেবের পায়ের তলা থেকে মাটি সরে গেলেও বোধহয় এত বিস্মিত হতেন না। লাফিয়ে উঠে বললেন, "ইম্‌পসিবল! এত কুৎসিত হাতের লেখা তোমার?"
সত্যি, হাতের লেখাটা অতি কদর্য, বকের ঠ্যাং-এর মতো। অবনী নির্বিকার-ভাবে বলল, "আজ্ঞে হ্যাঁ, আমারই।"
ডেস্‌ক খুলে ছোটসাহেব আর-একটি কাগজ বার করলেন। তাতে ছিল মুক্তোঝরা হস্তাক্ষর। বললেন, "এটা কার হাতের লেখা তবে?"
ও বলল, "আমারই। কিন্তু এখন আর আমি ওর চেয়ে ভালো লিখতে পারিনে।"
ছোটসাহেব হাসবেন না কাঁদবেন, বুঝতে পারলেন না। কয়েক মিনিট প্রায় রুদ্ধ-শ্বাস বিস্ময়তীব্র চোখে তাকিয়ে বললেন, "কাগজ নাও আমি ডিক্‌টেট করছি, তুমি লিখে যাও।"
অনায়াসে লিখে গেল অবনী, অবিকল সেই কদর্য হাতের লেখাগুলির মতোই। ছোটসাহেব আরও খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "আচ্ছা তুমি যাও।"
চলে এল অবনী। কিন্তু ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গোটা অফিস হাঁ করে তাকিয়ে রইল অবনীর দিকে। মানুষের পরিবর্তনের সঙ্গে যে তার হাতের লেখারও পরিবর্তন হয়, এমন বিচিত্র ব্যাপার কেউ দেখে নি। 'ব্যাপার কি?'
নটীর-হাটের মানুষের চোখে তখনও কিছু ধরা পড়ে নি।
কিন্তু একদিন ধরা পড়ল, চোখে-না-পড়ার ভিতর দিয়ে। অবনীর যাওয়া-আসার পথে, দোকানী আর পড়শী, সবাই ওকে একবার তাকিয়ে দেখত। এইজন্য দেখত যে, পাড়ার সবচেয়ে সুন্দর ছেলেটা যাচ্ছে।
একদিন কেউ ফিরেও দেখল না, কারণ তারা চিনতেও পারে নি যে, অবনী যাচ্ছে। কেননা, নটীর-হাটের কড়ি মিস্তিরির মতো, ছোট ছোট চুলের মাঝখানে সিঁথি-কাটা অবনীকে চেনাই দুষ্কর।
ওর ডেলি-প্যাসেঞ্জার বন্ধুরা, নটীর-হাটের মানুষেরা সবাই অবাক হলো, হাসল, দুঃখিত হলো। কেউ বলল, "এ আবার কেমন ফ্যাশান হে।" কেউ বলল, "অমন সুন্দর চুলগুলি। এ কি বিচ্ছিরি, ছি ছি..."
অবনী হাসে। আমি দেখি, হাসির মধ্যে ওর সেই বিদ্রূপই আরও তীব্র হয়ে উঠেছে। কিন্তু তার মুখটা যাচ্ছে বদলে, আর হাসিটা অবিকল নটীর-হাটের তেজারতী কারবারী নফর কুণ্ডুর মতো ছুঁচলো আর কুৎসিত হয়ে উঠল।
এর সঙ্গে সঙ্গেই এল একটু শীর্ণতা, গোমড়া মুখ আর অঙ্ক কষিয়ে বুড়োমাস্টারের মতো নীরবতা। চোখে ছানি পড়ে নি নিশ্চয়ই। কিন্তু চোখের মণি দুটিও কেমন যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল। ধবধবে রংটা গেল কালো হয়ে। শেষে প্যান্টশার্টগুলির রং-এর রুচিই শুধু গেল না, শরীরের তুলনায় বড় ঢলঢলে হলো।

ঠিক সেই দুটি হাতের লেখার মতো। প্রায় চাঁদের সঙ্গে জোনাকির মতো তফাত। ছ মাসের মধ্যে ওকে দেখাতে লাগল যেন পসারহীন বয়স্ক উকিলের মতো।

আমি ভাবি, এ ভয়ংকর প্রতিশোধটা নিচ্ছে কেন প্রকৃতি, কিসের জন্যে?

নটীর-হাটের ফিসফাস গুঞ্জরিত হয়ে উঠল। মন্দিরে, বৈঠকখানায়, ক্লাবঘরে আর রকের সান্ধ্য-আসরগুলির সব মাথা টনটন করে উঠল ব্যথায়। বাঁড়ুজ্যেদের সেজ শরিকের ঘরের ভিতরে ঘটছেটা কী? হিং-টিং-ছট-এর মতো অর্থ উদ্ধারের আশায় ঘোল খেতে লাগল সবাই।

ছোট ছোট ছেলেপিলেরা অবনীর পিছনে লাগল একটু-একটু করে। কেননা, তারা জানে 'অবুদা' পাগল হয়ে গেছে। আর পাগল হলেই সে আর মানুষ থাকে না, তখন তাকে ঢিল মারতে হয়, কাদা ছুঁড়তে হয়, পিছনে লাগতে হয়। পথে পড়ে ফণীন্দ্র ঘটকের বাড়ি। তার রূপসী সাত মেয়ে রাস্তার ধারে জানলায় দাঁড়িয়ে হেসে মরে। কেননা, অবনীটা যদি পাগলাই হলো, তবে তাদের সাতবোনের খপ্পরে পড়তে বাধা ছিল কোথায়?

এসব শুধু উপরে-উপরে। ভিতরে ভিতরেও অবনীর নতুন পরিবর্তন দেখা গেল। অফিসের লেখায় ভুল বেরিয়ে পড়ে রোজই। সেখানে ওকে করুণা করল সাহেব। বাড়িতে তো কান্নাকাটির দাখিল। বাবা মরতে লাগলেন গুমরে গুমরে। মা চেয়ে দেখেন জলভরা চোখে। ভাইবোনেরা ভীত, বিস্মিত।

ছ মাস বাদে, মাইনে পেয়ে অবনী বাড়িতে টাকা কমিয়ে দিল অর্ধেক।

মা বললেন, "এ কী, এত কম?"

ও বলল মোটা ঘড়ঘড়ে গলায়, "ওর চেয়ে বেশি দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার একটা ভবিষ্যৎ দেখতে হবে তো।"

মায়ের প্রাণটা ধক্ করে উঠল। ও মা! বলে কী! বললেন, "কী বলছিস তুই অবনী?"

অবনী হাসল, "ঠিকই বলছি। আর তা ছাড়া খাওয়ার অত বাছাবাছি কিসের? শুধু ডাল-ভাত করতে পার না?"

মায়ের মনে হলো, জ্ঞান হারাবেন, পড়ে যাবেন ধুলোয়। এটা কে? বাড়ির কারুর খাওয়া-পরার দুঃখ যে সহ্য করতে পারে না, সেই ছেলে এই?

তারপর দেখা গেল, অবনীকে ভাত দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারেন না। মুখে নয়, অন্তরে বলেন, শুধু ভাতগুলি অমন রাক্ষসের মতো খায় কী করে ছেলেটা। মনে মনে বলতে হলো মাকে, কী বিশ্রী খাওয়া!

এখন অবনী সরষের তেল মাখে মাথায় খাবলা খাবলা, ঘসর ঘসর দাঁত মাজে ছাই দিয়ে।

একদিন ঠাকুরদালানের উঠোনে এক তাল গোবর দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল অবনী। গোবর এরকম বহুদিন চোখে পড়েছে, কিন্তু ফিরেও দেখে নি। হঠাৎ ছোট বোনকে ডাকল কেমন একটা গোঁয়ারের মতো করে। বলল, "খেতে পারিস, আর গোবরটুকু কুড়িয়ে দেয়ালে চাপটি মেরে রাখতে পারিস নে। রোজ রোজ অত ঘুঁটের পয়সা আসে কোত্থেকে।"

বিষয়টা সামান্য, কিন্তু কত যে অসামান্য সেইটি ভেবে, আড়ালে বসে আঁচলে মুখ চেপে কেঁদে উঠলেন ওর মা।

অনেকদিন পর সাহস সঞ্চয় করে একদিন মা বলে ফেললেন, "অবনী, ললনাকে তুই বিয়ে করে আন।"

মায়ের দিকে তাকিয়ে ওর এখনকার স্বভাব-কুৎসিত হাসি উঠল ফুটে। বলল, "দোকানের পুতুল নাকি সে?"

আরও কয়েক মাস বাদে দেখা গেল, অবনীর ডান কাঁধটা যাচ্ছে উঁচিয়ে। একটু একটু করে বেশ খানিকটা উঁচু হয়ে শরীরটা গেল বেঁকে। তারপর বাঁ পা খোঁড়াতে লাগল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে কোমর বেঁকে হাঁটু ভেঙে কেমন একটা বিশ্রী হ্যাঁচকা দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল ও।

আমি আমার ঘুলঘুলি থেকে দেখলাম, অবনীর চলার ভঙ্গিতেও একটা ভয়ঙ্কর বিদ্রূপ ফেটে পড়ছে। ঠিক একটা ক্রুদ্ধ ক্ষিপ্ত মানুষ একজনকে ভেংচালে যেমন হয়, সেইরকম।

রাস্তার দুধারে দাঁড়িয়ে রোজ দেখল ওকে নটীর-হাটের মানুষেরা। আর সে সবাইকে যেন ভেংচাতে লাগল এই কদর্য ভঙ্গিতে। চলার তালে তালে ওর বুকের থেকে একটি শব্দ এসে বাজল আমার কানে, "এই, এই তো দ্যাখ চেয়ে, এই আমি।"

ঘরে বাইরে সবাইকে জানিয়ে দিল, "আপনি আপনি ওর হাত পা এমনি বেঁকে যাচ্ছে, নার্ভগুলি যাচ্ছে মরে, হাত-পা যাচ্ছে শুকিয়ে।"

ঘরে বলল, বাইরের ডাক্তার দেখছে। বাইরে বলল, দেখছে ঘরের ডাক্তার।

আর মধ্যরাত্রে আয়নার সামনে ঠিক সেই ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে তেমনি কুৎসিত হেসে বলল, "চব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত অনেক ভান করেছি। আসল রূপটা ফুটেছে আমার এতদিনে।"

আমি আমার চিলেকোঠাখানিতে বসে ভাবছিলাম, মানুষের মনের চিলেকোঠায় কতগুলি ঘুলঘুলি আছে।

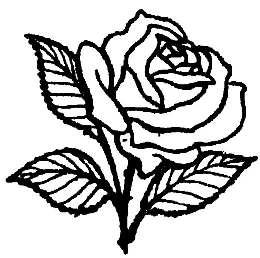
কিন্তু সামনের রাস্তায় অনেক লোক ওর পিছনে লাগল। অকারণ ডেকে ডেকে নানান কথা জিজ্ঞাসাবাদ করে। কেউ ঠাট্টা করে, করুণা করে কেউ। ছোঁয়াচে রোগের ভয়ও আছে অনেকের।

ওদের বাড়ি থেকে পশ্চিমে, হোমিওপ্যাথি ডাক্তার গোকুল মিত্তিরের বাড়ির কাছে এসে, দক্ষিণ দিক দিয়ে ঘুরে যেতে লাগল রোজ। আগে যেত গোকুল ডাক্তারের বাড়ির উত্তর দিক দিয়ে।

এতদিন আমার ঘুলঘুলি থেকে যেটা দেখেও দেখি নি, তা হলো দুটি চোখ। লক্ষ্য করে দেখলাম, অবনীর যাওয়া-আসার সময়টিতেই ঠিক নির্বাক নিশ্চল পটের মতো সেই চোখ দুটি গোকুল ডাক্তারের জানালার গরাদ থেকে তাকিয়ে থাকে অপলক। সেই চোখে যত মুগ্ধতা, তত বিস্ময়, তত করুণা!

চোখ দুটি গোকুল ডাক্তারের মেয়ে পারুলের। মনে পড়ল, পারুলে [illegible] এমনি পটে আঁকা ছবিটির মতন তিন বছর ধরে তাকিয়ে আছে।

খাঁ জালিয়াতির দায়ে একবার বোবা আর কালা হয়ে গেছল, মনে আছে ?”
বাস্, পুরুতের গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে বললে গদাই, “ওসব শালা কিছু নয়, সেরেফ ভিং-ডি বাবা। গদাশালার চোখ ফাঁকি দিতে পারবে না, ওসব শালা অনেক, শালা…”
—তা বটে। গদা একসময়ে হামা দিয়েও চলেছে। এর উপরে আর কথাই নেই।



ছেঁড়া তমসুক

তখন রাত্রি প্রায় আটটা। সেই সময় খবরটা এল। একজন এসে ঠোঁটটা বেঁকিয়ে কেমন একরকমের বিদ্রূপময় অথচ নির্বিকারভাবে হেসে খুব সাধারণ গলাতেই বলল, "ওই যে, ওই সেই মেয়েটা, মারা গেছে।"

পৌষ মাস। অন্ধকার ঘনিয়েছে প্রায় ঘণ্টা তিনেক আগেই। মফস্বল শহরের সদর-অন্দর, সব রাস্তাই এতক্ষণে ফাঁকা হয়ে আসার কথা। হয়ও অন্যান্য দিন। কিন্তু আজ শনিবার। তাই এখনও কিছু লোকের আনাগোনা রয়েছে।

রেলওয়ে স্টেশনের কাছে ভিড়টা একটু বেশী। কারণ দোকানপাট বেশী, আলোও বেশী আর মানুষের যাতায়াত তো আছেই। তারপর রাস্তাটা উত্তর-দক্ষিণে ক্রমেই ফাঁকা হয়ে গিয়েছে, দোকানপাট কমে এসেছে।

আকাশে কুয়াশা, তারাগুলি মরা চোখের মতো নিষ্প্রভ। ধুলো আর ধোঁয়ায় গোটা শহরটা একটা উলঙ্গবাহার শাড়ির মতো একটা অশ্লীলতার আবরণ জড়িয়েছে যেন। উত্তুরে বাতাসে শীতের কাঁটা। 'সিটি ফাদার' ষাঁড়টা স্টেশনের বারান্দায় উঠে পড়েছে। রাস্তার কুকুর আর মানুষেরা গরম আশ্রয়ের সন্ধান করছে।

সেই সময় খবরটা এল।

দক্ষিণের ফাঁকায়, রাস্তার উপরে, সেকেলে নিচু ছাদ, পোকা-খাওয়া কড়ি-বরগা আর চুন-বালি-খসা 'গণেশ কাফে'র ঘরে সংবাদটা এল। গণেশ কাফেতে তখন জম-জমাট আড্ডা। চায়ের কাপ-গেলাস-ভাঁড়, সবরকম পাত্রই জড় হয়েছে টেবিলের উপর। প্রায় একটা গণতান্ত্রিক ঐক্যের মতো।

সস্তা সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ায় ঘরটিকে গ্রাস করেছে।

মালিক লুঙ্গি পরে চাদর জড়িয়ে বসে আছে কাউন্টারে। নতুন লোক আসার সম্ভাবনা কম। এখন যারা আছে, তারা প্রতিদিনের, প্রায় সব সময়ের। অধিকাংশই স্থানীয় বেকার যুবক। কলেজ থেকে ফেল-করা, ভেগে-পড়া কিংবা পড়তে-না-যাওয়াদের ভিড়ই বেশী। ময়লা পাজামা, ধুতি, প্যান্ট, ছেঁড়া জামা, উসকো-খুসকো চুল আর পুরোপুরি খেতে না-পাওয়া মুখের একটা লেপটা-লেপটি দঙ্গল। অবশ্য এদের মধ্যে এদেরই দু-একজন ফিটফাট চকচকে, ভরপেট-খাওয়া সুস্থ বন্ধু-বান্ধব যে না দেখা যায় তা নয়। তবে সেটা অনিয়মিত। খাপছাড়া, করুণা-করুণা ভাব। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট, পি এস পি, আর এস পি, স্কুল-কলেজ, মিউনিসি-প্যালিটি, খুন-জখম-মারামারি, প্রেম-ফুসলানো-হরণ, গান-বাজনা-থিয়েটার এই শহরের আদি ও অন্ত এখানকার আলোচনার বিষয়। মায় সাহিত্য পর্যন্ত। চেঁচামেচি উত্তেজনা তো আছেই। হাসাহাসি গালাগালি আছে। হাতাহাতিও যে নেই, তা নয়।

মাঝেমধ্যে ছুরিও বেরিয়ে পড়েছে রুদ্ধ হুঙ্কারের মধ্যে। হয় নি যদিও, তবু খুনোখুনিরও আশঙ্কা দেখা দিয়েছে অনেকবার। আর এরই মধ্যে আবার কান্নাও আছে। রাত্রি আটটার সময়, আড্ডা তখন বেজায় জমজমাটি। কেরোসিন কাঠের পার্টিশান দেওয়া দুটি ছোট ছোট 'ফর লেডিজ'-এর খুপরিতেও আড্ডা জমেছে। যদিও লেডি নেই একজনও।

'গণেশ কাফে'র মালিক গণেশও আড্ডার শরিক হয়ে গিয়েছে। বাতাসহীন চাপা ঘরটায়, সস্তা সিগারেট আর বিড়ির ধোঁয়ায় একটি নরক-গুলজার-করা প্রেতচ্ছায়ার মতো দেখাচ্ছিল সবাইকে। নানান রকমের কথা, হাসি ও বাদ-প্রতিবাদে সবাই যখন মশগুল, সেই সময়ে একটা নিত্যনৈমিত্তিক পুরনো খবর বলার মতো, হেসে নির্বিকারভাবে একজন এসে বলল, "সেই কলোনিপাড়ার কাছে, ভটচার্জি পাড়ার রাধু বাঁড়ুজ্যের মেয়ে, আমাদের ফেমাস বিজু, বিজলী হে বিজলী, মারা গেছে।"

নরকটা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। ছায়াগুলি মন্ত্রপড়া জল ছিটানোর মতো অনড় নিশ্চল হয়ে তাকিয়ে রইল খবরদাতার দিকে।

একটু পরে একটা মোটা গলা শোনা গেল, "কী ভাবে ?"

জবাব শোনবার আগেই আর একজন বলল, "আজ বিকেলেও তো দেখেছি।"

আর একজন, "হ্যাঁ, এখানেই তো দেখেছি সন্ধ্যার সময়।"

বলে সে একজনের দিকে তাকাল। যার দিকে তাকাল, সে দাঁড়িয়ে পড়েছে ততক্ষণে। তার সংগে সংগে আরও দু'জন। চব্বিশ পঁচিশের বেশী কারও বয়স নয়। তিনজনেই প্রায় একসংগে শ্বাসরুদ্ধ অবস্থায় বলে উঠল, "হ্যাঁ, আজ, আজই সন্ধেয় সে ছিল। কিন্তু কি ভাবে মারা গেল ? কোথায় আছে ?"

যে খবরটা এনেছিল, সে বলল, "নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারে নর্থ কেবিনের কাছে, রেল লাইনের ওপরে।"

"রেল লাইনে ?"

"হ্যাঁ। মালগাড়ির তলায় কাটা পড়েছে। আমি দেখে এসেছি। ঠিক গলার কাছ থেকে—"

"সুইসাইড নিশ্চয় ? নইলে সেখানে রাত্রিবেলা কে যায় ?"

ততক্ষণে সেই তিনজন বেরিয়ে গিয়েছে।

তারপরেও 'গণেশ কাফে'র নিচু-ছাদ ঘরটা খানিকক্ষণ যেন দম চেপে রইল। একটু পরে একজনের গলা শোনা গেল, "আশ্চর্য। কিছু বোঝা যায় না আজকাল।"

গণেশ ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "সত্যি। আর এই রেল লাইনটা যেন কী মাইরি।"

কেউ কেউ উঠল। বলল, "যাই, দেখে আসি।"

সেই তিনজন তখন ছুটতে ছুটতে অন্ধকার রেল লাইন দিয়ে নর্থ কেবিনের কাছে এসে পেঁছেছে। জায়গাটায় রাস্তার আলো আসে না। কেবিনের আলো এসে পড়বার সুযোগ পায় নি একটি গাছের জন্য। গুটি তিনেক টিমটিমে রেল লণ্ঠন নিয়ে এসেছে কেবিনের কুলি। জি আর পি পুলিশও এসে পড়েছে। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে তাদের টর্চলাইটের আলো। কিছু লোকের ভিড় ঘিরে রয়েছে ফোর্থ

লাইনের একটা অংশ।
ওরা তিনজনে ভিড় ঠেলে এগিয়ে গেল। লাইনের দিকে একবার তাকিয়ে একই সংগে চোখাচোখি করলে তিনজনে। একটা অসহায় জিজ্ঞাসা ও বিস্ময়ে উদ্দীপ্ত তিন জোড়া চোখ। তিনজনেই যেন পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করছে, এটা বিজুই তো ?
হ্যাঁ। বিজুই। চোখ নামিয়ে আবার দেখল তারা বিজলীকে। ঠিক। ঘাড়ের কাছ থেকে মাথাটা কেটে গিয়েছে। জড়ানো রুক্ষ দীর্ঘ বেণীটা পুরোপুরি এলিয়ে পড়ে আছে লাইনের মধ্যে, কিন্তু মাথাসুদ্ধু লাল ফিতে স্লীপারের উপর। মাথাটা লাইনের মধ্যে, শাড়ি-জড়ানো দেহটি লাইনের বাইরে পাথর আর ঘাসের উপর যেন প্রায় কাত হয়ে এলিয়ে পড়ে আছে।
রেল-লাইনের টিমটিমে আলো, বিন্দুর মতো চিকচিক করছে বিজলীর চেয়ে-থাকা স্বচ্ছ চোখে। হাঁ-মুখটা খোলা, ঝকঝকে সাদা দাঁতে আলো পড়েছে। কপালের রক্তটিপটা জ্বলজ্বল করছে এখনও। আর এদিকে ঘাড়ের কাছ থেকে খয়েরী-ডোরা কালোপাড় শাড়ির আঁচলটা ঠিক বুকের উপর দিয়ে টানা আছে। কোথাও যেন এতটুকুও অবিন্যস্ত হয় নি। কেবল বাঁ পায়ের দিকে শাড়িটা একটু বেশী উঠে গিয়েছে, যে-রকম উঠে যায় ঘুমন্ত মানুষের। হাতের লাল কাচের চুড়ি-গুলির কয়েকটা ভেঙে পড়ে আছে হাতের কাছেই। বাকিগুলি সবই আস্ত আছে। কোথাও রক্ত লেগে নেই। কেবল ঘাড়ের কাছে খয়েরী ডোরাকাটা শাড়িটা পেরিয়ে লাল ব্লাউজের বুকের উপর গড়িয়ে এসেছে একদলা রক্ত। শীতের উত্তুরে হাওয়ার টানে তা এর মধ্যেই শুকিয়ে যেন বাসী হয়ে গিয়েছে।
তা ছাড়া আর সব ঠিক আছে। যেন, ঘাড়ের সংগে মাথাটা জুড়ে দিলে, এখনি বিজু ওর বিজলী-চমক হাসি হাসতে হাসতে উঠে বসে চমকে দেবে সবাইকে। যে-হাসিতে এই মফস্বল শহরের সবাই কোনোও না কোনোও দিন একবার চমকেছে।
বিজু, হ্যাঁ বিজুই। কলংক যার অংগের ভূষণ ছিল। যে-কলংকিনীর কথা বলতে রসিয়ে উঠত শহরের ইতর-ভদ্র। যাকে সহজলভ্য মনে করে সেই চিরকালের টোপ-ফেলাফেলি খেলা অনেক হয়েছে কিন্তু প্রচন্ড আক্রোশে গর্জাতে হয়েছে নীরবে ও সরবে। অথচ যাকে কলেজের কয়েকটা পড়ো কিংবা পড়তে পড়তে সরে-পড়া বখো দুর্বিনীত ছেলের সংগে প্রায়ই এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে নির্লজ্জের মতো। সন্দেহজনকভাবেই রাস্তার উপর গায়ে গায়ে, জোরে হেসে হেসে, শহরের গায়ে জ্বালা ধরাতে দেখা গিয়েছে। এমন কি আজও দেখা গিয়েছে। এ সেই বিজলী, এই রেলে-কাটা মেয়েটা।
'গণেশ কাফের' এই তিনজন আবার চোখাচোখি করল। ওরা তিনজন সেই কয়েকটা বখো ছেলে, যাদের সংগে বিজুকে দেখা যেত সব সময়। তাদের তিন-জনেরই চোখের দৃষ্টি যেন গলায় দড়ি দেওয়া লাশের মতো আরও উদ্দীপ্ত। একটা মহাশূন্যের মতো অশেষ বিস্ময় ও প্রশ্ন নিয়ে যেন এখুনি চোখগুলি রক্ত কিংবা জলের ফোয়ারা ছুটিয়ে ফেটে পড়বে।
বিজু, বিজুই তো। যে আজ বিকেলেও তাদের তিনজনের সংগে 'গণেশ কাফে'তে

ছিল। যার কথার হাসিতে, এমন কি রাগ ও অভিমানের মধ্যে, একবারও এই কাটা পড়ার ছায়া দেখা যায় নি।

তবে ?

ভিড়ের মধ্যে কার একটি রসাল দীর্ঘ হুঁ-উ-উ শোনা গেল। তারপর চাপা গলায়, "বড্ড বাড়িয়েছিল। বোঝ এবার।"

তিনজোড়া চোখ সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের দিকে ছুটে গেল যেন খ্যাপা নেকড়ের মতো। কাউকেই চেনা যায় না। রেল-লণ্ঠনগুলি বিজলীর কাছে নামানো। বিজলীকে ঘিরে রয়েছে। ভিড়ের লোকগুলি অস্পষ্ট।

অচেনা আর চেনা লোকের গুঞ্জন একইভাবে চলছে। কে ? কার মেয়ে ? ও ! সেই, সেই মেয়ে ? কী হয়েছিল ?

বুঝে নাও। হয়েছিল একটা কিছু নিশ্চয়।

হবে, জানাই ছিল।

বিজলীর বাবা রাধুবাবুকেও দেখা গেল 'জি আর পি'র দারোগার পাশে। বিজুর দিকে ওঁর চোখ নেই। অন্যদিকে তাকিয়ে আছেন কোল-বসা চোখে। খুবই অসহায়, তবু যেন একটা অপরাধীর ভাব। বিজলীর লাশ কিংবা লাশ দেখতে-আসা ভিড়ের কারও দিকেই তাকাতে পারছেন না।

দারোগা জিজ্ঞেস করল, "কত বয়স হয়েছিল আপনার মেয়ের ?"

"তেইশ।"

"বিয়ে দেননি কেন ?"

দারোগার মতোই প্রশ্ন। রাধুবাবু বললেন, "সঙ্গতি ছিল না।"

"হুঁ। কী হলো হে, লাশ বাঁধ।"

একটি সেপাই জবাব দিল, "বাঁশ নিয়ে জমাদার আসছে স্যার।"

"হুঁ।" দারোগা আবার বলল, "থার্ড ইয়ার থেকে পড়া ছেড়ে দিয়েছিল কেন আপনার মেয়ে ?"

"ছ মাসের বেতন বাকী পড়েছিল, তাই।"

"উঁ, তা হলে বলছেন, কোনো চিঠিপত্রই রেখে যায় নি ?"

"না।"

"আঁ-হা। দেখবেন মশাই, চেপে-টেপে যাবেন না, পরে মুশকিলে পড়ে যাবেন।"

রাধুবাবু যেন ধরা-পড়া চোরের মতো অন্যদিকে তাকিয়ে রইলেন।

দারোগার টর্চলাইট একবার ঝলকে উঠল কাটা বিজলীর উপর।

লাশ বেঁধে নিয়ে যাওয়ার লোকেরা এলো।

ওরা তিনজন এগিয়ে গেল রাধুবাবুর কাছে। ওদের তিনজোড়া উদ্দীপ্ত চোখে একটা হিংস্র প্রশ্ন বাগিয়ে ধরা ছুরির মতো চকচকিয়ে উঠল নিঃশব্দে। রাধুবাবুর কাছে তারা জানতে চায় কী হয়েছিল ? কেন মরেছে বিজলী ?

রাধুবাবু তেমনি অসহায়ভাবে তাকালেন। বললেন প্রায় চুপিচুপি, "এই যে শংকর আর নরেশ এসেছ। ও প্রভাতও এসেছ ?"

হ্যাঁ, ওরা এসেছে, কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। রাধুবাবু কী জানেন, সেইটি বলুন।

তারা জানতে চায় তাদের, হ্যাঁ তাদের সঙ্গে যে বিজু হাসতে হাসতে এসেছিল 'গণেশ কাফে' থেকে, সে কেন গলা বাড়িয়ে দিয়েছে রেলের তলে ?

রাধুবাবুও ওদেরই চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। এতক্ষণে দেখা গেল, ওঁর কোল বসা চোখ দুটি সর্দিজ্বরের মতো ভেজা লাল হয়ে উঠেছে। দাঁতহীন ঠোঁট দুটি চাপছেন বারে বারে। বললেন, "কিছু জানি নে। বিজুর তোমরা বন্ধু। তোমরা, তোমরা কিছুই জান না ?"

শংকর নরেশ আর প্রভাত আবার চোখাচোখি করল। বুঝল ওরা, রাধুবাবু সত্যি কিছু জানেন না। তবে ? তবে কে বলবে ? কে জানে ?

তিনজনেরই দৃষ্টি গিয়ে পড়ল বিজলীর উপরে। ওরা চমকে পরস্পরের হাত চেপে ধরল। যেন ছিটকে বেরিয়ে যাবে কোথাও। দেখল, বিজলীর শ্যামলী মুখখানি ওর বুকের উপর বসিয়েছে জমাদারেরা। আর বিজলী এখন চেয়ে আছে ঠিক তাদের তিনজনের দিকে।

ওরা তিনজনেই যেন নিঃশব্দে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠল, বি—জু ! বি—জু !

জমাদারেরা লাল কাপড়ে বেঁধে বাঁশে ঝুলিয়ে নিল। দারোগা ডাকল, "আসুন রাধুবাবু।"

ভিড় ছত্রভঙ্গ হলো। একদল লেগে-থাকা মাছির মতো চলল 'জি আর পি' পুলিশ অফিসের দিকে, লাশের পিছু পিছু।

ওরা তিনজন কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইল সেখানে। তারপর আরও খানিকটা উত্তরদিকে গিয়ে, আসশ্যাওড়ার জঙ্গল পেরিয়ে নির্জন আর অন্ধকার রেলপুলটার উপরে গিয়ে উঠল। রেলিং-এর উপর ভর দিয়ে, ঝুঁকে দাঁড়াল। জংশন স্টেশনের সর্পিল লাইন এঁকেবেঁকে চলে গিয়েছে অনেক দূর।

উপর থেকে দেখা যাচ্ছে, গোটা শহরটাকে ধোঁয়া গ্রাস করে ফেলেছে।

ওদের তিনজনকেও একটা ভয়ংকর কিছু গ্রাস করে ফেলেছিল। শত চেষ্টাতেও কারও গলা দিয়ে যেন একটি শব্দও বেরুল না।

কেবল নরেশ দম নিয়ে বলল, "বিজু—বিজুটা—"

আর কিছু বলতে পারল না। কেবল মনে পড়ল, রোজকার মতো আজকেও বিজু কেমন খিলখিল করে হেসেছিল বিকেলে।

তিনজনই চুপ করে রইল। ঝিঁঝির চিৎকার শোনা যাচ্ছে।

বিজুর খিলখিল হাসি ওদের তিনজনের বুকেই যেন বাজতে লাগল। তিনজনেই তাকাল ফোর্থ লাইনের সেই জায়গাটায়। কিছুই দেখা যায় না। ওখানে লাইনের উপর হয়তো এখনও রক্তের দাগ লেগে আছে। হয়তো এতক্ষণে শেয়াল এসে চাটতে আরম্ভ করেছে। আর ওরা তিনজন যখন চলে যাবে পুল থেকে নেমে, গভীর রাত্রে সেই খিলখিল হাসিটা হয়তো রেল লাইনের লোহায় বেজে উঠবে। কেননা, বিজুর গলাটা ওই লাইনের উপরেই কাটা গিয়েছে।

ওদের তিনজনকে এখন যে-কোনোও লোক পুলের উপর এই অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে খারাপ কিছু সন্দেহ করত। যেন তিনটে ষড়যন্ত্রী কোনো সর্ব-

নাশের মতলব আঁটছে। ওদের ময়লা ছেঁড়া জামা-কাপড় উসকো-খুসকো চুল, সর্বোপরি ওদের রক্তাভ চোখে কুটিল প্রশ্ন ও কঠিন প্রতিহিংসার একটা বাসনা দপদপ করছে।

মণি-হারা অজগরটার মতো দারুণ যন্ত্রণায় ও আক্রোশে যেন ওরা মনের অন্ধকারে হাতড়ে ফিরছে বিজুর মৃত্যুর কারণটা। মনে পড়ছে। আজ বিকেলে, যখন বিজু এলো ওরা বললে; "বিজু তুমি লেট।" বিজু বললে, "এখন থেকে লেট হতে হতে আর আসাই হবে না।" ওরা বললে, "কেন?"

বিজু হেসে বললে, "বা রে, আমার বুঝি বে-থা হবে না। তোমাদের তিনজনের সঙ্গে ঘুরলেই আমার চিরকাল চলবে?" বলে জোরে হাসল।

কিন্তু কী এসে যায় তাতে? ওকথা বিজু প্রায়ই বলত। নতুন কিছু নয়। হ্যাঁ। লেট বিজুর প্রায়ই হতো। মনে কোনোও রাগ থাকলে, কিংবা এমনি রহস্য করেও কতদিন বলেছে, "আর আসা হবে না। আজকেই ইতি।" এরকম অনেক ইতি হয়েছে, কিন্তু তারপরে পুনশ্চের কোনো অভাব হয় নি। সুতরাং বিজুর আজকের কথায় কিংবা ভাবে নতুন কিছুই ছিল না, যা দিয়ে শেষ দেখাকে চিহ্নিত করা যায়।

তবে? তবে কী হলো? ওরা তিনজনে একই সঙ্গে ফিরে তাকাল আবার লাইনের দিকে। তিনজনেরই যেন লাইনটার উপরে গিয়ে কপাল কুটতে ইচ্ছে করছে। কপাল কেটেকুটে জিজ্ঞাসা করতে ইচ্ছে করছে, "কেন, কেন বিজু?"

কিন্তু ওরা তিনজনেই মুখ চেপে রইল রেলিং-এ। কেননা, কপাল কুটে রক্তগঙ্গা করলেও লোহার লাইনটা কিছু বলবে না।

শুধু বিজুকে ঘিরে ওদের পুরনো দিনগুলি আবর্তিত হতে লাগল। সেই দিন-গুলি, যখন বিজলী ব্যানার্জি ছিল ওদের সহপাঠিনী।

যখন ওরা ছিল ছাত্র। যখন ওদের জীবনে ছিল ঝড়ের বেগ, ফেনিলোচ্ছল প্রাণ আর চোখে স্বপ্নের কাজল। যখন বিজু ক্লাসে আসত রাজেন্দ্রাণীর মতো, আর ওরা ছিল যেন বিদ্রোহী প্রজা। রানীর স্তুতি করত ওরা বিদ্রূপ দিয়েই, বেয়াদপির হাসি থাকত ওদের ঠোঁটে ও চোখে। কিন্তু বিজু ছুটে যায় নি প্রিন্সিপালের ঘরে। খাঁটি রাজেন্দ্রাণীর মতো শুধু হেসেই শান্ত করেছে সেই বিদ্রোহীদের। যে-হাসিটা তখন থেকেই বিজুর কলঙ্কের সন্দেহ ঘনিয়ে এনেছিল সকলের মনে। আর সকলের মতো ওরা তিনজনও সন্দেহ করত। কলঙ্কিনী ভেবেই ওদের বিদ্রোহ মাত্রা ছাড়িয়ে উঠতে চেয়েছে মাঝে মাঝে।

কিন্তু ছাত্র-জীবনের যেখানটায় থাকা উচিত ছিল নিশ্চিত আশ্রয়, আহার আর একটু ভালবাসা, ওদের সেই আসল নৌকাটাই ছিল তলাফুটো। জীবনে যে-ঝড়ের বেগটা ছিল, সেটা শুধু নোঙর ছিঁড়ে টেনে নিয়ে গিয়েছে সর্বনাশের মধ্যে। কলেজের প্রাঙ্গণ ছেড়ে কবে ওরা জীবনের আগুন-লাগা অঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, নিজেদেরই মনে নেই। মনে নেই, বাইরের প্রাঙ্গণে এসে কলেজের দলাদলি ভুলে, কবে ওরা তিনজন বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। বেকারি আর অনাহারের জ্বালায় কবে ওরা শহরের সেরা দুর্বিনীত ও বেয়াদপ বলে কু-খ্যাত হয়ে গিয়েছে, সে-

কথাও ওরা জানে না।

আর কে এক বিজলী ব্যানার্জিকে নিয়ে কোনো একদিন ওরা একটু মস্তানি করতে চেয়েছিল, সে-কথাও ওদের মনে থাকত না, যদি না তিনবছর আগের এক সন্ধ্যায়, শহরের দক্ষিণে, নিরালা রেল-কালভার্টের উপর দেখা হয়ে যেত। রাজেন্দ্রাণীর চোখের কোলে সেদিন গভীর পরিখা। চোখ দুটি বড় বেশী ভাসা ভাসা, করুণ। মুখখানি শুকনো। হাত-ভরতি বাদামভাজা। মুখেও দু'একটি দানা ছিল।

ওদের তিনজনকে দেখে এক মুহূর্ত বুঝি লজ্জা পেয়েছিল বিজু। পর মুহূর্তেই সেই রাজেন্দ্রাণীর হাসি বিদ্যুতের মতো ঝিলিক দিয়ে উঠেছিল তার করুণ মুখে। বলেছিল, "আপনারা এখানে?"

বিজলীকে দেখামাত্র ওদের তিনজনেরই জিভ্ চুলকে উঠেছিল বিদ্রূপ করার জন্যে। মনে মনে তৈরি হয়ে উঠেছিল পিছনে লাগার ফিকিরে।

কিন্তু বিজলীর কালো চোখ দুটিতে কী জাদু ছিল, ওদের ইচ্ছে পূরণ হয় নি। বরং সেই কুখ্যাত দুর্বিনীতেরা বিজুর গায়ে-পড়া আলাপে যেন একটু থিতিয়েই গিয়েছিল। বলেছিল, "এমনি।"

কিন্তু একটু রহস্যের আভাস যেন চিকচিক করে উঠেছিল বিজুর কালো চোখে। বলেছিল, "আরও কদিন দেখেছি এখানে আপনাদের।"

বলে হাতের মুঠি খুলে বাড়িয়ে দিয়েছিল তিনজনের দিকে। বলেছিল, "নিন, বাদাম খান।"

ওরা তিনজন মুখ চাওয়াচায়ি করে বাদাম নিয়েছিল। দেখলেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনজনের মুখে উপোসের ছাপ। ছেঁড়া জামাকাপড় আর উসকোখুসকো চুলে তিনজনকে যতটা হতভাগা মনে হচ্ছিল, তার চেয়ে বেশী মতলববাজের ছাপ ছিল ওদের চোখে মুখে।

ওদের তিনজনকেই একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরেছিল। কী বলতে চায় মেয়েটা? ওরা কেন আসে এই কালভার্টের কাছে, জানে নাকি সে? জানে নাকি ওই অদূরের সাইডিং-এর পাশে থাক-দেওয়া রেল-স্লীপারগুলি সারাতে এসেছে ওরা? কেন-না, স্লীপারগুলি একটা কাঠের গোলায় পেঁছে দিলে তবে ওরা কিছু টাকা পাবে। টাকা ওদের চাই, নইলে বাঁচা যায় না। আর বাঁচবার অন্য কোনো রাস্তা ওরা আবিষ্কার করতে পারে নি।

কিন্তু বিজলী ওদের কিছুই বলে নি। শুধু সেই হাসিটুকুই লেগে ছিল ঠোঁটের কোণে। বলেছিল, "চলুন, শহরের দিকে যাওয়া যাক।"

অসম্ভব। কাজ হাসিল না করে কেমন করে যাবে ওরা? পা ঘষছিল তিনজনেই। বিজলী আবার বলেছিল, "চলুন।"

আশ্চর্য! সে-ডাক ওরা ফেরাতে পারে নি। যেন কোন্ সুদূর আবছায়া থেকে এক বিচিত্র রহস্যময়ী তাদের ডাক দিয়ে নিয়ে গিয়েছিল হাতছানি দিয়ে। নিয়ে গিয়েছিল ওদেরই 'গণেশ কাফে'র আস্তানায়। আর নিজের খিদের নাম করে এক রাশ খাবার নিয়েছিল। বলেছিল, "টি এক্স আর-এর ক্লাস টেনের মেয়েটাকে পড়াই।

আজ মাইনে পেয়েছি, খাওয়া যাক।"

তখন ওদেরও চকিতে মনে পড়ে গিয়েছিল কালভার্টের কাছেই টি এক্স আর-এর কোয়ার্টার। তাই বিজু তাদের দেখতে পেয়েছিল কয়েকদিন।

ওরা লোভীর মতো খেয়েছিল। জানত, রাধু বাঁড়ুজ্যের এক পাল পুষ্যি-থিকথিক ঘরে কানাকড়িটি না থাকলেও বিজলীর অভাব নেই। তার মেলাই মক্কেল।

খেতে খেতেই তিনজনের মধ্যে কে যেন জিজ্ঞেস করেছিল, "কলেজের খবর কী?"

বিজু ছোট মেয়েটির মতো এক মুখ খাবার নিয়ে বলেছিল, "ছেড়ে দিয়েছি।"

"কেন?"

"টাকা নেই।"

অবিশ্বাস্য মনে হয়েছিল ওদের। টাকা নেই, সবাই জানত। কিন্তু একথাও সবাই জানত, ব্রজেন পালের মতো কাপ্তেন থাকতে, বিজলীর কোনোও অভাব নেই। উৎকৃষ্ট ব্যবসায়ী নকুড় পালের নিকৃষ্ট ছেলে ব্রজেন পাল। কিন্তু নকুড়ের মতে, সে তো ভগবানের হাত। ওই হাতটি থাকলে গাধা পিটিয়ে নাকি ঘোড়া করা যায়। আর পালবংশে কলেজের মুখ দেখা সে-ই তো প্রথম। অতএব, বি-এ পাশ করতে করতে দশ বছর লাগলেও ক্ষতি কী। নিকৃষ্টের পিছনে উৎকৃষ্ট টাকা থাকলেই তো গাধা একদিন ঘোড়ার মতো হ্রেষাধ্বনি করতে পারবে।

সেই হ্রেষাধ্বনিরই বাসনায়, খুরে-মারা নাল থেকে মাথার শিরস্ত্রাণ পর্যন্ত পোশাকে-আশাকে ব্রজেন একটি পাকা অশ্ব হয়ে গিয়েছে তখন। আমেরিকান কাট কোট-প্যান্টের পকেটে তার উৎকৃষ্ট টাকা বাজত ঝনঝন করে। বিশেষ করে বাজিয়ে ফিরত সে বিজলীর পিছনে। কলেজ থেকে রাধু বাঁড়ুজ্যের বাড়ি পর্যন্ত ধাওয়া করতে দেখা গিয়েছে ব্রজেনকে। ব্রজেনের কথা শুনে মনে হতো, বিজলীর শাড়ি, ব্লাউজ, বই-ফাউন্টেনপেনটি পর্যন্ত ওর টাকাতেই কেনা।

সবাই তাই বিশ্বাস করত। ব্রজেনের সঙ্গে বিজলীকে এদিকে ওদিকে দেখাও যেত। তাই, টাকা নেই শুনে ওদেরই গলায় খাবার আটকে যাবার দাখিল হয়েছিল।

বিজুর চোখে সেই রহস্যের ঝিকিমিকি আরও কয়েকটা ঘুলঘুলি দিয়েছিল খুলে। হেসে বলেছিল, "কী হলো?"

একজন জিজ্ঞেস করেছিল, "ব্রজেনের সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেছে নাকি?"

পলকের জন্য বুঝি বিজলীর চিবুক চিকচিক চোখ মেঘে ঢেকে গিয়েছিল। ঠোঁটের কোণে হাসিটুকু গিয়েছিল মরে।

পরমুহূর্তেই আবার হেসে বলেছিল, "ঝগড়া হবে কেন। যতটুকু ভাব দেখেছেন, এখনও তাই আছে। ব্রজেন তো কখনও পেছন ছাড়ে না। আপনারা বোধহয় দেখেন নি, ব্রজেন ছায়ার মতো আমাদের পেছনে পেছনে এসেছে। উঁকি দিয়ে দেখুন রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে, এই দিকে চেয়েই।"

ওরা উঁকি দিয়ে অবাক হয়ে দেখেছিল, সত্যি ব্রজেন বাইরে দাঁড়িয়ে। চোখে তার অপেক্ষমাণ কুকুরটার কৃপা প্রার্থনার দৃষ্টি। ঠোঁটে সিগারেট, দু'হাত প্যান্টের পকেটে।

ফিরে দেখেছিল ওরা, বিজলীর ঠোঁটে যেন ক্লান্ত বিষণ্ণ হাসি। আর সেই ওদের

তিনজনেরই, বিজলীকে বড় অসহায় মনে হয়েছিল। ওদের দুর্বিনীত বুকেও মানুষের হৃৎপিণ্ডের অবশিষ্টাংশে টনটন করে উঠেছিল যেন একটু।
বিজু কেমন একটু হেসে আবার বলেছিল, "মেয়ে হয়ে ব্রজেনের টাকা কেমন করে নেওয়া যায় বলুন।"
সেই মুহূর্তেই বিজলীর দিকে তাকিয়ে থাকা চোখের চাউনি একেবারে বদলে গিয়েছিল ওদের। সেই মুহূর্তেই একটি মেয়ে-জীবনের সত্যের তত্ত্বকে আবিষ্কার করে, বিজলীর নতুন পরিচয়ে অপরাধী হয়ে উঠেছিল নিজেরা।
বিজলী তখন উঠে পড়েছিল। ওদের মধ্যেই কে যেন বলেছিল, "চলুন আপনাকে পোঁছে দিয়ে আসি।"
বিজলীর চোখে আবার সেই রাজেন্দ্রাণীর হাসি উঠেছিল চমকে।
বলেছিল, "ব্রজেনের জন্যে? তার দরকার হবে না। পেছনে ঘুরেই যখন ওর শান্তি, ও ঘুরুক। কিন্তু—"
বিজলীর চোখে রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল হঠাৎ। একটু থেমে বলেছিল, "কালভার্টের ওই বিচ্ছিরি জায়গাটায় আপনারা আর যাবেন না। রেলের গুড্‌স-শেডের ওখানটা থেকে পুলিশে বিনা দোষেও লোক ধরে নিয়ে যায়।"
বলে সে চলে গিয়েছিল।
ওরা তিনজন যেন বিজলী-তারের শক্‌ খেয়ে থমকে তটস্থ হয়ে গিয়েছিল।
সেই ওদের ত্রয়ীকে ঘিরে বিজলীর শুরু। সেইদিনই 'গণেশ কাফে' থেকে গোটা শহরে মাছিরা ভ্যানভ্যান করে উঠেছিল, তিন কুখ্যাতের সঙ্গে বিজলীর মিলনের কথা। বলেছিল, যার যেথা ঠাঁই।
তারপর সে-কাহিনীও পুরনো হয়ে গিয়েছে। এই তিন বছরে, ওই তিনজনের সঙ্গে বিজু প্রতিদিন ঘুরেছে। কবে ওরা 'আপনি' ছেড়ে 'তুমি' হয়ে গিয়েছে। কবে ওরা চারজনের এক সর্বক্ষণের অখণ্ড জুটি হয়ে গিয়েছে, নিজেদেরও বোধহয় মনে নেই। দেখে, শহরের টোপ-ফেলা খেলোয়াড়েরা অনায়াস ভেবে অনেকবার উৎসাহিত হয়েছে আর আক্রোশে দাঁত পিষেছে। ব্রজেন পিছন ছাড়ে নি, ক্ষিপ্ত হয়েছে আরও। গোটা শহরের গায়ে অনেক জ্বালা ধরেছে, আজও ধরেছে।
আজও ধরেছে; এবং ধরিয়ে বিজু নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারে এসেছিল কেন?
রেলপুলের উপর থেকে তিনটে অভিশপ্ত প্রেতের মতো ওরা আবার ফিরে তাকাল ফোর্থ লাইনের সেই জায়গাটায়।
আর ওদের তিনজনেরই মনে হলো, প্রথম দিন বিজুকে যে রহস্য ঘিরে ছিল, আজ সেই রহস্যই ফোর্থ লাইনের উপরে শেষবারের জন্য গলা পেতে দিয়েছে। উদ্ঘাটনের কোনো চিহ্নই সে রেখে যায় নি। শুধু তিনটি প্রেতাত্মা চিরকাল ধরে সেই রহস্যের সন্ধানে ফিরবে।
ফিরবে, আর জানতে চাইবে, কেন বিজু নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারে এসেছিল? বিজু তাদের কালভার্টের সেই বিচ্ছিরি জায়গাটায় যেতে বারণ করে-ছিল, তারা আর যেতে পারে নি। তারপরে বিজু তাদের অনেক জায়গায় যেতে

বারণ করেছে, তারা যায় নি।

কিন্তু বিজু কেন নর্থ কেবিনের কালো-আঁধারে, লাইনের উপরে এসে মরেছে? কেন বিজু?

জবাব পাওয়া যাবে না। কালকের শিশিরে-ভেজা লাইনটায় কোনো চিহ্নও থাকবে না। কেবল অদূরে ক্রশ লাইনের কাছে, দু' ফুট উঁচু সিগন্যালের এই লাল আলোটা জ্বলবে। থিতিয়ে আসা অন্ধকারে এখন ওই আলোর রক্তাভা বেশ গুঁড়ি মেরে মেরে গিয়ে ঠেকেছে ফোর্থ লাইনের বুকে। ওই রক্তাভা রেশটা চিররাত্রি ধরে দগদগ করবে একটি রক্তাক্ত ক্ষতের মতো।

কিন্তু তার পরদিন রহস্যের একটি গ্রন্থিমোচন হলো। সকলের জিহ্বা আর একবার লক্‌লক্‌ করে উঠল। বিকেলের দিকে মর্গ থেকে সংবাদ এলো, বিজলী গর্ভবতী ছিল।

আর ওরা তিনজন নরেশ-প্রভাত-শংকর গণেশ কাফেরই 'ফর লেডীজ' খুপরিতে বসেছে মুখোমুখি। চোখে ওদের প্রজ্বলিত ঘৃণা দপদপ করছে। হিংস্র কুটিল সন্দেহে ওরা নিজেদেরই পরস্পরকে হানছে। ওদের গোটা জীবনের সব সর্বনাশ আজ নিজেদের মধ্যেই খুনোখুনি করবার উন্মাদনায় বসেছে কবুল করতে। কে? কে অকলঙ্ক বিজুকে এই কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে মেরেছে?

কবুল খেতে হবে, কেননা তিনজন ছাড়া, বিজলীর এই সর্বনাশের শরিক আর কেউ হতে পারে না। শহরের সব বিষধরদের নির্বিঘ্ন করেই এই দুর্বিনীত ছন্নছাড়া ত্রিভুজকে সে নিজেই আশ্রয় করেছিল। একটি মেয়ে যতটুকু পারে, সবটুকু নিয়ে সে আত্মসমর্পণ করেছিল এই তিনের কাছে; তার সব সর্বনাশ, তার সব কলঙ্ক সে বন্ধক রেখেছিল এই তিনজনেরই কাছে বন্ধুত্বের মূল্যে। সাহস প্রীতি আর স্নেহের মূল্যে। তাদের তিনজনকে সর্বনাশের সব পথ থেকে নোংরা জীবাণুদের সমস্ত আশ্রয় থেকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার মূলে, বিজু তার ভিতর-দুয়ারের কপাটও দিয়েছিল হাট করে খুলে। রাখে নি কোনো সদর অন্দর। তাদের তিনজনের পাশ-আস্তীর্ণ ত্রিভুজ-আঙিনাটায় নিশ্চিন্ত হয়ে ফুটেছিল সে ফুলের মতো। তারই সুযোগ নিয়ে কে তাকে খুন করেছে প্রকাশ করতে হবে। বন্ধুত্বের হাতে নিজেকে অবশ করে ছেড়ে দেবার তমসুক ছিল তাদেরই হাতে। তারাই কেউ ছিঁড়েছে সেই তমসুক। কবুল করতেই হবে।

সেই কবুল করবার জন্যেই, তিনজনে তারা কাঠের খুপরিটার মধ্যে রুদ্ধশ্বাস হিংস্র হয়ে বসে আছে। কারও দিক থেকে কারও চোখ নামছে না। যেন প্রত্যেকেই শিকারী ও শিকার।

বাইরে 'গণেশ কাফে'র গুলতানি চলেছে রোজকার মতোই। সেখানে তাকিয়ে বোঝবার উপায় নেই, এই একই ছাদের তলায়, একটি খুপরিতে, একটা ভয়ংকর রক্তারক্তির উত্তেজনা ক্রমেই বাড়ছে।

কুটিল সন্দেহে, চাপা ক্রুদ্ধ গলায় হিসিয়ে উঠল শংকর, "আমি নয়, প্রভাত নয়, নরেশ নয়, তবে কে? কে, আমি জানতে চাই। আর কে ছিল তার, আমরা ছাড়া?"

যেন ছোবল মারার আগে, কেউটের মতো কাঁধ বাঁকিয়ে নরেশ গর্জে উঠল, "আমিও

তাই জানতে চাই। সে যেই হোক্, আমি তাকে দু-হাতে টিপে পিঁপড়ের মতো মারতে চাই।"

মানুষ যখন ভয়ংকর হয়ে ওঠে, তখন তার সবটাই নাটকীয়। প্রভাত পকেট থেকে ওর সেই বিখ্যাত বোতাম-টেপা ড্যাগারটা বার করে খুলে রাখল টেবিলের উপর। শাণিত ছুরিটার তীক্ষ্ন ধার আজ রক্তলোলুপতায় যেন বড় বেশী চকচক করছে। সে ছুরিটা বিজলীর সামনে যতবার খুলেছে প্রভাত, ততবারই বিজলীর দু' চোখে ঘনিয়ে এসেছে অভিমান। বলেছে, "কতদিন বলেছি তোমাকে প্রভাত, ওটা আমি দু' চক্ষে দেখতে পারি নে। রেখে দাও।"

বলে নিজের হাতে বন্ধ করে রেখে দিয়েছে। আজ বন্ধ করবার কেউ নেই।

সে বললে দাঁতে দাঁত পিষে, "তাকে যখন আমি পাব, সে যতবড় বন্ধুই হোক, তার বুকটা আমি উপড়ে ফেলব।"

কিন্তু এ শুধু কথা। তারপর?

ছুরিটার তীক্ষ্ন ধার ওদের তিনজনের মুখেই যেন হিংস্র হয়ে জ্বলতে লাগল। যেন হত্যা-উৎসবের আগে, মন্ত্রপূত অস্ত্রটাকে ঘিরে বসেছে ওরা প্রাইবদের মতো। আগে ওরা রাগে ও ঘৃণায় যখন কোনো কারণে রুদ্র হয়ে উঠত, তখন বিজলী ওদের শান্ত করত। শান্ত না হলে বিজু রেগেছে। বিজু কেঁদেছেও।

আজ বিজু নেই। আজ ওরা সেই মূর্তি ধরেছে।

প্রভাত ছুরি বের করেছে। নরেশ ওর সেই কালো বিশাল শরীরটার পেশীতে পেশীতে ঘষছে। শংকরের রক্তাভ বড় বড় চোখ দুটিতে নেশা ধরেছে। যে-চোখ দেখলে বিজু হাসতে হাসতে আঁচলের ঝাপটা মেরেছে। বলেছে, "এই রাক্ষস! চোখ করেছে দেখ।" নরেশের পেশীশক্ত শরীর বিজলীর ছোট হাতখানির চাপে কোনোদিন নির্দয় দুর্দান্ত হয়ে উঠতে পারে নি।

ওরা প্রতিটি দিনের পাতা উল্টে উল্টে দেখছে, খুঁজছে, পরস্পরের প্রতিটি দিনের ব্যবহার। প্রতিটি দিন, কে কবে কেমন করে হেসেছিল, কতখানি বেশী ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিল বিজুর। কোন্‌দিন কে কতক্ষণ একলা ছিল বিজুর সঙ্গে। বিজু কাকে কবে একটু বেশী স্নেহ করেছিল।

ওদের মনে এই অবিশ্বাস ও সন্দেহের জড় লুকিয়ে ছিল হয়তো। কিন্তু তখন বিজু ছিল। রামধনুর মতো কোনো কালকূট মেঘকে ঘন হতে দেয় নি। বুক চেপে হাঁটা শ্বাপদ-অন্ধকার পারে নি ফিরে আসতে। আজ ওদের সেই মন হতাশায়, অবিশ্বাস ও সন্দেহে হিংস্র। সেই শ্বাপদ-অন্ধকারটাই গ্রাস করেছে আজ তিন-জনকে। তাই প্রতিদিনের উনিশ-বিশ ঘেঁটে ঘেঁটে খুঁজছে ওরা। কে? কে হতে পারে? বিজুর নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারে যাবার আগে, কাল বিকেলেও কে কেমন করে কথা বলেছিল তিনজনে, সেটাও ভাবছে ওরা। ভাবছে, তিনজনের মধ্যে, কাকে বাঁচাবার জন্যে ঘুণাক্ষরেও কিছু বলে নি বিজু?

একসময়ে নিজেদেরই নিশ্বাসে চমকে উঠে ওরা পরস্পরের দিকে তাকায়। তারপর টেবিলের উপর ছুরিটার দিকে। যেখানে অনেকদিন বসেছে বিজু আর বিজুকে ঘিরে ওরা বসেছে চেয়ারে।

সন্দেহ আর অবিশ্বাস ওদের ছাড়ে না। শেষপর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ওরা একটা রক্তারক্তি কাণ্ড করবে। তবু বিজুর প্রতিদিনের স্মৃতি ওদের মাঝে মাঝে আনমনা করে তুলছে।

শংকর হঠাৎ ডাকে, "প্রভাত।"

প্রভাত সন্দেহ করে আগে থেকেই রুক্ষ হয়ে জবাব দেয় "কী ?"

নরেশ দু'জনের দিকেই তাকায় তীক্ষ্ণ চোখে।

শংকর বলে, "বেচু পাঠক তার বুড়ি দিদিকে খুন করাতে চেয়েছিল, মনে আছে ?"

প্রভাত ভ্রূ-কুঁচকে বলে, "তাতে কী ?"

"বেচু পাঠক তোকে দিয়ে খুন করাতে চেয়েছিল সম্পত্তির লোভে। তোকে নগদ দু' হাজার টাকা দিতে চেয়েছিল। বেচু পাঠক দরজা খুলে রাখবে রাত্রে, তুই গিয়ে শুধু বুড়ির গলাটা টিপে রেখে আসবি অন্ধকারে। ব্যস্ আর কিছুই নয়। এমন কি বেচু পাঠক পরে ধরিয়ে দিতে চাইলেও তোকে ধরবার কোনো উপায় থাকত না।"

প্রভাত প্রায় চিৎকার করে ওঠে, "কিন্তু তাতে কী হলো ?"

শংকর যেন প্রায় চুপি চুপি বলল, "তুই তা করিস্ নি। বিজু তোকে বারণ করেছিল বলে।"

শংকরেব গলার স্বরে প্রভাত আর নরেশ যুগপৎ চমকে ওঠে। দু'জনেরই চোখে ঘৃণা আর উত্তেজনা ছাপিয়ে একটা দিশি-পাওয়া ব্যাকুলতা ওঠে ফুটে। ওদের তিনজনেরই চোখের উপর ভেসে ওঠে বিজুর মূর্তি।

হ্যাঁ, বিজু প্রভাতকে যেতে দেয় নি বেচু পাঠকেব দিদিকে খুন করতে। খুন করার ভয়াবহ নারকীয়তার রূপ ওদের অনুভূতি থেকে বহুদিন বিদায় নিয়েছিল। ওদের সেই অনুভূতিটাকে ফিরিয়ে দিয়েছে বিজু।

যখন ওরা চাকরির জন্য দরখাস্তের পর দরখাস্ত করেছে, ভেড়ার পালের মতো সর্বত্র লাইন দিয়েছে, চটকলের স্পিনার হওয়ার আশাতেও গিয়েছে ছুটে আর ফিবে এসে হতাশায় অবসাদে পড়েছে ভেঙে, তখন একটিই সৎ ও সত্যিকাবের রাস্তা খোলা ছিল, মরা। খবরের কাগজের একটি শিরোনামাকেই ওরা বাড়াতে পারতো, 'অনাহারের জ্বালায় যুবকের আত্মহত্যা।'

কিন্তু তা করে নি ওরা। তারই একটা রকমফের জীবনের যত ভয়াবহ অন্ধকার সুড়ঙ্গপথগুলি বেছে নিয়েছিল। কেননা, ওরা দেখেছিল, এ-দেশে ওইটিই প্রশস্ত পথ।

সেই সময়েই বিজুব আবির্ভাব হয়েছিল ওদের জীবনে। সে আগলে দাঁড়িয়েছিল ওই অন্ধকার সুড়ঙ্গগুলি।

সেই সময় দেখেছিল, ওদের রাজেন্দ্রাণীর মুখে ঠিক ওদেরই মতো উপোসের ছাপ। তখন থেকে ওরা দু' পয়সার বাদাম, চার পয়সার মুড়ি, দু'গেলাস চা, বিজুর সঙ্গে ভাগ করে খেয়েছে। অনাহারের মধ্যেও সমস্ত লোভ জয় করেছে ওরা।

প্রভাত গোঙাব মতো ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, "হ্যাঁ, বিজু বারণ করেছিল। বলেছিল,

বারণ না শুনলে সে মরবে। বিজু মরবে, তাই আমারও যত ঘেন্না হয়েছিল টাকার লোভে। বিজু বারণ করেছিল। বিজু তোকেও বারণ করেছিল শংকর। দাশু গাঙ্গুলী তোকে পাঁচ শ' টাকা দিতে চেয়েছিল, শুধু ওর অপজিট পার্টির লিডার কেদার ঘটকের নামে একটা মেয়েমানুষকে জড়িয়ে মিথ্যে বক্তৃতা দেবার জন্য। মানহানির মামলা করলে টাকা দেবার চুক্তি ছিল দাশু গাঙ্গুলীর। কিন্তু তুই যাস নি, বিজু বারণ করেছিল।" যেন মাতালের মতো সুরহীন গলায় বলতে থাকে প্রভাত, "বিজু তোমাকেও বারণ করেছিল নরেশ। ডাক্তার তালুকদার তোকে মাসে তিন শ' টাকা মাইনের চাকরি দিতে চেয়েছিল, শুধু তার স্মাগলিং-এর কর্নারিগুলির উপর নজর রাখবার জন্যে, দলের বিশ্বাসঘাতকদের ওপর স্পাইং-এর জন্যে। সেই চাকরি তুই নিস নি। বিজু তোকে বারণ করেছিল।"

বিজু তাদের বারণ করেছিল, এই কথাটা কাঠের খুপরির মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে। বিজু তাদের ঘেন্না করতে শিখিয়েছিল। তাই তারা অন্ধ-সুড়ঙ্গগুলির মুখে পা দিয়ে ফিরে এসেছিল। তাই তারা এ-সংসারের সকল অনাহারীর সাধারণ দলেই এসেই ভিড়েছিল। বাঁচতে চেয়েছিল আর সকলেরই মতো রোষে ও রাগে, কষ্টে ও কান্নায়।

আর তবু উপোসী বিজু তাদের তিনজনের তিলে তিলে মরা মূর্তিগুলির দিকে তাকিয়ে কখনও চোখের জল চাপতে পারে নি। মুখ নিচু করে, যেন অপরাধিনীর মতো বলেছে, হয়তো আমার জন্যে, আমারই জন্যে তোমরা মরছ। হয়তো আমার ভুল হচ্ছে। তোমরা একটু ভাব।

কিন্তু তখন আর ভাববার কিছু নেই। একদিন যে-পথ থেকে ফিরে এসে ওরা বিজুকে ঘিরে ছিল, যেই পথটাকে ওরা ঘৃণা করতে শিখেছিল, বিজু ফিরিয়ে দিতে চাইলেও ওরা ফিরে যেতে পারত না। পারবেও না। কারণ, ঘৃণা শুধু নয়, ওরা একটি ভালবাসাকে পেয়েছিল। একটি বিজুকে পেয়েছিল, যার সঙ্গে ওরা সংসারের লাঞ্ছিতদের হাটের মিছিলে চেয়েছিল শরিক হতে।

তাই রাজেন্দ্রাণীর শোক-বিমূঢ় চোখের জল তারা মুছিয়ে দিয়েছে। ওই কালো চোখে দপদপ করে আগুন জ্বলারই তাপ চেয়েছে তারা। মৃত্যুহীন নির্ভয়ের খিলখিল হাসির ঝনঝনায় এ বিশ্ব-সংসার কেঁপে উঠুক, তারা তাই চেয়েছে। সেই হাসি তাই শেষদিন পর্যন্তও হেসেছিল বিজু। অনেক দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-ভয়-দুর্দশাগ্রস্ত জীবনে সেই হাসিটাই তাদের অনেক নির্ভয়ের নিশান হয়ে ছিল।

সেই হাসিটা ছিনিয়েছে কে!

আর কারা ছিল বিজুর জীবনের সব অন্ধিসন্ধির খবর জানতে? অসহায় আর অপমানিত ভদ্রলোক রাধু বাঁড়ুজ্যেকে সপরিবারে তিলে তিলে মরতে দেখেছিল তারা। শুধু তাদেরই তিনজনের জন্যে রাধু বাঁড়ুজ্যে তার আইবুড়ো মেয়ের কলঙ্কে মাথা নত করেছিলেন। সেই সব চেয়ে বড় কলঙ্কের গুপ্ত তথ্য কী, তা তো শুধু তারা তিনজন আর বিজুই জানত। তারা চারজনেই শুধু জানত, সেই কলংক ছিল শুধু তাদের চারজনের হাত ধরাধরি করে বাঁচা। তাদের বন্ধুত্ব! বন্ধুত্বের সেই সুযোগ নিয়ে, কে মেরেছে বিজুকে?

তিন জোড়া চোখের কুটিল সন্দেহ, ঘৃণার দৃষ্টি কেউ কারও উপর থেকে নামাতে পারছে না ওরা।
কিন্তু শত অবিশ্বাস সন্দেহেও, ওদের ক্রোধের আগুনে আর তেমন করে ছুরিটার তীক্ষ্মধার চক্‌চক্‌ করছে না। অবসাদগ্রস্ত মনে শুধু একটা হাহাকার ওদের যেন গ্রাস করে ফেলেছে। শুধু মনে পড়ছে, বিজু ওদের কোথায় যেতে বারণ করেছিল, আগলে রেখেছিল কেমন করে! সর্বনাশীর মতো কেমন করে সে তিনটি পুরুষের ছটি থাবার উপরে নিজেকে নিশ্চিন্তে মুক্ত করে দিয়েছিল।
গণেশ কাফে'র ঘরে ভিড় কমে এসেছে। ক্রমেই চুপচাপ হয়ে যাচ্ছে সামনের ঘরটা। রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়ার শব্দও কমছে।
নরেশ হঠাৎ যেন ছটফট করে উঠল। ছুরিটা হাতে নিয়ে সে দ্রুত চাপা গলায় বলল, "আমি বলব, একটা কথা বলব।"
শংকর আর প্রভাত দু'জনেই ফিরে তাকাল তার দিকে।
নরেশ যেন স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে বলল, "একদিন, সেদিন তোরা দু'জনে ছিলি নে, কোথায় গেছিলি। এই ঘরে, আমি আর বিজু। বিজু হাসছিল, অনেক কথা বলছিল। কিন্তু আমার কী হলো, আমি জানি নে। বিজুর শরীরের দিকে সেই যেন আমি প্রথম তাকালাম। সেই যেন প্রথম জানলাম, বিজুর রূপ আছে, যৌবন আছে, আশ্চর্য সুন্দর তার গঠন। আমি পাগলের মতো দু'হাতে জড়িয়ে ধরলাম বিজুকে। বিজু যেন একবার কেঁপে উঠে স্থির হয়ে গেল।"
বলতে বলতে নরেশ প্রকাণ্ড শরীরটা নিয়ে যেন হাঁপিয়ে উঠল। কিন্তু কেউ ওকে কিছু বলল না। দু'জনেই স্থির তীক্ষ্ম চোখে তাকিয়ে আছে নরেশের দিকে।
নরেশ আবার বলল, "জড়িয়ে ধরে আমি বার বার ডাকতে লাগলাম, বিজু—বিজু। বিজুর মুখ আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না। তাকাতে আমার সাহসও হচ্ছিল না। কিন্তু একটু পরে, বিজু দু'হাত দিয়ে আমার মাথাটা জড়িয়ে ধরল। বলল, 'কী বলছ নরেশ?' আমার চোখে বুঝি তখন রক্ত। ফিরে তাকালাম তার দিকে। দেখলাম, মুখে তার হাসি, কিন্তু চোখে জল। সে যেই আমার মাথায় হাত দিল, তখুনি আমার কেমন হয়ে গেল। আমি তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিলাম। বিজু বলল, 'নরেশ, বাবা কোনো দিন বিয়ে দিতে পারবে না। আমি নিজে যদি করি, কাকে করব, বল? তুমি যা চাইছ, তুমি নিতে পার। শংকর আর প্রভাতকে আমি কী বলব? তুমি কী বলবে?' আমার তখন পালিয়ে যাওয়া কুকুরের মতো অবস্থা। আমি দু'হাতে মুখ ঢেকে রইলাম। বললাম, 'ক্ষমা কর বিজু, ক্ষমা কর।' বিজু আমার দু'হাত ওর কোলের ওপর টেনে নিয়ে গেল। আরও কাছে এলো আমার। বলল, 'তুমিও আমাকে ক্ষমা কর নরেশ। তুমি, আমি, প্রভাত, শংকর কেউই আমরা ভিন্ন হয়ে যেতে পারব না আর। তাই কোনো দিনই আর আমরা এসব পারব না।"
নরেশ নিশ্বাস নেবার জন্য একবার থামল। আবার বলল, "এই, এই আমার একমাত্র অপরাধ বিজুর কাছে। এই—এই—।"
বলতে বলতে তলিয়ে গেল নরেশের গলার স্বর।

কিন্তু প্রভাত আর শংকরও তখনও নিশি-পাওয়া জড়ের মতো মুখ ঢেকে বসেছে। ওই একই অপরাধ, ভিন্ন জায়গায় একইভাবে ওরাও করেছে বিজুর কাছে।
একই ভাবে প্রভাত অন্ধকার রাত্রে বিজুকে একা বাড়ি পেঁছে দিতে গিয়ে সেই গাছতলায় দু'হাতে টেনে এনেছিল কাছে। এইভাবেই, বিজুর দুটি ঠোঁটের পিপাসায় ছাতি ফেটে গিয়েছিল তার। কিন্তু তার মনে হয়েছিল, বিজুর ঠোঁট যেন শবের ঠোঁট। ঠান্ডা, রক্তহীন, অনড়, শক্ত। পরমুহূর্তেই প্রভাতের বুকের মধ্যে একটা ভয়ংকর সর্বনাশের মতো মনে হয়েছিল, বিজুকে চিরদিনের জন্যে হারাবে সে। কিন্তু বিজুই তার ঠোঁটের স্পর্শ দিয়ে নির্ভয় করেছিল তাকে। শুধু সেই ঠোঁটে কোন্ অকূল থেকে ভেসে আসা নোনা স্বাদ ছিল। সেই ঠোঁট নেড়ে সে বলেছিল, 'তা হলে আর দু'জনের কাছে আমাকে মরতে হয় প্রভাত।'
একইভাবে এক বর্ষার রাতে, রেলের অন্ধকার ওভারব্রিজের নিচে শংকর বিজুর দুটি হাত চেপে ধরেছিল, সে হাত চেপে ধরার মধ্যে পুরুষ তার কিছুই গোপন রাখতে পারে না। তার বড় বড় চোখ দুটিতে দপদপ করে পতঙ্গ পুড়ছিল। বিজু শুধু অপলক চোখে তাকিয়ে ছিল রেল লাইনের দিকে। একইভাবেই সে শংকরকে শান্ত করেছিল। একই কথা বলেছিল, সে স্বৈরিণী হলে একই প্রাপ্য তিনজনকে দিতে পারত। তা যখন নয়, তখন বন্ধুত্বকে রক্ষা করার প্রয়াসই বিজুর জীবনে অক্ষয় হয়ে থাক।
বিজু বন্ধুত্বকে রক্ষা করেছিল। ওদের আত্মনাশের আর বন্ধুত্বের দুর্গের অটল প্রহরী বিজু। তবে ? ওদের তিনজনের সর্বক্ষণের ছায়া আর কেউ ভেদ করেছিল নাকি ? ভেদ করে কোথায় যাবে ? বিজুরই কাছে তো ? যে-বিজু তাদেরই সঙ্গে মরছিল আর বাঁচছিল। তাদের ফিরিয়ে এনেছিল, বারণ করেছিল, ভালবেসেছিল।
রাত হয়েছে। ঠাস্ঠাস্ করে 'গণেশ কাফে'র দরজা বন্ধের শব্দ ওদের চলে যাবার নির্দেশ দিচ্ছে। ওরা উঠে পড়ল।
কিন্তু পরস্পরকে কেউ ওরা ছেড়ে দিতে পারবে না।
বাইরের রাস্তা ধোঁয়ায় আর কুয়াশায় আবছা। শীতার্ত পথটা নরকের মতো জনহীন আর নিস্তব্ধ।
কালকে ওরা কিছুই না জেনে, ফিরে যেতে পেরেছিল। আজকে ওরা ফিরে যেতেও পারছে না। বিজুর যে কলঙ্কে শহর ধিক্কার দিয়ে হেসেছে, সেই একই ধিক্কার দিতে গিয়ে, আর সকলের মতো বিজুর বাবার চোখের সামনেও এই ত্রিমূর্তিই হয়তো ভেসে উঠবে। চিরকাল কলঙ্কটা তাদেরই জন্য থেকে যাবে।
উত্তরদিকেই চলল ওরা। নিশি স্যাকরার আমবাগানের ধারটাই টানছে যেন ওদের। একজন হনহন করে তাদের পার হয়ে গেল হেঁটে। যেতে গিয়ে লোকটা যেন চমকে গেল তাদের দিকে তাকিয়ে। হঠাৎ যেন থমকে গেল এক মুহূর্ত। কুয়াশায় অস্পষ্ট দেখা গেল লোকটার উস্কো-খুসকো চুল। বড় বড় উন্মাদ চোখ দুটিতে চকিতে যেন একটা ভয়ের ঝিলিক চমকাতে দেখা গেল। এক মুহূর্তমাত্র। তারপরেই, আরও দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগল।
কে ? চেনা-চেনা লাগল যেন মুখটা ? ব্রজেন না ?

মনে হতেই ওদের তিনজোড়া চোখ, চোখাচোখি করল আর ওদের মনের মধ্যে সহসা কেমন চমকে উঠল। যেন কী একটা ঘটে গেল ওদের মধ্যে, আর সেই মুহূর্তেই তিনজনে ছুটে গেল ব্রজেনের দিকে। ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তিনজনেই। মুহূর্তমাত্র সময় না দিয়ে টুঁটি ধরে নিয়ে গেল সামনের সরু গলির মধ্যে।

কেন ঘিরে ধরল তিনজনে ব্রজেনকে, নিজেরাই জানে না। শুধু ব্রজেনের মুখে যেন ওরা কী দেখতে পেয়েছে। দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছে। যদি কিছু জানে ব্রজেন, বলুক। ঘোচাক সন্দেহ।

ব্রজেন হাঁপাচ্ছে। এই শীতে ওর একটিমাত্র পাতলা জামার বোতাম খোলা। প্যাণ্টটা জুতো ছাড়িয়ে নেমে গিয়েছে, ধুলোয় লুটোচ্ছে, যেন খুলে পড়বে এখনি। সেটাকে ও ধরে আছে এক হাতে। সারা গায়ে ধুলো মাখা, যেন কোথায় গড়িয়ে এসেছে। ভয় নয়, চোখে ওর অস্থির উন্মাদ অস্বাভাবিক এক চাহনি।

বেসুরো ভাঙা গলায় দ্রুত বলল, "কী, কী চাও তোমরা? বিজু, বিজুর খবর?"

বিজু। বিজু। ওই নামটা ওরা কারও মুখ থেকে শুনতে চায় না। দাঁতে দাঁত চেপে ওরা তাকিয়ে রইল ব্রজেনের দিকে। যদিও চোখে ওদের বিস্ময় চাপা থাকছে না। কেবল প্রভাতের হাতে ছুরিটা চকচক করছে। যেন সময় হলেই ঝাঁপিয়ে পড়বে সে।

আবার, একই গলায় আরও তীব্রভাবে বলল ব্রজেন, "বিজুর খবর চাও তোমরা? বিজুর?" বলতে বলতে ওর উন্মাদ চোখ দুটোতে জল দেখা গেল। আর দু'হাত বাড়িয়ে ধরল প্রভাতের হাত। প্রায় রুদ্ধ গর্জনের সুরে বলল, "তবে মার, মার, আমাকে মার।"

ওরা তিনজনেই যেন দারুণ বিস্ময়ে একটা ভয়ংকর কিছুর কাছ থেকে সরে দাঁড়াল।

ব্রজেনের গলা ক্রমেই অতলে ডুবতে লাগল। তবু অস্থির গলায় বলল, "হ্যাঁ আমি সে-ই। আমাকে তাড়াতাড়ি মার, মেরে ফেল। আমি, আমি সে-ই। আমি তাকে তিন মাস আগে সাত শ' টাকা দিয়েছিলাম। সে আমার কাছে এসে চেয়েছিল। নইলে তার বাপকে, আর মা-ভাইবোনকে বাড়িওয়ালা এক রাত্রে বাইরে বার করে দিত। দু'বছরের বাড়িভাড়া, আমি তাকে দিয়েছিলাম একটা শর্তে। যে-শর্তে আমি তার পেছনে ছায়ার মতো ঘুরেছি। ছায়ার মতো।"

ওরা তিনজনেই যেন ওত পেতে দাঁড়াল ব্রজেনকে টুকরো টুকরো করবার জন্য। ব্রজেনের গলা সহসা আরও চড়ল। বলল, "মার প্রভাত, শংকর, নরেশ মার আমাকে। আমি সেই, বিজু যাকে সবচেয়ে বেশী ঘেন্না করত, যার কাছে শুয়ে তাকে মরার যন্ত্রণা পেতে হয়েছিল। যার ঠোঁটে, মুখে সে থুথু দিয়েছিল, অভিশাপ দিয়েছিল। তবু তার নিজেকে বিলিয়ে দিতে হয়েছিল; আমি সেই, যে তাকে তবু লোভীর মতো ছিঁড়ে খেয়েছে, অনেকদিনের লালসায়। আমি সেই, যে তাকে শেষবারের মতো মেরেছে। মার, মার আমাকে।"

কিন্তু খুনের নেশা কোথায় গিয়েছে তিনজনের। একটা অবিশ্বাস্য ভয়ংকর

কাহিনী শুনে তিনজনেই যেন চলচ্ছক্তিরহিত, বিহ্বল হয়ে গিয়েছে। শুধু একটা *উন্মাদ জন্তু, তাদের কাছে হাঁটু গেড়ে বসে মৃত্যু ভিক্ষা করছে।*

মৃত্যু ভিক্ষার আর্তনাদ ওরা শুনেছে, কিন্তু এখনও যেন সেই বিজুই ওদের হাত ধরে রেখেছে, যে তাদের সব পঙ্কিলতা আর পাপ থেকে ফিরিয়ে এনেছে। মনে হলো, ব্রজেনকে খুন করার নিষ্ঠুরতাকে বিজুই যেন দু' হাত দিয়ে আগলে ধরে রেখেছে। ওরা দেখল, সেই পাশ-আস্তীর্ণ ত্রিভুজের ভিটেটায় এখনও ফুলটা ফুটে আছে অম্লান।

সহসা ব্রজেনের গলার স্বর মোটা আর স্পষ্ট শোনাল। বলল, "মারতে পারলে না তোমরা। আমি কাল রাত্রি আটটা থেকে চব্বিশ ঘণ্টা বাঁচবার আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। ঘুরেছি, সে বেঁচে থাকলে আজীবন তার পিছে পিছেই ঘুরতাম।"

আবার ওর চোখে সেই উন্মাদ ভাব পুরোপুরি ফিরে এল। প্যাণ্ট হেঁচড়ে হেঁচড়ে টলতে টলতে চলে গেল ; গেল সামনের ঝুপসি জঙ্গলের দিকে।

ওরা তিনজন তখনও তেমনি দাঁড়িয়ে। তখনও ওদের নড়বার মতো ক্ষমতা ছিল না। হয়তো ব্রজেন রেল-লাইনে মরতেই গেল। যাক। ওরা ফেরাতে যাবে না। কারণ, ওদের বুকের মধ্যে তখনও ফেটে পড়ার একটা ভয়ংকর যন্ত্রণা টনটন করছে। তিনটি বুকে বিজুই তখন ফিস্‌ফিস্‌ করে যেন বলছে, কেন, বিজু মরেছে কেন ?



অবাধ্য

রুনুর মা সেদিন রুনুকে ডেকে বললেন, [illegible] রুনু।
রুনুর তখন স্কুলে যাওয়ার সময়। দুপাশের দুটি বিনুনি ঝাঁকিয়ে, ফ্রকের বেল্টটা বাঁধতে বাঁধতে বলল, তাড়াতাড়ি বল মা, সময় হয়ে গেছে।
কিন্তু মা কিছুই বললেন না, শুধু একটু তাকিয়ে দেখে বললেন, আচ্ছা, ঘুরে এসো স্কুল থেকে।
রুনুর মুখখানা লাল হয়ে উঠল। চোখের পাতা গেল নেমে। কোনো রকমে যেন পালিয়ে গেল মায়ের কাছ থেকে। লজ্জা, বিস্ময় আর বিচিত্র একটু বিক্ষোভে মনে মনে বলল, মা যেন কী! এমন করে তাকান যেন কী একটা অন্যায় বুঝি করে ফেলেছে রুনু। গায়ের মধ্যে এমন করে ওঠে।
কেন কী করেছে রুনু? মা আজকাল প্রায়ই এ রকম করেন। এখানে যেয়ো না, ওখানে যেয়ো না, হেসো না অত জোরে। ওরকম দাপাদাপি কোর না রুনু। কেন? না, মা কেবল বলবেন: কেন আবার। বড় হচ্ছ না এখন? কোথাও বেড়াতে গেলে বলবেন, রুনু, তুমি বেশী দূরে যেয়ো না। কাছাকাছি থেকো। কেন? না, বড় হচ্ছ না তুমি?
বড় হচ্ছে, না ছাই হচ্ছে রুনু। বড় বিরক্তি লাগে।
পরমুহূর্তেই রুনুর মনটা আবার অন্তঃস্রোতে বহে উজানে। লজ্জা করে বলতে, ভীষণ লজ্জা করে, আর আশ্চর্য আনন্দ বোধহয়, কোথায় যেন কেমন করে সে সত্যি বড় হয়ে যাচ্ছে। মা যেন ভগবান! ভগবানের মতো সব দেখতে পান!
প্রায় পৌনে এক মাইল হাঁটতে হয় রুনুকে স্কুলে যাওয়ার জন্যে। মফস্বলের এ ছোট শহরে তাদের মোটর-বাস নেই স্কুলে যাবার। অনেক মেয়েই হেঁটে যায়। রুনুও যায়। স্কুলে পাঠিয়েও নাকি মায়ের বড় ভাবনা।
স্কুলের মাঠ পেরিয়ে, লাফাতে লাফাতে দোতলার সিঁড়ি ভেঙে ক্লাস এইটের ঘরে ঢুকতে না ঢুকতে সব ভুলে গেল রুনু। তখনও ক্লাস বসে নি। মনিটর দীপালি কাজল-ধ্যাবড়ানো ছোট ছোট চোখে এক-একজনের দিকে তাকাচ্ছে আর নাম টুকছে। নামের পাশে পাশে লিখে রাখছে, 'চেঁচিয়ে হাসি', 'অলকার চুল ধরে টানা', দিদি-মণির টেবিলের ওপর বসা', 'বাদামভাজার খোসা ছড়ানো' ইত্যাদি।
রুনুর সে দিকে খেয়াল নেই। তিপুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই দুর্জয় অভিমান ঝিলিক দিল তার চোখে। ঠোঁট দুটিও ফুলে উঠল একটু।
তিপু অর্থাৎ তৃপ্তি ছুটে এসে রুনুর থুতনি তুলে ধরে বলল, রাগ করেছিস ভাই

না।

না আবার। রাগ না করলে বুঝি রুনু এমন করে।

তিপু বলল, আজ তোর জন্যে দাঁড়াতুম ঠিক। কিন্তু বাবার সঙ্গে এলুম রিকশায় চেপে, সত্যি। তা নইলে বুঝি দাঁড়াইনে?

রুনু চোখ তুলে তাকায়। মুখের অন্ধকার প্রায় কেটে আসে। সত্যি, বাবার সঙ্গে এলে তো কিছু বলার নেই।

তিপু আবার বলল, আর বাবাকে দাঁড়াতে বললে, বাবা যদি রাগ করত?

তাও তো বটে। বাবারা যে সব সময় কাজ করেন। রুনুর ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠল। বলল, একলা একলা আসতে এত খারাপ লাগে—

বলতে বলতেই রুনুর চোখে পড়ে যায় তিপুর বিনুনির ভাঁজে পুরোনো ফিতের ফুঁপড়ি বেরিয়ে পড়েছে। বিনুনি ধরে টেনে বলল রুনু, এদিকে আয়, খারাপ দেখাচ্ছে।

বলে সুকৌশলে ফিতের ফুঁপড়ি ঢুকিয়ে দিল বিনুনির ভাঁজে। তারপর চোখা-চোখি হতে হাসল দুজনে।

এ স্কুলে নতুন এসেছে রুনু। এ বছরেই এসেছে। আগের স্কুলটা নাকি বাজে, বাবা বলেছেন। আর এ স্কুলে ভর্তি হয়ে অনেক মেয়ের সঙ্গে মিশতে মিশতে সবচেয়ে তার ভাব বেশী জমে গেছে তিপুর সঙ্গে।

প্রথম প্রথম তিপু দূরে থেকে তাকিয়ে থাকত। তখনও ওদের আলাপ হয় নি। প্রথম যেদিন চোখে চোখ পড়ে গেল রুনুর, সেদিন ওর কী অস্বস্তি। আর লজ্জাও করছিল ভীষণ। প্রথম সব পিরিয়ডের দিদিমণিদের কাছেই ওকে বকুনি খেতে হয়েছে অন্যমনস্কতার জন্যে।

কিন্তু কী করবে রুনু। কেবলই মনে হচ্ছিল, তিপু ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। কেন? কে মেয়েটা, বারে বারে অমন করে তাকাচ্ছে। আর তো কেউ অমন করে তাকায় না। চোখের যেন পলক পড়ে না মেয়েটার। কী যেন রয়েছে তার চোখে, তার অপলক সুন্দর চোখ দেখে রুনুর লজ্জা করছিল, অস্বস্তি হচ্ছিল, তার মধ্যে কোথায় একটু ভালো-লাগার ভাবটুকুও এসে গিয়েছিল। শুধু অচেনা হলে মানুষ ও-রকম করে তাকায় না। যেন কী হয়ে গেছে মেয়েটার রুনুকে দেখে। ঠোঁটের কোণে একটু হাসির আভাসও বুঝি উঠছিল চমকে চমকে। সে-ই যে চোখ নামিয়েছিল রুনু, আর কিছুতেই তাকাতে পারে নি। কিন্তু তাকাবার জন্যে মনটা হাঁসফাঁস করছিল ভিতরে ভিতরে। আড়চোখে তাকাতে গিয়েও লক্ষ্য করেছে, ঠিক তাকিয়ে আছে সে।

পরদিনই আবার চোখাচোখি হয়ে গেল রাস্তায়। একই রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছিল দুটিতে। মা গো! ধক্ করে উঠেছিল রুনুর বুকের মধ্যে। পরমুহূর্তেই লজ্জায় চোখের পাতা আনত হলো রুনুর। লাল ছোপ ধরে গেল মুখে।

কত মেয়ের সঙ্গে কত সহজে আলাপ হয়ে যায়। পাঁচ-দশ মিনিটের মধ্যে আলাপ হয়ে কত কথাই না হয়ে যায়। আর এখানে কথা বলা দূরে থাকুক, সহজভাবে তাকাতেই পারে নি রুনু। মেয়েটাও কথা বলতে পারছিল না যেন কিছুতেই।

ক্লাসে গিয়েও সেই একই অবস্থা।

তিন দিন চলেছিল প্রায় একই রকম। কিন্তু রুনুর প্রাণ ভিতরে ভিতরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল মেয়েটির জন্যে। তিপুর নামটা শুনে নিয়েছিল ইতিমধ্যে। কিন্তু আড়চোখে কত আর তাকাবে রুনু তিপুর দিকে। কেন যে ভাব হয় না মেয়েটার সঙ্গে!

চার দিনের দিন, টিফিনের ক্লাসে কেউ ছিল না তখন। রুনু কোনোদিনই বাড়ি যায় না টিফিনে। মাঠে মেয়েরা খেলা করছিল। রুনু মাঠে না গিয়ে, ক্লাসের জানালায় গিয়ে দাঁড়াল। তিপু খেলা করবে, রুনু দেখবে লুকিয়ে লুকিয়ে।

সবে দাঁড়িয়েছে জানালায়, পিঠে আঙুলের খোঁচা খেয়ে ফিরতেই, তিপু! কিন্তু লজ্জা পাবার সময় না দিয়েই সে বলে উঠল, তোমার সঙ্গে ভাব করতে এলুম ভাই। উঃ কি মেয়ে ভাই তুমি। বড্ড গম্ভীর।

রুনুর লজ্জা-লজ্জা করছিল। তবু হেসে বলল, যাঃ।

তিপু বলল, ইস। নয়? তোমাকে দেখে আমার এত ভালো লাগছিল। যতবারই তোমার দিকে তাকাই, তুমি কেমন গম্ভীর হয়ে মুখ ফিরিয়ে নিতে। তোমার ভাই একটু অহংকার আছে।

রুনু হেসে বলল, হ্যাঁ, তাই বুঝি! কিন্তু তুমি কিছু জান না, আমার কী ভীষণ লজ্জা করছিল, সত্যি।

সত্যি?

হ্যাঁ।

আমারও। জান, এত লজ্জা করছিল, কিছুতেই ভাব করতে পারছিলুম না।

তবে আমি এসে ভাব না করলে তুমি কিছুতেই কথা বলতে না, না?

রুনু বলল, মোটেই তা নয়। আমি ঠিক আজকে তোমার সঙ্গে ভাব করে ফেলতুম। আমার ভীষণ ইচ্ছে করছিল।

তার পরে সত্যি সত্যি ভাব হয়ে গেল। এত ভাব আর কারুর সঙ্গে হয় নি রুনুর। মা যে আজকাল রুনুকে পায়ে পায়ে সাবধান করেন, বড় হচ্ছ বড় হচ্ছ বলেন, সেটুকুও তিপুকে না বললে তার চলে না।

এমন কি সেদিন যে অমন হঠাৎ ডেকে মুহূর্তে তাকিয়ে বলেছিলেন, আচ্ছা, স্কুল থেকে ঘুরে এসো। তারপর বিকেলে দরজি ডাকিয়ে নতুন জামার মাপ নিয়ে, তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন অন্য রকম ঝাঁপালো-ফাঁপালো লুজ ফ্রক, সেটুকুও বলে। সব বলে—সবটুকু, তার এই চোদ্দ বছর গহীনের সব কথা—সব অজানা সংশয়, তার রক্তের বিচিত্র বিস্ময়।

তিপুও বলে। কিন্তু তিপু ওর মায়ের কথা তেমন করে বলে না। বাবা নাকি ওর নেই। না-ই বা থাকলেন, তা বলে রুনুকে কী একদিন তিপু ওদের বাড়িতে যেতে বলতে পারে না! নিজেও যেতে বলবে না, আর রুনু এতবার তিপুকে তাদের বাড়ি নিয়ে যেতে চায়, তিপু যায় না। খালি বলে, আচ্ছা, আর একদিন যাব, সত্যি মাইরি। কেন? এমন করে এড়িয়ে কেন যায় তিপু? কষ্ট হয় না বুঝি, রাগ হয় না, না?

একদিন শনিবারের ছুটির পরে দুজনে ওরা হেঁটে আসছিল। বড় রাস্তার কাছেই একটি রাস্তার বাঁকে রুনুদের বাড়ি। তিপুদের বাড়ি আরও ছাড়িয়ে—সেই বাজার পার হ'য়ে গঙ্গাধারের কাছাকাছি।

এই দিনে রুনু বলল রাস্তায় চলতে চলতে, তিপু, আজ আমাদের বাড়ি তোকে যেতেই হবে।

তিপু বলল প্রতিদিনের মতো, আজ না ভাই রুনু, আর একদিন যাব।

আজ রুনুর মুখ ভার হয়ে উঠল। হাত ধরে টানল তিপুর। হাসতে হাসতে হাত-টানাটানি করল দুজনেই। তারপর রুনুর চোখে যেন মেঘ করে এলো। হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে বলল, থাক্ তা হলে, আসিস নে।

রাগ করলি ভাই?

না।

তিপু হেসে রুনুর হাত ধরে বলল, আহা, মেয়ে যেন একেবারে মনসা। চল্ চল্, যাচ্ছি। তোর মা রাগ করবেন না তো?

ভাগ! সবাই কত যায়। বীণা, কুসুম—

তারপরেই দুটি বড় বড় ছেলের দিকে চোখ পড়তেই রুনু বলে উঠল, দেখছিস, লোক দুটো কী রকম করে তাকাচ্ছে!

তিপু বলল, তাকাকগে মুখপোড়াগুলো!

তিপুর এমন পাকা গালাগাল শুনে দুজনেই চাপা গলায় খিলখিল করে হেসে উঠল। পরমুহূর্তেই বোধহয় রুনুর মনে পড়ে যায়, এ রকম হাসা উচিত নয়। মা দেখলে খুব রাগ করতেন।

বাড়ি গিয়ে, তিপুকে নিয়ে একেবারে মার ঘরে চলে এলো রুনু; দেখ মা, কাকে নিয়ে এসেছি আজ।

মা তখন খাটে শুয়ে উপন্যাস পড়ছিলেন। ভেজা চুল ছড়ানো, পান খেয়েছেন ঠোঁট লাল করে। মায়ের এই রূপটি তিপুকে দেখাতে পেরেও রুনু খুব খুশি মনে মনে। এ সময় মাকে তার এত সুন্দর লাগে, ঠিক যেন একটি মহারাণী। সুন্দর লাগে, আবার ভয়-ভয়ও করে।

মা বই থেকে চোখ তুলে বললেন, কে?

রুনু বলল, তিপু গো, সেই যার কথা তোমাকে অনেকবার বলেছি।

কিন্তু মা তো কই হেসে, ভালবেসে ডেকে উঠলেন না এখনও তিপুকে। বরং মায়ের ভ্রূ দুটি কেমন যেন মেঘভার আকাশের বিদ্যুতের মতো ঢেউ খেলে গেল। রাগ করেন নি, তবু যেন কেমন একটু উদাসীন ভাব। বললেন, ও তোমার নাম তিপু?

তিপু সলজ্জ হেসে বলল, হ্যাঁ।

মা বললেন, বোস, তোমাদের বাড়ি কোথায়? গঙ্গার ধারে? অধর পণ্ডিত লেনের কাছে?

তিপু বসে বলল, হ্যাঁ। আপনি চেনেন?

মা বললেন, চিনি বইকি।

তার পরে আরও দু-চারটি কথা বলে মা যেন কেমন সহজেই গা এলিয়ে দিলেন। অন্যমনস্কভাবে ডুব দিলেন বইয়ের পাতায়।

মার বুঝি ঘুম পেয়েছে? না কি বইটা পেয়ে বসেছে মাকে, এক-একটা বই নিয়ে মা অনেক সময় নাওয়া-খাওয়া ভুলে যান। কিন্তু সেদিন ময়নার সঙ্গে মা কতক্ষণ কথা বললেন। এমন কী ময়নার মা কি কি রান্না করেছে, সেটুকুও জেনেছেন। আর আজ তিপুকে দেখে মার কেমন যেন গা-এলানো ভাব। তিপু হয়তো মাকে একটা বিচ্ছিরি কুঁড়ে গেঁয়ো মেয়েছেলে ভেবে গেল। মনে মনে বড় রাগ হলো রুনুর মায়ের উপর।

কিন্তু তিপু কিছুই বলল না। সহজভাবেই হেসে, ঘুরে সারা বাড়িটা প্রায় দেখল রুনুদের। ছাদে দাঁড়িয়ে বড় রাস্তাটা দেখা যায়। বেলা বুঝি তখন দুটো বেজেছে। ভাদ্রের মেঘলা-ভাঙা রোদ প্রায় ফাঁকা রাস্তাটার উপর ভ্রূ কুঁচকে আছে। বড় জ্বলুনি এই রোদে। শুধু একটি লোক হেঁটে যাচ্ছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে, ছেঁড়া নেংটি পরে, খালি গায়ে। নিশ্চয় ভিখারী।

দুই বান্ধবী খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল লোকটির দিকে। তারপর যখন দুজনের চোখাচোখি হলো, তখন তাদের দুজনের মনই এক বিস্ময়কর বেদনায় ভরে গিয়েছে। এই প্রথম শরতে অনেকখানি-ছড়িয়ে-পড়া আকাশের তলায় হঠাৎ কেমন উদাস হয়ে যায় দুজনেই। রুনু বলল ফিসফিস করে. ভারি কষ্ট হয় দেখলে, না?

তিপু বলল, হ্যাঁ। জানিস, আমি যখন রাত্রে শুয়ে চোখ বুজব, তখন ঠিক লোকটা অমনি করে হেঁটে যাবে আমার চোখের ওপর দিয়ে। কেন এ রকম হয় ভাই?

রুনুও বলল অসহায়ভাবে: কি জানি। আমি স্বপ্ন দেখে ঠিক জেগে উঠব অনেক রাত্রে।

কেন যে এই অজানা ব্যথায় ভরে ওঠে মন, এই দুই সখী তা বোঝে না। শুধু কারুর কষ্ট দেখলেই, তাদের বুক ছাপাছাপি হয়ে যায়। একটুখানি আনন্দের সন্ধান পেলে হেসে হেসে মরে যায় তারা।

তারপরে তিপু বলল, এবার যাই।

রুনু বলল, আর একটু থাক্ ভাই। আয় চল্ দুজনেই ভাত খেয়ে নি অ্যাঁ?

তিপু বলল, ভাগ, না ভাই, আজ নয়, আর একদিন হবে।

তিপু চলে গেল। তার পরে মার উপরে অভিমানটা আবার ফিরে এলো রুনুর মনে। মার কাছে আর গেল না। রান্নাঘরে গেল খেতে। সেখানে তার ভাত ঢাকা দেওয়া আছে।

কিন্তু তার আগেই রুনুর পায়ের শব্দ পেয়ে মা ডাকলেন।

রুনু মুখখানি ভার-ভার করে গেল মায়ের কাছে। কিন্তু মা ওসব চেয়েও দেখলেন না; তিনি ততক্ষণে উঠে বসেছেন। জিজ্ঞেস করলেন, চলে গেছে তোমার বন্ধু?

হ্যাঁ।

শোন।

কেন?—মার গলা যেন কেমন শাণিত হয়ে উঠছে। চাউনিটি যেন একটা রাগরাগ ভাবের।

রুনু অভিমানে ডুবে গেল। বলল, কী বলছ মা?
মা বললেন, ও-ই যে তোমার তিপু, তা জানতুম না। ওকে আর কোনোদিন বাড়িতে এনো না, ওর সঙ্গে মেশামিশিও কোর না একদম।
রুনুর দুটি বড় বড় চোখ বিস্ময়ে ও অজানা ভয়ে পলকহারা হয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, কেন মা?
মার ভ্রু দুটি কুঁচকে উঠল। কী ভয় করছে এখন মাকে দেখে। মা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, সব কথা তোমাকে বলতে পারব না, জেনে রাখ, ওরা ভালো নয়। ওদের সঙ্গে কোনো ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ের মেলামেশা একদম উচিত নয়।
কী একটা বিশেষ ভয়াল ইঙ্গিত আছে যেন মার কথায়। তাই মা অমন এলাকাড়ি দিয়েছিলেন তিপুকে দেখে। কিন্তু তিপু! তিপুর তো কোনোদিন কিছু খারাপ দেখে নি রুনু। ক্লাসের মায়া নাকি কাকে কী সব চিঠিপত্র লেখে। শোভা কত রকমের বাজে কথা বলে। তিপু তো সে রকম কথা কোনোদিন বলে নি!
রুনু বলল খুব ভয়ে ভয়ে, জান মা, তিপু কিন্তু ক্লাসের পড়া খুব ভালো দেয়। ইংরিজীতে—
শোন রুনু।—মার গলা রুনুর বুকে যেন কেটে কেটে বসে। বললেন, তিপু লেখাপড়ায় কত ভালোমন্দ, আমি ওসব শুনতে চাই নে। তিপুর কী দোষ আছে, গুণ আছে তাও আমি জানি নে। কিন্তু তিপুর সঙ্গে তোমার মেশা দূরের কথা, কথা বলাও উচিত নয়। কী করে ও-মেয়েকে স্কুলের দিদিমণিরা পড়তে দিচ্ছে বুঝি নে। খালি জেনে রাখ, ওর মা ভীষণ খারাপ, ভীষণ! যার চেয়ে আর কিছু হয় না, বুঝেছ?—বলে রুনুর চোখের দিকে তাকালেন মা। কী একটা বিশ্রী ইঙ্গিত ছিল মায়ের কথায়, রুনুর মুখ লাল হয়ে উঠল। আর তিপুর মার কথা ভাবতে গিয়ে শহরের এক শ্রেণীর মেয়ের চেহারা ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। মার কথা থেকে সেই সব মেয়ের মূর্তিই ভেসে ওঠে।
কিন্তু তিপুর সঙ্গে তো কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। তিপুকে রুনু তার চেয়ে সব বিষয়ে অনেক সুন্দর দেখে।
বোধহয় রুনুর মুখে কিছু সংশয়ের ছায়া দেখে দৃঢ় গলায় মা বললেন, মোট কথা, তুমি এখন বড় হচ্ছো। তিপুর সঙ্গে একেবারে মিশবে না, কথাও বলবে না। যাও খেয়ে নাও গে। এখুনি তোমার গানের মাস্টারমশাই এসে পড়বেন আবার।
চলে গেল রুনু। কিন্তু তিপুর কোনো দোষের কথা তো মা বললেন না। তিপুর তো কোনো দোষ নেই। কথা বলবে না সে তিপুর সঙ্গে। তবে কী বলবে সে তিপুকে। তিপু যখন হাসবে তার দিকে তাকিয়ে; ডাকবে—এই রুনু, শোনু, তখন কী করবে রুনু, সে কথা কেন মা বলে দেবেন না! এমনি মিছিমিছি একজনের সঙ্গে কখনও আড়ি করা যায়। তিপু যদি সেই আগের মতো একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে, তখন কী হবে রুনুর?
খেতে বসে বুকের মধ্যে টনটন করতে লাগল রুনুর। মরে গেলেও তো সে তিপুকে

তার মায়ের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে পারবে না। গান করতে বসে 'জাগরণে যায় বিভাবরী'-র স্বরলিপি তুলতে গিয়েও তার মনে হলো, আচ্ছা, কেন এত প্যাঁচালো এই পৃথিবীটা! কার সঙ্গে এখন এ বিষয় নিয়ে রুনু আলোচনা করবে! তার আলোচনা করা দরকার, জানা দরকার, বোঝা দরকার।

রাত্রে সে যে বাইরের উঠোনের অন্ধকারে বসে ছিল, মা বোধহয় তা জানতেন না। শুনতে পেল, মা বাবাকে বলছেন, তবে আর তোমাকে বলছি কী। দেখি রুনুর সঙ্গে একেবারে আমার ঘরে এসে হাজির। আমি তো একেবারে শিউরে উঠেছি দেখে। এ কী, মঙ্গলার মেয়ে এ বাড়িতে কেন? সে যে আবার স্কুলে পড়ে, তা কে জানত!

বাবার গলা শোনা গেল, দিনকাল তো বদলে যাচ্ছে।

মা বললেন, তা বলে একটা প্রস্টিটিউটের মেয়েকে স্কুলে রাখবে? অন্যান্য মেয়েরা খারাপ হয়ে যাবে না?

বাবা বললেন, শুনেছিলুম মঙ্গলা ওর মেয়েকে কোনো এক আলাদা বাড়িতে রেখে দিয়েছে।

যতই রাখুক আলাদা, তবু সে যা তাই।

প্রস্টিটিউট শব্দটার আভিধানিক মানে জানে না রুনু। ভাবগত অর্থটা জানে। ঠিক যে সব মেয়েদের কথা ভেবেছিল সে, তবে তা-ই তিপুর মা। তিপুর মতো মেয়ের মা এই রকম কেন হয়? তিপু তো তার চেয়ে মোটেই খারাপ নয়। ও, তাই বুঝি তিপু কোনোদিন রুনুকে তাদের বাড়ি যেতে বলত না।

কিন্তু তিপুকে কী বলবে রুনু। মা-বাবার কাছে যেটা সমস্যা, রুনুর কাছে সেটা কোনো সমস্যাই নয়। ওঁদের কাছে তিপু শুধু খারাপ মেয়েমানুষের মেয়ে। রুনুর যে বন্ধু।

কিন্তু রুনু মনে মনে ঠিক জানে, তার আর কিছুতেই তিপুর সঙ্গে কথা বলা চলবে না, মেলামেশা তো অনেক দূরের কথা।

পরদিন আগে আগে বেরিয়ে গেল রুনু স্কুলে। তিপু এসে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে রাস্তার মোড়ে একসঙ্গে যাবার জন্য। তার আগেই বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু কী দুর্ভাগ্য, তিপু যে এত আগে এসে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে, কে জানত! তিপু হেসে বলে উঠল, উঃ আজ খুব সকাল সকাল এসেছিস তো! রুনু দেখল, আজও ঠিক তিপু বেণী দুটি যা-তা করে বেঁধে এসেছে। ফ্রকের পিঠের বোতামগুলি লাগায় নি ঠিক করে।

রুনু গম্ভীর হয়ে গেল। রাগ করে নয়। বুকটা কী রকম ধড়াস ধড়াস করছে! মার কথাগুলো মনে পড়ছে! কী বলবে সে তিপুকে! মার উপরে, সংসারের উপরে ভীষণ রাগ হচ্ছে আর কান্না পাচ্ছে রুনুর। আর, আর তিপুর উপরেও রাগ হচ্ছে। কেন মরতে ও-রকম মায়ের মেয়ে হয়েছে! হলো যদি, তবে রুনুকে কেন ভালবেসেছে!

তিপু কিন্তু থতিয়ে গেছে রুনুর ভাব দেখে। কেন, এ রকম করছে কেন রুনু! রুনুর মুখে তো সে ভাবের অভিমান লেগে নেই! তিপুর উপর রাগলে তো

তাকে এ রকম দেখায় না। তবে, তবে—? তিপু যেন সাপ। অ্যাসিডের গন্ধ পেয়ে সতর্ক সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল। মাথা নত হলো তারও। মুখখানি ভরে গেল একটি বোবা ব্যথার অভিব্যক্তিতে। তোর মা রাগ করেছে, না?

রুনু পিছন ফিরে তাকাল। কে জানে, মা ছাদে দাঁড়িয়ে আছে কি না। নেই। রুনু কোনো রকমে ঘাড় নেড়ে, হঠাৎ জোরে জোরে হাঁটতে লাগল তার শিলপারে শব্দ তুলে। তিপু আস্তে আস্তে হাঁটতে লাগল তার শক্ত হিলে খট খট করে।

এর চেয়ে বেশী কিছু বলার দরকার ছিল না তিপুকে। এইটুকুর মধ্যেই আসল গন্ডগোলটা জানাজানি হয়ে গেল ওদের!

এতে ওরা কে কতখানি আঘাত পেয়েছে, কে কত কেঁদেছে লুকিয়ে, সেটা জানা-জানি হওয়ার কোনো উপায় রইল না। মেশামেশি, কথা-বলাবলি বন্ধ হয়ে গেল ওদের আপনা থেকেই। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল দুজনে।

কিন্তু রুনুর তবু মনে হয়, তিপু ক্লাসে তাকিয়ে আছে তার দিকে। তাই মাঝে মাঝে ও আড়চোখে তাকায়।

আসলে ওরা দুজনেই সোজা চোখে তাকাতে গেছে ভুলে। কিন্তু তাকানোটা এ জীবনে যেন শেষ হবে না আর। আর, বুকের মধ্যে কোথায় যেন আছে একটি মস্ত তেপান্তর। সেখানে কেন পুব-সাগরের ঝড়ো বাতাস মাথা কোটে নিরন্তর। কে এসে দুজনের মাঝখানে পড়ে রাস্তার ডাইনে বাঁয়ে সরিয়ে দিয়েছে ওদের। বিচ্ছেদের আড়ালে, কাঁদতে গিয়ে হাসবার মতো একটি বিচিত্র খেলা পেয়ে বসেছে দুটিকে।

তিপু অপেক্ষা করে না আগে এসে, রুনু ছুটে আসে না কারুর আশায়, তবু ওদের দেখা হয়ে যায় রোজ। কিন্তু মিশতে মানা, কথা বলতে মানা। রাস্তার দু পাশ ধরে দুজনে যায় হেঁটে। যেন একজনকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে পথের একপাশে, আর একজনকে টেনে ধরে রাখা হয়েছে আর একপাশে।

আড়চোখে দেখে কি না! কে জানে! না দেখাই উচিত, কেন না, ওদের মানা আছে। বেলা দশটার রোদে ওদের ছায়া দুটি শুধু জানে, কী করে ওরা, কী হয় ওদের।

খানিকটা এগিয়ে মিউনিসিপালিটি, তারপরে অনেকগুলো দোকান—মোষের খাটাল, কামারের দোকান, একটা কালভার্ট, সিনেমা-হল, ডাক্তারখানা, ফোটোর দোকান। তারপর ডান দিকে একটি রাস্তা চলে গেছে পুব দিকের মাঠে। ওদিকটার কোনো সীমা নেই। বড় বড় গাছের ফাঁকে ফাঁকে মাঠ, ধানক্ষেত, জঙ্গল, দূর গ্রাম। তার পরে আরও যেন কত কী। কত কী! শুধু তার ইশারা নিয়ে পড়ে থাকে আকাশটা।

কিন্তু ওরা যায় সোজা উত্তরে—কারখানা পেরিয়ে, পোস্ট-অফিস ডিঙিয়ে, তার পরে স্কুল।

ওদের মানা আছে, ওরা কথা বলে না, মেশে না। যেন দুটি আলাদা জগৎ, নত মুখে, সামনে তাকিয়ে, নিস্পৃহভাবে চলে যায় রাস্তার দু'পাশ দিয়ে। রোজ রোজই এই খেলা।

তার পরে একদিন এই খেলার আর শেষ হয়ে আসে। পৃথিবীতে সব খেলারই যেমন একদিন শেষ হয়।

পুজোর ছুটি কেটে গেছে। শরৎ গিয়ে হেমন্তের কাল এসে পড়েছে আকাশে। বাতাসে মাঝে মাঝে উত্তরের ঝাপটা টের পাওয়া যায়। আকাশ যেন বছর কাবারের আগে বড় বেশী নীল হয়ে গেছে। আরও বড়, অনেক বড় হয়ে সে হারিয়ে যেতে চাইছে। রোদে নতুন আমেজ। শীত আসার আগেই পাখিগুলি সারাদিন ডেকে নিচ্ছে প্রাণভরে।

আজও তেমনি না তাকিয়েও মোড়ের মাথায় এসে পরস্পরকে টের পেয়ে গেল ওরা। তার পর যেমন চলে, তেমনি চলতে লাগল।

মিউনিসিপাল অফিস গেল, পার হয়ে গেল দোকানগুলো, মোষের খাটাল, কামারের দোকান, কালভার্ট—

কেন, তিপু কি আজ আর যেতে চায় না? ওর ছায়াটা যেন পিছিয়ে পড়ছে মনে হয় রুনুর।

তার পরে সিনেমা-হল, ডাক্তারখানা, ফোটোর দোকান—

এ কি, কোথায় যাচ্ছে তিপু? রুনু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। দেখল, তিপু পুব-দিকের পথটায় চলে যাচ্ছে হনহন করে। কেন রাগ হয়েছে?

রুনুর মনে হলো, মা যেন বলছেন, তুমি ওদিকে কী দেখছ রুনু? যাও স্কুলে চলে যাও, ঘণ্টা বাজার সময় হলো।

রুনুর বুকটা কি রকম করছে। ওকে স্কুলে যেতে হবে, কিন্তু তিপু আজ কেন এমন করে খেলা ভেঙে চলে যাচ্ছে। তিপু কি একটুও বোঝে না, একটুও কি কষ্ট হয় না তার রুনুর জন্যে।

রুনু যেন শুনতে পাচ্ছে মায়ের শাসানো চিৎকার—স্কুলে যাও বলছি…।

কিন্তু এ কী রুনু, অবাধ্য মেয়ে তুই, তুই কেন মাঠের পথে যাস?—নিজেকেই যেন বলে রুনু, আর নিজেই জবাব দেয়, তিপু কি একটুও বোঝে না, কত কষ্টে রুনু চেপে রাখে নিজেকে। নাকি তিপু আজ আর সহ্য করতে পারে নি। আর বুঝি সে এমন খেলা খেলতে পারে না।

কিন্তু এ কী, তিপু এত জোরে যাচ্ছে কেন? রুনু পিছু পিছু আসছে বলে? রুনু ডেকে উঠল, তিপু, তি—পু!

অমনি রুনুর কানে মায়ের হুঙ্কার: খবরদার, খবরদার বলছি রুনু—

কিন্তু তিপু এত জোরে ছুটছে কেন? মাথাটা এত নুয়ে পড়েছে কেন ওর? কাঁদছে, না? কাঁদছে তিপু, আর রুনুর কান্না তুই দেখবি নে চেয়ে, না? তোরই খালি কষ্ট হয়, রাগ হয়, আর আমার বুকটা কেমন করে, তুই জানিস নে? তিপু—তি-পু—

গাছের আড়ালে পড়ল তিপু, আবার দেখা গেল। মাঠে পড়ল, আবার গাছের আড়ালে। বই বুকে চেপে, বেণী উড়িয়ে রুনু ছুটছে। দমের অভাবে আর ডাকতে পারে না। ফিসফিস করে ডাকে শুধু, তিপু তিপু তিপু—

তার পরে একটা কুলঝোপের কাছে এসে, বই ফেলে রুনু দুহাতে জড়িয়ে ধরে

সখীকে। তিপু মাটিতে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। রুনুও কাঁদতে থাকে তিপুর পিঠে মুখ চেপে।

হেমন্তের উদার আকাশ ভরে বাতাস লুটোপুটি খায়। মাঠে মাঠে পাকাধানের গোছা পড়ে নুয়ে। শব্দ হয় ঝিরিঝিরি, গন্ধ ছড়ায় নতুন ধানের। আর মনে হয়, আকাশ আর মাঠ যেন হাসে ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে, তাদের দু চোখভরা স্নেহ ও বেদনা। এই যে মেয়ে দুটি আজ প্রথম স্কুল পালিয়ে এসেছে, সমাজ ও মায়ের বারণ মানে নি, তাতে তাদের একটুও রাগ হলো না। বরং যেন খুশী হয়ে ঠাঁই দিল এ ঝোপের নির্জনে।

দুটিতে অনেকক্ষণ ধরে শুধু কাঁদল, তারপর ফোঁপাতে লাগল। তার পরে এক সময়ে ফোলা-ফোলা চোখ নিয়ে, গায়ে গায়ে জড়িয়ে বসে রইল চুপ করে, দূরে মাঠ ও আকাশের দিকে চেয়ে। তখনও কান্নার হেঁচকি উঠছে দুজনের। তারপর শুধু থেকে থেকে কেঁপে যেতে লাগল ওদের বুকের গভীর থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাস।

দুঃখ দেখলে ওদের বুক ছাপাছাপি হয়ে যায়, আনন্দে হেসে বাঁচে না। ভালবাসার টান ধরলে যে সব অনুশাসনের বেড়া ভেঙে ফেলতে পারে, সেটা ওরা জানে না। না জেনে, বাঁধ ভেঙে ওরা জীবনের অচেনা আঙিনায় এসে বোবা হয়ে রইল অনেকক্ষণ।

তিপু দুজনের বইগুলি গোছাল। রুনু তিপুর বিনুনি দুটি বাঁধল ভালো করে, ফ্রকের বোতামগুলি ঠিক করে লাগিয়ে দিল। আর রুনুর বুকের কাছে একটি পাকা ঘামাচি নখ দিয়ে মেরে দিল তিপু। আবার দুটিতে বসে রইল, গায়ে গায়ে, হাতে হাত দিয়ে। কোথায় যেন মেঠো মানুষের গলা শোনা গেল। গরু ডেকে উঠল দূর থেকে। কুলগাছে ডেকে গেল পাখি। কখন সূর্য চলে গেল মাথার উপর দিয়ে।

রুনু গুন্‌গুন্‌ করে গান গেয়ে উঠল। এতদিন মাস্টারমশায়ের কাছে শিখেছে, বাড়িতে কেউ এলে মা গান করতে বলেছেন। আজ আপনা থেকে গাইছে রুনু—

এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না।
মন উড়েছে, উড়ুক না রে মেলে দিয়ে গানের পাখনা।

রুনুর গান শেষ হলো। তারপর তিপুও গুন্‌গুন করে উঠল—

তোমার বাঁশী শুনলে ঘরে রইতে পারি না।
তোমার দেখা পেলে আগল বাঁধতে পারি না॥

দুজনের গান দুরকম। সুরের কোনো মিল নেই, ভাবে ও ভাষার কোনো মৈত্রী নেই। না-ই বা থাকুক। তারা যা জানে, তাই গাইতে লাগল। তাদের সব গান তারা গাইবে আজ পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে।

রুনু। মরি মরি, জাগরণে যায় বিভাবরী
আঁখি হতে ঘুম নিল হরি।
তিপু। সখি এ পথ দিয়ে অনেক গেছি,
তাকায়েছি মিছামিছি

তোমার দেখা পাই নি গো।

রুনু। কবে তুমি আসবে বলে
আমি রইব না বসে,
আমি চলব বাহিরে।

তিপু। অমন কুঞ্জের ধারে আসব না
ভুজঙ্গ সেথা আছে গো,
তবু অঞ্জন মাখি নয়নে
মনোরঞ্জন পাশে আসি গো।

রুনু। আলোকের এই ঝরনা ধারায় ধুইয়ে দাও
আপনাকে এই লুকিয়ে রাখা,
ধুলোয় ঢাকা, ধুইয়ে দাও।

তিপু। শিকল দিয়ে বাঁধো নাই তো
কী দিয়ে যে বেঁধেছ—
বাঁধনে যে এত সুখ
ছাড়া যেন না পাই গো।

এই যেন জীবনে দুজনের প্রথম গান গাওয়া। হাসল তারা দুজনে, গম্ভীর বিষণ্ণ সে-হাসি। এই বয়সের কত কথা, কত কাকলি—সব ছাপিয়ে, যেন ভরা গাঙের টাবুটুবুতে এসে পড়েছে তারা। অবাধ্য হয়ে তারা বাধ্য হলো পরস্পরের। জীবনের কোথায় একটা দরজা খুলে গেল নিঃসাড়ে, দেখে শুধু হাসল ওই আকাশ আর পাকাধানের মাঠ।

রুনু বলল, স্কুলে ছুটির ঘণ্টা বোধহয় পড়ল।

তিপু বলল, চল্ এবার যাই।

মাথার ওপরে আকাশটি চলল সঙ্গে সঙ্গে, মাঠের বাতাস এলো পিছু পিছু।

বাড়ি আসতে মা রুনুর দিকে তাকিয়ে একটু অবাক হলেন। বললেন, কী রে, শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

রুনুর বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। বলল, না তো।

তারপরে খেয়েদেয়ে, চুল বাঁধার আগেই আজ রুনুর বড় ঘুম পেতে লাগল। কখন এক সময় ঘুমিয়েও পড়ল মায়ের বিছানায়।

বিকালে ঘরে ঢুকে রুনুকে এমন ঘুমুতে দেখে চমকে উঠলেন মা। গায়ে হাত দিলেন আস্তে আস্তে। না, জ্বর আসে নি। তারপর খানিকক্ষণ রুনুর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মায়ের কী যেন হলো। তিনি হঠাৎ উপর দিকে মুখ করে চুপিচুপি বললেন, মেয়েটা যেন আমার সুখী হয় জীবনে।

ঘরে ঢুকলেন রুনুর বাবা। বললেন, কী করছ?

মা বললেন, কিছু না। জান গো, আমার বড় সাধ, রুনু একখানি শাড়ি পরবে।

আদাব

রাত্রির নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দিয়ে মিলিটারি টহলদার গাড়িটা একবার ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে একটা পাক খেয়ে গেল।

শহরে ১৪৪ ধারা আর কারফিউ অর্ডার জারী হয়েছে। দাঙ্গা বেধেছে হিন্দু আর মুসলমানে। মুখোমুখি লড়াই দা, সড়কি, ছুরি, লাঠি নিয়ে। তা ছাড়া চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে গুপ্তঘাতকের দল—চোরাগোপ্তা হানছে অন্ধকারকে আশ্রয় করে। লুঠেরা-রা বেরিয়েছে তাদের অভিযানে। মৃত্যু-বিভীষিকাময় এই অন্ধকার রাত্রি তাদের উল্লাসকে তীব্রতর করে তুলছে। বস্তিতে বস্তিতে জ্বলছে আগুন। মৃত্যু-কাতর নারী-শিশুর চীৎকার স্থানে স্থানে আবহাওয়াকে বীভৎস করে তুলছে। তার উপর এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে সৈন্যবাহী-গাড়ি। তারা গুলী ছুঁড়ছে দিগ্‌বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আইন ও শৃংখলা বজায় রাখতে।

দুদিক থেকে দুটো গলি এসে মিশেছে এ জায়গায়। ডাস্টবিনটা উল্টে এসে পড়েছে গলি দুটোর মাঝখানে খানিকটা ভাঙাচোরা অবস্থায়। সেটাকে আড়াল করে গলির ভিতর থেকে হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো একটি লোক। মাথা তুলতে সাহস হলো না, নির্জীবের মতো পড়ে রইল খানিকক্ষণ। কান পেতে রইল দূরের অপরিস্ফুট কলরবের দিকে। কিছুই বোঝা যায় না।—'আল্লাহু-আকবর' কি 'বন্দেমাতরম্'।

হঠাৎ ডাস্টবিনটা একটু নড়ে উঠল। আচম্বিতে শিরশিরিয়ে উঠল দেহের সমস্ত শিরা-উপশিরা। দাঁতে দাঁত চেপে হাত পা-গুলোকে কঠিন করে লোকটা প্রতীক্ষা করে রইল একটা ভীষণ কিছুর জন্য। কয়েকটা মুহূর্ত কাটে।···নিশ্চল নিস্তব্ধ চারিদিক।

বোধহয় কুকুর। তাড়া দেওয়ার জন্যে লোকটা ডাস্টবিনটাকে ঠেলে দিল একটু। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার নড়ে উঠল ডাস্টবিনটা, ভয়ের সংগে এবার একটু কৌতূহল হলো। আস্তে আস্তে মাথা তুলল লোকটা···ওপাশ থেকেও উঠে এলো ঠিক তেমনি একটি মাথা। মানুষ! ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী, নিস্পন্দ নিশ্চল। হৃদয়ের স্পন্দন তালহারা—ধীর···। স্থির চারটে চোখের দৃষ্টি ভয়ে সন্দেহে উত্তেজনায় তীব্র হয়ে উঠেছে। কেউ কাউকে বিশ্বাস করতে পারছে না। উভয়ে উভয়কে ভাবছে খুনী। চোখে চোখ রেখে উভয়েই একটা আক্রমণের প্রতীক্ষা করতে থাকে, কিন্তু খানিকক্ষণ অপেক্ষা করেও কোনো পক্ষ থেকেই আক্রমণ এলো না। এবার দুজনের মনেই একটা প্রশ্ন জাগল—হিন্দু, না মুসলমান? এ প্রশ্নের উত্তর পেলেই হয়তো মারাত্মক পরিণতিটা দেখা দেবে। তাই সাহস করছে না কেউ

কাউকে সে কথা জিজ্ঞেস করতে। প্রাণভীত দুটি প্রাণী পালাতেও পারছে না—ছুরি হাতে আততায়ীর ঝাঁপিয়ে পড়ার ভয়ে।

অনেকক্ষণ এই সন্দিহান ও অস্বস্তিকর অবস্থায় দু'জনেই অধৈর্য হয়ে পড়ে। একজন শেষ অবধি প্রশ্ন করে ফেলে—হিন্দু, না মুসলমান ?

আগে তুমি কও। অপর লোকটি জবাব দেয়।

পরিচয়কে স্বীকার করতে উভয়েই নারাজ। সন্দেহের দোলায় তাদের মন দুলছে।··· প্রথম প্রশ্নটা চাপা পড়ে, অন্য কথা আসে। একজন জিজ্ঞেস করে—বাড়ি কোন্ খানে ?

—বুড়িগঙ্গার হেইপারে—সুবইডায়। তোমার ?

—চাষাড়া—নারাইণগঞ্জের কাছে।···কী কাম কর ?

—নাও আছে আমার, না'য়ের মাঝি।—তুমি ?

—নারাইণগঞ্জের সুতাকলে কাম করি।

আবার চুপচাপ। অলক্ষ্যে অন্ধকারের মধ্যে দু'জনে দু'জনের চেহারাটা দেখবার চেষ্টা করে। চেষ্টা করে উভয়ের পোশাক-পরিচ্ছদটা খুঁটিয়ে দেখতে। অন্ধকার আর ডাস্টবিনটার আড়াল সেদিক থেকে অসুবিধা ঘটিয়েছে।···হঠাৎ কাছাকাছি কোথায় একটা শোরগোল ওঠে। শোনা যায় দুপক্ষেরই উন্মত্ত কণ্ঠের ধ্বনি। সুতাকলের মজুর আর নাওয়ের মাঝি দু'জনেই সন্ত্রস্ত হয়ে একটু নড়েচড়ে ওঠে।

—ধারে-কাছেই ধ্যান লাগছে। সুতা-মজুরের কণ্ঠে আতঙ্ক ফুটে উঠল।

—হ, চল এইখান থেইক্যা উইঠা যাই। মাঝিও বলে উঠল অনুরূপ কণ্ঠে।

সুতা-মজুর বাধা দিল : আরে না না—উইঠো না। জানটারে দিবা নাকি ?

মাঝির মন আবার সন্দেহে দুলে উঠল। লোকটার কোনো বদ অভিপ্রায় নেই তো। সুতা-মজুরের চোখের দিকে তাকাল সে। সুতা-মজুরও তাকিয়েছিল, চোখে চোখ পড়তেই বলল—বইয়ো। যেমুন বইয়া রইছ—সেই রকমই থাক।

মাঝির মনটা ছাঁৎ করে উঠল সুতা-মজুরের কথায়। লোকটা কি তাহলে তাকে যেতে দেবে না নাকি। তার সারা চোখে সন্দেহ আবার ঘনিয়ে এলো। জিজ্ঞেস করল—ক্যান্ ?

—ক্যান্ ? সুতা-মজুরের চাপা গলায় বেজে উঠল—ক্যান্ কি, মরতে যাইবা নাকি তুমি ?

কথা বলার ভঙ্গিটা মাঝির ভালো ঠেকল না। সম্ভব-অসম্ভব নানারকম ভেবে সে মনে মনে দৃঢ় হয়ে উঠল।—যামু না কি এই আন্দাইরা গলির ভিতরে পইড়া থাকুম নাকি ?

লোকটার জেদ দেখে সুতা-মজুরের গলায়ও ফুটে উঠল সন্দেহ। বলল—তোমার মতলবডা তো ভালো মনে হইতেছে না। কোন্ জাতির লোক তুমি কইলা না, শেষে তোমাগো দলবল যদি ডাইকা লইয়া আহ আমারে মারণের লেইগা ?

—এইটা কেমুন কথা কও তুমি ? স্থান-কাল ভুলে রাগে-দুঃখে মাঝি প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে।

—ভালো কথাই কইছি ভাই ; বইয়ো, মানুষের মন বোঝ না ?

সুতা-মজুরের গলায় যেন কী ছিল, মাঝি একটু আশ্বস্ত হলো শুনে।

—তুমি চইলা গেলে আমি একলা থাকুম নাকি?

শোরগোলটা মিলিয়ে গেল দূরে। আবার মৃত্যুর মতো নিস্তব্ধ হয়ে আসে সব—মুহূর্তগুলিও কাটে যেন মৃত্যুর প্রতীক্ষার মতো। অন্ধকারে গলির মধ্যে ডাস্টবিনের দুই পাশে দুটি প্রাণী ভাবে নিজেদের বিপদের কথা, ঘরের কথা, মা-বউ ছেলেমেয়েদের কথা…তাদের কাছে কি আর তারা প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে, না তারাই থাকবে বেঁচে—কথা নেই, বার্তা নেই, হঠাৎ কোত্থেকে বজ্রপাতের মতো নেমে এল দাঙ্গা। এই হাটে-বাজারে-দোকানে এত হাসাহাসি, কথা কওয়াকওয়ি—আবার মুহূর্ত পরেই মারামারি, কাটাকাটি—একেবারে রক্তগঙ্গা বইয়ে দিল সব। এমনভাবে মানুষ নির্মম নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে কী করে? কি অভিশপ্ত জাত! সুতা-মজুর একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে। দেখাদেখি মাঝিরও একটা নিশ্বাস পড়ে।

—বিড়ি খাইবা? সুতা-মজুর পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে বাড়িয়ে দিল মাঝির দিকে। মাঝি বিড়িটা নিয়ে অভ্যাসমতো দু'একবার টিপে, কানের কাছে বার কয়েক ঘুরিয়ে চেপে ধরল ঠোঁটের ফাঁকে। সুতা-মজুর তখন দেশলাই জ্বালবার চেষ্টা করছে। আগে লক্ষ্য করে নি জামাটা কখন ভিজে গেছে। দেশলাইটাও গেছে সেঁতিয়ে। বার কয়েক খস্‌খস্‌ শব্দের মধ্যে শুধু এক-আধটা নীলচে ঝিলিক দিয়ে উঠল। বারুদ-ঝরা কাঠিটা ফেলে দিল বিরক্ত হয়ে।

—হালার ম্যাচবাতিও গেছে সেঁতাইয়া। —আর একটা কাঠি বের করল সে।

মাঝি যেন খানিকটা অসবুর হয়েই উঠে এলো সুতা-মজুরের পাশে।

—আরে জ্বলব জ্বলব, দেও দেহি নি—আমার কাছে দেও। সুতা-মজুরের হাত থেকে দেশলাইটা সে প্রায় ছিনিয়েই নিল। দু'একবার খস্‌খস্‌ করে সত্যিই সে জ্বালিয়ে ফেলল একটা কাঠি।

—সোহান্‌ আল্লা! —নেও নেও—ধরাও তাড়াতাড়ি।…ভূত দেখার মতো চমকে উঠল সুতা-মজুর। টেপা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পড়ে গেল বিড়িটা।

—তুমি…?

একটা হালকা বাতাস এসে যেন ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল কাঠিটা। অন্ধকারের মধ্যে দু'জোড়া চোখ অবিশ্বাসে উত্তেজনায় আবার বড়বড় হয়ে উঠল। কয়েকটা নিস্তব্ধ পল কাটে।

মাঝি চট্‌ করে উঠে দাঁড়াল। বলল—হ আমি মোছলমান।—কী হইছে?

সুতা-মজুর ভয়ে ভয়ে জবাব দিল—কিছু হয় নাই, কিন্তু…

মাঝির বগলের পুঁটুলিটা দেখিয়ে বলল, ওইটার মধ্যে কী আছে?

—পোলা-মাইয়ার লেইগা দুইটা জামা আর একখান শাড়ি। কাইল আমাগো ঈদের পরব জানো?

—আর কিছু নাই তো! —সুতা-মজুরের অবিশ্বাস দূর হতে চায় না।

—মিথ্যা কথা কইতেছি নাকি? বিশ্বাস না হয় দেখ। —পুঁটুলিটা বাড়িয়ে দিল সে সুতা-মজুরের দিকে।

—আরে না না ভাই, দেখুম আর কী। তবে দিনকালটা দেখছ তো? বিশ্বাস করন

যায়—তুমিই কও ?

—হেই ত' হক্ কথাই। ভাই—তুমি কিছু রাখ-টাখ নাই তো ?

—ভগবানের কিরা কইরা কইতে পারি একটা সুঁইও নাই। পরানটা লইয়া অখন ঘরের পোলা ঘরে ফিরা যাইতে পারলে হয়। সুতা-মজুর তার জামা-কাপড় নেড়েচেড়ে দেখায়।

আবার দু'জনে বসল পাশাপাশি। বিড়ি ধরিয়ে নীরবে বেশ মনোযোগ-সহকারে দু'জনে ধূমপান করল খানিকক্ষণ।

—আইচ্ছা··· মাঝি এমনভাবে কথা বলে যেন সে তার কোনো আত্মীয়-বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে।

—আইচ্ছা—আমারে কইতে পার নি—এই মাই'র দ'ইর কাটাকুটি কিয়ের লেইগা ?

সুতা-মজুর খবরের কাগজের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখে, খবরাখবর সে জানে কিছু। বেশ একটু উষ্ণকণ্ঠেই জবাব দিল সে—দোষ ত' তোমাগো ওই লীগওয়ালোগোই। তারাই তো লাগাইছে হেই কিয়ের সংগ্রামের নাম কইরা।

মাঝি একটু কটূক্তি করে উঠল—হেই সব আমি বুঝি না। আমি জিগাই মারামারি কইরা হইব কী। তোমাগো দু'গা লোক মরব, আমাগো দু'গা মরব। তাতে দ্যাশের কী উপকারটা হইব ?

—আরে আমিও তো হেই কথাই কই। হইব আর কী, হইব আমার এই কলাটা— হাতের বুড়ো আঙুল দেখায় সে। —তুমি মরবা, আমি মরুম, আর আমাগো পোলামাইয়াগুলি ভিক্ষা কইরা বেড়াইব। এই গেল-সনের 'রায়টে' আমার ভগ্নিপতিরে কাইটা চাইর টুকরা কইরা মারল। ফলে বইন হইল বিধবা আর তার পোলামাইয়ারা আইয়া পড়ল আমার ঘাড়ের উপুর। কই কি আর সাধে, ন্যাতারা হেই সাততলার উপুড় পায়ের উপুড় পা দিয়া হুকুম জারী কইরা বইয়া রইল আর হালার মরতে মরলাম আমরাই।

—মানুষ না, আমরা য্যান কুত্তার বাচ্চা হইয়া গেছি ; নাইলে এমুন কামড়া-কামড়িটা লাগে কেমূবায় ? —নিষ্ফল ক্রোধে মাঝি দু'হাত দিয়ে হাঁটু দু'টোকে জড়িয়ে ধরে !

—হ।

—আমাগো কথা ভাবে কেডা ? এই যে দাঙ্গা বাধল—অখন দানা জুটাইব কোন্ সুমুন্দি ; নাওটারে কি আর ফিরা পামু ? বাদামতলির ঘাটে কোন্ অতলে ডুবাইয়া দিছে তারে—তার ঠিক কি ? জমিদার রূপবাবুর বাড়ির নায়েবমশয় পিত্যেক মাসে একবার কইরা আমার নায়ে যাইত নইরার চরে কাছারি করতে। বাবুর হাত য্যান্ হজরতের হাত, বখশিশ দিত পাঁচ, নায়ের কেরায়া দিত পাঁচ, একুনে দশটা টাকা। তাই আমার মাসের খোরাক জুটাইত হেই বাবু। আর কি হিন্দুবাবু আইব আমার নায়ে।

সুতা-মজুর কী বলতে গিয়ে থেমে গেল। একসঙ্গে অনেকগুলি ভারি বুটের শব্দ শোনা যায়। শব্দটা যেন বড় রাস্তা থেকে গলির অন্দরের দিকেই এগিয়ে আসছে সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই। শঙ্কিত জিজ্ঞাসা নিয়ে উভয়ে চোখাচোখি করে।

—কী করবো ? মাঝি তাড়াতাড়ি পুঁটলিটাকে বগলদাবা করে।
—চল পলাই। কিন্তুক যামু কোন্‌দিকে ? শহরের রাস্তাঘাট তো ভালো চিনি না।
মাঝি বলল, চল যেদিকে হউক। মিছামিছি পুলিশের মাইর খামু না ;—ওই ঢ্যামনাগো বিশ্বাস নাই।
—হ। ঠিক কথাই কইছ। কোন্‌দিকে যাইবা কও—আইয়া তো পড়ল।
—এই দিকে।—
গলিটার যে মুখটা দক্ষিণ দিকে চলে গেছে সেদিকে পথনির্দেশ করল মাঝি। বলল, চল, কোনো গতিকে একবার যদি বাদামতলি ঘাটে গিয়া উঠতে পারি—তাইলে আর ডর নাই।
মাথা নিচু করে মোড়টা পেরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে তারা ছুটল, সোজা এসে উঠল একেবারে পাটুয়াটুলি রোডে। নিস্তব্ধ রাস্তা ইলেকট্রিকের আলোয় ফুট্‌ফুট্‌ করছে। দুইজনেই একবার থম্‌কে দাঁড়াল—ঘাপ্‌টি মেরে নেই তো কেউ ? কিন্তু দেরি করারও উপায় নেই। রাস্তার এমোড়-ওমোড় একবার দেখে নিয়ে ছুটল সোজা পশ্চিম দিকে। খানিকটা এগিয়ে এমন সময় তাদের পিছনে শব্দ উঠল ঘোড়ার খুরের। তাকিয়ে দেখল—অনেকটা দূরে একজন অশ্বারোহী এদিকেই আসছে। ভাববার সময় নেই। বাঁ-পাশে মেথর যাতায়াতের সরু গলির মধ্যে আত্মগোপন করল তারা। একটু পরেই ইংরেজ অশ্বারোহী রিভলবার হাতে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল তাদের বুকের মধ্যে অশ্ব-খুরধ্বনি তুলে দিয়ে। শব্দ যখন চলে গেল অনেক দূরে, উঁকি-ঝুঁকি মারতে মারতে আবার তারা বেরুল।
—কিনারে কিনারে চল। সুতা-মজুর বলে।
রাস্তার ধার ঘেঁষে সন্ত্রস্ত দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলে তারা।
—খাড়াও।—মাঝি চাপা-গলায় বলে। সুতা-মজুর চমকে থম্‌কে দাঁড়ায়।
—কী হইল ?
—এদিকে আইয়ো—সুতা-মজুরের হাত ধরে মাঝি তাকে একটা পানবিড়ির দোকানের আড়ালে নিয়ে গেল।
—হেদিকে দেখ।
মাঝির সংকেত মতো সামনের দিকে তাকিয়ে সুতা-মজুর দেখল প্রায় একশো গজ দূরে একটা ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরের সংলগ্ন উঁচু বারান্দায় দশ-বারোজন বন্দুকধারী পুলিশ স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে আছে, আর তাদের সামনে ইংরেজ অফিসার কি যেন বলছে অনর্গল পাইপের ধোঁয়ার মধ্যে হাত মুখ নেড়ে। বারান্দার নিচে ঘোড়ার জিন্‌ ধরে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি পুলিশ। অশান্ত চঞ্চল ঘোড়া কেবলি পা ঠুকছে মাটিতে।
মাঝি বলে—ওইটা ইস্‌লামপুর ফাঁড়ি। আর একটু আগাইয়া গেলে ফাঁড়ির কাছেই বাঁয়ের দিকে যে গলি গেছে হেই পথে যাইতে হইব আমাগো বাদামতলির ঘাট।
সুতা-মজুরের সমস্ত মুখ আতঙ্কে ভরে উঠল।—তবে ?
—তাই কইতাছি তুমি থাক, ঘাটে গিয়া তোমার বিশেষ কাম হইব না। মাঝি বলে,

এইটা হিন্দুগো আস্তানা আর ইসলামপুরে হইল মুসলমানগো। কাইল সকালে উইঠা বাড়িত্ যাইবা গা।

—আর তুমি?

—আমি যাইগা। মাঝির গলা উদ্বেগে আর আশংকায় ভেঙে পড়ে।—আমি পারুম না ভাই থাকতে। আইজ আটদিন ঘরের খবর জানি না। কী হইল না হইল আল্লাই জানে। কোনোরকম কইরা গলিতে ঢুকতে পারলেই হইল। নৌকা না পাই সাঁতরাইয়া পার হমু বুড়িগঙ্গা।

—আরে না না মিয়া কর কী? উৎকণ্ঠায় সুতা-মজুর মাঝির কামিজ চেপে ধরে।—কেমনে যাইবা তুমি, আঁ? আবেগ উত্তেজনায় মাঝির গলা কাঁপে।

—ধইরো না, ভাই, ছাইড়া দেও। বোঝ না তুমি কাইল ঈদ্, পোলামাইয়ারা সব আইজ চান্দ্ দেখ্ছে। কত আশা কইরা রইছে তারা নতুন জামা পিন্‌ব, বাপ্-জানের কোলে চড়ব। বিবি চোখের জলে বুক ভাসাইতেছে। পারুম না ভাই—পারুম না—মনটা কেমন কর্‌তাছে। মাঝির গলা ধরে আসে। সুতা-মজুরের বুকের মধ্যে টন্‌টন্ করে ওঠে। কামিজ ধরা হাতটা শিথিল হয়ে আসে।

—যদি তোমায় ধইরা ফেলায়?— ভয়ে আর অনুকম্পায় তার গলা ভরে ওঠে।

—পারব না ধরতে, ডরাইও না। এইখান থাইকা য্যান্ উইঠো না। যাই···ভুলুম না ভাই এই রাত্রের কথা। নসিবে থাকলে আবার তোমার লগে মোলাকাত হইব।

—আদাব।

—আমিও ভুলুম না ভাই—আদাব।

মাঝি চলে গেল পা টিপে টিপে।

সুতা-মজুর বুকভরা উদ্বেগ নিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। বুকের ধুক্‌ধুকুনি তার কিছুতে বন্ধ হতে চায় না। উৎকর্ণ হয়ে রইল সে, ভগবান্—মাজি য্যান্ বিপদে না পড়ে।

মুহূর্তগুলি কাটে রুদ্ধ-নিশ্বাসে। অনেকক্ষণ তো হলো, মাঝি বোধহয় এতক্ষণে চলে গেছে। আহা 'পোলামাইয়ার' কত আশা নতুন জামা পরবে, আনন্দ করে পরবে! বেচারা 'বাপজানের' পরান তো। সুতা-মজুর একটা নিশ্বাস ফেলে। সোহাগে আর কান্নায় বিবি ভেঙে পড়বে মিয়াসাহেবের বুকে।

'মরণের মুখ থেইকা তুমি বাঁইচা আইছ?'—সুতা-মজুরের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠল, আর মাঝি তখন কী করবে? মাঝি তখন—

—হল্ট্······

ধ্বক্ করে উঠল সুতা-মজুরের বুক। বুট পায়ে কারা যেন ছুটোছুটি করছে। কী যেন বলাবলি করছে চীৎকার করে।

—ডাকু ভাগ্‌তা হ্যায়।

সুতা-মজুর গলা বাড়িয়ে দেখল পুলিশ অফিসার রিভলবার হাতে রাস্তার উপর লাফিয়ে পড়ল। সমস্ত অঞ্চলটার নৈশ নিস্তব্ধতাকে কাঁপিয়ে দুবার গর্জে উঠল অফিসারের আগ্নেয়াস্ত্র।

গুড়ুম্, গুড়ুম্। দুটো নীল্‌চে আগুনের ঝিলিক। উত্তেজনায় সুতা-মজুর

হাতের একটা আঙুল কামড়ে ধরে। লাফ দিয়ে ঘোড়ায় উঠে অফিসার ছুটে গেল গলির ভিতর। ডাকুটার মরণ আর্তনাদ সে শুনতে পেয়েছে।

সুতা-মজুরের বিহ্বল চোখে ভেসে উঠল মাঝির বুকের রক্তে তার পোলামাইয়ার, তার বিবির জামা শাড়ি রাঙা হয়ে উঠেছে। মাঝি বলছে—পারলাম না ভাই। আমার ছাওয়ালরা আর বিবি চোখের পানিতে ভাসব পরবের দিনে। দুশমনরা আমারে যাইতে দিল না তাগো কাছে।



পসারিণী

সেই সময় সে এসে দাঁড়াল।

যখন চৈত্রের দুপুর ঝিমোচ্ছিল। যখন কলকাতা থেকে মাইল বারো দূরে উত্তরের এই স্টেশনটাও ঝিমোচ্ছিল এই দুপুরের মতোই। অবসন্ন, হাত পা এলিয়ে দেওয়া চোয়াল নাড়া, ল্যাজে মাছি না তাড়ানো অবসাদগ্রস্ত চোখ বোজা জানোয়ারের মতো।

যখন দক্ষিণের হাওয়াটা উঠছিল এলোমেলো হয়ে, আড় মাতলার মতো টিন্ শেডের কানায় ঘা খেয়ে হঠাৎ দমকা নিশ্বাসের মতো শব্দ তুলে যাচ্ছিল হারিয়ে।

যখন বড় গাছগুলির মাথা দুলছিল, স্টেশনে পুবের ঘন ঘন ঘাস কাঁপছিল আর আকাশ যেন উত্তাপের ভয়ে পাখা-মেলা চিলগুলিসহ হঠাৎ নেমে আসছিল খানিকটা। যখন স্টেশনটা, প্ল্যাটফর্মের ঘুমন্ত কুকুরটা হঠাৎ ঘাড় তুলে কিসের গন্ধ শুঁকছিল বাতাসে, কুলিটা উঁকি মেরে দেখছিল দূরের সিগন্যাল, স্টেশনমাস্টার নাকের ডগায় চশমা নিয়ে তাকিয়ে ঘুমোচ্ছিলেন আপিসে। যখন বয়স ও অবয়বহীন, ব্যাগ ও ছোটখাটো কাঠের বাক্স জড়ানো একটা মানুষের দলা স্তূপাকার দেহ-পিণ্ডের মতো পড়েছিল ওয়েটিংরুমের কোণে, ডাউন প্ল্যাটফর্মের লোহার বেড়ায় হেলান দিয়ে। পুবের ফোর্থ লাইনে অপেক্ষমান এঞ্জিনের কালো ধোঁয়ারাশি যখন ঝাঁপিয়ে পড়ছিল ওদের গায়।

তখন সে এলো। ধীরে এসে দাঁড়াল আপ প্ল্যাটফর্মের কিনারে। একবার দেখল উত্তরে আর একবার দক্ষিণে। তারপর পুবে ডাউন প্ল্যাটফর্মের ওই স্তূপাকার দেহপিণ্ডের দিকে। সেইদিকে সে তাকিয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত, একটু বেশী কৌতূহল নিয়ে।

চেহারা দেখে তার বয়স অনুমান করা কঠিন। হতে পারে আঠারো কিংবা বাইশ, নয়তো আরো দু-বছর বেশী। হতে পারে এমনও, সে পঞ্চদশী বা ষোড়শী। রোগা রোগা গড়ন, সেজন্যে একটু লম্বা মনে হয়। একটু লম্বা, যেন হঠাৎ ছোট একটা মেয়ে কিছুটা বেড়ে উঠেছে। মাজা মাজা রং ফিতাহীন এলো খোঁপায় রুক্ষ গোছাটা এত বড় যেন ওটার ভারে সে নুয়ে পড়েছে। দেহের সমস্ত গড়নটা যেন তার চুলেই কেন্দ্রীভূত। চোখ-মুখ বলার মতো কিছু না, অথচ একটা না-বলার শান্ত দৃঢ়তার ছাপ তার মুখে। হাতে-কাচা একটা মোটা নীল শাড়ি সাদাসিদেভাবে তার পরনে, গায়ে সাদা জামা। পায়ে রোদে জলে ধোয়া পোড়া মান্ধাতার আমলের স্যাণ্ডেল। কাঁধে একটা ছিটের ব্যাগ। ব্যাগটা নতুন। হাতে গোটা কয়েক কাচের চুড়ি। নাম তার পুষ্প—পুষ্পবালা। পুষ্পর চোখগুলি বড় বড়, কিন্তু করুণ। তাকে

দেখলেই মনে হয় যেন, অনেক ঝড়-ঝঞ্ঝা দুর্যোগের রাত্রি পেরিয়ে একটু গোছগাছ করে এসে দাঁড়িয়েছে প্রসন্ন সকালে। দাঁড়িয়েছে আশা ও সংশয় নিয়ে।

ওভারব্রীজের উপর দিয়ে সে এলো ডাউন প্ল্যাটফর্মে। এসে বসল একটা বেঞ্চিতে। বেঞ্চিটার দু-তিন হাত দূরেই, একটা মাল-ঠেলা ট্রলির উপর গায়ে গায়ে লেপটে পড়েছিল সেই মানুষগুলি। ট্রলির নিচেও দু-একজন। কয়েকজন রেলিঙে হেলান দিয়ে রয়েছে। কোলে বগলে কাঁধে তাদের ব্যাগ, বয়াম, কাঠ অথবা টিনের ছোট বাক্স। মনে হচ্ছিল, সব মিলিয়ে দেহস্তূপটা নিশ্চল, নিঃশব্দ।

কিন্তু তা নয়। লক্ষ্য করলে দেখা যায়, স্তূপটা নড়ছে। কান পাতলে শোনা যায় চাকের মৌমাছির মতো একটা চাপা গুঞ্জন। একটা গোঙানি।

পুষ্প দেখল সেদিকে আড়চোখে, বসল অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে। কান পেতে রইল ওই গোঙানি স্বরের মধ্যে যেন কোনো গোপন কথা শুনছে, এমনি কৌতূহল তার বড় বড় চোখ দুটিতে। কোলের উপর টেনে দু-হাতে জড়িয়ে ধরল ব্যাগটা।

মনে হচ্ছিল গোঙানি। গোঙানি নয়, কথা। পুষ্পর পুরনো স্যাণ্ডেলের খসখসানিতে কথাটা থামল। তারপর, চাপাস্বরে কেউ বললে—যেন পুষ্প শুনতে না পায়, কে রে বাইরন ওয়াটার?

কিন্তু একাগ্রভাবে কান পাতায় শুনতে পেল পুষ্প। কিন্তু বাইরন? এমন নাম শোনে নি জীবনে। তারপরের সব নামগুলিই আরও অদ্ভুত। বোধহয় বাইরনেরই গলা শোনা গেল, একটা মেয়ে।

আইবুড়ো?

বোঝা যাচ্ছে না।

কে রে নিমের মাজন?

সম্ভবত জবাব দিল নিমের মাজন, কি জানি। ভিকস্‌কে জিজ্ঞেস কর। ওসব বোঝে ও।

ভিকস্ বলল, কেন বাবা মরটন্‌কে জিজ্ঞেস করো না, বিক্রি বেশী, মানুষ চেনে।

মরটন বলল, তোদের যেমন শালা কথা। আজকাল আইবুড়ো আর নাইবুড়ো বোঝা যায়?

তবে ভদ্দরলোক বলে মনে হচ্ছে।

আবার প্রথম গলাটাই শোনা গেল, এই জন্যেই তো বলছিলাম। দ্যাখ না, দু-পয়সার মাল যদি বিকোয় দুপুরের ঝোঁকে। কই রে দার্জিলিঙের নেবু।

বোধহয় এবার জবাব দিল লেবুই। লেবু খাওয়ার মতো চেহারা মনে হচ্ছে না—তারপর যা বলছিলি তার কী হলো বল্।

ঢিপঢিপ করছিল পুষ্পর বুকের মধ্যে। এত জোরে ঢিপঢিপ করছিল যে, বুকের কাছে আঁচলটা কষে টেনে দিতে হলো তাকে। চোখে ত্রাসের ছায়া।

তবু কৌতূহল, আর তার মাজা মাজা মুখে হাসি লজ্জা ও ভয়ের মিলিত বিচিত্র ছাপ পড়ল।

আবার একটা ভাঙা ও চাপা উৎসুক গলা শোনা গেল, তারপর কী হলো হরেন, থুড়ি, পারিজ সুইট? সুইটি না কি?

জবাবে আবার সেই গোঙানিটা শোনা গেল, তারপর আবার কী, ম্যাট্রিকটা পাস করে ফেললুম। মেদিনীপুর কলেজে ভর্তিও হয়েছিলাম মাইরি। কেঁচে গেল।

কী করে ?

যেমনি করে কেঁচে যায়। পয়সা নেই। বাবা বললে, খুব হয়েছে। এবার একটা চাকরি-বাকরি দেখে নিগে যা। ম্যাট্রিক পাস হয়েছিস, বংশে এই প্রথম। আবার কী। শা—লা।···

শালা কেন ?

কে দেবে চাকরি। ভিকস্‌ও তো ম্যাট্রিক পাস করেছে। কিরে কেষ্ট, বল্‌ না তোর চাকরির কথা।

ভিকস্‌ ভেংচে উঠল, আবার কেষ্ট কেন, ভিকস্‌ বলা যায় না ? ম্যাট্রিক পাস আবার কিসের ? সে তো করেছিল কেষ্ট রায়। মরে ভূত হয়ে গেছে কবে। এখন ভিকস্‌। সর্দি, কাশি, মাথা ধরা···এই চাপাস্বরের গোঙানির মধ্যেই সমবেত গলার একটা হাসি বেরিয়ে আসবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু চাপা পড়ে গেল। যেন পোড়োবাড়ির রুদ্ধ অন্দরে দমকা হাওয়া পাক খেয়ে মুখ গুঁজে হারিয়ে গেল।

আবার, হ্যাঁ ওই যে কালি বিক্কিরি করে চশমাওয়ালা ছোঁড়াটা, ও নাকি গেজেট।

কে, দার্জিলিঙের নেবু বুঝি ? গেজেট কি রে শালা। বল্‌ গ্রাজুয়েট।

দার্জিলিঙের লেবু তাতে লজ্জা পেল না। বলল, কি জানি। মুখে না এলে, জিভটা তো আর আঙুল দিয়ে নাড়া যায় না।

পাগল। কিন্তু আসামের লেবু তো দার্জিলিঙের ঠিক বলতে পারিস্‌ ?

হ্যালহেলে গলায় হেসে জবাব দিল, তো ব্যাওসা চলাতে হলে···। যা বলছিলুম, গেজেটও শালা হকারি করে ? আর কী রকম ভদ্দরলোক দেখেছিস ছোঁড়াটাকে। নির্ঘাত কেটে পড়বে একদিন।···

কথাগুলি যেন গিলছিল পুষ্প। সে বসেছিল পশ্চিমদিকে মুখ করে। কিন্তু চোখে তার ওদেরই কথার ছায়া। সব মিলিয়ে তার শিশুর মতো মুখে কৌতূহল ও চাপা হাসির আলো পড়ে দুষ্টু মেয়ের ভাব হয়ে উঠেছে।

আবার একটা নতুন গলা শোনা গেল, আমিও শালা কেলাস এইট অব্দি পড়েছিলাম।

মাইরি ?

কেন, বিশ্বাস হয় না বুঝি ?

না, বলি কোন্‌ ইস্কুলে ?

কেন, ঢাকা শহরের হাইস্কুলে ?

বটে ? তোরা তো আবার বিক্রমপুরের জমিদার ছিলি, না।

চিবিয়ে চিবিয়ে বলল আর একজন, হ্যাঁ জমিদার। এখন চানাচুরদার হয়েছে।

আবার একটা চাপা হাসি ও রুদ্ধ গলার গুঞ্জন উঠল। চানাচুরদারই বলে উঠল, আমি জমিদার ছিলাম, না, আমার মেসোমশায় ?

ও-ই হলো। মায়ের বোনের বর তো ? আ হা হা উঠছিস কোথায় ?

না হয় শালা এইট অব্দিই পড়েছিস্। হলো তো? বোস্ এখন।
আর একটা নতুন গলা, আমি তো শালা জীবনে বই ছুঁইনি।
আমিও না।
আমি তো বই দেখলে কেটেই পড়ি শালা।
আর মেয়ে দেখলে জমে যাস।
আবার হাসি। তারপর শান্ত গম্ভীর গলায় একজন বলল, থাম থাম!
হরেন, তারপর?
হরেন বলল, তারপর আবার কী? বিয়াল্লিশে দেশ স্বাধীন করতে গেলুম। গুলি খেয়ে ঠ্যাংটা গেল। তারপর লাঠি বগলে দিয়ে নরক ঘুরতে ঘুরতে এই ট্রেনের হকারি। ক্ষণিক নিঃশব্দ। শুধু ফোর্থ লাইনের বেকার এঞ্জিনটার সোঁ সোঁ।
তারপর আবার, মাইরি, আমাকে আবার লোকে গলায় মালা দিয়েছিল, যখন হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছিলুম। আর এ লাইনের পুরনো হকাররা প্রথম প্রথম পাছায় লাথি মারত।
পুষ্পর শান্ত মুখের হাসিটুকু হঠাৎ উধাও হলো। ব্যাকুল অথচ চাপা ব্যথায় ভরে উঠল মুখটা। ফিরে তাকাতে গিয়েও পারল না। শুধু কাত হয়ে পড়ল তার মাথার চেয়ে বড় খোঁপাটা।
কে আর একজন বলল, আমার বৌটা মরে গেল তাই। নইলে—
একটা বিদ্রূপাত্মক কাঁচ গলায় শোনা গেল, আমার তো বাপ মা সবই মরে গেল দাঙ্গায়।
বৌ গেলে বৌ হয়। বাপ মা—
আমার গ্লাস ফ্যাক্টরির চাকরিটা খেয়ে নিল শালা পালবাবু।
হঠাৎ সমস্ত দেহস্তূপটা থেকে অভাব, অভিযোগ, ব্যথা, ব্যর্থতার ক্রুদ্ধ একটা মিলিত গুঞ্জন উঠতে লাগল: যেন একনাগাড়ে উড়ে চলেছে এঞ্জিনের কালো ধোঁয়া। তারা কেউ বাপ-মা বৌ হারিয়েছে, জমি-ছাড়া হয়েছে, ছাঁটাই হয়েছে কারখানা থেকে, বিতাড়িত হয়েছে ঘর থেকে। কাউকে খাওয়াতে হয় গাদা গাদা পোষ্যদের, যোগাতে হয়, নয়তো স্রেফ শালা সিনেমা আর নেশা, মাইরি।
পুষ্পর চাপা বুকটার মধ্যে কী যেন কলরব করে উঠল ওদের মতো। চুপি চুপি ফিসফিস করে আর্তনাদ করে উঠল, তার বুকের মধ্যে; বুড়ি মা, ছোট ছোট ভাই-বোন, অনাহার, পীড়ন, অপমান। বিয়ে, বর, ঘর ও শান্তির স্বপ্ন! একটু ভালবাসা, এক ছিটে সোহাগ…
একটা তীব্র বিদ্রূপের হাসি চমকে দিল চৈত্রের দুপুরের ঝিম-ধরা স্টেশনটাকে। যেন গলা টিপে ধরল সমবেত গোঙানি-ঘরটা। চাপা পড়ে গেল এঞ্জিনের সোঁ সোঁ শব্দ। তারপর শোনা গেল হাসির চেয়েও তীব্র শ্লেষভরা কথা, এই, এই হয়েছে। সব ব্যাটার সর্দি ধরে গেছে। লাও, ভিকস্।
ভিকস্ দোস্ত, ভিকস্। সর্দি, কাশি, মাথা ধরা।
আর একজন, আই কিওর, আই কিওর। লাগাও চোখের জল আর পড়বে না, মাইরি বলছি।

আবার সাড়া পড়ল হাসির। আটকে-পড়া ঘূর্ণি জলের আবর্ত ছাড়া পেল। এবার কড়া হাসি চড়ল আরও। নিরাশার পাগলা হাওয়া সঙ্গী পেল অনেকগুলি।

আশ্চর্য! পুষ্পর চাপা-পড়া অস্থির বুকটাতেও হুস্ করে হাওয়া লাগল একটু। সে শান্ত হলো, বিপথ থেকে পথে ফিরল হৃদয়। একটু হাসিও যেন দেখা দিল চোখে। খুলে পড়েছিল শুধু চুলের গোছাটা। সেটাকে বাঁধল আবার টেনে। কী-যে চুল!

দূর থেকে ভেসে এলো ট্রেনের হুইশল্। মাল-ঠেলা ট্রলিটা খালি করে ভেঙে গেল দেহস্তূপটা। যেন চাকের মৌমাছি সব খালি করে ছড়িয়ে পড়ল।

প্রথমে ক্লাচ ঠুকে ঠুকে এলো হরেন, পারিজ সুইট। একটা বুক-খোলা, গায়ে-ছোট জামা আর সরু পাজামা। দূরে তাকিয়ে দেখল গাড়ি, তারপরে মহিলা প্যাসেঞ্জারের চেহারাটা অর্থাৎ পুষ্পকে। যদি দুটো লজেন্স কাটে। কিন্তু না, কোনো আশা নেই। চোখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আঁচল গড়েরমাঠ। কেবল তার খোঁড়া চেহারাটার দিকেই মেয়েটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে। যেন জীবনে আর খোঁড়া দেখে নি কোনো-দিন। নেহাত ভদ্রলোকের মেয়ে।

চোখাচোখি হতেই দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল পুষ্প। তারপর আর একজন। একজন একজন করে সবাই দেখল মাত্র একটি প্যাসেঞ্জারকে। বায়রন ওয়াটার, ভিকস্, মরটন, চানাচুর, পানবিড়ি, ফাউণ্টেন পেন…সকলে। এই দুপুরের ঝোঁকে যখন অনেক দেরিতে দেরিতে আসে ফাঁকা গাড়ি, তখন ছুটকো খদ্দেরকে তারা এমনি শিকারী বাজপাখির মতো দেখে তাকিয়ে তাকিয়ে। কিন্তু মস্ত চুপড়ির মতো খোঁপাওয়ালা মেয়েটা যে কিছু কিনবে, এমন আশা হলো না তাদের।

ইতিমধ্যে এলো আরও দু-একজন প্যাসেঞ্জার। এলো গাড়ি। দুপুরের লোকাল ট্রেন। অধিকাংশ দরজাগুলি খোলা, কামরাগুলি ফাঁকা। ভিখিরী অন্ধ আর খঞ্জরাই মাত্র যাত্রী। পড়ে পড়ে ঘুম দিচ্ছে দেদার। সাধারণ যাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। তারাও ঝিমুচ্ছে, ঘুমোচ্ছে, বিড়ি ফুঁকছে। কেউ বই পড়ছে নয়তো গান ধরেছে গুনগুন করে। এর মধ্যেই কোনো কামরা থেকে ভেসে আসছে একঘেয়ে গল্প, 'অন্ধ হয়ে ভাই কত দুঃখ পাই…।' সে নিশ্চয় খাঁটি অন্ধ। নইলে চেঁচাত না ফাঁকা গাড়িতে। আর কামরায় কামরায় হকারদের চিৎকার নেই, দলে দলে গুলতানি চলছে।

কে একজন চিৎকার করে বলল, কই রে, প্রগতিশীল কাগজ-বিক্রেতা বসে রইলি যে?

জবাব এলো, প্যাসেঞ্জারই নেই, কী হবে এখন গিয়ে?

প্যাসেঞ্জার কি আকাশ থেকে পড়বে? ছুটির সময় হলো, শিয়ালদা চল্। চল্ যাই।

প্রত্যেকটি কথা কান পেতে শুনল পুষ্প। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল প্রত্যেকটি হকারের চেহারা। প্রত্যেকের চলা বলা হাসি, তাদের কথার ভঙ্গি। তারপর দ্বিধাজড়িত পায়ে এগিয়ে একটা কামরার হাতল ধরল। ধরে উঠবে গাড়িতে, তেমন শক্তিটুকুও যেন নেই হাতে। এখান থেকে শিয়ালদা, মাত্র বারো মাইল যার দূরত্ব। তবু সে

যেন কতদূরে। কত দুঃসাহসের যাত্রা। বুকের মধ্যে ভয়ের ধুক-পুকুনি, ধড়-ফড়ানি। আর এই মানুষগুলি উস্কখুস্ক চুল, এবড়ো-খেবড়ো মুখ, ছেঁড়া ময়লা জামা। কাঁধে বগলে যাদের চলন্ত দোকান, ছুটন্ত ট্রেনের সংকীর্ণ পাদানির বিপজ্জনক পথে পথে চলেছে ছুটে। এত শক্তি কোথায় পুষ্পর দেহে।

কিন্তু সময় নেই ভাববার। বাঁশি বাজাল গার্ড। বাঁশি বাজল গাড়ির। তারপর কয়েক মুহূর্তের থেমে যাওয়া চাকাগুলি একটা তীব্র আর্তনাদ করে এগিয়ে চলল। যেন পুষ্পর সমস্ত সংশয় ও ভয়ের দাঁড়িটাকে ছিঁড়ে দিয়ে টেনে নিয়ে গেল তাকে শব্দটা। স্টেশনটা আবার ঝিমুতে লাগল পেছনে।

যেতেই হবে। এই পথের যাত্রী ছাড়া জীবনে আর কোনো যাত্রা নেই। জীবনের সমস্ত যাত্রা আজ ঠেলে দিয়েছে এই পথে। মানুষের জীবনে তার পেছনটা শুধু ঝিমোয়, এই ফেলে-আসা স্টেশনটার মতো। পুষ্পর পেছনটা কেবলি তাড়া করে। কখনো দারুণ অভাবের বেশে, অপমানের বেশে। কখনো ঘৃণ্য লোভের মূর্তিতে, দুরন্ত কান্নার বন্যায়।

সুদীর্ঘ, বিরলযাত্রী কামরার এক কোণে জড়োসড়ো হয়ে বসল পুষ্প। খোলা দরজা দিয়ে দুর্বার হাওয়া এসে বিস্রস্ত করে দিল তার শাড়ির আঁচল আর চুলের গোছা। দু-হাতে ব্যাগটি বুকের কাছে নিয়ে নিশ্চল হয়ে তবু বসে রইল পুষ্প। পুষ্পবালা, ঢাকা জেলার কাছে বজ্রহাটের নিরাপদ মাস্টারের মেয়ে। তবু তার বুক চাপা ভয়ের পাথর, ব্যাকুল সংশয়। সে পারবে কী? পারবে তো?

চোখের উপর ভেসে উঠল বিধবা মায়ের মুখ। সে মুখ মেয়ের প্রতি নির্দয়, অথচ মমতাময়ী। সেই মুখটি চোখে ভাসল আর মন বলল, পারব। অপোগণ্ড ভাই-বোনগুলির মুখ মনে পড়ল, আর বলল, পারব। তার নিজের ক্ষুধাকাতর পুষ্ট ও অপুষ্টতায় মেশা এই দেহ ও মন দাঁড়াল তার সামনে, মন বলল, পারব পারব। তার এই সুদীর্ঘ চুলের গোছা যতই এলোমেলো হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, ঝাপটা মারতে লাগল, ততই তার শিরদাঁড়া থেকে পায়ের দিকে একটা অদৃশ্য শক্তি নুয়ে-পড়া দেহটাকে সোজা করে দিয়ে ছুটে এলো পারব পারব বলে।

ওই তো কয়েকজন যাত্রী আবার বিস্ময়ে তাকিয়ে আছে তার অতিকায় চুলের দিকে। চুলের ওইটুকুই তার রূপ। তার সুখ দুঃখ অপমান। বাবা বলত আদর করে, 'আমার এলোকেশী'। এই চুল একদিন আদর দিয়েছে, সোহাগ কেড়েছে। হাতিয়ে সুখ, আঁচড়ে দিয়ে সুখ, বেঁধে দিয়ে আনন্দ। অনেক সঙ্গিনী শুধু খেলার জন্যে দশটা করে বিনুনি বেঁধে দিয়েছে, শিবের মতো দিয়েছে জড়িয়ে। আজও এ চুল মন টানে, চোখ টানে। আর পুষ্প ভাবে, এ চুল গলায় বেঁধে ঝোলা যায় না কড়িকাঠে? এ-চুলে একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে দিলে দরকার হবে না চিতার কাঠ সাজানোর।

তবু তো এ চুল মুড়িয়ে দিতে হাত উঠেও ওঠে নি। আগুন জ্বালাতে নিভে গেছে দীপশলাকা। প্রাণটাকে টিপে শেষ করতে গিয়েও থাবা গুটিয়ে এসেছে আপনি। মৃত্যু যে বাসা বাঁধে নি মনের কোথাও। সে তাকে ঠেলে দিয়েছে এই পথে। সে পারবে না কেন?

এই গরমের দুপুরবেলা যখন আপনার গলা শুকিয়ে আসছে। কিশোর গলা শুনে চমকে উঠল পুষ্প। দেখল একটা ছেলে, কামরার মাঝখানে দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব পরিষ্কার স্বরে চিৎকার করছে। যখন আপনার ঘুম আসছে আর শরীরটা ভার লাগছে, তখন মুখে পুরে দিন এক শ্লাইজ মরটনের টকামিষ্টি লজেন্স। মুখ ভরে উঠবে রসে, নতুন এনার্জি আপনাকে ফ্রেশ করে তুলবে, না হলে পয়সা ফেরত। এক শ্লাইজ দু-পয়সা, দু শ্লাইজ চার পয়সা, ছ-শ্লাইজ দশ পয়সা। বলুন কোন্ দাদাকে দেব, বলে ফেলুন।

কিন্তু যাত্রীরা নির্বিকার। কেউ এক-আধবার তাকিয়ে দেখল, শুনল কেউ কেউ, ঝিমোতে লাগল অধিকাংশ। দুপুরের যাত্রী, ছাত্র-কেরানীর ভিড় নেই। খুচরো ব্যবসাদার, বেকার, উমেদার আর ভিড়ের ভিড়।

এই যে, এখানে একটা দাও।

ছেলেটা ফিরে তাকাল আর হাসির রোল পড়ল একটা। আর একজন মরটন লজেন্সেরই হকার তাকে ডাকছে। বলল, দে না একটা, কেউ তো নেবে না, আমিই নিই।

দেখা গেল, মরটন, প্যারিজ, বায়রন, প্রগতিশীল কাগজ, ফাউন্টেনপেন, চানাচুর, সব একসঙ্গে ঠাঁই নিয়েছে কামরার এক কোণে।

ছেলেটাও হাসল। তবু বলল, বলুন, আর কারো চাই। শুধু শুধু ঝিমুবেন না, তেষ্টায় কষ্ট পাবেন না। এক শ্লাইজ আধঘণ্টা আপনার গালে থাকবে।

একজন ফিরে তাকাল। বোধহয় বুড়ো উমেদার। ছেলেটা বলল, আধঘণ্টা থেকে এক ঘণ্টা স্বাদে গন্ধে ভরে রাখবে আপনার মুখ।

এক ঘণ্টা? লোকটি বলল, দেখি একটা।

ছেলেটি বলল, দুটো দিই?

একঘণ্টা থাকে তো গালে?

ছেলেটা বলল, না চিবুলে সোয়া ঘণ্টা থাকবে। পাথর, দাদা পাথর।

লোকটি কিনে ফেলল দুটো। আর কারো চাই, বলুন?

সে আবার লজেন্সের গুণগান আরম্ভ করল। আরও সুন্দর ভাষায়, জোরালো ভাষায়। আরও তিনটে বিক্রি হলো।

পুষ্প জানে না, অজান্তেই তার মুখে একটু হাসির আভাস দেখা দিয়েছে। সে ভারি খুশি হয়েছে ছেলেটার কৃতকার্যতায়। হঠাৎ ছেলেটা তাকেই জিজ্ঞেস করছে, 'আপনাকে দেব এক শ্লাইজ দিদিমণি, মরটনস্ সুইট।'

বিস্মিত লজ্জায় চমকে পুষ্প ঘাড় কাত করে ফেলল। ছেলেটা কয়েক লাফে হাজির হলো তার কাছে। পুষ্পর বুকের মধ্যে ঢাক বাজছে। পয়সা? পয়সা আছে তো? আছে। সাত পয়সা আছে। পয়সা বার করতে গিয়ে পুষ্প বারবার ছেলেটাকেই দেখছে। বোতামহীন, হাট-করে-খোলা জামার ফাঁকে হৃৎপিণ্ডটা থরথর করে কাঁপছে ছেলেটার। ঢোঁক গিলছে, কাশছে আর পিচ্ পিচ্ করে থুথু ফেলছে খোলা দরজা দিয়ে। ছোট্ট মুখটিতে উত্তেজনা, বিন্দু বিন্দু ঘামে ভরা। আর হলদে চোখ দিয়ে দেখছে পুষ্পর চুলেরই গোছা। সমীহ করে দেখছে, দিদিমণি বলে

ডাকছে। পুষ্প ওদের খরিদ্দার।
সব মিলিয়ে যেন অনেকগুলি পোকা কুরে কুরে খেতে লাগল তার বুকের মধ্যে। কেন, কেন পুষ্পকে ওরা ওদের সমগোত্রীয় ভাবতে পারে না। পুষ্প যে ওদেরই মতো এসেছে ব্যাগ কাঁধে ট্রেনের মধ্যে। দু-পয়সা দিয়ে লজেন্সটা ঘামে-ভেজা মুঠির মধ্যে নিয়ে হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসল সে, সারাদিনে কত বিক্রি হয় ?
ছেলেটা একটু অবাক হলো। একে খরিদ্দার তায় মেয়ে। ছেলেটা হঠাৎ দয়ার প্রত্যাশায় করুণ হয়ে উঠল। পুষ্প বুঝল না, ছেলেটা করুণার জন্যে তাকে মিছে কথা বলল। বলল, কিছু না।
সারাদিন খেটে কিছু পাই না, জানেন। কয়েক পয়সা হয়।
হতাশা ঘিরে আসতে লাগল পুষ্পর মনে। জিজ্ঞেস করল, তোমরা এমনি করে ঘোর, রেল কোম্পানী কিছু বলে না ?
কী আর করবে। মাঝে মাঝে ধরে নিয়ে যায়, হাজতে পুরে রাখে।
কেঁপে উঠল পুষ্পর বুকের মধ্যে। বলল, টিকিট কাটলে হয় না ?
ছেলেটা বলল, কিসের টিকিট ? মান্থলি ? মান্থলি তো প্যাসেঞ্জারের। আমাদের লাইসেন্স চাই, ভেন্ডারস লাইসেন্স। কোথায় পাব ! গবরমেন্ট তো দেয় না আমাদের।
মান্থলি থাকলেও ধরে নিয়ে যায়। আর একটা লজেন্স দেব আপনাকে ?
চমকে উঠল পুষ্প। বলল, অ্যাঁ ? না আর চাই না।
ছেলেটা চলে গেল। আর পুষ্প চটকাতে লাগল লজেন্সটা হাতের মধ্যে। তবে ? লজেন্সটা পড়ে গেল হাত থেকে। থাক। তবে ? পুলিস হাজত ও অপমান ?
এ অপমান। কিন্তু তার যৌবন ও হৃদয়ের অপমান ? সেই ভয়ংকর ঘোর অন্ধকারের রাক্ষসটা ? অদৃশ্যে যে রেখেছে তাকে চোখে চোখে ?
তবুও পারল না পুষ্প। শুধু তার বড় বড় চোখ দুটো মেলে দাঁড়িয়ে রইল শিয়ালদা স্টেশনের জনাকীর্ণ প্ল্যাটফর্মে। ব্যাগটিকে দু-হাতে বুকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দেখল। তার পসরার ব্যাগ। থরে থরে এনেছে সাজিয়ে। আর হকারের দল তাদের পসরা দেখিয়ে সেধে সেধে গেল তাকে তার মূঢ় মুখের সামনে।
সন্ধ্যাবেলা একটা ভিড়বহুল কামরাতে উঠে পড়ল পুষ্প। আপিস-ফেরতা মানুষের ভিড়ে গিজগিজ করছে সমস্ত কামরাটা। ব্যাগের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিল পুষ্প। বুকটা কাঁপছে থরথর করে। কাঁপুক। তবু, বলবে, দেখাবে তার পসরা। দেখুক সকলে, সে একজন মেয়ে হকার।
হঠাৎ একটি যুবক কেরানী উঠে দাঁড়াল। চশমা-পরা চোখের মুগ্ধ দৃষ্টি তার পুষ্পর চুলের দিকে। একটু বিরক্ত হলো বোধহয়। কণ্ঠে কিছু সমীহ। বলল, বসুন আপনি।
চমকে উঠল পুষ্প। হকার নয়, যাত্রিণী। মহিলা-যাত্রীর সম্মান ও কষ্ট লাঘব করা। পারল না, বসে পড়ল পুষ্প। বসে রইল মাথা নিচু করে। নারীর সম্মান। কিন্তু জীবন এমনই শক্ত চিড়ে যে, সে শুধু সম্মানের জলে ভেজে না। ক্রাচ বগলে সেই পারিজ সুইট হরেন তখন বলছে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলে গেছে স্যার।

হাওয়া ঠান্ডা না হতেই, আবার ড্রাম বাজানো হচ্ছে। আপিসে এখনো অনেক হিসাব কষতে হবে। মাথা ঠান্ডা রাখুন, ভাবুন, পারিজ সুইট মুখে রাখুন। পারিজ কোকো সুইট্, চার পয়সা শ্লাইজ, বাট ইকোয়েল টু ওয়ান কাপ কোকো…
কে একজন বলল, এম-এল-এ-রাও নাকি অবাক হয়ে হকারদের বক্তৃতা শোনে। আর একজন যোগ করল, প্রফেসাররাও হার মানে।
ততক্ষণে অসহ্য যন্ত্রণায় বোবা বুকটা ফেটে পড়তে চাইছে পুষ্পর। নিজের স্টেশনে নেমে, ঝাপসা চোখে অন্ধকার গলিপথে বাড়ির দিকে চলল সে।

কিন্তু আবার এলো তার পরদিন। আবার দেখা হলো সেই দলটার সঙ্গে। ওরা আবার বলাবলি করল নিজেদের মধ্যে। বোধহয় কিছু জুটেছে মেয়েটার কলকাতায়। মেয়ে হলেই নাকি শালা একটা কিছু জুটে যায়, মাইরি।
তারপর সন্ধ্যাবেলা, শিয়ালদহের যাত্রী ও হকারের দল অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে রইল কয়েক মুহূর্ত। সবাই দেখল, ভিড়াক্রান্ত গাড়িতে একটা মেয়ে, অল্পবয়সী ভদ্রলোকের মতো দেখতে একটা মেয়ে, কী যেন বলছে। হরেন ক্রাচ্ বগলে বক্তৃতা দিতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। সঙ্গে তার ভিকস্, দার্জিলিং-এর কমলালেবু, মরটন, বাইরন, প্রগতিশীল মাসিক বিক্রেতার দল।
তারা সবাই মিলে হাঁ করে রইল।
কেবল ভিকস্ বলল, নির্ঘাত ভিক্ষে চাইছে। ভেংচে বলল চাপা গলায়, দেখুন, আমার স্বামী মারা গেছেন, ছেলেপুলে নিয়ে—
পুষ্পর হাতে তখন ছোট ছোট কয়েকটা ন্যাকড়ার পুতুল জুলজুল করে নুলো দোলাচ্ছে। আর একটা চাপা সরু মেয়েলী গলা : আমার নিজের হাতের তৈরি, ন্যাকড়া আর তুষের তৈরি, উপরে রংকরা। দাম দু-আনা করে…
গলাটা কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে স্থির হয়ে আসছে, একটু বা চড়ছেও। যাত্রীদের শুধু বিস্ময়টুকু কেটে গিয়ে, বিস্ময়, লজ্জা, বিরক্তি, করুণা ও হাসির মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠতে লাগল।
ছি ছি, কী কান্ড।
এ সব কী হচ্ছে আজকাল ? একটা অতবড় মেয়ে।…
এখনই কি, আরো কত দেখতে হবে।
উঃ কী অবস্থা ভাই দেশের।
বিবাহিতা!
নুনাঃ। কি জানি, হবে হয়তো। কিন্তু সিঁদুর তো নেই।
কেবল দার্জিলিঙের লেবু হরেনের কাছে চাপা হুংকার দিয়ে উঠল, ওরে শালা, এ যে হকারনি দেখছি।
হরেন বলল, তাই তো।
মরটন বলল, সর্বনাশ করেছে।
কে একজন বলল, কোনো তেল কোম্পানির শো-কেসে বসে থাকলে চুল দেখিয়ে মাইনে পেত।

সত্যিই সর্বনাশ। এমন একটা মেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর কল্পনা করে নি তারা কোনোদিন। প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক রকম হতে পারে। কিন্তু, এ রকম একটা মেয়ে। মেয়ে হকার। সত্যি সর্বনাশ। আর সেই সর্বনাশের আশঙ্কায় তাদের মুখগুলি এঁকেবেঁকে দুমড়ে কেমন নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। মলম মাজন, রেলে-ঘোরা আজব ডাক্তার ডেণ্টিস্ট থেকে শুরু করে সবাই দেখল মেয়েটাকে, অনাগত এক পথ-দ্রষ্টাকে। তাদের সকলেরই মুখগুলি বিরূপ হয়ে উঠল।

হরেন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলল, সেই মেয়েটা।

চানাচুর বলল, নিশ্চয়ই সাত-ঘাটের-জল-খাওয়া মেয়ে।

আর একজন মন্তব্য করল, নইলে আর রেলে এসেছে হকারি করতে। কতবড় বুকের পাটা।

মাজন প্রায় চেঁচিয়েই বলল, বুকের পাটা আবার কিসের? বুকের বালাই শালা কবেই খেয়ে বসেছে। কোন্‌দিন দেখব, ছুঁড়িটাই মাজন বিকোচ্ছে।

ওইটিই বোধহয় সবচেয়ে বড় ভয়। ওই নজরেই তারা দেখে সমস্ত ঘটনাটা। নতুনেরা পুরনোদের কাছে অনেক লাথি ঘুষি খেয়েছে। পরে তারা একত্রিত হয়েছে। বাধ্য হয়েছে পরস্পরে হাত মেলাতে। আর এই মেয়েটা এসেছে আজ খদ্দেরদের মন ভোলাতে। তাদের হাত থেকে কেড়ে নিতে। খদ্দেরের মন আর মেয়েমানুষ। এই ভেবেই তাদের বিবেক, বুদ্ধি, মন কুঁকড়ে গিয়ে হঠাৎ প্রতিশোধের জন্য ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে চাইল।

কেরানী ও ছাত্রদের সন্দেহপরায়ণ মন দেখল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝে দুলতে লাগল সকলের মন। দোলার ঝোঁকটা অবিশ্বাসের দিকেই যেন বেশী। গরিব? হ্যাঁ গরিবই মনে হচ্ছে। আটপৌরে শাড়ি আর কাচের চুড়ি ক-গাছা। চুলগুলিই সবচেয়ে দ্রষ্টব্য।

কিন্তু না, মেয়েটা ভালো হওয়া তো সম্ভব নয়। একেবারে রেলে হকারি। যা দিনকাল। বয়সও তো নেহাত কাঁচা। যাকে বলে উঠতি বয়স। এই বয়সে একেবারে পথে, গাড়িতে, ভিড়ের মধ্যে! কেমন যেন ঝাপসা লাগছে ব্যাপারটা।

মাথাটা উঠছে আস্তে আস্তে পুপের। একটা আত্মপ্রত্যয়ের ভাব ফুটছে গলায়। চোখের দৃষ্টিটা কিন্তু আধা অন্ধ। কেবল ভিড়ের উপর দিয়ে ঘুরে যাচ্ছে, পরিষ্কার দেখছে না কাউকে। বলছে, ন্যাকড়াটা বেশ মোটা আর শক্ত। ছিঁড়বে না সহজে। বাড়ির ছেলেপুলেরা···বলছে, দেখছে শুনছে সবাই, কিন্তু কেউ নিচ্ছে না। যেন নিতে পারাটাই একটা মস্ত ব্যাপার। চাকরি ব্যবসা করে না, অথচ রোজগার করে এরকম একশ্রেণীর ভদ্রলোকের মতো যাত্রীও দু-একজন ছিল। তারা টিপ্পনি কাটল, অর্থপূর্ণ গলায় বলল, মন্দ নয়, কী বলিস্। তবু শালা দেখতে দেখতে সময় কেটে যাবে।

শুধু একজন হাত বাড়িয়ে একটা পুতুল নিল। পরনে ময়লা হাফ প্যাণ্ট, তেল-কালি-মাখা নীল জামা! মুখও তেলমাখা। গোঁফজোড়াটা বিরাট! কোনো তেল-কলের মিস্তিরি মজুর হবে হয়তো। অনেকক্ষণ নেড়েচেড়ে দেখল গম্ভীর মুখে। দেখে পয়সা দিল।

অমনি পুষ্পর সঙ্গে ওই মানুষটাও দ্রষ্টব্য হয়ে উঠল একটা। শোনা গেল, হুঁ, বুঝলুম। কিন্তু মানুষটি নির্বিকার।
পরমুহূর্তে একটা চিৎকার, ভিকস্। ভিকস্ স্যার। আপনার মাথা সাফ হয়ে যাবে, জাম ছেড়ে যাবে।
আই কিওর স্যার, চোখের গণ্ডগোল কাটবে,…
অ্যান্ড্ পারিজ সুইটস্। আজেবাজে চিন্তা থেকে আপনার মনকে একমুখো করুন।…
দার্জিলিঙের নেবু।…চানাচুর।…সাড়েচার ভাজা।…ধূপ।…বায়রনের জল।… কে পি দে-র মলম।…
গুলি। সীসের নয়, তানসেনের।
কামরাটার চারদিকে একটা প্রচণ্ড হট্টগোল পড়ে গেল। ডুবে গেল পুষ্পর গলা। সে অবাক হয়ে তার ভীত করুণ চোখ মেলে দেখতে লাগল চারদিকে। একটা কামরাতে এতগুলি হকার। একসঙ্গে? কেন?
কাছ থেকেই কে একজন কেশো গলায় হেসে বলে উঠল, ওই দেখুন যারা চেনে আর জানে, তারা ঠিক ব্যবস্থা করছে। দু-দিনে তাড়িয়ে ছাড়বে মশাই…
শোনার দরকার ছিল না। তার আগেই বুঝল পুষ্প। সমস্ত চিৎকারগুলি তার কানে আর বুকে এসে বিঁধিয়ে পিটিয়ে ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল। অন্ধকার হয়ে এলো চোখের দৃষ্টি। তাকে ওরা তাড়িয়ে দিতে চায়। সেই মানুষগুলি।
গাড়ি ছাড়ল। স্টেশনে নেমে নেমে সে যে কামরায় গেল, একই চিৎকার। চিৎকার আর ক্রুদ্ধ বিদ্রূপাত্মক কটাক্ষে পুষ্পকে খুঁচিয়ে মেরে দিশেহারা করে তুলল।
বাড়ি ফেরার পথে, মফস্বলের অন্ধকার গলিটাতে থমকে দাঁড়াল পুষ্প। বুকে মুঠিকরা হাতে একটি দু-আনি, একটি পুতুলের দাম। সেটিকে বুকে চেপে সে আচমকা ফুঁপিয়ে উঠল নিঃশব্দে। বহু ভয় ও সংশয় পেরিয়ে সে এসেছিল। কিন্তু এমন ভয়ঙ্কর বাধার কথা মনেও আসে নি। না, সে পারবে না, পারবে না।

•

তবু আবার এলো পরদিন। দূরের এই স্টেশনটা আজও ঝিমোচ্ছিল। কিন্তু সে আসবামাত্র ডাউন প্ল্যাটফর্ম থেকে একটা চিৎকার ভেসে এলো, পুতুলের মা এসেছে রে।
দেখতে দেখতে সকলেই দাঁড়াল উঠে। সর্বাগ্রে ক্রাচ বগলে হরেন। একজন বলল, পুতুলগুলি মরা না জ্যান্ত, জিজ্ঞেস কর।
আর একজন বলল, জিজ্ঞেস কর তো কার পুতুল?
না, নিজেরগুলো ঘরে রেখে এসেছে।
সেগুলোকেও নিয়ে এলেই হতো।
পুষ্পর বুকটা ছিঁড়ে গেল ওদের ইঙ্গিতে। তার জ্যান্ত পুতুল। পুতুলের মা। তার সারা শরীরের মধ্যে একটা দুর্বোধ্য যন্ত্রণায়, অনেকদিন কান্না চিৎকার করে বেরিয়ে আসতে চেয়েছে। অনেকদিন অজ্ঞান্তে তার বুকে ঠোঁটে অসহ্য বেদনায়

ও আনন্দে বিচিত্র শিহরনের স্পর্শে তারা মাতাল করে গেছে পুষ্পকে। সে ছিল যৌবনের স্বপ্ন। আঠারো বছরের পূর্ণ যৌবনে সে পুতুলের মা, হকারনি। মেয়ে নয়। শাঁখা সিঁদুরের আবির্ভাব ঘটে নি। পুতুলের জন্মদাতা আসে নি কোনোদিন ঘরদোর-আশ্রয়ের ঢোলক-কাঁসি বাজিয়ে।

রাগ হলো না। বিষণ্নভাবে হাসল পুতুলের মা পুষ্প। পুতুলের মা-ই। তার নিজের হাতের পুতুল। কিন্তু সে ভয় পেল না। পেলে তাকে ফিরে যেতে হবে নরকে। পঙ্ক-অঙ্কে নিতে হবে আশ্রয়। তার সে মরণের পর কেউ পুতুলের মা বলেও বিদ্রূপ করবে না।

মাথা তুলে ফিরে তাকাল সে ওদের দিকে। কিন্তু ওরা টিটকিরি ও বিদ্রূপের জেদী ও চাপা চিৎকারে ভেঙে পড়ল। শোনা যায় না, তাকানো যায় না ওদের ছেঁড়া জামা আর রোদে-পোড়া নিষ্ঠুর মুখগুলির দিকে।

অথচ এই হরেন বিয়াল্লিশের গুলি-খাওয়া মানুষ। ভিকস্‌ও নাকি ছেচল্লিশে জেল খেটেছে। ওদের অনেকের পিছনে অনেক ইতিহাস। শুধু পুষ্পর মধ্যে এক কলঙ্কিনী শত্রু-মেয়ে ছাড়া ওরা আর কিছু খুঁজে পায় নি। লাইন পেরিয়ে পুষ্প অনেকখানি দূরে গিয়ে দাঁড়াল।

কেবল প্রগতিশীল কাগজ-বিক্রেতা, গোঁফ মুচড়ে শান্ত গলায় বলল, শত হলেও মেয়েমানুষ।

হরেনই খ্যাঁক করে উঠল, তার কী করতে হবে ?

না, দেখ, আজকাল দেশের এই অবস্থায় নারী-জাতির—সে খুব গম্ভীর গলায় আরম্ভ করেছিল। হরেন ভেংচে উঠল, আর থাক, তোমার আর পেগ্‌তিছিল বক্তিমে দিতে হবে না। শালা আজ একটা মেয়ে যদি আঁচল উড়িয়ে চোখ ঘুরিয়ে, কাগজ নিয়ে ওঠে গাড়িতে, তবে আর তোমাকে পয়সা দিয়ে চাল কিনে খেতে হবে না, বুঝেছ ?

কাগজ-বিক্রেতা বিমূঢ় গলায় বলল, অ্যাঁ ?

ভিকস্‌ বলল, অ্যাঁ নয়। ব্যাটা, শোঁক শোঁক, ভিকস্‌ শোঁক. মাথাটা সাফ কর।

কিন্তু কাগজ বিক্রেতার গোঁফজোড়া বেয়াড়ারকম বেঁকে রইল, না রে, কাথাটা বোধ-হয় ঠিক নয়।

মরটন বলে উঠল, এ যে পুতুলের সাক্ষাৎ বাপ এলো দেখছি।

তাই না বটে। সবাই তিক্ত গলায় হেসে উঠল।

বিদ্রূপ ও চিৎকারে যেন পুষ্পকে ওরা তাড়া করে নিয়ে এলো শিয়ালদায়। তারপর সেই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি। পুষ্প মুখ খোলবার আগেই সেই বহু পসরার বিজ্ঞাপনের কলরোলে ডুবে গেল তার গলা। তেমনি করেই আবার তাকে তাড়িয়ে নিয়ে এলো তার স্টেশনে।

দেবে না, তাকে ওরা কোনো অধিকার দেবে না। আইনের অধিকার দেওয়ার মালিক যারা, তাদের মুখোমুখি কোনোদিন দাঁড়াতে হবে কিনা কে জানে। কিন্তু আসল অধিকারীরাই বিরূপ।

শুধু এই চলল। তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, আর তাড়িয়ে নিয়ে আসা। প্রতিবাদী যাত্রী

হয়তো কেউ কেউ ছিল। তারা সংখ্যায় নগণ্য। অধিকাংশ শুধু মজাই দেখে যেতে লাগল।

কেবল, পুষ্প প্রতিদিন থমকে দাঁড়ায় বাড়ি ফেরার পথে, অন্ধ গলি-পথটাই যেন ছায়ালোকের কোনো অভিশপ্ত আত্মা। কখনো চুলের গোছা দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরে। কখনও শক্ত মুঠিতে চেপে ধরে বুকের কাপড়।

এরা চেয়েও দেখল না; মেয়েটা দিন দিন শুকোচ্ছে। চুলগুলো জট পাকাচ্ছে। সেই একই অধৌত জামাকাপড় ধুলিমলিন হয়ে উঠছে।

ওরা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ মারামারি করে, কিন্তু বন্ধুত্বে কখনো ফাটল ধরে না। কেবল পুষ্পকে ওরা তাড়া করে। শুনিয়ে শুনিয়ে বলে নানান কথা।

কোনোদিন বলে, পুলিসের সঙ্গে নিশ্চয়ই খুব জমজমাটি। নইলে আর বেমালুম পুতুলের মা হয়ে রেলে ঘুরছে?

অথচ সেপাইগুলি চোখ ঘোঁচ করে গোঁফ পাকায় তার দিকে চেয়ে। কোনোদিন বলে, রেলের বাবুদের কাছেও যাওয়া আসা আছে, সেইজন্যেই অত সাহস।

সত্যি, এ যে কোন্ সাহস ঠেলে দিয়েছে তাকে এই পথে, পুষ্প নিজেও ভালো-ভাবে টের পায় না।

কখনো লোকের ভিড়ে, রেলের পা-দানিতে চোখাচোখি হয় হরেনের সঙ্গে। হয়তো হরেন তখন বিপজ্জনকভাবে ক্রাচ্ সহ চলন্ত ট্রেনে কামরা বদলাচ্ছে। কখনো ভিক্সের ক্ষুধাকাতর চোখের সঙ্গে, অদম্য কাশিক্ষুব্ধ মরটনের সঙ্গে, রুগ্ন তানসেনের গুলির সঙ্গে।

যেন কিছু বলতে চায় পুষ্প। কিন্তু ওদের চোখের দিকে তাকিয়ে বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না তার। মুখ ফোটে না, অপমানে ধিক্কারে ঘৃণায় জ্বলে যায় বুকের মধ্যে।

একদিন শিয়ালদায় কে তার কানের কাছে বলে উঠল, পুতুলের মার ক-বিয়ে? ফিরে দেখল পুষ্প, অদূরে দার্জিলিঙের লেবুর বাঁকা চোখ-জোড়া। আর তার সামনে একটি নতুন বর আর কনে-বৌ। কনে-বৌ, কানে দুল, নাকে নাকছাবি, গলায় হার, হাতে চুড়ি নিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে পুষ্পর দিকে। পুষ্পর চুলের দিকে।

হকারনি নয়, স্বপ্ন নেমে এলো হঠাৎ আঠারো বছরের এক বাঙালী মেয়ের চোখে। যেন হঠাৎ চুলকে উঠল তার নাকের ও কানের খোলা ছিদ্রগুলি। ছোটকালে বিঁধিয়েছিল বাপমা শখ করে। একদিন সোনা পরবে বলে। ওই বেশে একদিন সাজবে বলে। আজন্ম শুভ্র সিঁথি একদিন লাল হবে বলে।

সত্যি, কত বিয়ে করেছে পুষ্প মনে মনে? শৈশবের সেই বিয়ের যে সংখ্যা নেই। দার্জিলিঙের লেবুকে বলবে কী করে সে-কথা?

কনেবৌটি দিব্যি জিজ্ঞেস করল, অসুখ করেছে ভাই?

-না তো?

তবে অমন ধুঁকছ যে?

পুষ্প হেসে বলল, এমনি।

তাই তো, পুষ্প অবাক হয়। বৈশাখ এসে পড়েছে। চৈত্র চলে গেছে তাই এত বিয়ের হিড়িক। বর-কনেরা বেরিয়েছে পথে। আর এতদিনে মাত্র সাতটি পুতুল বিক্রি করতে পেরেছে পুষ্প। অনেক বাধা মাড়িয়ে পেরেছে।
কিন্তু তাতে আশা বাড়ে নি, বিপদ বেড়েছে। ঘরে অবিশ্বাস, অবিশ্বাস বাইরে। কোথাও সে কিছু পেল না, দিতেও পারল না। এবার তাকে যেতে হবে পথে ফেরি করতে : পুতুল, হাতে-গড়া পুতুল নেবেন ?
আবার কানে এলো, পুতুলের মা অনেক বিয়ে বিয়ে খেলেছে। এবার পুতুলের বিয়ে দেবে।
আহা! আজকে ওরা কী কথাগুলিই বলছে! সত্যি, কত বিয়ে বিয়ে খেলেছে। কিন্তু সেই পুতুল নিয়ে খেলা তো তার আজও শেষ হলো না। একদিন শেষদিন মনে করে এলো সে। আজকে শিয়ালদহ স্টেশন পেরিয়ে চলে যাবে কলকাতার পথের ফেরিতে!
কিন্তু যেতে পারল না। আজ আইনের অধিকারীরা স্টেশনের চারপাশে জাল ছড়িয়ে বসেছিল! বেটন ও বন্দুকধারী পুলিসের বেশে ব্যূহ রচিত হয়েছিল বে-আইনী হকারবৃত্তি নিবারণের স্পেশাল কোর্টের। যারা ছিল কাছেপিঠে, তারা ধরা পড়েছে অনেকেই। দুপুরের ঝোঁকে যারা বাইরে মফস্বলে চলে যায়, ফিরে আসে বিকালে, এবার আক্রান্ত হলো তারা।
হঠাৎ পুলিসের আক্রমণে, চিৎকারে, গণ্ডগোল, যাত্রীদের অকারণ ঠেলাঠেলি হুড়োহুড়িতে একটা শ্বাসরুদ্ধ দৃশ্যের অবতারণা হলো।
ধক্ করে উঠল পুষ্পর বুকের মধ্যে। পুলিস দেখে নয়। সে দেখল হরেনের একটা ক্রাচ ছিটকে পড়েছে অনেক দূরে, আর তাকে ঘাড় ধরে নিয়ে যাচ্ছে সেপাই। ক্রাচটা তুলে নেওয়ার জন্যে অগ্রসর হতেই তাকে বিশালকায় এক মহিলা এসে শক্ত হাতে ধরল। আর পুলিসের চড় খেতে খেতে একটা পানবিড়িওয়ালা ছোট ছেলে কুড়িয়ে নিল হরেনের ক্রাচটা।
কিছু বলবার অবকাশ মিলল না। গলায় সোনার চন্দ্রহার, আর হাতে কঙ্কণ ও ঘড়িপরা মহিলাটি পুষ্পকে এনে হাজির করল টেবিলের সামনে। একটা খেঁকুরে গম্ভীর গলা শোনা গেল, লাইসেন্স আছে ?
না।
পঞ্চাশ টাকা ফাইন বার কর।
পঞ্চাশ টাকা ?
পুষ্পর মনে হলো, তাকে বুঝি ঠাট্টা করছে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। অনা-দায়ে সাত দিন হাজতবাস।
মহিলাটি তার কাঁধ থেকে ব্যাগটা ছিনিয়ে নিল। নিয়ে ঠেলে দিলে পুলিসের ঘেরাওয়ের মধ্যে। সেখানে আর কেউ নেই, শুধু সে। পুষ্পবালা, ঢাকার বজ্রহাটের অমুক মাস্টারের মেয়ে।
সেখান থেকে পুষ্প দেখল, প্যারিজ সুইট হরেন, ভিকস্, বায়রন, মরটন, চানাচুর. প্রগতিশীল কাগজ-বিক্রেতা, দার্জিলিঙের লেবু সকলেই রয়েছে, আর একটা ঘেরা-

ওয়ের মধ্যে। ঘর্মাক্ত ধুলোমাখা, উস্কখুস্ক। ওদেরই মতো জড়ো হয়েছে একটা টেবিলে ওদের মালগুলি।
কে বলে উঠল, আরে শত হলেও হকারনি। কর্তারা রাত্রে ঠিক ছেড়ে দেবে দেখিস। হয়তো দেবে। যদি না দেয়? যদি না দেয়, তবে মা ভাববে, সন্দেহ এতদিনে কাটল। সর্বনাশী শেষে সর্বনাশ করে পালিয়েছে। কিন্তু পালাতে পারে নি তো এতদিন। তারপর চালান দিয়ে দিল সবাইকে হাজতে।

সাতদিন পর।
বেলা দশটায় কোর্ট খুলল। বেলা এগারটায় ছাড়া পেল হকারেরা। সকলেই গিয়ে জড়ো হলো, ভিড়ের বাইরে, পুবের রেলহাসপাতালের কাছে।
এঃ শালা, চানাচুরগুলো সব সাবাড় করেছে ধর্মপুত্তুর সেপাইরা।
আমার একটা লজেন্সও নেই মাইরি।
দার্জিলিঙের লেবু সব ফাঁক।
মাইরি আমার কাগজগুলোও কমে গেছে। ওরা কি প্রগতিশীল কাগজও পড়ে! পড়ে, ধার দেখবার জন্য।
হ্যাঁরে, সেই মেয়েটাকে ছেড়ে দিয়েছে না?
তারপর হাসি আর গালাগালির একটা ঝড় বইতে থাকে। হরেন চেঁচিয়ে উঠল, আমার অনেকগুলি মাল আছে!
মাইরি?
মাইরি। আয়, সব হাজত-খাটাকে এক করে দিই, তারপর নতুন করে আবার আরম্ভ করা যাবে।
বলতেই সবাই ঘিরে এলো তাকে, সে একটা করে লজেন্স দিতে লাগল সবাইকে। হঠাৎ চাপা গলায় ভিকস্ ডাকল, এই হরেন।
হরেন বলল, কী?
ওই দ্যাখ!
সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখল, পুতুলের মা। কোর্টের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে। চুলগুলি জড়ানো কিন্তু জট পাকিয়ে আরো বড় হয়ে উঠেছে। স্যান্ডেল নেই, খালি পা। কাপড়টা কুঁকড়ে পায়ের থেকে উঠে গেছে অনেকখানি। চোখের কোলগুলি বসে গেছে। গাল দুটো গেছে চড়িয়ে। ঝুঁকে পড়েছে নিচের দিকে। কাচের চুড়িগুলি হলহল করছে হাতে। ব্যাগটা ঝুলছে কাঁধে।
ওরা সকলে হেসে উঠতে যাচ্ছিল। কিন্তু একসঙ্গেই সকলের গলায় হাসিটা কি রকম আটকে গেল। একজন বলল, হাজতে ছিল রে। হ্যাঁ, কিরকম দেখাচ্ছে, না?
হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল হরেন। খট্‌খট্ করে খানিকটা গিয়ে, খ্যাঁকারি দিয়ে ডেকে উঠল, পুতুলের মা!
পুষ্প দাঁড়াল থমকে। ঠিক এমনি সুরের ডাক তো কখনো শোনে নি সে ওদের কাছ থেকে। তবুও নতুন অপমানের জন্যে শক্ত হয়ে দাঁড়াল সে। আজ শুধু অপমান নয়, শোধও নেবে।

পেছনে সকলেই ভ্রূ কুঁচকে চোখ তুলে নিঃশব্দে চেয়ে রইল। আর ঠক্‌ঠক্‌ করে হরেন এসে দাঁড়াল পুষ্পর সামনে। পুষ্পর চোখের দিকে তাকিয়ে চোখ নামাল হরেন। কৌটো থেকে একটা লজেন্স্‌ বের করে হরেন বলল, মানে, যারা হাজত খেটেছে, তাদের সকলেরই একটা করে পাওনা হয়েছে। তা আপ…আপ…মানে তোমার একটা আছে, নিতে হবে কিন্তু ভাই।

কী শুনছে, এ কী শুনছে পুষ্প। হরেনরা, হকাররা তাকে তাদের সঙ্গিনী করে নিচ্ছে? তাদের পুতুলের মাকে!

ততক্ষণে সকলেই ভিড় করে এসেছে। আর পুষ্পর শিশুর মতো মুখে হাসির নিঃশব্দ ঝরনা, সেই সঙ্গে আচমকাচোখ ফেটে জল এসে পড়ল তার। সে লজেন্সটা নিল।

হরেন ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, সত্যি মানে কেঁদে কিছু হয় না, তুমি কেঁদো না। বলতে বলতে তারও গলাটা আটকে এলো। আর সবাই নিঃশব্দে ঢোঁক গিলছে।

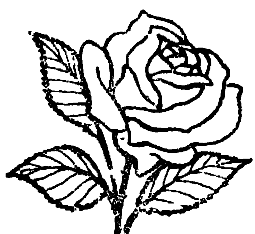
তারপরে বলল, চানাচুরের শেষ প্যাকেটটা তুমি খাও।

দেখা গেল সকলেই, তাদের অবশিষ্ট মালটুকু পুষ্পর হাতে তুলে দিতে ব্যস্ত।

এই নাও, একটা কাগজও দিলুম, পড়ো।

কাগজটা কী তা বললি না?

হেসে উঠল সকলে। চোখের জলে ও হাসির আলোছায়ায় অন্ধ হয়ে এলো পুষ্পর চোখ। সে দেখল শুধু, তাকে ঘিরে ওদের হাজত-খাটা উস্কখুস্ক চেহারার ভিড়ের মধ্যে সে একাত্ম।



নিষিদ্ধ ছিদ্র

'শুয়োরের বাচ্ছা !' কান্ত কুন্ডুর হুংকার।

'আজ্ঞে।' বৃন্দাবন—বৃন্দা—বেন্দার জবাবের সুরে অন্যমনস্কতা।

'বানচোত !' কান্ত কুন্ডুর হুংকারে পূর্ব সম্বোধনের তুলনায় ঝাঁঝের মাত্রা তীব্রতর।

'বলেন কত্তা।' বেন্দা ছুটে কাছে এলো, পূর্ণ সচেতন স্বর, মুখে কাঁচুমাচু ভাব, কপট ভয়। আসবার আগে, স্টেশনারি কাউন্টারে দাঁড়ানো দশ-এগারো বছরের ছেলেটাকে চোখের ইশারা করল।

কান্ত কুন্ডু বলল, 'ভেড়ার বাচ্ছা, কানে শুনতে পাস না, না ? তিন নম্বরের তাক থেকে মিছরির টিনটা ঈশেনকে দে।' কান্ত কুন্ডু হুসহুস করে ভাজা তামাকের সিগারেটে টান দিল, মুদিখানার কাউন্টারের সামনে ধুতি পাঞ্জাবি পরা প্রৌঢ় লোকটির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'লোকে এসব জানে না। চিনি দিয়ে পায়েস খায়। আরে শীতের সময় পায়েস খেতে হলে নলেন গুড়ের পায়েস খাবে, নয় তো অন্য সময় মিছরি দিয়ে। মিছরি হলো ঠান্ডা জিনিস। মিছরির পায়েসে পেট ঠান্ডা থাকে। আমি রোজ পায়েস খাই, মিছরির পায়েস। হ্যাঁ, আপনার কী চাই ? দালদা ? নেই।…তুমি কি চাইলে ? ভেলি গুড় ?'

কান্ত কুন্ডু ক্যাশ বাকসের সামনে, শীতলপাটি পাতা গদীতে বসে এক-একজন খরিদ্দারকে জিজ্ঞেস করছে, কর্মচারীদের সওদা মেপে দিতে বলছে। মুখ ফিরিয়ে বলল, 'কী হলো ঈশেন ? দেড় কে. জি. মিছরি ওজন করতে কতোক্ষণ লাগে ? ভেলি গুড় কতোটা ? পাঁচ কে. জি. ? আচ্ছা। এই—এই ভোঁদড়ের বাচ্ছা !'

বেন্দা স্টেশনারি কাউন্টারে দাঁড়ানো সেই ছেলেটার সঙ্গে তখন কথা বলছিল, 'পটলা ? যে পটলা রোজ এখান থেকে চারটে লজেন্স কেনে ? ও গোল দিল ? ওর পায়ের ডিম খুব শক্ত, না ?'

ছেলেটি বলছিল, 'হ্যাঁ, ও রোজ নাকি কচ্ছপের মাংস খায়। আমাকে একটা ছ-পয়সার টফি দে।'

বেন্দা বলছিল, 'দিচ্ছি। আচ্ছা, ইস্কুলের মাঠে বিকালে রোজ খেলা হয় ?' এই জিজ্ঞাসার সময়েই, 'ভোঁদড়ের বাচ্ছা' ডাক শুনে ও জবাব দিল, 'বাবু।'

'গুখেগোর ব্যাটা, এদিকে আয়, ভেলি গুড়ের টিনটা এক নম্বরের তাক থেকে ঈশেনকে দে।' কান্ত কুন্ডু হুকুম করল।

বেন্দা কাউন্টারের সামনে ছেলেটাকে আবার চোখের ইশারায় দাঁড়াতে বলে মাল ঠাসা তাকের দিকে ছুটে গেল। ওর বয়স বারো। খালি গা, হাফ প্যান্ট পরা।

গায়ে ময়লা থাকলেও, আশ্চর্য রকমের ফরসা, গোরাচাঁদ বললেই হয়। আরো আশ্চর্য, ও মোটেই হাড় জিরজিরে রোগা না। একটু যেন থলথলে নরম শরীর। খোঁচা খোঁচা পাঁশুটে চুল, চোখ দুটো প্রায় গোল। নাকটা বড়ির মতো। ময়লা দাঁত বের করে হাসলে, চোখ দুটো বুজে যায়। অথচ দাঁতগুলো সবই নতুন। এক নম্বর তাক থেকে প্রায় কুড়ি কে. জি. ওজনের ভেলি গুড়ের টিনটা দাঁতে দাঁত চেপে তুলল। তুলে ধরতে পারল না, মেঝের ওপর দিয়ে ঠেলে ঠেলে ঈশেনের কাছে, পাল্লার সামনে রাখল। ঈশেন বেন্দার পশ্চাদ্দেশে একটি চিমটি কাটল। বেন্দা পাছায় হাত ঘষে, স্টেশনারি কাউন্টারে গিয়ে, টফির বোয়েম থেকে রঙিন কাগজে মোড়া একটা টফি বের করে ছেলেটার দিকে এগিয়ে দিল। ছেলেটি একটি পাঁচ, আর একটি এক পয়সা বেন্দার হাতে দিল। বলল, 'তুই কলেজের মাঠে খেলা দেখতে আসতে পারিস না?'

বেন্দা বলল, 'ছুটি পাই না।'

ছেলেটা বলল, 'কেন, বেস্পতিবার তো দোকান বন্ধ থাকে।'

বেন্দা বলল, 'বেস্পতিবার কাঁচরাপাড়া কলোনিতে মার কাছে যাই। যেতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু না গেলে মা রাগ করে, আর বাবুও প্যাঁদায়।' বলে কান্ত কুন্ডুকে চোখের ইশারায় দেখাল।

ছেলেটা মোড়ক ছাড়িয়ে টফি মুখে দিয়ে বলল, 'মার কাছে তোর যেতে ইচ্ছে করে না কেন?'

বেন্দা মুখ বিকৃত করে বলল, 'মায়ের লোকটাকে আমার ভাল্ লাগে না। আমাকে খুব খাটায়, আর খিস্তি দেয়।'

ছেলেটা অবাক চোখে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তোর মায়ের লোকটা কে? তোর বাবা না?'

বেন্দা বলল, 'আমার বাপ তো কবেই পটল তুলেছে। এখন মায়ের একটা লোক আছে। আর মায়ের অনেক ছেলেমেয়ে। আমার ভাল্ লাগে না। একটা বেস্পতি-বার আমি কাট মারব, মেরে খেলা দেখতে যাব।'

ছেলেটা নির্ভেজাল অবুঝ বিস্ময়ে বেন্দার দিকে তাকিয়ে রইল। বেন্দা আবার বলল, 'আমার খুব খেলতে ইচ্ছা করে। ফুটবল। এয়সা গেদে শট মারতে ইচ্ছা করে যে বল ফাটিয়ে দিই।'

ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'তুই কোনো খেলা করিস না?'

বেন্দা ঘাড় কাত করে, চোখ ঝলকিয়ে বলল, 'খেলি, রোজ রাত্রে ইঁদুর মারা খেলি।' বলতে বলতে ওর মুখে কঠিন খুশি ঝলক দিল, 'আমি তো রাত্তিরে দোকানের পেছুনকার ঘরে থাকি। ঘর অন্ধকার করে ইঁদুর মারা খেলি। আমি অন্ধকারে দেখতে পাই—।'

'এই কুত্তার বাচ্ছা!' কান্ত কুন্ডুর হুংকার শোনা গেল, 'খইলের বস্তা থেকে ঠোঙায় করে পাঁচ কে. জি. খইল ভরে দে।'

বেন্দা বলল, 'যাই বাবু।' যাবার আগে ছেলেটাকে আবার চোখের ইশারা করে গেল।

কান্ত কুন্ডু নরম স্বর চড়িয়ে বলল, 'গোপাল, তুমি কী কর, বানচোতটা খালি গল্প করে।'

স্টেশনারি কাউন্টারের এক পাশে, প্রৌঢ় স্বাস্থ্যহীন গোপাল একটি টুলে বসে ঝিমুচ্ছিল। সে কান্তর আগের পক্ষের শালা। স্টেশনারি বিভাগ সে দেখাশোনা করে। সে কান্তর কথার কোনো জবাব না দিয়ে ছেলেটাকে বলল, 'তোমার কী চাই খোকা?'

ছেলেটা মাথা নাড়ল। গোপাল বলল, 'তা হলে এখন চলে যাও, ও কাকের বাচ্ছাটা খালি গল্প মারে।'

এই সময় একজন খরিদ্দার এসে টুথপেস্ট চাইল। ছেলেটা দাঁড়িয়েই থাকল। বেন্দা ঠোঙায় খইল ভরে, ঈশেনের কাছে এগিয়ে দিলো। দিয়ে আবার স্টেশনারি কাউন্টারে এলো। গোপাল তখন আলমারি খুলে খরিদ্দারকে টুথপেস্ট দিচ্ছে। ও সব কাজ বেন্দার না। তেল সাবান টুথপেস্ট স্নো পাউডার হিমানী খাতা কাগজ কলম পেনসিল, এ সবে ওর হাত দেবার হুকুম নেই। ও কেবল লজেন্স আর চানাচুর দিতে পারে। আর গোটা দোকানের ফাইফরমাস খাটে। ও সামনে আসতে ছেলেটা জিজ্ঞেস করল, 'এখানে তোকে কেউ নাম ধরে ডাকে না কেন?'

বেন্দা কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে ছেলেটার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। ছেলেটা বলল, 'তোকে সবাই শুয়োরের বাচ্ছা নয়তো কাকের বাচ্ছা, এসব বলে কেন?'

বেন্দা হেসে নিচু স্বরে বলল, 'ওহ্। ওরা তো সব ইঁদুরের বাচ্ছা।'

'বাঁদরের বাচ্ছা।' হঠাৎ আবার কান্ত কুন্ডুর হুংকার, 'ঠোঙায় আড়াইশো সরষে দে।'

'এই যে বাবু।' বেন্দা ছুটে চলে গেল।

কান্ত কুন্ডুর জমজমাট দোকান। স্টেশনারি, মুদিখানা। পাশেই র‍্যাশনশপ। র‍্যাশনশপের দায়িত্বভার এ পক্ষের শালার ওপর। হিসাবনিকাশ সলাপরামর্শ সব কান্তর সঙ্গেই। কান্ত সব কিছুর মালিক। বেন্দা তার সব থেকে অল্প বয়সের কর্মচারী। খাওয়া-পরা পায়, মাইনে কুড়ি টাকা ওর মা এসে মাসে মাসে নিয়ে যায়। খেতে যায় কান্ত কুন্ডুর বাড়িতে। তার আগে রাস্তার কলে চান করে যায়। কান্তর প্রথম বউ মরেছে। ছেলেপিলে ছিল না। এ পক্ষে বিয়ে করেছে চার বছর। ছেলেপিলে হয় নি। এ বউটার বয়স কম, দেখতে সুন্দরী। নিজের বিধবা মাসীকে হেঁশেলে রেখেছে। সে বেন্দাকে বলে বোঁটকা পাঁটা। ওর গায়ে নাকি বোঁটকা গন্ধ। কান্তর বউ বলে ওল কচু। ওর মুখটা নাকি ওল কচুর মতো দেখতে। ওর নিজের মা বলে, 'খ্যাংরামুখো, ষেঁড়ো, ড্যাকরা, মড়া ভাতারের ছাঁ...।' বাদ বাকি উচ্চারণের যোগ্য না। উচ্চারণের যোগ্য না, এমন অনেক বিশেষণ কান্তর আছে। বেন্দার তাতে কিছুই যায় আসে না। ও সবাইকে মনে মনে ইঁদুর বলে, বা ইঁদুরের বাচ্ছা। কান্তর মাসী-শাশুড়িটা খেতে কম দেয়। তবু ওর কিছু যায় আসে না। জীবনে একটি মাত্র উত্তেজনা নিয়েও বেঁচে আছে। একটি মাত্র কারণে। ইঁদুর মারা খেলা। এই খেলার সঙ্গে আছে উত্তেজনাময় বাজী। জুয়ার মতো। এক নেংটি ইঁদুরে পাঁচ পয়সা। একটা ধাড়ি ইঁদুরের জন্য দশ পয়সা। কান্ত কুন্ডু দেয়।...

রাত্রি সাড়ে ন-টা। বেন্দা খেয়ে এলো। কান্ত কুন্ডু এ পক্ষের শালার সঙ্গে বসে, হিসাবপত্র শেষ করে, চাবির গোছা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। দোকানের সামনের দরজা আগেই বন্ধ হয়েছে। দোকানের পিছনে একটি খালি গুদামঘর আছে। বেন্দা রাত্রে সেই ঘরে থাকে। সেই ঘরের পিছনে যাবার একটি দরজা আছে। দরজার বাইরে তিন ফুট চওড়া লম্বা ফালি, তার পশ্চিম সীমান্তে খাটা পায়খানা। ফালি জমিটা পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। পাঁচিলের মাথায় কাঁচের টুকরো গাঁথা, তার ওপরে তিন প্রস্থ কাঁটাতারের বেড়া। দোকানঘর থেকে গুদামঘরে ঢোকার একটিমাত্র দরজা। বেন্দাকে সেই ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে কান্ত কুন্ডু চারটে তালায় চাবি দিল। তারপরে বাইরের দরজা, তার ওপরে কোলাপসিবল গেট টেনে, এক ডজন তালা মেরে চলে গেল। ব্যবস্থা সব পাকা।

বেন্দা এখন গুদামঘরে একলা। মোমবাতি আর দেশলাই এক জায়গায় রাখা থাকে। এ ঘরে বিজলিবাতি আছে, তার সুইচ্ দোকান ঘরে। রাত্রে নিভিয়ে দেওয়া হয়। বেন্দাকে আলোর প্রয়োজনে মোমবাতি জ্বালাতে হয়। ও অন্ধকারে এগিয়ে গেল একটা পিপের কাছে। হাত বাড়াল পিপের ওপরে অব্যর্থ জায়গায়। দেশলাই হাতে নিয়ে, কাঠি জ্বালিয়ে, পিপের ওপর দাঁড় করানো সরু মোমবাতি জ্বালল। দুই বস্তা ভুষির ফাঁক থেকে টেনে বের করল কাঁথা আর তেলচিটে বালিশ। ভুষির বস্তার ওপরে তা পাতল। একটা বার্লির ছোট কৌটো বের করল ছোলার বস্তার আড়াল থেকে। খুলে দেখল তিনটি বিড়ি আছে। একটি বিড়ি নিয়ে, কৌটো যথাস্থানে রেখে, মোমবাতির শিষে বিড়ি ধরাল। তারপর গুদামঘরটার চারিদিকে দেখল।

সরু মোমবাতির আলোয় লম্বা ফালি গুদামঘরের সবটা দেখা যায় না। রক্তিম আলোর গায়ে বস্তা টিন পিপে, নানা কিছুর ফাঁকে ফাঁকে খামচা খামচা অন্ধকার। সেই অন্ধকারে আর লাল আলোয় ওর ছায়াটা বিরাট, যার অবয়বটা অমানুষিক। বেন্দা বিড়ি টানতে টানতে, পাঁচিলের দিকের দরজাটা খুলল। প্যান্ট তুলে প্রস্রাব করল। পাঁচিলের ওপাশে বাজার। ও প্রস্রাব করে দরজা বন্ধ করে আবার পিপের কাছে ফিরে এলো। স্থির অপলক চোখে চারিদিকে দেখতে লাগল। বিড়ির ধোঁয়া ছাড়তে লাগল নাক মুখ দিয়ে। ওর মুখের চামড়া টান টান হয়ে উঠছে, চোখ জ্বলতে আরম্ভ করেছে। ভিতরে বাইরে, যে-কোনো শব্দ ও উৎকর্ণ হয়ে শুনছে। সারাদিনের কাজের মধ্যে ওর এই চেহারা দেখা যায় না। ও যেন কোনো মন্ত্রের সাধনে শরীরে শক্তি সঞ্চার করছে, উত্তেজনা ছড়াচ্ছে চোখে মুখে। বিড়ি টানতে লাগল, ধোঁয়া ছাড়তে লাগল। দপ্‌দপ্ করতে লাগল, ওর নরম থলথলে শরীরের পেশিগুলো শক্ত হয়ে উঠতে লাগল। মুখে ফুটে উঠতে লাগল একটা কঠিন হিংস্রতা। গুদামের কোথায় খুট করে একটা শব্দ হলো। ও মুখ ফেরাল না, চোখের পাতা নামিয়ে ঘাড় কাত করে উৎকর্ণ হয়ে শুনল।

বিড়ি টানা শেষ হলো। বিড়ির অঙ্গারটা একবার চোখের সামনে তুলে দেখল, তারপর অনায়াসেই অঙ্গার দুই আঙুলে টিপে নিভিয়ে বিড়িটা ফেলে দিল। পিপের পিছনে হাত বাড়িয়ে বের করে নিয়ে এলো একটা বাঁশের লাঠি। তেল

চকচকে, এক দিক মুণ্ডুর মতো মোটা। লাঠিটা তুলে একবার চোখের সামনে দেখল। তারপর সরু দিকটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরল। মুখ ফিরিয়ে মোমবাতির শিষটা ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিল। অন্ধকার ঝুপ করে নামল একটা ভারি পর্দার মতো। বেন্দা পিপের কাছ থেকে আস্তে আস্তে নিঃশব্দে হেঁটে কয়েক পা গিয়ে নিশ্চল পাথরের মূর্তির মতো এসে দাঁড়াল।

বেন্দার পৃথিবীও এখন নিশ্চল। জগৎসংসার অন্ধকার, মানুষ নামক জীবদের অস্তিত্বহীন। সময় থমকিয়ে আছে।

বেন্দা দেখতে পেল, দুটি ছোট লাল অঙ্গারের বিন্দু। দেখা দিয়েই তা একদিকে ছুটে চলে গেল। বেন্দা স্থির। আবার দুটি অঙ্গারবিন্দু ওপরের চালের কাছে ফুটে উঠেই, দ্রুত নিচের দিকে অন্ধকারে মিশে গেল। বেন্দা নিশ্চল। চারটি অঙ্গারবিন্দু ওর কয়েক হাত দূর দিয়ে এপার ওপার চলে গেল। বেন্দা পাথরের মূর্তি। দুটি অঙ্গারবিন্দু ঝটিতি এগিয়ে এলো, মুহূর্তেই থমকিয়ে পিছনে হারিয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ আবার দুটি অঙ্গারবিন্দু ওর বাঁ পাশ থেকে, পায়ের কাছে এসে দাঁড়াল, চকিতেই পায়ের পাশ দিয়ে ডান দিকে চলে গেল।

এইরকম জোড়া জোড়া অঙ্গারবিন্দুরা, ওপরে নিচে, দূরে সামনে, ছুটে ছিটকে বেড়াতে লাগল। তারপরে যেন মন্ত্রমুগ্ধ সম্মোহিতের মতো, কতগুলো অঙ্গারবিন্দু ওর সামনে এসে লাফালাফি করতে লাগল। বেন্দার হাতের মুঠি শক্ত হলো, লাঠি উঠল এবং অবিশ্বাস্য দ্রুত লাঠি প্রচণ্ড আঘাতে উঠল, থামল। ও লাফিয়ে দাপিয়ে লাঠির মোটা মুণ্ডু দিয়ে পেটাতে লাগল। তারপরেই আর একপাশে সরে গিয়ে আবার পাথরের মূর্তির মতো দাঁড়াল। পৃথিবীও আবার থমকিয়ে নিশ্চল হয়ে গেল।

সময়ের কোনো হিসাব নেই, অন্ধকারের গাঢ়তার কোনো মাপজোখ নেই। আবার জোড়া জোড়া অঙ্গারবিন্দু ওপরে নিচে মেঝেয় বস্তায় পিপেয় জেগে উঠতে লাগল। ছুটে ছিটকে ঘুরে ফিরে আবার সম্মোহিতের মতো বেন্দার কাছাকাছি কতগুলো অঙ্গারবিন্দু লাফালাফি করতে লাগল। বেন্দার হাত আবার উঠল, আর প্রতিটি আঘাত যেন বিদ্যুচ্চকিতের মতো পড়তে লাগল। তারপরে পিপের কাছে সরে এসে, দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে মোমবাতি ধরালো। মোমবাতির আলো আস্তে আস্তে অন্ধকারে ঠেলে ঠেলে সরালো। বেন্দা এদিকে ওদিকে চোখ বুলিয়ে, মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল তিনটে নেংটি একটা ধাড়ি ইঁদুরের মৃতদেহ। তুলে রাখল পিপের ওপরে মোমবাতির কাছে। চকচকে চোখে তাকিয়ে দেখল। ওর উত্তেজিত মুখে হিংস্র হাসি। গায়ে মুখে ঘাম চিকচিক করছে। মাথার চুলগুলো কপালে গালে ছড়িয়ে পড়েছে। বলল, 'শালা, ইঁদুরের বাচ্ছা ইঁদুর।' …লাঠিটা পিপের পিছনে রাখল। ফুঁ দিয়ে নেভাল মোমবাতি। অন্ধকারে অব্যর্থ ভুষির বস্তার ওপরে পাতা কাঁথার ওপরে গিয়ে, চিটে বালিশে মাথা রেখে শুয়ে পড়ল।

সারাদিন নামহীন জীবনের দুর্জয় পরিশ্রমের পরে, অনেক অপমান আর অপূর্ণ খাওয়ার পরে, এই এক সুখের খেলা। এতো সুখ, গভীর ঘুম আসতে দেরি হয়

না। এই সুখ আর আরাম ভোর পর্যন্ত। তারপরে আবার শুরু আর একটা অভিশপ্ত দিনের। রাত্রি ন-টার পরে আবার সেই খেলা, খেলার উত্তেজনা আর সুখ, তারপরে গভীর নিদ্রার আরাম।

বৃন্দার ভাববার অবকাশ নেই, কোন্ অজ্ঞাত শক্তির হাতে, ওর এই দিন ও রাত্রের জীবন নির্ধারিত আর পরিচালিত হয়। এই জীবনের শেষ কোথায়, ওর জানা নেই। এই জীবনযাপনের শরীরে কতগুলো ছিদ্র ক্ষণেকের জন্য ফেটে বেরোয়। সেই সব ছিদ্রে ভেসে ওঠে খেলার মাঠে খেলার ছবি। অনেক কিশোরের উল্লাসের ধ্বনি। সেই সব ছবি আর শব্দ থাকে নিষেধের গণ্ডীতে। ছিদ্রগুলো নিষিদ্ধ।



রাজা

রাজা দরবার কক্ষের অলিন্দ দিয়ে যেতে যেতে, একবার পিছন ফিরে তাকালেন। পিছনে, লালের ওপর সোনালী নকশা আঁকা দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিলেন, রাজার বাবার আমলের বৃদ্ধ উপদেষ্টা। বৃদ্ধ উপদেষ্টার মোটা লেন্সের চশমার ওপরে, কালো কাঁচের ঠুলির ঢাকা। তাঁর চোখ উজ্জ্বল আলো সহ্য করতে পারে না। রাজা বুঝতে পারলেন, উপদেষ্টা তাঁর সঙ্গেই, পিছন পিছন দরবার কক্ষ থেকে বেরিয়ে এসেছেন। দরবার কক্ষ? ঠিক তা না। ঐ ঘরকে এখন প্রাসাদের মন্ত্রণা কক্ষ বলা যায়। তাঁর বাবার আমলে, অবিশ্যি এ ঘর দরবার কক্ষই ছিল, আর দরবার কক্ষেই আইন তৈরি হতো, সেই আইনের বলে দেশ শাসিত পালিত হতো। বর্তমান রাজা, গত এক মাস আগেও দেশ শাসন করছিলেন, নতুন আইন-সভায় বসে। এই আইনসভায় ভোটের দ্বারা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে, তিনি দেশ পরিচালনা করেছিলেন। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকার অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা, তা নির্ভরশীল ছিল রাজার ওপরে। শেষ নির্বাচন তিনিই করতেন, যাঁকে যে-বিষয়-বিভাগের দায়িত্বের ভার দেবার তিনিই দিতেন। প্রয়োজন হলে পরিবর্তন, ক্ষমতার অধিগ্রহণ, বিতাড়ন, গ্রহণ, সবই ছিল তাঁর হাতে।

এ রাজ্যের সংবিধান অনুযায়ী,রাজা ছিলেন সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী। রাজপরিবারের নিরঙ্কুশ শাসনের পরিবর্তে, জন-প্রতিনিধিদের নির্বাচনের সংবিধান, গত রাজার আমলেই প্রথম প্রচলিত হয়েছিল। নির্বাচনে যাঁরা অংশগ্রহণ করতেন, তাঁদের একটা বড় অংশ—পরিবার এবং ব্যক্তিকে মনোনয়ন করতেন স্বয়ং রাজা। নির্বাচনের ফলাফল হতো আশানুরূপ, রাজার জন-প্রতিনিধিরাই বরাবর সংখ্যাগরিষ্ঠ হতেন। প্রথম নির্বাচনের সময় থেকেই, তৈরি হয়েছিল নতুন আইনসভা। রাজা নিজেকে সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী রেখে এইভাবে রাজ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। জন-প্রতিনিধিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা নির্বাচন করতেন তিনি, তাঁদের নিয়ে দেশ শাসন করতেন। গত একটা যুগ এভাবে চলে আসছিল।

তিন মাস আগে মন্ত্রিসভায় ভাঙন ধরেছিল, যে-ভাঙন, বর্তমান রাজা রক্ষা করতে পারেন নি। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিরোধকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রিসভায় ভাঙন ধরেছিল, আর তার পরিণতিতে দেখা দিয়েছিল বিদ্রোহ। বিদ্রোহের মূল দাবী ছিল দুটি। এক, নতুন নির্বাচন। দুই, রাজার ক্ষমতা সংকোচ।

রাজা—যাঁরা নিজেদের সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী মনে করেন, তাঁরা কখনো বিদ্রোহকে মেনে নিতে পারেন না, সহ্যও করতে পারেন না। এটা একটা প্রাকৃতিক ঘটনার মতো। তিনি মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়েছিলেন, নিজের হাতে শাসনভার তুলে নিয়েছিলেন।

কিন্তু বিদ্রোহ দমন করতে পারেন নি, বরং তা সমগ্র রাজ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল আরো প্রবলভাবে। বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেছিলেন, প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর দল।
রাজার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর বিরোধের কারণ ছিল, উভয়ের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ। রাজা ক্রুদ্ধ বিস্ময়ে ঝলকিয়ে উঠেছিলেন। এরকম একটা প্রশ্ন আদৌ উঠতে পারে, তিনি কখনো ভাবেন নি। কারণ তিনি রাজা। তিনশো বছরের ওপর, তাঁরা বংশানুক্রমে রাজ্য শাসন করে এসেছেন। প্রধানমন্ত্রীর জবাব ছিল, তিনি জনগণের দ্বারা নির্বাচিত। দেশের মানুষ রাজার থেকেও বড় অধিকার তাঁকেই দিয়েছে।
রাজা তাঁর নিজস্ব উপদেষ্টাদের সঙ্গে পরামর্শ করে, বিদ্রোহের পটভূমিতেই নির্বাচনের সম্মতি দিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁর মনোনীত প্রার্থীরা নিশ্চিত নির্বাচিত হবে। বিদ্রোহীরা বেশি সময় পেলে, রাজার ভাবমূর্তি নষ্ট হতে পারে, বিদ্রোহীরা নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারে, উপদেষ্টাদের এই পরামর্শে তিনি অবিলম্বে নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে, ফল হয়েছে বিপরীত। বিদ্রোহীরা লাভ করেছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা।
বিদ্রোহীরা জয়লাভ করার পরেই, তাদের প্রথম দাবীকে কার্যকরী করার প্রস্তাব নিয়েছে, রাজার ক্ষমতা সংকোচ। সংকোচ না, আইনসভায় রাজার সমস্ত অধিকারকে অস্বীকার করা হয়েছে, অতএব শাসনের ক্ষেত্রেও। সামরিক আর পুলিশবাহিনী নির্বাচিত সরকারের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছে। রাজাকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অতঃপর রাজা এবং তাঁর পরিবারবর্গের জন্য, এবং তাঁর নিজস্ব সীমিত রক্ষীদলের জন্য সরকার থেকে বরাদ্দ করা অর্থ দেওয়া হবে।
প্রাসাদের মন্দিরে এ অসময়ে ঘণ্টা বাজার কারণ, রাজ-পরিবারের শুভ আর মঙ্গল কামনায়, রাজ-পুরোহিত দিবারাত্র পূজা করে চলেছেন। কিন্তু মন্দিরের ঘণ্টার শব্দ ছাপিয়ে, চারদিক থেকে জনতার উল্লাসের ধ্বনি ভেসে আসছে। তাদের মিছিল সব সময়েই বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণ করছে। তাদের সমবেত গান, বাদ্য আর নানারকম ধ্বনি, সমস্ত শহরকে মাতিয়ে রেখেছে।
রাজা বৃদ্ধ উপদেষ্টার দিকে ফিরে তাকালেন। উপদেষ্টার মোটা লেন্সের চশমা কালো কাঁচে ঢাকা থাকলেও, স্পষ্টতই যেন তাঁর দৃষ্টি দ্বিধাজড়িত এবং ম্রিয়মাণ।
রাজা মুখ ফিরিয়ে রেলিং-এর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাঁর গায়ের হাইল্যান্ডার সামরিক পোশাকে রোদ পড়লো, আর রঙের ছটা ছড়িয়ে পড়লো। সুতীক্ষ্ণ শীতেও বেলা এগারোটার এই রোদে রাজা কোনো আরাম অনুভব করলেন না। তিনি অন্যমনস্ক চোখে দূরের পাহাড়ের দিকে তাকালেন। কিন্তু তাঁর চোখে ভাসছে জিগোর মুখ। জিগো প্রধানমন্ত্রী, তাঁর পরম শত্রু।
রাজার বয়স এখন পঞ্চাশের উপান্তে। এ মাসেই তিনি আটচল্লিশ বৎসর বয়সে পদার্পণ করেছেন। নাতিদীর্ঘ স্বাস্থ্যবান শরীর, টকটকে ফরসা বলতে যা বোঝায়, সেইরকম তাঁর গায়ের রঙ। ঠোঁট আর নাক কিঞ্চিৎ মোটা, বাদামী চোখ অত্যুজ্জ্বল। মাথার চুলে, কপালের কাছে, কানের পাশে রগের ওপর কয়েকটি রুপোলি ঝিলিক চোখে পড়ে। যে-কোনো পোশাকেই তাঁকে চমৎকার মানায়, কিন্তু এই হাইল্যান্ডার সামরিক পোশাকে তাঁকে যেন আরো সুন্দর দেখাচ্ছে। উঁচু হিলের জুতো, লাল

উলের মোজা হাঁটুর গোড়ায়, গোল ঘেরাওয়ের চেক কাটা লাল নীলের স্কার্ট আর সেই রঙেরই গলাবন্ধ, হাতের মণিবন্ধ পর্যন্ত ঢাকা জামা, মাথার টুপির সঙ্গে পাখির পালকের মতো লেস্ বসানো। হাতে একটা ব্যাগপাইপ বগলে চেপে নিলেই, সেই সুন্দর চেনা ছবিটির মতো মনে হতো। কেন যে আজ এই পোশাকটি পরেছেন, তাঁর নিজেরও সঠিক কোনো ব্যাখ্যা নেই। মারিয়া—মারিয়ান কি বলেছিলেন? মনে পড়ছে না।

রাজা লেখাপড়া শিখেছেন ইংল্যান্ডে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সামান্য কিছুদিন বৃটিশ রয়্যাল আর্মিতে শিক্ষানবিসি করেছিলেন। প্রকৃত সামরিক শিক্ষা লাভ করেছিলেন দেরাদুনে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের একেবারে শেষ দিকে, তিনি রয়্যাল আর্মিতে কিছুকালের জন্য নিয়মিত সৈনিকবৃত্তি গ্রহণ করলেও, যুদ্ধ আদৌ কখনো করেন নি। দরকারও হয় নি। অশ্বারোহণ আর পোলো খেলায় তিনি বিশেষ পারদর্শী। প্রত্যেক বছর পশ্চিম ইওরোপ আর আমেরিকায় একবার সপরিবারে বেড়াতে যান, ঠিক এ সময়টাতেই। স্বভাবতই, রাজপরিবার এবং রাজ্যের এই চরম দুর্দিনে আর সংকটে, এ বছর যাওয়া সম্ভব হলো না। বিদেশে তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবান্ধবের সংখ্যা অনেক।

'কিন্তু জিগোকে প্রাসাদে ডেকে আমি যদি তাঁকে সংবর্ধনা দিই, তার পরিণতি কী হবে?' রাজা মুখ না ফিরিয়েই কথাগুলো বললেন, তারপরে বৃদ্ধ উপদেষ্টার দিকে ফিরে তাকালেন। আবার বললেন, 'তাতে কি সবাই এ কথাই ভাববে না, আমি ভয় পেয়েছি, নতুন করে আবার একটা আপসরফা করার চেষ্টা করছি, জিগো যা কখনোই মেনে নেবে না?'

বৃদ্ধ উপদেষ্টা নীল বর্ণের ঢলঢলে স্যুট পরেছিলেন। মাথার টুপিতে তাঁর পাকা চুল আর টাক ঢাকা। লাল নেকটাইয়ের মাঝখানে হীরের কাঁটা গাঁথা। তিনি দু' পা এগিয়ে এসে, ফ্যাসফেসে স্বরে বললেন, 'সংবর্ধনার ভাষাটা কোনোরকমেই আপসরফার দিকে যাবে না, সেটা পরিষ্কার করে দিতে হবে।' ভয় পাবার কোনো প্রশ্নই নেই। সমস্ত কথাই হবে খুব সংক্ষিপ্ত, অথচ হৃদ্যতাপূর্ণ। এটা আমি করতে বলছি, ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে।'

রাজা কোনো কথা বললেন না, কেবল ভাবলেশহীন চোখে তাকিয়ে রইলেন। বৃদ্ধ উপদেষ্টার রেখাবহুল অনুজ্জ্বল সোনালী মুখে একটা অস্বস্তির ভাব ফুটলো। তিনি একবার মুখ নিচু করলেন, আবার তুললেন, বললেন, 'আমি হয়তো আগের ব্যাপারে ভুল পরামর্শ দিয়েছি, যদিও সমস্ত ঘটনাটা আমার কাছে দৈব দুর্ঘটনার মতো মনে হয়েছে। রাজ্যের সঠিক অবস্থার সংবাদ আমরা পাই নি, বা আমাদের দেওয়া হয় নি, আমরা প্রস্তুত হতে পারি নি। কিন্তু তার জন্য আমাদের নিষ্ক্রিয় থাকা চলে না। নিষ্ক্রিয় থাকার থেকে খারাপ কিছু নেই, সেটা খুবই বিপজ্জনক।'

রাজা জিজ্ঞাসার স্বরে বললেন, 'জিগোকে প্রাসাদে ডেকে সংবর্ধনা দিলেই কি সে-বিপদ কাটবে?'

'আমি তা বলছি না।' বৃদ্ধ উপদেষ্টা বললেন, 'বিপদ যা ঘটেছে, তারপরে

নিষ্ক্রিয়তার অর্থ মৃত্যু। জিগোকে রাজপ্রাসাদে এনে সংবর্ধনা দেওয়ার অর্থ, তোমার বর্তমান অচল অবস্থাকে সচল করার একটা চেষ্টা। সবকিছু বাদ দিয়েও এখন আমাদের মনে রাখতে হবে, জিগোর শরীরে তোমাদের বংশের রক্ত কিঞ্চিৎ আছে, সে তোমার বন্ধুস্থানীয় ছিল।'

রাজার ঠোঁটে বাঁকা হাসি ফুটলো, বললেন, 'কিন্তু এখন সে জননেতা, আমার মতো নীল রক্তের ধারক সে নয়। সে নিজেই একথা প্রচার করছে।'

'তার দিক থেকে সে ঠিক প্রচারই করছে।' বৃদ্ধ উপদেষ্টা ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বললেন, তাঁর বাঁধানো দাঁত একটু দেখা গেল। আবার বললেন, 'জিগো জন-প্রতিনিধি, লোকের ধারণা, এরকম কিছু করলে, নীল রক্ত লালে পরিবর্তিত হয়। লোকের কোনো কোনো ধারণাকে আঘাত করা অর্থহীন। আমরাও বিশ্বাস করবো, জিগো এখন লাল রক্তের ধারক। বাস্তব অবস্থার ক্ষেত্রে এ বিষয়টা খুবই সামান্য। পৃথিবীর বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়ার সব থেকে সহজ জনপ্রিয় রাস্তাটাই জিগো নিয়েছে, তাই না?' তাঁর কালো ঠুলিতে আলোর রেখার জিজ্ঞাসা ফুটলো।

রাজা বললেন, 'ওরা বলে, স্বৈরতন্ত্রের উৎখাত।'

'স্বেচ্ছাচারিতার অবসান।' বৃদ্ধ উপদেষ্টা বললেন, 'প্রিয় মূল্যবান গেইলো! জনগণের রাজা হিসাবে, একথাটা তুমিও উচ্চারণ করতে পারতে। কিন্তু সে অভি-জ্ঞতা আমাদের ছিল না। পরিবর্তিত পটভূমির জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকা উচিত। আমাদের মনে রাখা দরকার, ঝর্ণার জল কখনো পিছনে ফেরে না, সামনেই যায়, আর তার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে না চলতে পারলেই পৃথিবীর যে-কোনো মহারথীর পতন হয়।' তিনি চুপ করলেন।

রাজা বুঝতে পারলেন, উপদেষ্টা অনুমান করার চেষ্টা করছেন, তিনি তাঁর কথা শুনে বিরক্ত বোধ করছেন কী না। বুঝতে পারছেন, উপদেষ্টা আরো কিছু কথা বলতে চান। তিনি বললেন, 'আপনি বলুন, আমি আপনার কথা শুনছি।'

বৃদ্ধ উপদেষ্টার কালো ঠুলিতে যেন উজ্জ্বলতা ফুটলো। তাঁর স্বাভাবিক মন্থর আর ফ্যাসফেসে স্বরে বললেন, 'আমি একটা খুব পুরনো কথা তোমাকে বলতে চাই। পৃথিবীতে কোনো সমাজ আর শাসনব্যবস্থাই নিখুঁত আর চিরস্থায়ী হতে পারে না, যে-কারণে পৃথিবীর কয়েক শো কোটি মানুষ চিরদিন কখনোই স্থির আর অবিচলিত থাকতে পারে না। মানুষ চিরদিনই, ইতিহাসের একটা মোড়ে এসে, ভাঙাচোরা করবে, গড়ে পিটেও নেবে। এই ভাঙাগড়াকে বুঝে, সঠিক নেতৃত্বে যে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, সে দীর্ঘদিন নিজের আসনে থাকবে, ইতিহাস তাকে মনে রাখবে।'

রাজা অবাক উৎকণ্ঠিত স্বরে বলে উঠলেন, 'ভীষণ কঠিন কাজ।'

'হ্যাঁ, বুদ্ধি কৌশল শক্তি, সবই খুব জবরদস্ত হওয়া দরকার।' বৃদ্ধ উপদেষ্টা বললেন, 'মোহ আর বিরাগ, দুটোই ত্যাগ করা উচিত। এর জন্য প্রস্তুতি দরকার। জিগোকে কেন প্রাসাদে ডেকে তোমার সংবর্ধনা দেওয়া উচিত, এখন বুঝতে পারছো?'

রাজার রক্তাভ ম্লান মুখে ঔৎসুক্য দেখা দিল, বললেন, 'আপনি বলুন।'
'আমি চাই, রাজ্যের লোকে জানুক, তুমি বাস্তব অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করেছ।' বৃদ্ধ উপদেষ্টা এবার একটু দ্রুত বললেন, 'এবং যা ঘটেছে তা অনিবার্যভাবেই ঘটেছে, যথার্থ যা ঘটবার তা-ই ঘটেছে, তুমি এটা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেছ। তা বলে কি তুমি খুশিতে আত্মহারা? আদৌ না। লোকে জানুক, বড় দুঃখের মধ্যে তুমি এই সত্য উপলব্ধি করেছ, আর তা-ই তুমি এই বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়াতে চাইছ। সব হারিয়ে তুমি উদার হয়েছ, জিগোকে প্রাসাদে ডেকে সংবর্ধনা দিচ্ছ। সমস্ত ব্যাপারটাই হতে হবে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যভাবে, তা হলেই, যারা ভাববে তুমি ভয় পেয়ে বা দায়ে পড়ে একাজ করছো, তাদের সে-ধারণা আস্তে আস্তে কেটে যাবে। এর দ্বারা কী লাভ হবে, তুমি বুঝতে পারছো?'
রাজা অবাক স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'
'এই প্রাসাদে আবদ্ধ জীবন থেকে, আস্তে আস্তে খুব ধীরে তুমি মুক্তি পাবে।' বৃদ্ধ উপদেষ্টা যেন প্রত্যেকটি কথা বেদ-বাণীর মতো উচ্চারণ করলেন, 'ক্ষমতা থেকে তুমি বিচ্যুত। কিন্তু রাজ্যের লোকের সঙ্গে তোমার মেলামেশা শুরু হবে, সংযোগ স্থাপিত হবে বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে, আর সেখানেই তোমার অগ্নিপরীক্ষা, নতুন যাত্রা পথের। জিগো বিদ্রোহের শেষ কথা না, সে আর তার দলের নেতারাই শেষ জনপ্রতিনিধি না।'
রাজার ম্লান মুখ, ছায়া-বিষাদ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। তিনি সহসা কিছু বললেন না, গভীর চিন্তামগ্নতার মধ্যে অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন।
রাজপ্রাসাদের মন্দিরের ঘণ্টার ক্ষীণ শব্দ ছাপিয়ে, জনতার উল্লাসের নানা ধ্বনি ভেসে আসছে।
রাজার সামনে দাঁড়িয়ে প্রাসাদরক্ষী বাহিনীর প্রধানের শক্ত মুখে, উত্তেজনায় রক্তের ছটা লেগে গেল। তার শার্দুল চোখে অন্তহীন বিস্ময়, প্রায় স্খলিত স্বরে উচ্চারণ করলো, 'জিগোকে প্রাসাদে সংবর্ধনা?' তারপরে মুখ নিচু করে বললো, 'হিজ হাইনেস আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি ভেবেছিলাম জিগোকে প্রাসাদে ডেকে এনে আমার ওপর তাকে হত্যার দায়িত্ব দেওয়া হবে। আমাদের পরম শত্রুকে হত্যা করতে পারলে আমি সুখী হতাম।'
রাজা বললেন, 'পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমাদের ভিন্ন পথ ধরতে হবে।'
রক্ষী বাহিনীর প্রধান বিনীত গম্ভীর স্বরে বললো, 'হতে পারে, আমি রাজনীতি ঠিক বুঝি না। আপনি যা সিদ্ধান্ত নেবেন, তাই হবে, তবে, আপনি যদি সাহস দেন তো বলি, এতে আমার কোনো আনন্দই নেই, অপমান আর দুঃখ ছাড়া।'
রাজা চিন্তিত মুখে সরে গেলেন।

·

রাজমাতার ভ্রূকুটি চোখে গভীর বিস্ময়। তাঁর রক্তাভ মুখের চামড়া টান টান হয়ে উঠেছে। তিনি নিচু রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'কথাটা আমার কাছে সাপের ছোবলের মতো বাজলো। জিগোকে তুমি প্রাসাদে ডেকে সংবর্ধনা দেবে? যে আমার ছেলেকে পথের ভিখারি করেছে?'

'আমাদের বৃদ্ধ উপদেষ্টা ডওরির কথা ভুলে যেও না মা।' রাজা বললেন, 'এ সংবর্ধনা এক দীর্ঘ সংগ্রামের শুরুর কৌশল মাত্র। এভাবে প্রাসাদের মধ্যে বন্দী আর নিষ্ক্রিয় থাকা বিপজ্জনক। একটা কোনো পথ আমাদের খুলতেই হবে, আর তা এভাবেই খুলতে হবে।'

রাজমাতার কঠিন মুখ বিন্দুমাত্র কোমল হলো না, বললেন, 'বৃদ্ধ ডওরি এখন এই উপদেশ দিচ্ছেন। জিগো যখন ক্ষমতার লোভে আস্তে আস্তে তোমাকে ডিঙিয়ে জননেতা হয়ে উঠেছিল, তখন তাঁর খেয়াল ছিল না। জিগো নিজে একটা অকৃতজ্ঞ। ওর মাকে আমি কী না দিয়েছি? একটি সমৃদ্ধ জেলার একটা বড় অংশ তাকে আমি ভোগ করতে দিয়েছিলাম। কোনো অধিকার ছিল না তার পাবার। জিগোকে তুমিই ক্ষমতাশালী করেছ।'

রাজা বললেন, 'আপাতত আমাদের এসব কথা ভুলে যেতে হবে!'

রাজমাতা বললেন, 'সেটা সম্ভব না। জিগোকে তুমি সংবর্ধনা দিতে চাও, দাও। আমি সেখানে উপস্থিত থাকবো না।'

রাজার মুখ বিষণ্ণ আর শুষ্ক হয়ে উঠলো।

'ওহ্, গেইলো, ডারলিং।' রানী মারিয়ান আহত বিস্ময়ে বলে উঠলেন, 'জিগোকে প্রাসাদে সংবর্ধনা! আমি ভাবতে পারি না।'

রাজা তাঁর আমেরিকান রানীকে বুকের দিকে টেনে নিলেন। মারিয়ানের বয়স অনধিক তিরিশ। কিন্তু তাঁকে দেখায় আরো কম বয়সের তরুণীর মতো। তাঁর রূপ, সাজ-পোশাক, সবই মনে করিয়ে দেয়, হলিউডের যে-কোনো সুন্দরী চিত্রাভিনেত্রীকে, যদিও মারিয়ান ওয়াশিংটনের এক বিশিষ্ট রাজনীতিকের কন্যা। রাজা গেইলোর সংগে দশ বছর আগে তাঁর পরিচয় হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়ায়। রাজার নিঃসন্তান প্রথম স্ত্রী তখনও বেঁচে ছিলেন এবং তাঁর সম্মতিক্রমেই মারিয়ানকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। পাঁচ বছর আগে প্রথম স্ত্রী রাজার প্রধান মহিষী হিসাবে মারা গিয়েছেন। মারিয়ান এখন একমাত্র রানী, এবং তিনি রাজাকে একটি পুত্রসন্তান উপহার দিয়েছেন, যার বয়স এখন ছয়।

রাজা বললেন, 'মারিয়ান, ভাবতে পারা খুবই কষ্টকর, আমি বুঝি। কিন্তু এ ছাড়া কোনো উপায় নেই। এরকম নিশ্চেষ্ট বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব না।'

'জিগোকে আমি ঘৃণা করি।' মারিয়ান কঠিন স্বরে বললেন।

রাজা বললেন, 'এ কথা বলবার দরকার করে না, আমি জানি।'

'জিগোকে এক সময়ে আমি বন্ধুর মতো মনে করতাম।' মারিয়ানের স্বরে জ্বালা ফুটে উঠলো। 'কারণ আমি তাকে তোমারও বন্ধু মনে করতাম। আমি তার সংগে এই প্রাসাদে দাবা খেলেছি, করমর্দনের জন্য আমার হাত তাকে স্পর্শ করতে দিয়েছি। আর সে আমার সমস্ত স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিয়েছে।'

রাজা বললেন, 'মারিয়ান, তোমার স্বপ্নকে আবার যেন বাস্তব করে তোলা যায়, সেই জন্যই এই সংবর্ধনার আয়োজন।'

'আর আমাকে যদি সেই সংবর্ধনায় অংশ নিতে হয়', মারিয়ান নিচু শক্ত স্বরে

বললেন, 'তা হলে তা হবে নিষ্প্রাণ কাঠের পুতুলের মতো। জিগোর দিকে তাকিয়ে আমি সামান্য ভদ্রতাসূচক হাসি হাসতে পারবো না।'

রাজা মারিয়ানের রক্তাভ কঠিন মুখের দিকে তাকালেন। মারিয়ানকে তিনি দোষ দিতে পারলেন না, রাগ করতে পারলেন না, বিষণ্ণ মুখে নিশ্বাস ফেললেন।

রাজভগ্নী জ্বলন্ত সিগারেটসহ দীর্ঘ পাইপ দাঁতে কামড়ে ধরে, তাঁর অগ্রজ, রাজার দিকে তাকালেন। তাঁর নাসারন্ধ্র স্ফীত। তপ্ত নিশ্বাসে সুরার মৃদু গন্ধ ছড়াচ্ছে। ছেলেদের মতো মাথার চুল এলোমেলো রুক্ষ। রাজ্যের সংবাদ পেয়ে এক সপ্তাহ আগে তিনি মিয়ামি থেকে ফিরে এসেছেন। বয়স চল্লিশ হলেও এখনো অবিবাহিতা।

রাজা আবার বললেন, 'জিগো নিশ্চয় লক্ষ্য করবে, তুমি সংবর্ধনায় ছিলে কী না।'

'তাতে কী আসে যায়?' রাজভগ্নী দাঁত থেকে পাইপ হাতে নিয়ে বললেন, 'আমি কি জিগো শুয়োরের বাচ্ছার জন্য পরোয়া করি?'

রাজা জানেন, তাঁর ভগ্নীর সঙ্গে জিগোর সম্পর্ক ছিল বন্ধুর থেকেও বেশি। তাদের অবৈধ সম্পর্কের কথা প্রাসাদে কারোর অজানা নেই। এক সময়ে ভাবা হতো, জিগো রাজপরিবারের জামাতা হবে। রাজার একথাও মনে আছে, তাঁকে ডিঙিয়ে জিগোকে ক্ষমতাশালী করার প্রচেষ্টা এই ভগ্নীই করেছিলেন। কিন্তু তখনকার সেই ষড়যন্ত্রের চেহারা ছিল আলাদা। রাজপরিবারে এই দারুণ পরিণতির কথা তখন কেউ ভাবতে পারতো না। সেই ষড়যন্ত্রের মূলে ছিল, রাজাকে সর্বদাই খানিকটা তটস্থ করে রাখা, ভগ্নীর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে তিনি যেন কোনো বাধা দিতে না পারেন।

রাজা বললেন, 'এটা পরোয়া করা না করার প্রশ্ন নয়। এটা একটা আমাদের সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা। নিতান্ত দায়ে পড়েই, কিন্তু খুব সুষ্ঠুভাবে কাজটা আমাদের করতে হবে।'

'আমার ভয় হয়, জিগোকে আমি মুখের ওপর খারাপ কিছু বলে ফেলবো।' রাজ-ভগ্নী ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'ওর রাজনৈতিক থেকে যে-কোনো লোভের কথা আমার থেকে বেশি কেউ জানে না। আমি ওকে সব থেকে বেশি জানি। ক্ষমতালাভই হচ্ছে ওর শেষ কথা। ও একটা হিংসুটে কুকুর ছাড়া কিছুই না।'

রাজা বললেন, 'তোমার সব কথাই আমি মেনে নিচ্ছি। এখন আমাদের যা কিছু করতে হবে সবই একটা প্রতিকারের জন্য। আমাদের সকলেরই শেষ কথা, ক্ষমতা।'

ভ্রাতাভগ্নী কয়েক মুহূর্ত পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপরে রাজভগ্নী একটা দমকা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'ঠিক আছে, জিগোর সংবর্ধনায় আমি থাকবো। তবে বৃদ্ধ ডওরি পরামর্শ দিতে একটু ভুল করেছেন। জিগোকে একলা সংবর্ধনা দিলে, সে হয়তো আসবে না। উচিত, তার মন্ত্রিমণ্ডলীর সমস্ত সদস্যকেই সংবর্ধনা দেওয়া, যাতে জিগোর কোনো দ্বিধা না থাকে।'

রাজা ভ্রূকুটি চোখে এক মুহূর্ত ভাবলেন, তারপর হেসে উঠে বললেন, 'ঠিক বলেছ। আমি বৃদ্ধ ডওরির সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলে নেবো।'

রাজভগ্নী হাত বাড়িয়ে, অগ্রজের হাত চেপে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, 'জিগোকে আমি পৃথিবীতে সব থেকে বেশি ঘৃণা করি।'

রাজা আনমনে ঘুরতে ঘুরতে তৈরি করা জলাশয়ের ওপর ঝুলন্ত সেতু পেরিয়ে প্রমোদ উদ্যানের ভবনে এসে ঢুকলেন। এ ভবনে, তিনিই একমাত্র পুরুষ যাঁর প্রবেশাধিকার আছে। এ রম্য ভবনে কিছু রমণী বাস করেন, যাঁরা রাজা এবং রাজ অতিথিদের নানা প্রমোদ অনুষ্ঠানে আনন্দ দান করে থাকেন। যাঁরা নৃত্য গীত এবং আরো নানা প্রমোদপূর্ণ আচরণে অভিজ্ঞ।
রাজার আগমন মাত্র রমণীরা সকলেই প্রায় তাঁকে অভ্যর্থনা করতে এগিয়ে এলেন। রাজা জিগোর সংবর্ধনার কথা ঘোষণা করলেন। তৎক্ষণাৎ প্রস্ফুটিত ফুলের মতো মুখগুলো যেন শুকিয়ে গেল। বিতৃষ্ণা তাদের চোখে মুখে। এমন কি, কারোর কারোর মুখে ঘৃণা ও ক্রোধের ঝলক।
রাজা বললেন, 'তোমাদের মনের কথা আমি জানি। কিন্তু এটা একটা পদ্ধতি আমাদেরই স্বার্থের জন্য। সকলেই প্রস্তুত থেকো।'

রাজার সংবর্ধনা প্রস্তাবের আবেদনপত্র মন্ত্রিসভাকে পাঠানো হলো। রাজ্যময় সংবাদ রটনা হলো অতি দ্রুত। প্রস্তাবের পক্ষে বিপক্ষে নানা বিতর্ক আর উত্তেজনার সৃষ্টি হলো। উল্লাস আর সন্দেহ অবিশ্বাস, এক সঙ্গেই দেখা দিল।
রাজার উত্তেজনা সর্বাপেক্ষা বেশি, অবিশ্যি রাজপরিবারেও। রাজা তাঁর সংবাদ-বাহকদের প্রতিটি কথা রুদ্ধশ্বাস হয়ে শুনছেন। দ্বিধা আর দ্বন্দ্বের মধ্যে কাটছে তাঁর প্রতিটি মুহূর্ত। সংবর্ধনা প্রস্তাব নিয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠকের খবর পেয়ে তিনি এক আসনে পাথরের মূর্তির মতো বসে রইলেন। প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের অর্থ, মৃত অন্ধকার। আসন ছেড়ে হয়তো আর উঠতে পারবেন না।
মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত রাজার কাছে পেঁছুবার আগেই রাজা সংবাদ পেলেন, তাঁর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। মন্ত্রিসভা সর্বসম্মতিক্রমে সংবর্ধনায় সম্মতি দিয়েছেন।
সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরেই রাজপ্রাসাদ যেন আরো থমথমিয়ে উঠলো। রাজ-পরিবারের ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায়, শত্রুকে সংবর্ধনা দিতে হবে, অথচ তা হবে আন্তরিক আর নিখুঁত। প্রস্তুতি পর্ব চললো এবং সেই দিনটিও এলো। মন্ত্রীদের সঙ্গে হাজার হাজার জনতার মিছিল যারা প্রাসাদের চারদিকে উল্লাস আর ধিক্কারের ধ্বনিতে মুখরিত করে তুললো। কিন্তু রাজপ্রাসাদ আর দরবার-কক্ষ জুড়ে যেন এক অদ্ভুত আড়ষ্টতা থমথমে ভাব।
রাজা নিজেকে শান্ত আর হাসিখুশি রাখতে চেষ্টা করছেন। তাঁর পাশের আসনে মারিয়ান বসে আছেন এবং অন্যান্য আসনে বিশিষ্ট পরামর্শদাতা ও উচ্চপদের কর্মচারীরা। তিনি ভিতর থেকে উদ্যান প্রান্তরের দূরে বিশাল সিংহ-দরজা দেখতে পাচ্ছেন, যেখানে রক্ষীবাহিনী মন্ত্রীদের অভ্যর্থনার জন্য অপেক্ষা করছে। চারদিক থেকে ভেসে আসছে জনতার কোলাহলের গুঞ্জন। রাজমাতা দরবারে

আসবেন না। রাজভগ্নী যথাসময়ে আসবেন এইরকম কথা আছে।

সিংহ-দরজার কাছে কোলাহল ফেটে পড়লো। রাজকীয় বাহিনীর বাজনা বেজে উঠলো। রাজা দেখলেন, সর্বাগ্রে জিগো এবং তাঁর পিছনে মন্ত্রিসভার সদস্যরা ঢুকছেন। অভ্যর্থনা করছে রক্ষীবাহিনীর প্রধান ডেংগা। জিগোকে দেখা মাত্র রাজার বুকে রক্তস্রোত প্রবল হয়ে উঠলো। আনন্দে না, দুঃখে আর ক্ষোভে।

কিন্তু এ কি! রাজা চমকিয়ে উঠলেন, দেখলেন জিগো ডেংগার কাঁধে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছেন। ডেংগা সসম্মানে মাথা ঝাঁকাচ্ছে এবং হাসছে। অথচ ডেংগা বলেছিল জিগোকে হত্যা করতে পারলে সে খুশি হতো। পরমুহূর্তেই রাজার মনে হলো ডেংগা অত্যন্ত নিখুঁতভাবে তার ভূমিকা পালন করছে।

বৃদ্ধ সভাসদ্ ডওকি রাজার দিকে একবার তাকালেন। তাঁর চোখের কালো কাঁচে দ্বিধা আর সংশয়। রাজাও তাঁর দিকে তাকালেন এবং ঈষৎ মাথা ঝাঁকিয়ে হাসলেন। ডওকি এগিয়ে গেলেন দরবারের দিকে। হাত বাড়িয়ে জিগোর হাত ধরে দরবারের ভিতর নিয়ে এলেন। রাজা দ্রুত এগিয়ে এলেন জিগোর দিকে। ডওকি আরো কয়েকজন পদস্থ ব্যক্তিকে নিয়ে অন্যান্য মন্ত্রীদের অভ্যর্থনা করে ভিতরে নিয়ে এলেন।

রাজা জিগোকে মারিয়ানের কাছে নিয়ে গেলেন। রানীকে যে-ভাবে সম্মান দেখানো উচিত জিগো সেইভাবেই নত হয়ে মারিয়ানকে সম্মান দেখালেন। রাজা দেখলেন মারিয়ানের হাসিটি আশ্চর্যরকম আন্তরিক এবং খুশি। কিন্তু মারিয়ান কোনো কথা বললেন না। জিগো পরে এসে রাজার সঙ্গে তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন, তারপরে রানীর সঙ্গে। রানী সকলের সঙ্গে পরিচিত হলেন, কিন্তু আসন থেকে নেমে জিগোর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে গিয়ে খুশি উপছানো স্বরে বলে উঠলেন, 'জিগো, তোমার কি আশ্চর্য পরিবর্তন ঘটে গেছে।'

'কিন্তু আমি আপনাকে দুঃখিত করতে চাই না।' জিগো হেসে বললেন।

মারিয়ান অবাক খুশির স্বরে বললেন, 'ওহ্! জিগো, আমি মোটেই তা বলতে চাই নি। আমি তোমাকে দেখে ভীষণ-ভীষণ খুশি হয়েছি। তোমাকে সত্যি বিজয়ী আর মহান মনে হচ্ছে। তুমি আমার সঙ্গে করমর্দন করবে না?'

তিনি হাত বাড়িয়ে দিলেন।

জিগো তাঁর হাত বাড়িয়ে মারিয়ানের হাত ধরলেন। মারিয়ান জিগোকে টেনে নিয়ে একটু সরে গেলেন, রাজা শুধু শুনতে পেলেন, 'আমি ভেবেছিলাম তুমি ভয়ংকর একটা কিছু—!'

রাজা আর শুনতে পেলেন না। মারিয়ান কি নিখুঁত ভূমিকায় অভিনয় করছেন? কিন্তু রাজা তাঁর বুকে ধারালো অস্ত্রের আঘাত অনুভব করছেন কেন? একটা দুঃসহ যন্ত্রণা? তিনি মুখ ফিরিয়ে দেখলেন রক্ষীবাহিনীর প্রধান অত্যন্ত খুশি মুখে একজন মন্ত্রীকে বলছে, 'ওর মতো নিরহংকার ভালো মানুষ আর হয় না। উনিই দেশের সত্যিকারের নেতা।'

রাজা তাকালেন বৃদ্ধ ডওরির দিকে। বৃদ্ধ ডওরি তাঁর দিকেই তাকিয়ে ছিলেন, কিন্তু তাঁর চোখের কালো কাঁচে জমাট অন্ধকার।

কয়েকজনকে দরবারের পেছন দিকে তাকাতে দেখে রাজা চকিত হয়ে সেদিকে তাকালেন। দেখলেন পিছনের দরজায় তাঁর ভগ্নী এসে দাঁড়িয়েছেন। ভগ্নীর মুখ গম্ভীর এবং শক্ত। রাজা দ্রুত পায়ে ভগ্নীর দিকে এগিয়ে গেলেন, কাছে গিয়ে ডাকলেন, 'এসো। নিয়মানুযায়ী জিগোর সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ করিয়ে দিই।'

কিন্তু তার দরকার হলো না। দেখা গেল, মারিয়ান নিজেই জিগোর হাত ধরে তাঁর ননদের কাছে এগিয়ে এলেন। রাজভগ্নী অপলক তীক্ষ্ণ চোখে জিগোর দিকে তাকালেন। জিগো সসম্মানে মাথা নত করে তাঁকে সম্মান জানালেন।

রাজভগ্নীর চোখে মুখে চকিতে আলো ঝলকিয়ে উঠলো। চোখে এক আশ্চর্য হাসির দ্যুতি। বলে উঠলেন, 'আহ্, জিগো, তোমাকে মনে হচ্ছে রাজার থেকেও রাজা। বিজয়ী বীরের মতো লাগছে তোমাকে।'

'সত্যি!' মারিয়ান উচ্ছ্বসিত স্বরে বলে উঠলেন, 'জিগোর সঙ্গে আজ আমি দাবা খেলবো ভাবছি।'

রাজভগ্নী বললেন, 'আমরা সারা রাত গল্প করেও কাটাতে পারি।'

জিগো বললেন, 'আসুন আপনার সঙ্গে আমার মন্ত্রিসভার সদস্যদের পরিচয় করিয়ে দিই।'

'নিশ্চয়ই।' রাজভগ্নী জিগোর সঙ্গে দরবারের মাঝখানে এগিয়ে গেলেন।

মারিয়ান জিগোর হাত ছাড়েন নি, তিনিও সঙ্গে গেলেন। রাজার মনে পড়তে লাগলো ভগ্নীর কথা, 'শুয়োরের বাচ্চা!'...'হিংসুটে কুকুর!'...ভগ্নীর এ ভূমিকাও কি নিখুঁত? তিনি দূর থেকে বৃদ্ধ ডওরির দিকে তাকালেন।

তাঁর কালো কাঁচে অতলান্ত অন্ধকার।

দরবার একটি প্রাণোচ্ছল আনন্দময় পরিবেশে রূপান্তরিত হলো। মন্ত্রীদের সঙ্গে কে কতো গভীর আর ঘনিষ্ঠভাবে মিশতে পারে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। রাজা দেখলেন, প্রমোদ-ভবনের রমণীরা তখন কার নির্দেশে দরবারে এসে প্রবেশ করেছেন। মন্ত্রীদের ঘিরে ঘনিষ্ঠ হয়ে নানা রসালাপে গুঞ্জন তুলেছেন। এসব কি সকলেরই নিখুঁত ভূমিকা? রাজা কিছু বুঝতে পারলেন না, তাঁর নিজেকে এই উৎসবের মধ্যে বড় একাকী মনে হলো। তিনি দরবারের পিছন দিকের দরজায় পা বাড়ালেন।

রাজমাতা দ্রুত পায়ে ভিতর থেকে দরজার দিকে এগিয়ে আসছিলেন। রাজা থমকিয়ে সরে দাঁড়ালেন। রাজমাতা রাজাকে প্রথমে লক্ষ্য করেন নি, তারপরে চমকিয়ে উঠে বললেন, 'ওহ্, গেইলো, তুমি! জিগোকে আমি ওপরের জানালা থেকে ঢুকতে দেখছিলাম, ওকে একটা নতুন মানুষ বলে মনে হচ্ছিল আমার। তাই না?'

রাজা কোনো জবাব দিতে পারলেন না। তিনি দেখলেন, মায়ের মুখে রক্তের ছটা। মা বললেন, 'সত্যি বলতে কি গেইলো, আমার মনে হচ্ছে, রাজমাতা হওয়ার থেকে মন্ত্রীর মাতা হওয়া অনেক সার্থক। দিনকালের সঙ্গে সবই কি অদ্ভুত বদলে যায়। তাই না? জিগোকে আমার আশীর্বাদ করা উচিত।' বলতে বলতে

তিনি দরজা দিয়ে ভিতরে চলে গেলেন।

মা জিগোর সঙ্গে দেখা করতে চান নি। এখন তিনি মন্ত্রীমাতা হওয়াকে অনেক বেশি সার্থক মনে করছেন। রাজার মনে হলো তাঁর মস্তিষ্ক জুড়ে একটা গভীর শূন্যতা নেমে আসছে। বৃদ্ধ ডওরির কথা তাঁর মনে পড়লো, ঝর্ণার জল কখনো পিছনে ফেরে না, সামনেই এগিয়ে যায়। রাজা তা বিশ্বাস করেছিলেন এবং সম্মুখে যাবার পরিবর্তিত অবস্থার দিকে অগ্রসর হয়ে মুখোমুখি করবার আগেই, এই সব ঘটনার তাৎপর্য কী? কী তাৎপর্য, সকলের এই বিপরীত আচরণের?

রাজা অনুভব করলেন, রাজকীয় বর্ণাঢ্য পশমী পোশাকের মধ্যে তাঁর শরীর কলকল করে ঘামছে, স্নায়ুসমূহ কাঁপছে। তিনি আবার পিছন ফিরে পা বাড়াতেই দেখলেন, তাঁর ছয় বৎসরের একমাত্র ছেলে অবাক চোখে অগাধ কৌতূহলে দরবারের দিকে তাকিয়ে আছে। রাজাকে ফিরতে দেখেই ও তাঁর মুখের দিকে তাকালো, জিজ্ঞেস করলো, 'পাপা, তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

রাজা বললেন, 'ভিতরে।'

ছেলে রাজার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক স্বরে বললো, 'পাপা, তোমার মুখটা ধবধবে সাদা দেখাচ্ছে।'

রাজা নিচু স্বরে বললেন, 'আমার শরীরটা খারাপ লাগছে।'

ছেলে দরবারের মধ্যে জিগোকে দেখিয়ে জিজ্ঞেস করলে, 'পাপা, ওই লোকটা কে, যার সঙ্গে মা পিসিমা ঠাকুমা এত গল্প করছে?'

রাজা হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারলেন না। একবার ঢোঁক গিলে বললেন, 'ও এ দেশের প্রধানমন্ত্রী।'

ছেলে জিজ্ঞেস করলো, 'সেটা কী?'

রাজা বললেন, 'ও জনগণের নেতা। জনপ্রতিনিধি।'

ছেলে আবার জিজ্ঞেস করলো, 'সেটা কী? ও কি তোমার থেকে বড়?'

রাজা দ্বিধা করে প্রায় রুদ্ধস্বরে বললেন, 'বোধহয়। এখন জনপ্রতিনিধিরাই দেশ শাসন করে।'

ছেলে মাথা ঝাঁকিয়ে হেসে বললো, 'পাপা, তা হলে আমাকেও জনপ্রতিনিধিই হতে হবে, তাই না? আমাকেও তো দেশ শাসন করতে হবে।'

রাজা বললেন. 'বাছা, আমার শরীর খুব খারাপ লাগছে, আমি ভিতরে যাচ্ছি। তুমি দরবারে যাও।'

ছেলে রাজার হাত ধরে বললো, 'লোকটাকে আমার ভালো লাগছে না। চলো, আমি তোমার সঙ্গে যাবো।'

রাজা দেখলেন, তাঁর চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা, চিকচিক করছে। ছেলের তপ্ত কোমল হাত ধরে তিনি এগিয়ে চললেন।

বিবেক

বিভূতি এখন গ্রামের বাড়িতে, নিজের ঘরে একা। নিজের ঘর মানে, শোবার ঘর না। একটা ঘরের একই খড়ের চালের নিচে, মাটির দেওয়াল দিয়ে ভাগাভাগি করা। ঘরের তিন ভাগের দু ভাগ অংশ ভিতর বাড়ির উঠোনের দিকে। বাকি এক ভাগ বাইরের দিকে। সেই হিসাবে এটাকে এ বাড়ির বাইরের ঘর বলা যায়। দেওয়ালের ওপাশের ঘরটা শোবার ঘর। ভিতরে আরো ঘর আছে। একটা মাটির দোতলা ঘর, খড়ের চাল। এককোণে চওড়া কাঠের মই বেয়ে ওপরে ওঠার ব্যবস্থা। চাল বেশ উঁচু, দোতলার মাটির মেঝেয় দাঁড়িয়ে মাথা ঠেকে না। পাশেই রান্নার চালা, ঢেঁকি-ঘর; উঠোনের কোনাকুনি, পাশাপাশি দুটো মরাই। মরাইয়ের গা ঘেঁষে আর একটি ছোট ঘর, যার চালার মাথায় একটি ত্রিশূল রয়েছে। ওটা ঠাকুরঘর। শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছেন। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বিভূতির ঠাকুরদা। ও-ঘরে থাকবারমতো জায়গাও আছে।

বিভূতি যখন ছোট ছিল, তখন এই বাইরের ছোট ঘরটায় ওর বাবা তক্তপোশের ওপর বসে লোকজনের সঙ্গে কথা বলতেন। বর্গাদার, কৃষি মজুরদের সংগে চাষ-আবাদের বিষয়, দর কষাকষি, সবই এ ঘরে হতো। বিভূতির মনে আছে। যথার্থ অর্থে ওর বাবা সুদের কারবারি ছিলেন না, তবে নিতান্ত কেউ দায়ে পড়লে, সোনা আর জমি বাঁধা রেখে টাকা দিতেন। জমি বাঁধা রাখতে বিক্রি কোবালা লিখে দিতে হতো, কারণ বিভূতির বাবার মহাজনী তেজারতি কারবারের কোনো লাইসেন্স ছিল না। তখন এক কাকাও ছিলেন। পরে আলাদা হয়ে পাশের জমিতে ঘর তুলে চলে গিয়েছেন। বিভূতি তখন ইস্কুলের ক্লাস সেভেনে পড়ে। বাবার সংগে কাকার বিস্তর ঝগড়াঝাঁটি হয়েছিল। এমনকি হাতাহাতি, লাঠিসোঁটা নিয়ে মারা-মারির উপক্রমও হয়েছিল। তারপরেই একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন, জমি ভাগা-ভাগি। বাবা না কাকা, কার দোষ বেশি ছিল, বিভূতি তখন ঠিকমতো বুঝতে পারে নি। তবে ও মনে মনে বাবার সপক্ষেই ছিল। মারামারি লাগলে ও কাকার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ঠিক করেই রেখেছিল। পরে আরো বড় হয়ে ওর মনে হয়েছে বাবাই কাকাকে ঠকিয়েছিলেন। যে কারণে, বাবার অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও কাকার বাড়ি যাতায়াত করতো। বিভূতি তখন জেলা শহরের কলেজে পড়ে। বাবা মুখ ফুটে কখনো কিছু বলে নি। না-বলা-ভাব দিয়েই অনেক কিছু বোঝানো যায়। বাবাও বিভূতিকে সেই রকম বুঝিয়ে দিতেন। শক্ত চোয়াল, কঠোর মুখ, কথা বন্ধ, কিন্তু বিদ্বেষভরা চোখের কোণ দিয়ে বিভূতির দিকে দেখতেন।

বিভূতি বুঝতে পারতো বাবার দম্ভে আঘাত লাগে। তিনি যে ভাইয়ের মুখ

দেখতেন না, তাঁর একমাত্র ছেলে—তাও যে-সে ছেলে না, শিক্ষিত ছেলে, গ্রামের নাম-করা ছেলে, বাপের গৌরব, বংশের গৌরব, সে কী না তাঁর সেই ভাইয়ের বাড়িতে যাতায়াত করে? স্বভাবতই তিনি অপমানিত বোধ করতেন। এক দূর পল্লীর গণ্ডগ্রামের ব্রাহ্মণ পরিবারে বিভূতিই একমাত্র ছেলে যে জেলা শহরে অনার্স নিয়ে কলেজে পড়তো, থাকতো জেলা শহরে। ওদের পরিবারের জমিজমা, চাষবাস, কিছু সুদের কারবার ছাড়াও, বাবা কাকা পুরোহিতবৃত্তিও করতেন। জমিজমা বা মহাজনী কারবার এমন ছিল না, যা ঠিক জোতদারের পর্যায়ে পড়ে। কৃষি-নির্ভর গ্রামীণ সম্পন্ন মধ্যবিত্ত বলা যায়। বিভূতির ভাষায় মাঝারি কুলাক। কিন্তু ব্রাহ্মণ, নানা যাগযজ্ঞে পূজাপাটের পুরোহিত, অতএব সেই হিসাবে সম্মান এবং প্রতাপ কম না। বিভূতির বাবার এ সব বোধ খুব প্রবল ছিল। এতই প্রবল, পৈতৃক সম্পত্তির ভাগীদার নিজের ছোট ভাইকেও নিকৃষ্ট ভাবতেন, আর সুযোগ পেলে হেনস্থা করতে ছাড়তেন না। অতঃপর তাঁর ছেলে, সেই ছোট ভাইয়ের বাড়ি যাতায়াত করলে অপমান অভিমান বোধ স্বাভাবিক।

বিভূতি বাবার মনের অবস্থা বুঝেও গায়ে মাখতো না। এমন ভাব করতো যেন বাবার মনের অবস্থা ও বুঝতে পারে না। ও জানতো, বাবার আচরণের মধ্যে বিভূতিকে প্ররোচিত করার একটা ভংগি ছিল। বিভূতি প্ররোচিত উত্তেজিত হয়ে যদি বাবাকে কিছু বলে এই রকম একটা ভংগি করতেন। অবিশ্যি বিভূতি উত্তেজিত বা প্ররোচিত হলেই যে তিনি ফোঁস করে উঠতেন, তা মনে হতো না। হয়তো উনি ছেলের কাছে দুঃখে আর অভিমানে ভেঙে পড়তেন। বিভূতিকে ওর কাকার বাড়িতে না যেতে অনুরোধ করতেন। তা হলে সেটা হয়ে উঠতো একটা সংকটের বিষয়। বিভূতির অবস্থা হয়ে উঠতো কুল রাখি না মান রাখি। সেই জন্যেই ও বিশেষ করে, এই একটি বিষয়ে বাবার মনের অবস্থা না বোঝার ভান করতো। ওর অন্তরে একটা শক্তি আর যুক্তিও ছিল। ও যে কাকার বাড়ি যেতো তাতে ওর মায়ের নীরব সায় ছিল, তিনি খুশি হতেন। এটা বোঝা যেতো তাঁর কথাবার্তা থেকে, তখন তিনি জিজ্ঞেস করতেন, কাকা কাকীমার সংগে ওর কী কথা হলো, ভাইবোনেরা কেমন আছে, ইত্যাদি এবং তাঁর দীর্ঘশ্বাস পড়তো। অথচ আশ্চর্য, বিভূতির দুই বিবাহিতা দিদি বাপের বাড়িতে এলে কখনোই কাকার বাড়ি যেতো না। দিদিরা পুরোপুরি বাবার সমর্থক ছিল।

চরিত্রের দিক থেকে বাবা আর কাকার মধ্যে বিশেষ কোনো তফাত ছিল না। তফাত একটাই, কাকা বিভূতিদের থেকে গরীব, আর তাঁর—অর্থাৎ বিভূতির খুড়তুতো ভাইবোনের সংখ্যাও অনেক বেশী। ভূমিনির্ভর গ্রামীণ নিম্নমধ্যবিত্ত। কাকার প্রতি বিভূতির সমবেদনা নিতান্ত মানবিক কারণে না। সমবেদনার অনেকটাই ছিল ওর শহুরে ছাত্রজীবনের রাজনীতি ভাবনার প্রতিফলন। জেলা শহরে বিভূতি সেই সময়ে রীতিমতো নাম করা ছাত্রনেতা। অবিশ্যি ওর মস্তিষ্কটা ছিল যথেষ্ট পরিচ্ছন্ন, লেখাপড়াটা মাটি হয় নি।

বিভূতির রাজনীতি করাটাও ওর বাবার আদৌ পছন্দ ছিল না। বরং একটা দুশ্চিন্তা ছিল। কারণ তাঁর আর কোনো বংশধর ছিল না। তিনি মারা গেলে কী

হবে ? তাঁর জমি চাষ-আবাদ ফসল পুকুর গোয়াল—তাঁর প্রাণ, কে সে সব রক্ষা করবে ? ওসব ভেবে কোনো লাভ ছিল না। গলদ তো গোড়াতেই ছিল। ছেলে শহরে লেখাপড়া শিখে গ্রামে ফিরে মাঝারি কুলাকের জীবনযাপন করবে তা হয় না। হয়ও নি। বিভূতির জীবনধারণের কোনো বাধা বা পেছনটান ছিল না, বাবার উদ্বেগের বিষয় ওর চিন্তায়ও আসে নি। জেলা শহরের কলেজে থেকে ও যখন কলকাতার ইউনিভারসিটিতে পড়তে গিয়েছিল তখন ওর রাজনৈতিক জগৎ আরো বিস্তৃত হয়েছিল। কিন্তু পার্টিতে তখন মরা গাঙের শুকো ভাঁটার টান। ও যখন কলকাতায় থেকে এম এ পড়ছিল, অখণ্ড পার্টি তখন আদর্শ আর নীতি-গত দ্বন্দ্বে ভাঙনের মুখে।

বিভূতির মনেও দ্বন্দ্ব জেগেছিল। দক্ষিণপন্থী শাসকদল পর্যন্ত বিভূতিদের পার্টির ধিক্কারে আর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠেছিল। পার্টির অনিবার্য ভাঙনের দুটো স্লোগানের মুখে তখন বিভূতি দাঁড়িয়ে—জনগণতন্ত্র আর জাতীয় গণতন্ত্র। পার্টির আদর্শ গ্রহণ করার আগে সকলেরই একজন গুরু থাকে। বিভূতিরও ছিল। ওর জেলা শহরের কলেজের এক অধ্যাপক গদাধর রায় ওকে প্রথম পার্টির প্রতি আকৃষ্ট করেছিলেন। বিভূতি ওর মানসিক দ্বন্দ্বের কথা জানিয়ে গদাধরবাবুকে চিঠি দিয়েছিল। জবাবে একটিই সংকেত ছিল, জনগণ-তান্ত্রিক বিপ্লবের পথ ছাড়া রাস্তা নেই। পত্রপাঠ বিভূতির দ্বন্দ্বের নিরসন হয়েছিল। ইউনিভারসিটিতে নিজের দলের সীমানায় গিয়ে দাঁড়াতে সময় নেয় নি।

দল ভাগাভাগির মধ্যেই বিভূতি এম.এ. পাস করেছিল। কিছুকাল আগেও যাদের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে আন্দোলন করেছে, তখন তাদেরই অনেকের সঙ্গে প্রতি-দ্বন্দ্বিতার লড়াই চলছিল। ছাত্র ফ্রন্টে তো বটেই, ট্রেড ইউনিয়ন ফ্রন্ট থেকে ক্রমে তা গ্রামের কৃষক ফ্রন্টের দিকেও এগিয়েছিল। কিন্তু এম. এ. পাস করে বিভূতি গ্রামে গিয়ে কৃষক আন্দোলনের কথা ভাবে নি। শহরে যুব ফ্রন্ট গঠনের দিকেই ওর ঝোঁক ছিল। কলকাতা থেকে দেশের বাড়ি যাতায়াত চলছিল প্রায়ই। অঢেল না হলেও, টাকার টানাটানি তেমন ছিল না। বাড়ি থেকে চাইলেই কিছু না কিছু পাওয়া যেতো। বেকার জীবনের জ্বালাটা কখনোই তেমন করে ওকে বুঝতে হয় নি। বাবা মা বিয়ের তাগাদা দিচ্ছিলেন।

বিভূতির মনে কোনো ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা ছিল না। ইউনিভারসিটির করিডোর থেকে কফি হাউস পর্যন্ত কোনো কোনো ছাত্রী বান্ধবীর পাশে চলতে চলতে মনে যে কখনোই কিছু কিঞ্চিৎ রঙ ধরে নি, তা ঠিক না। কিন্তু বিভূতির আজন্ম পরিবেশ আর গ্রামের কথাও ভাবতে হবে। বেশির ভাগ ট্রেন দাঁড়ায় না, এমন একটা নিঝুম খাঁ খাঁ রেলওয়ে স্টেশন থেকে বাসে চেপে পাঁচ মাইলের স্টপ। সেখান থেকে সাত মাইল দূরে গ্রাম। তার মধ্যে গ্রাম থেকে টানা তিন মাইল শালবন। ছেলেবেলায় সেই শালবন পেরিয়ে স্কুলে পড়তে যেতো। নতুন হাইওয়ে থেকে গ্রামের দূরত্ব দশ মাইল। যে-কোনো বাস স্টপ থেকে সাইকেল রিকশায় গ্রামে যাওয়া যায়। কিন্তু মাত্র কয়েক মাসের জন্য। বছরের বেশির ভাগ সময়েই

কাঁচা রাস্তায় সাইকেল রিকশা চলে না। চলাচলের প্রধান যান এখনো গরুর গাড়িই। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে গ্রামের বাইরে কেই বা যায়।

বিভূতি যতোই জেলা শহরের কলেজে পড়ুক আর কলকাতার হোস্টেলে থেকে ইউনিভারসিটিতে পড়ুক, কখনোই তেমন শহুরে হয়ে উঠতে পারে নি। কোনো মেয়েকে প্রেম নিবেদন করতে হলে শহুরে হতে হয় নাকি? হয়তো না। কিন্তু ওর যে বন্ধুরা প্রেম করতো ও তা কখনোই পারে নি। বন্ধুদের ঠাট্টার জবাবে ওর মতো শক্তপোক্ত একটা বলিষ্ঠ ছেলেকে হেসে বলতে হতো, 'ও ব্যাপারে আমি ডিসকোয়ালিফায়েড।' অথচ মনে মনে কোয়ালিফায়েড হবার ইচ্ছা ছিল। কারণ, বয়স আর মনের দিক থেকে ওর কোনো অস্বাভাবিকতা ছিল না। আর সেটা প্রমাণ করতে পেরেছিল সাতষট্টি সালের নির্বাচনের পরে, প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের আমলে। যে কংগ্রেস ওদের দু পক্ষকে সংশোধনবাদী আর নৈরাজ্যবাদী বিপথ-গামী বলে হেয় প্রতিপন্ন করছিল, ভাঙন ধরেছিল তাদের নিজেদের মধ্যেও। যার থেকে প্রসব হয়েছিল 'বাংলা কংগ্রেস'।

কংগ্রেসের পতন, বামফ্রন্টের মন্ত্রিত্ব, মরা গাঙে যে জোয়ার এসেছিল, তা বিভূতিকে প্রেমের সাহস যোগায় নি, কিন্তু বিয়েটা করে ফেলেছিল। বাবা মায়ের পছন্দ, ওর অপছন্দ লাগে নি। জ্যোতি—জ্যোতির্ময়ী জেলা শহরের স্কুল ফাইনাল পাস করা মেয়ে। স্বাস্থ্য আর লাবণ্য মিশিয়ে ওর নামের মতোই একটা অকৃত্রিম উজ্জ্ব-লতা ছিল। চোখের দ্যুতিতে বুদ্ধি ছিল, আর ছিল পরিবেশ, পরিবেশের মানুষদের ভাষা ও ভাব হৃদয়ংগম করার স্বাভাবিক অনুভূতি। সব মিলিয়ে বিভূতির ভালো লেগেছিল জ্যোতিকে। জ্যোতির যে বিষয়টা বিভূতিকে সব থেকে বেশি মুগ্ধ করেছিল তা হলো ওর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা। জ্যোতি খুব অনায়াসেই বিভূতির রাজনৈতিক ধারণাকে উপলব্ধি করেছিল আর বিভূতির সহধর্মিণী হয়ে ওঠার মতো একটা উৎসাহও ছিল।

সাতষট্টি সালের সেই সময়টা সব দিক থেকেই বিভূতির জীবনে একটা খুশির জোয়ার এনেছিল। গণতান্ত্রিক যুব সংগঠনের আন্দোলনের থেকে আরো বৃহত্তর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করতে চাইছিল। তখন ওর রাজনৈতিক বিচরণ ক্ষেত্র জেলা শহর, কলকাতা আর নিজের গ্রামে। জ্যোতির ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, ও বিভূতির সংগে ঘরের বাইরে আসতে পারে নি। বাবা মা থাকতে সেটা সম্ভব ছিল না। কিন্তু জ্যোতির সংগে পার্টি আর অনেক কমরেডের সংগে একটা মোটামুটি যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিল।

কিন্তু রাজনীতি কি নানী আর পানীর প্রবাদের মতো? প্রবাদের আইডিয়াটা নিঃসন্দেহে রিঅ্যাকশনারি। নানী মানে মেয়ে—মেয়েদের মন আর মেঘের মতি-গতি কিছুই বোঝা যায় না, কখন কোন্‌দিকে মোড় নেবে, ঢল নামবে। অন্তত রাজনীতির ক্ষেত্রে ঘটনাটা সেই রকমই ঘটেছিল। প্রথম বামফ্রন্ট সরকারের পতন হয়েছিল। বিভূতির মনে আবার দ্বিধা আর সংশয় জেগেছিল। তার চেয়ে যেটা খারাপ, হতাশা ওকে গ্রাস করছিল। সময়টা সব দিক থেকেই খারাপ চেহারা নিয়েছিল। বাবা সেই সময়েই মারা গিয়েছিলেন। অথচ তাঁর সাংসারিক এবং

বৈষয়িক কর্তব্যের দায়িত্ব নেবার যোগ্যতা বিভূতির ছিল না। অবিশ্যি সে-দিকটা ও ভাবেও নি। তখন আবার সেই কলেজের অধ্যাপক কমরেড গদাধর রায়। তিনি নিজেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন, আর সেই প্রথম বিভূতি চারুবাদের কথা শুনেছিল।

দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রতি বিভূতির আর কোনো মোহ ছিল না। তার আগেই ও চারুবাদের দিকে এগিয়ে গিয়েছিল, ধিক্কার দিচ্ছিল জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের ধুয়াকে। উত্তরের তরাই অঞ্চলে ক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম শুরু হয়ে গিয়েছিল। গদাধর নির্দেশ দিয়েছিলেন, গ্রামে ফিরে যাও, শ্রেণী শত্রু খতমের আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ো। পার্লামেন্টের আর এক নাম শুয়োরের খোঁয়াড়। নির্বাচন নয়, ক্ষমতা দখলের লড়াই।

বাম সরকার গঠনের মোহমুক্তি আর হতাশা থেকে এক নতুন উত্তরণ। চোখে আগুন জ্বলেছিল, বুকে রক্তের তৃষ্ণা। অনেক কালের পুরনো ঘৃণা ধরা নীতির পরিবর্তে, একটা তাজা টাটকা আর নিশ্চিত নীতির সন্ধান মিলেছিল। বিভূতি একলাই ওর গ্রামে ফিরে যায় নি। জেলা শহর আর কলকাতা থেকে কয়েকজন তাজা জোয়ান কমরেড ওদের সুদূর অরণ্যঘেরা গ্রামে এসে আস্তানা নিয়েছিল। গদাধর রায় রাতারাতি আন্ডারগ্রাউন্ডে চলে গিয়েছিলেন। সকলেই তখন আন্ডারগ্রাউন্ডে। শক্তির একমাত্র উৎস রাইফেলের নল।

সেই সময়ে জ্যোতি কিছুটা হকচকিয়ে গিয়েছিল। ও যেন যথার্থ নীতিটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। ওদের বাড়ি, গ্রাম আর গ্রামের চারপাশের চেহারাটাই আস্তে আস্তে বদলিয়ে যাচ্ছিল। বিভূতিও বদলিয়ে যাচ্ছিল। আশেপাশের গ্রামের যতগুলো বাড়িতে বন্দুক ছিল, সবই ওরা ছিনিয়ে নিয়েছিল। শুরু হয়েছিল খতম অ্যাকশন। গণতান্ত্রিক বিপ্লবীরাও তখন শ্রেণী শত্রুর পর্যায়ে।

অন্য দিকে কংগ্রেসের নবজাগরণ ঘটছিল। ওদের বিবদমান মেঘ-ভারাক্রান্ত আকাশে মেঘ কেটে, ধীরে ধীরে এশিয়ার মুক্তি সূর্যের উদয় হচ্ছিল। তাদের পোষা সশস্ত্র পুলিস বাহিনী নিশ্চেষ্ট বসে ছিল না। থাকতেও পারে না। বিভূতিদের খতমের পাল্টা আরো ভয়াবহ আর বিশাল সশস্ত্র খতমবাহিনী গড়ে উঠেছিল। তাদের সঙ্গে ছিল গোয়েন্দারা, নব জাগরিত মস্তানবাহিনী।

গ্রামের বাইরে তিন মাইলব্যাপী শালবনে বিভূতিদের আস্তানা ছিল। দেড় বছর পরে, জঙ্গল ঘিরে পুলিস ওদের আক্রমণ করেছিল, আর পুলিসের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াইয়ে, বিভূতি আহত অবস্থায় ধরা পড়েছিল।

বিভূতি সাতদিন আগে জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে। ছাড়া পেয়ে প্রথমে বাড়ি এসেছিল। পরশু কলকাতা গিয়েছিল, পার্টি লিডার গদাধর রায়ের সঙ্গে দেখা করতে। গতকাল রাত্রে আবার ফিরে এসেছে। ইতিমধ্যে ছ' বছরে, রাজনীতির হাল আবার সেই নানী আর পানীর প্রবাদের মতো, ওলটপালট হয়ে গিয়েছে। আর চারুবাদ নয়, খতম নয়, সশস্ত্র বিপ্লব নয়। জনগণের সমর্থন-বিহীন ও-পথ ভুল। কমরেড গদাধর রায় প্রথম আন্ডারগ্রাউন্ড থেকে আত্মপ্রকাশ করে এ-কথা ঘোষণা করেছিলেন। বিভূতিকে জেলে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। বিভূতি জেলের মধ্যে

তখন একটা নৈরাশ্যে ভুগছিল। গদাধরের চিঠি পেয়েই তাঁর কথার প্রতিধ্বনি করেছিল জেল থেকে। তারপরেই পার্টির নির্দেশ, জেলের ভিতরে থেকেই বিভূতিকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। কারণ তার বিরুদ্ধে অভিযোগগুলো খন্ডনের জন্য আগে নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর কেন্দ্রে জনতা সরকারকে সমর্থনের দরকার ছিল।

বিভূতিদের পার্টির মধ্যে আবার নতুন ফ্যাকশন। জেলের মধ্যেই দল ভাগাভাগি হয়ে গিয়েছিল। একদল স্পষ্টই বলেছিল, 'শুয়োরের খোঁয়াড়ে আর কখনোই যাবো না।' কিন্তু বিভূতির চিন্তায় কমরেড গদাধরের সিদ্ধান্তই যথার্থ মনে হয়েছিল। 'আমরা জনসাধারণের দ্বারা পরিত্যক্ত। এ ভুল পথে আর নয়। নতুন পরিস্থিতিতে নতুন কৌশল অবলম্বন করে, দক্ষিণপন্থী বুর্জোয়া ক্যাপিটালিস্ট আর সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে লড়াই চালাতে হবে।'...অতএব বিভূতি জেলের ভিতর থেকেই নমিনেশন ফাইল করেছিল। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অবিশ্যি হেরেছিল, কিন্তু জেল থেকে মুক্তি পেয়েছিল। প্রায় সব পার্টি, এমন কি নির্দল প্রার্থীও ওর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল। ও খুব অল্প ভোটে হেরেছিল, ওর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল সি পি এম-এর ক্যান্ডিডেট।

নির্বাচনে হেরে যাবার পরে বিভূতি কি মনে মনে আবার নৈরাশ্যের শিকার হয়েছিল? প্রথমত জেলের থেকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অথচ যতগুলো পার্টি বন্দীমুক্তি আর বন্দীদের ওপব থেকে মামলা তুলে নেবার জন্য বাইরে আন্দোলন করছিল, তারা সবাই বিভূতির বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়েছিল। ঐক্যের কোনো প্রশ্নই ছিল না, বা বামপন্থী নীতিগত কোনো আদর্শ? কেন্দ্রের জনতা সরকারের উদারতা আর রাজ্যে নিতান্ত নামেই মার্কসবাদী লেনিনবাদী এক আধটা পার্টির সমর্থন।

বিভূতি জেল থেকে ছাড়া পেয়ে, জেলা শহরের আর গ্রামের আশেপাশের কিছু পরিচিতের এবং অপরিচিতের দেখা পেয়েছিল, যারা ওকে অভ্যর্থনা করতে এসেছিল। বিভূতি যেন এতোটা আশা করে নি। নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানিটা তখনো কাটিয়ে উঠতে পারে নি। তবু খুশি হয়েছিল। দু-একজন সাংবাদিকও এসেছিল। তাদের জিজ্ঞাসার জবাবে, বিভূতির নতুন করে কিছু বলার ছিল না। ওর বলবার একটা কথাই ছিল, 'আমার নতুন করে কিছু বলার নেই। আমাদের পার্টি সেক্রেটারি কমরেড গদাধর রায় সব কিছুই ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন।'

একজন সাংবাদিক হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'প্রায় ছ' বছর বাদে ছাড়া পেলেন। ছাড়া পেয়ে কেমন লাগছে?'

জিজ্ঞাসাটা ছিল এতই আচমকা, বিভূতি হঠাৎ কোনো জবাব দিতে পারে নি। কিন্তু চোখের সামনে বাড়ির ছবিটা ভেসে উঠেছিল। মা আর জ্যোতির মুখও। ও জবাব দিয়েছিল, 'একটা নতুন জগতের স্বাদ পাচ্ছি।'

সাংবাদিক একটু অবাক হয়েছিল, 'নতুন জগৎ?'

বিভূতি বলেছিল, 'মানে, নতুন করে আন্দোলনের পথে যাচ্ছি তো, সে-কথাই বলছি। এ বিষয়ে যা বলবার, তা তো জেল থেকেই বলেছি।' বলে ও হেসেছিল।

আর এক সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখন কোথায় যাবেন—মানে, আপনার কর্মসূচী জানতে চাইছি।'

'আগে বাড়ি যাবো।' বিভূতি জবাব দিয়েছিল, 'চারদিন পরেই কলকাতায় হাজির হবো, কমরেড গদাধর রায় আমাদের রাজ্য কমিটির জরুরী সভা ডেকেছেন।' ও সাংবাদিকের কাছ থেকে সরে গিয়ে পরিচিতদের সঙ্গে করমর্দন করেছিল। কেউ কেউ ওকে আবেগের সঙ্গে জড়িয়ে ধরেছিল। অপরিচিতেরাও‌ছুটে এসে ওর সঙ্গে করমর্দন করেছিল। সকলের সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে; ক্রমেই ওকে ঘিরে আরো অনেক মানুষের ভিড় জমে উঠেছিল। অনেকের চোখেই অবাক কৌতূহল। জেলের একশো চুয়াল্লিশ ধারার সীমানা ছাড়িয়ে, হঠাৎ কারা স্লোগান দিয়ে উঠেছিল, 'কমরেড বিভূতি মুখারজি, জিন্দাবাদ!'

কমরেড বিভূতি মুখারজি জিন্দাবাদ। বিভূতি নিজেও মনে মনে উচ্চারণ করেছিল। নির্বাচনে পরাজয়ের গ্লানি, ভিতরের নৈরাশ্যের মেঘ কেটে গিয়ে, প্রাণে একটা আলোর ঝলক লেগেছিল কি? একটা আবেগ আর উচ্ছ্বাসের জোয়ার উথলিয়া উঠেছিল যেন? বন্ধু আর জনগণের সেই স্বতঃস্ফূর্ত ভালবাসা ওকে অভিভূত করেছিল। বিভূতি এতোটা আশা করে নি। বিরাট এক জনতা ওকে স্টেশন অবধি পেঁছে দিয়েছিল, স্লোগান দিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে, বিদায় জানিয়েছিল। সেই জনতা কি বিভূতিদের পার্টির সমর্থক? ওদের নতুন পথ আর কৌশলকে কি তারা স্বাগত জানাচ্ছিল?

বিভূতির সঙ্গে অনেকে ট্রেনের যাত্রীও হয়েছিল, ওদের গ্রামে যাবার সেই নিঝুম স্টেশন অবধি অনেকে এসেছিল। তারপরেও একটা ছোটখাটো দল ওর সঙ্গে গ্রামে, গ্রামের বাড়ি পর্যন্ত এসেছিল। ও বাড়ি পেঁছুতেই প্রতিবেশীরা অনেকেই বাড়ির সামনে এসে ভিড় করেছিল। বিভূতি বাড়ি ঢুকতেই, প্রথমে ওর মা ছুটে এসেছিলেন, 'বিভু এসেছিস, আমার বিভু! আয় বিভু, আমার কাছে আয়।'

মা ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে ছুটে এসে, দু হাত বাড়িয়ে কোন্ দিকে ছুটে যাবেন, যেন ঠিক করতে পারছিলেন না। কেবল ব্যাকুল স্বরে ডাকছিলেন, 'বিভু আমার বিভু!'

বিভূতির তৎক্ষণাৎ মনে পড়ে গিয়েছিল, মায়ের চোখে ছানি পড়েছে। মা দেখতে পান না। মনে পড়তেই ও মায়ের সামনে ছুটে গিয়েছিল, নিচু হয়ে মায়ের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল, 'এই যে মা আমি, এই যে!'

মা বিভূতিকে জড়িয়ে ধরে, হাহা স্বরে কেঁদে উঠেছিলেন, 'সকলে বলতো তোকে আর কোনোদিন ফিরে পাব না। হা, ওরে বিভু, আমি তোকে দেখতে পাচ্ছি না।'

বিভূতির বুকের মধ্যে টলটলিয়ে উঠেছিল। এতোটা আবেগপ্রবণ ও ছিল না। ভয় পাচ্ছিল, চোখে জল এসে পড়বে। বলেছিল, 'দেখতে পাবে মা। আমি শীগগিরই তোমার ছানি কাটাবার ব্যবস্থা করবো। তুমি সবই আবার দেখতে পাবে।'

'না না, বিভু, আমি সব দেখতে চাই না।' মার থানের ঘোমটা খোলা, পাকা চুল মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'শুধু তোকেই একটু দেখতে চাই। এ জীবনে আমার

আর কিছু দেখবার নেই, শুধু তোকে, তোকে একবারটি দেখতে চাই।' মা বিভূতির সারা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়েছিলেন।

পাশের বাড়ি থেকে কাকা-কাকিমা এসেছিলেন। ভাই-বোনেরা এসেছিল। প্রণাম করা আর প্রণাম নেবার জন্য যেন একটা হুড়োহুড়ি পড়ে গিয়েছিল। কাকা বিভূতির হাত ধরে, মাটির দোতলা ঘরের দাওয়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন 'আয়, আগে একটু বোস।' মাকে ডেকে বলেছিলেন, 'বোঠান এসো।'

মাকে উঠোনে তাঁর সমবয়সী প্রতিবেশিনীরা সান্ত্বনা দিচ্ছিল, 'আর তোমার দুঃখ কী? তোমার মানিককে ফিরে পেয়েছো তো!'…

বিভূতি কাকার সঙ্গে দাওয়ায় উঠে, পাশাপাশি একটা বেঞ্চিতে বসেছিল। জ্যোতি কোথায়? তাকে দেখা যাচ্ছিল না। লজ্জা পাচ্ছিল নাকি বিভূতির সামনে আসতে? কাকা স্বর তুলে বলেছিলেন, 'কই গো বউমা, বিভূতির জন্য একটু চা কর। চা জলখাবার খেয়ে একটু জিরোক, তারপরে নাইবে খাবে।'

বিভূতির একটি খুড়তুতো বোন রান্নাঘরের কাছ থেকে মুখ বাড়িয়ে বলেছিল, 'বউদি চা জলখাবার করছে বাবা, হলেই আমি নিয়ে আসছি।'

জ্যোতি তা হলে বিভূতির চা জলখাবারের জন্য ব্যস্ত ছিল? উঠোনের ভিড় অনেকটাই পাতলা হয়ে গিয়েছিল। উঠোনের এক পাশে বড় একটা আতাগাছের ছায়ায় মা তাঁর প্রতিবেশিনীদের সঙ্গে বসে বকবক করছিলেন। একটু পরেই খুড়তুতো বোন চা আর জলখাবার নিয়ে এসেছিল। কাকাকেও চা দিয়েছিল। কিন্তু জ্যোতি? বিভূতি মনে মনে ভেবেছিল, জ্যোতি কখন আসবে? এতক্ষণে ওর চেহারাটাও দেখা হলো না যে!

জ্যোতি এসেছিল অনেক পরে। কাকা-কাকিমা, বাইরের লোকজন প্রায় সবাই চলে যাবার পরে সামনে এসেছিল। বিভূতি তখন ঘরের মধ্যে গিয়ে, কাঁধের ব্যাগটা এক পাশের তক্তপোশের ওপর রেখে, সবে মাত্র সিগারেট ধরিয়েছিল। জ্যোতি ঘরে ঢুকে আগেই নিচু হয়ে বিভূতির পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করেছিল। বিভূতির অবাক চমকানোর মধ্যে খুশির ঝিলিক ছিল, 'আরে, এটা আবার কী হচ্ছে?' ও জ্যোতির একটা হাত ধরেছিল।

'ধর্ম'। জ্যোতি হেসে বলেছিল। ওর বেগুনি রঙের পাড়, বেগুনি ডোরা শাড়ির ঘোমটা খসে গিয়েছিল।

বিভূতি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ধর্ম?'

'তা হলে কর্ম।' জ্যোতি আবার হেসেছিল, 'তুমি যেমন মাকে প্রণাম করলে, কাকা-কাকিমাকে করলে। আর আমি স্বামীকে প্রণাম করবো না?'

বিভূতি কৌতূহলিত উৎসুক আবেগে জ্যোতির দিকে তাকিয়েছিল। মনে হয়েছিল, ছ'বছর না, তারো অনেক কাল আগে থেকেই যেন জ্যোতিকে দেখা হয় নি। ভাবনাটা একেবারে মিথ্যা না। জংগলের গভীরে আন্ডারগ্রাউন্ডে থাকাকালীন জ্যোতির সঙ্গে বার কয়েক মাত্র দেখা হয়েছিল। বাড়ি আসবার উপায় ছিল না। সব সময়েই নজর রাখা হতো। খুব সাবধানে, আগে থেকে খবর নিয়ে যে-কয়েক বার বাড়িতে এসেছিল, সে সময়ে জ্যোতির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখা হয়

নি। তাই মনে হয়েছিল, ছ' বছর না, তারো অনেক আগে থেকে জ্যোতিকে যেন দেখা হয় নি। তবু বিভূতির রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জ্যোতির এমন একটা সহজ আর অনায়াস যোগসূত্র ঘটেছিল, ওরকম ভাবে স্বামীকে প্রণাম করা যেন ওকে মানাচ্ছিল না। অবিশ্যি বিভূতি মনে করতে পারছিল, সশস্ত্র বিপ্লব আর ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের সময়টায়, জ্যোতির চোখে মুখে সব সময়েই যেন একটা আকস্মিকতার ঘোর ছিল। দুজনের রাজনৈতিক যোগসূত্রের কোথায় যেন একটা অস্পষ্টতার ছায়া পড়েছিল। কিসের ছায়া সেটা? জ্যোতি বিভূতিকে সমর্থন করতে পারছিল না? না কি ভয়ে আর উদ্বেগে ওরকম মনে হতো?

'কী দেখছো অমন করে?' জ্যোতি হেসে উঠে, মাথায় অল্প একটু ঘোমটা টেনে দিয়েছিল।

বিভূতি বলেছিল, 'তোমাকে!' এবং বিভূতি সত্যি জ্যোতিকেই দেখছিল। জ্যোতি লাবণ্য হারিয়েছে, এমন মনে হয় নি, কিন্তু কিছুটা যেন শীর্ণ হয়েছে। যে-শীর্ণতাকে যথার্থ স্বাস্থ্যহানি বলা যায় না, বরং অতি ব্যবহৃত, ক্ষয়প্রাপ্ত ধারালো কাস্তের মতো। হাসিটা ওর তেমনি ঝকঝকে আছে, তবু কেমন যেন একটু বদলিয়ে গিয়েছে। ওর চোখের কালো তারা দুটোয় বরাবরই একটা দীপ্তি ছিল। কিন্তু এখন যেন সেই কালো চোখের গভীরে কোথায় একটা রহস্যের অতলতা। অথচ ওকে আশ্চর্য আকর্ষণীয় লাগছিল।

জ্যোতি যেন লজ্জা পেয়ে, হাত ছাড়াবার চেষ্টা করে বলেছিল, 'ওরকম করে দেখো না, লজ্জা করছে।'

'কিন্তু আমার ভালো লাগছে।' বিভূতি জ্যোতির হাতটা আর একটু জোরে চেপে ধরেছিল।

জ্যোতি কেমন হাল্‌কাভাবে হেসেছিল, 'জেলে কেমন ছিলে, শুনি আগে?'

'কেমন আবার? প্রথমে কিছুদিন খুবই টর্চার করেছিল।' বিভূতি বলেছিল, 'কিন্তু জেলের কথা বলতে এখন ভালো লাগছে না। তোমাদের—তোমার কথা বলো। তোমাকে যে আমি লিখেছিলাম, শহরে বাপের বাড়ি গিয়ে আবার লেখা-পড়া শুরু করো, তা তো করো নি। কোনো জবাবও দাও নি।'

জ্যোতি তেমনই হেসে বলেছিল, 'ও-কথার কী জবাব আর দেবো? আমার শাশুড়ীকে এখানে ফেলে রেখে, আমি বাপের বাড়ি গিয়ে কলেজে ভর্তি হবো? তাই কখনো হয়?' একটু থেমে, একটু গম্ভীর হয়ে, আবার হেসে বলেছিল, 'তা ছাড়া, এসব লেখাপড়ার কী মূল্য আছে? চারপাশে তো অনেক লেখাপড়া জানা ছেলেমেয়ে দেখছি। কী দাম আছে ওসবের?'

বিভূতির বুকের ভিতর পুঞ্জীভূত অন্ধকারে যেন হঠাৎ বিজলী হেনেছিল। জ্যোতি এমন একটা কথা বলেছিল, যার কোনো জবাব বিভূতির সেই মুহূর্তে জানা ছিল না। ও কিছু বলবার আগেই, জ্যোতি বাইরের দাওয়ার দিকে তাকিয়ে চলে যেতে যেতে বলেছিল, 'মা আসছেন, কথা বলো।'

মা এসে ঘরে ঢুকেছিলেন।

কলকাতা যাবার আগে, তিনদিন জ্যোতির সঙ্গে এইরকম টুকরো টুকরো কথা

হয়েছিল। যে-সব কথার মধ্য থেকে অন্য এক জ্যোতিকে বিভূতি দেখতে পেয়েছিল। প্রথম দিনই বিকালে পুরনো একটি খবরের কাগজের একটি সংবাদের দিকে জ্যোতি আঙুল দেখিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কি সত্যি একথা বলেছিলে নাকি?'
বিভূতি ছোট হেডিংটার দিকে তাকিয়েছিল: 'আমি আর সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাস করি না।—নকশাল নেতা বিভূতি মুখার্জি।'
বিভূতির বুকের ভিতরে যেন একটা অন্ধকার পর্দা দুলে উঠেছিল। বলেছিল, 'হ্যাঁ, জেল থেকে বলেছিলাম। আমাদের পার্টি তখন অলরেডি এই লাইন নিয়েছিল। কেন বলো তো?'
'এমনি।' জ্যোতি হেসেছিল, 'খবরের কাগজে তোমার নিজের কথা এইটাই প্রথম বেরিয়েছিল।' বলতে বলতে ও রান্নাঘরের দিকে চলে গিয়েছিল।
বিভূতি কাগজ ছেঁড়বার শব্দ শুনতে পেয়েছিল। তার মানে, তিন মাস রেখে দেওয়া খবরের কাগজটা জ্যোতি ছিঁড়ে ফেলেছিল যেন বিশ্বাস করতে পারে নি, বিভূতি ও-কথা বলেছে। তার মুখ থেকে শোনবার জন্য অপেক্ষা করছিল। তাই কি? তা না হলে জিজ্ঞেস করার অর্থ কী, ছিঁড়ে ফেলারই বা কারণ কী?
বিভূতি পরে এক সময়ে জ্যোতিকে বলেছিল, 'আমরা ভুল পথে চলেছিলাম। জনসাধারণ আমাদের ত্যাগ করেছিল। হঠকারিতা বলতে পারো। আমাদের নতুন আন্দোলন কী ভাবে শুরু হবে, কলকাতার রাজ্যকমিটিতে সেই আলোচনা হবে। মূলত গ্রামে গ্রামে কৃষক আন্দোলনই আমরা সংগঠিত করবো।'
জ্যোতি বিভূতির চোখের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্তভাবে কথাগুলো শুনেছিল, আর কেবল একটি মাত্র শব্দ করেছিল, 'ও।' বিভূতি বুঝতে পেরেছিল, শব্দটার মধ্যে নির্লিপ্তির সামান্য সুরও ছিল না। জ্যোতি আবার হালকাভাবে হেসে যেন খুবই আলগোছে কথাটা জিজ্ঞেস করেছিল, 'আন্দোলন করলে, জনতা সরকার কিছু বলবে না?'
বিভূতির প্রথমে মনে হয়েছিল, জ্যোতি ঠাট্টা করছে। কিন্তু ওর চোখে ঠাট্টার লেশ ছিল না। বিভূতি বলেছিল, 'বলতে পারে, তা বলে আমরা আন্দোলন থামাতে পারি না। আমরা জনতা সরকারকে কোনো মুচলেকা লিখে দিই নি।'
'তা বটে।' কথাটা বলে জ্যোতি সামনে থেকে চলে যাবার উপক্রম করেছিল।
বিভূতি তাড়াতাড়ি ডেকে বলেছিল, 'জ্যোতি, এবার থেকে আমি গ্রামেই আন্দোলন শুরু করবো। এখন আমার সঙ্গে আন্দোলনে নামতে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না।'
জ্যোতি হতচকিত বিস্ময়ে বলে উঠেছিল, 'আমি? আন্দোলনে নামবো?' হঠাৎ হেসে উঠে মাথা নেড়েছিল, 'না না, আমি ওসবে নেই। আমার সংসার আছে, শাশুড়ী আছেন, তুমি আছো। এসব ছাড়া আমি এখন আর কিছু ভাবতেই পারি না।'
বিভূতি আহত বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি আমাদের পার্টিতে আসতে চাও না?'

'আমি কোনো পার্টিতেই যেতে চাই না।' জ্যোতি আলগাভাবে হেসে বলেছিল, 'আমি একেবারে সাধারণের দলে। আমার বাপু কোনো পার্টি-টার্টির দরকার নেই। তোমার জন্য একটু চা করে নিয়ে আসি।' জ্যোতি সামনে থেকে চলে গিয়েছিল।

বিভূতির বুকে সেই অন্ধকার পর্দাটা দুলে উঠেছিল। জ্যোতির চলে যাওয়াটা অসামান্য মনে হয়েছিল। ওর হাসিটা কি সত্যি নেহাত আলগা? বিভূতি তো চায়ের তৃষ্ণাবোধ করে নি।

কলকাতা যাবার আগের দিন বিকালে, জ্যোতি হঠাৎ হেসে জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখন আর সশস্ত্র আন্দোলনে বিশ্বাস করো না, কিন্তু যে নিরপরাধ লোকগুলোকে তোমরা খুন করেছো, তার কী হবে?'

বিভূতি অবাক হয়ে বলেছিল, 'নিরপরাধ জেনে তো আমরা কারোকে মারি নি।

'তবু তো অনেকে নিরপরাধ ছিল।' জ্যোতির মুখে সেই আলগা হাসি লেগেছিল। চোখের কালো তারায় কি কৌতুকের ছটা?

বিভূতি বলেছিল, 'আমরা তো বলেছি, সেগুলি আমাদের ভুল হয়েছিল।'

'তা বটে।' যেন খুব তুচ্ছভাবে হেসে বলেছিল।

বিভূতি চুপ করে থাকতে অস্বস্তিবোধ করেছিল, 'আমরা ভুল করেছি, আবার তা সংশোধন করবো! কিন্তু আমাদের থেকে পুলিস আরো অনেক বেশি নিরপরাধ মানুষকে খুন করেছে।'

'পুলিস!' জ্যোতি যেন অবাক হেসে কথাটা উচ্চারণ করেছিল, 'ওদের সংগে তোমাদের আমি মেলাতে পারি না। পুলিস তো পুলিসই। ইদানীং দেখছি, তারাও বাড়াবাড়ির ভুল স্বীকার করছে। অদ্ভুত, না?' যেন নেহাত কৌতুকছলে শব্দ করে হেসে উঠেছিল।

বিভূতির বুকের ভিতরের সেই অন্ধকার পর্দা দুলছিল, আর অস্বস্তি বাড়ছিল এবং কিছুতেই চুপ করে থাকতে পারে নি। জ্যোতির হাসিটা অসাধারণ মনে হয়েছিল। সে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি কিছু বলতে চাও জ্যোতি?'

জ্যোতি ওর হাসির সরসতা হারায় নি, ও অনায়াস ভঙ্গিতে বলেছিল, 'না। মাঝে মাঝে গোপালদার কথা আমার খুব মনে হয়।'

বিভূতি অবাক হয়ে জানতে চেয়েছিল, 'কে গোপালদা?'

'একজন ফেরিওয়ালা।' জ্যোতির সরস হাসিতে একটু যেন ছায়া ঘনিয়েছিল, 'এই গ্রামের বাইরে তোমরা যাকে শেষবার খতম করেছিলে।'

বিভূতি অধিকতর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, 'ফেরিওয়ালা? হ্যাঁ, কিন্তু সে গোপালদা কী করে হলো?'

'গোপালদা শহরে আমার বাপের বাড়ির পেছনে তাঁতীপাড়ায় থাকতো।' জ্যোতি মুখে হাসি বজায় রেখে কথাটা বলেছিল, 'পরে জেনেছিলাম, আমার ভাইয়ের কাছে, সেই ফেরিওয়ালা আমাদের তাঁতীপাড়ার লোক। লোকটা খুব রগুড়ে ছিল, অনেক মজার মজার ছড়া কাটতে পারতো, কোমর ঘুরিয়ে নাচতো—লোক হাসাবার জন্য—আসলে মাল বিক্রির ফিকিরে।' জ্যোতির মুখ রক্তের ছটায় যেন দপ-

দপ করছিল, কিন্তু হাসছিল, 'আমাদের ছেলেবেলা থেকে গোপালদাকে চিনতাম, অনেক পুঁতির মালা আর কপালের টিপ্ তার কাছ থেকে কিনেছি। তার বউ আর তিন চারটি ছেলেমেয়ে ছিল। বউটিকেও দেখেছি—ভারি মিষ্টি—কিন্তু আশ্চর্য, গোপালদাকে এ গ্রামে কোনোদিন মাল ফেরি করতে আসতে দেখি নি। শহর থেকে অন্য একটা ফেরিওয়ালাই তো এ গ্রামে আসতো।'

বিভূতির চোখের সামনে সেই দৃশ্যটা ভাসছিল, গলা কাটা ফেরিওয়ালাটা শাল গাছের গোড়ায় ছিটকে পড়লো। রক্তাক্ত ছুরিটা ওর নিজের হাতে। মাথার বেতের গোল চুপড়িটা আর কাঁধে ঝোলানো, সেফ্টিপিন চুলের ফিতের ব্রাকেটটাও দুপাশে পড়েছিল। সিঁদুর, আলতা, সস্তা সাবান, স্নো, পাউডার, গোল চৌকো ছোট ছোট আয়না, লক্ষ্মীর পাঁচালী, বাঁধানো দেবদেবীর ছবি, এমন কি খানকয়েক সিনেমার চটি ম্যাগাজিনও। জ্যোতি বলছিল, আর সেই ছবিটা বিভূতির চোখের সামনে ভাসছিল, একটা খতমের ছবি। কিন্তু ওর বুকের অন্ধকারে বিজলী হানা-হানি করছিল। মনে হচ্ছিল, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, ঘেমে উঠেছিল। প্রায় ফ্যাসফেসে স্বরে বলেছিল, 'লোকটা আমাদের সাসপেকটের তালিকায় ছিল, আগের থেকেই খবর ছিল, ও একজন স্পাই। আসলে শহর থেকে আসা নতুন মুখ কী না, তাই—।' বিভূতি জ্যোতির দিকে চোখ তুলতে গিয়েছিল।

জ্যোতি তখন সামনে থেকে সরে গিয়েছিল।

পরের দিন ভোরবেলার ট্রেনেই বিভূতি জেলা শহরে গিয়েছিল। আগে ঠিক ছিল, রিকশায় হাইওয়ে পর্যন্ত গিয়ে, টানা বাসে কলকাতায় যাবে। কিন্তু ও মতের পরিবর্তন করেছিল। শহর হয়ে কলকাতা যাওয়া স্থির করেছিল। শহরে গোপাল ফেরিওয়ালার বিধবার সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছে হয়েছিল। জ্যোতিকেও বলেছিল সে-কথা। জ্যোতি অবাক হয়ে বলেছিল, 'গোপালদার বউকে তুমি কোথায় পাবে?'

'কেন, তাঁতীপাড়ার বাড়িতে।' বিভূতি বলেছিল।

জ্যোতি যেন জোর করে হেসেছিল, 'সে কি আর সেখানে আছে?'

'কোথায় যাবে?'

জ্যোতি ঠোঁট উলটে বলেছিল, 'কী জানি।'

'তোমার ভাই হয়তো বলতে পারে।'

'তা হয় তো পারে।' জ্যোতি হেসেছিল, 'কেন, কী হবে দেখা করে?'

'তা জানি না। একবার দেখতে ইচ্ছা করছে।' বিভূতি বলেছিল।

জ্যোতি হেসে বলেছিল, 'ভুল তো ভুলই। সব ভুলের কি সংশোধন হয়?'

হয়তো হয় না, তবু বিভূতি গিয়েছিল। জ্যোতির হাসিটা খুব সহজ মনে হয় নি। শহরে পেঁছে ওকে আগে জ্যোতির বাপের বাড়ি যেতে হয়েছিল। জামাই আপ্যায়নকে সে মোটেই আমল দেয় নি। জ্যোতির ভাই টুপান, কলেজে পড়ে। টুপানকে ও বলেছিল, 'আমাকে একবার গোপাল ফেরিওয়ালার বাড়ি নিয়ে যেতে পারো? আমি তার বিধবার সঙ্গে একবার দেখা করবো।'

টুপান হতচকিত বিস্ময়ে বলেছিল, 'সে তো আর তাঁতীপাড়ায় থাকে না।'
'কোথায় থাকে ?'
বিভূতির কথার জবাব, টুপান হঠাৎ দিতে পারে নি, কেমন যেন থতিয়ে যাচ্ছিল। বিভূতি আবার জিজ্ঞেস করেছিল, 'দূরে কোথাও চলে গেছে ?'
টুপান মাথা নেড়ে বলেছিল, 'না, এ শহরেই আছে।'
'আমাকে সেখানে নিয়ে যেতে পারো না ?' বিভূতি ব্যগ্রভাবে জিজ্ঞেস করেছিল।
টুপান বলেছিল, 'পারি।'
'তবে চলো।' বিভূতি বলেছিল, 'আমার হাতে বেশি সময় নেই, কলকাতায় যেতে হবে।'
বিভূতিকে নিয়ে টুপান সাইকেল রিকশায় চেপে শহরের এক অংশে গিয়েছিল। যে-রাস্তায় গিয়ে ঢুকেছিল, বিভূতি দেখেই চিনতে পেরেছিল, অঞ্চলটা শহরের বেশ্যাপল্লী। শহরের সব থেকে শ্রীহীন দুর্ভাগা অঞ্চল। অধিকাংশই মাটির ঘর, মাথায় খড়ের চাল। দোকানপাট বলতে, চা তেলেভাজা, পান, বিড়ি সিগারেট সবই বিবর্ণ। কাছে একটা পুকুরে পাড়ার মেয়েদের উদাস আর নির্লজ্জ অবগাহন, বাসন মাজা, কাপড় কাচার সঙ্গে উৎকট আলাপ। পাশাপাশি কয়েকটা ঘিঞ্জি ঘরের সামনে টুপান রিকশা দাঁড়াতে বলেছিল। বিভূতি যেন স্বগতোক্তি করেছিল, সে এখানে থাকে ?
টুপান বলেছিল, 'হ্যাঁ।'
বিভূতি এক মুহূর্ত ভেবেছিল, রিকশা থেকে আদৌ নামবে কী না। ওর চোখের সামনে, শাল গাছের গোড়ায় ছিটকে পড়া সেই রক্তাক্ত চেহারাটা ভেসে উঠেছিল। টুপানকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'গোপাল ফেরিওয়ালার ছেলেমেয়েরা কোথায় থাকে ?'
'এখানেই।' টুপান নির্বিকারভাবে বলেছিল, 'কোথায় আর যাবে ?'
বিভূতি রিকশা থেকে নেমেছিল। একটা কথা তার বিশেষভাবে জিজ্ঞেস করার ছিল। টুপানকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তুমি ঠিক জানো, সে এ বাড়িতেই থাকে ?'
'কুসুমদিকে এখানেই অনেকদিন দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছি।' টুপান সহজভাবে বলেছিল।
কুসুমদি!
বিভূতি মনে মনে উচ্চারণ করেছিল। ইতিমধ্যে কৌতূহলী দু-একজন ওদের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছিল। টুপান একটি ঘরের দরজার সামনে গিয়ে ডেকেছিল, 'কুসুমদি আছো নাকি ?'
ভিতর থেকে গোঙানো স্বরে জবাব এসেছিল, 'কে ?' তারপরে আলুথালু বেশে একটি প্রায় পঁয়ত্রিশ বছরের স্ত্রীলোক বেরিয়ে এসেছিল। উস্কখুস্ক চুল, গায়ে জামা নেই। গলায় আর গালে ধুলো। চোখ দুটো লাল। তার সারা গা থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল। বোধহয় কাঁচা মাটির মেঝেয় শুয়েছিল, গত রাত্রের খোয়ারি মেটে নি। লাবণ্য না থাক, সদ্য তাতানো বাসি ব্যঞ্জনের মতো একটা ঝাঁজ ছিল শরীরে। চোখ মুখ দেখে মনে হয়েছিল, হ্যাঁ, এক সময়ে সত্যি মিষ্টি দেখতে ছিল। বিভূতি ঘামতে আরম্ভ করেছিল।

কুসুম অবাক চোখে টুপানের দিকে তাকিয়ে জড়ানো স্বরে বলেছিল, 'টুপান না কি ? তুই হেথাকে ক্যানে ?' বলে বিভূতির দিকে একবার তাকিয়ে, গায়ের কাপড় ঠিক করেছিল।

টুপান বিভূতির দিকে একবার তাকিয়েছিল, 'কুসুমদি, ইনি আমার জামাইবাবু, তোমার কাছে এসেছেন।'

'আমার কাছে ?' কুসুম যেন অবাক আর শশব্যস্ত হয়ে মাথার ঘোমটা টেনে দেবার চেষ্টা করেছিল, যদিও দিতে পারে নি, বরং নিজেকে আরোই অবিন্যস্ত করে তুলেছিল, 'জ্যোতনের বর আমার কাছে ? ক্যান রে টুপান ?'

হ্যাঁ, জ্যোতিকে ওর বাপের বাড়িতে, পাড়ার প্রতিবেশীরা জ্যোতন বলেই ডাকে। টুপান তাকিয়েছিল বিভূতির দিকে। বিভূতির বুকের ভিতরে অন্ধকার পর্দাটা যেন বাতাসের ঝাপটায় বাড়ি খাচ্ছিল, ঘামে ভিজে উঠেছিল মুখ। গলা শুকিয়ে যাচ্ছিল, ফ্যাসফ্যাসে স্বরে বলেছিল, 'আচ্ছা, একটা কথা, আপনার মনে আছে কি, আপনার—।'

কুসুম ফেসো গলায় হেসে উঠে, মুখে আঁচল চেপেছিল। লাল চোখে বিভূতিকে একবার দেখে, টুপানের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'অই মা, কোথা যাব গ। জ্যোতনের বর আমাকে আপনি আজ্ঞা করছে যে ?'

বিভূতি একটু থতিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু আপনি সম্বোধন করা ছাড়া, ওর কোনো উপায় ছিল না। ও খুব তাড়াতাড়ি ফ্যাসফেসে গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনার স্বামী তো কখনো সেই গ্রামে ফেরি করতে যেতো না। আমি তো সেই গ্রামের ছেলে, কখনো দেখি নি। অন্য একজন ফেরিওয়ালাকে দেখতাম।'

'হুঁ কেতু যেতো, উদিককার দূরের গাঁগুলোতে কেতু ফিরি করতে যেতো।' কুসুম যেন একটু আনমনা হয়ে গিয়েছিল, 'তা সে তা কপালের নিকন বাবা। কেতুটা মাসভর জ্বর জ্বালায় ভুগছিল। আমার সোয়ামীকে বলেছিল, 'নইলে আবার কোন্ নতুন নোক হোথাকে বাজার জমিয়ে বসত, তাই বলেছিল। মানুষের মন তো, দুদিন না দেখলে ভুলে যায়। তাই আমার নোক কেতুর সাল নিয়ে গিছল। কপালের নিকন, আসলে যমে টেনেছিল যে বাবা।'

যমে টেনেছিল। বিভূতির চোখে ওর নিজের চেহারাটা ভেসে উঠেছিল। হাতে ছুরি, দাঁতে দাঁত পেষা। অন্যান্য কমরেডরা আশেপাশে গাছের আড়ালে। বিভূতি বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ফেরিওয়ালার ওপর, আর বাঘের মতোই টেনে নিয়ে গিয়েছিল গাছের গোড়ায়, আর ছুরির একটা নির্ঘাত ফালাতেই টুঁটি দুই টুকরো। কুসুমের সামনে দাঁড়িয়ে বিভূতি ওর দুটো হাত পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল। টুঁটি কাটার অনুভূতিটা যেন হাতে স্পষ্ট অনুভূত হচ্ছিল। হাত দুটো ঘেমে কাঁপতে আরম্ভ করেছিল, আর বিকৃত গোঙানো স্বরে জিজ্ঞেস করেছিল, 'আর তারপরেই আপনি এ পথে চলে এলেন ? এই জীবনে ?'

কুসুম হেসেছিল, 'এমনি কি আর এইচি। ছেলেমেয়েগুলানকে নিয়ে ধান্দা তো মেলাই করেছিলাম—তা সে তোমাকে আর কী বলে বুঝাব গ, ভাতার মরা, ক'ড়ে রাঁড়ি, নুকব কোথা ? পেটের শত্তুরগুলানকে বাঁচাইবা কী করে ? তাই এক ভাতার

হারিয়ে বারোভাতারি হইচি।'
বিভূতির চোখে সেই চোখ দুটো ভাসছিল, অবাক আর ভয়ার্ত চোখ। সেই একটি-মাত্র অস্ফুট গোঙানি কানে বাজছিল, যে গোঙানির স্বরে আর্ত আর অবাক জিজ্ঞাসা ছিল।
কুসুমের লাল চোখে কৌতূহল ফুটেছিল। টুপানকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তা হ্যাঁরে টুপান, জ্যোতনের বর জেলে ছিল না?'
টুপান বলেছিল, 'হ্যাঁ, কয়েকদিন হলো ছাড়া পেয়েছেন।'
'অ।' কুসুম বিভূতির দিকে তাকিয়েছিল, 'তা, জামাই, তুমি আমাকে এসব কথা জিগেস করছ ক্যানে?'
কেন, কেন জিজ্ঞেস করছিল বিভূতি? তৎক্ষণাৎ কোনো জবাব দিতে পারে নি। বলতেও পারে নি, সে-ই সেই কপালের লিখন, সে-ই সেই যম। একটু পরে তার গলার স্বর যেন কোলা ব্যাঙের মতো শুনিয়েছিল, 'আমি বলতে এসেছিলাম, আপনার স্বামীকে ভুল করে মারা হয়েছিল।'
'অহ্, এই কথা!' কুসুম হেসে তুচ্ছভাবে বলেছিল, 'তা হবে। ও-কথায় আর কী দরকার, সব তো চুকেবুকে গ্যাছে। খুনের খবর যখন পেথাম পেইছিলাম, তখন মনে মনে বলতাম, ও তো মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা গ। দেশে গাঁয়ে এত যে শত্তুর, সব লাট-বেলাটি করে বেড়াচ্ছে, উয়াদের মুণ্ডুগুলান কাটে ক্যানে নাই?' কুসুম টুপানের দিকে যেন লাল চোখে রেগে তাকিয়েছিল, 'ওই উয়াদের, জামাইকে যারা জেলে পুরেছিল, উয়াদের মুণ্ডুগুলান কাটা যায় ক্যানে নাই?' সে ঘাড়ে ঝটকা দিয়েছিল, দিয়ে হেসেছিল 'ত বুঝি।'
উয়াদের মুণ্ডুগুলান! বিভূতি মনে মনে উচ্চারণ করেছিল, আর জ্যোতির মুখ ওর চোখের সামনে ভেসে উঠেছিল। বুকের অন্ধকার পর্দাটা ঝাপটায় ফালা ফালা হচ্ছিল, আর আগুনের হল্কা ছিটকে আসছিল। রাগে না, ভিতরের একটা অবাধ্য আবর্তকে রোধ করার জন্যই যেন দাঁতে দাঁত চেপে বসছিল। ঘামে গায়ের জামাটা সপসপে হয়ে যাচ্ছিল। কুসুমের দিকে তাকিয়ে কোনোরকমে উচ্চারণ করেছিল, 'চলি।' বলেই রিকশায় উঠেছিল।

বাইরের ঘরে অন্ধকার নেমে আসছে। বিভূতি যেন নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। বাইরে এখনো দু-একটা পাখির ডাক শোনা যায়। ও কিছুক্ষণ আগেই কলকাতা থেকে ফিরেছে। ফিরে বাইরের ঘরে ঢুকেছে, ভিতরে যায় নি। রাজ্য কমিটির সভায় আলোচনার মোট বক্তব্য সমস্ত বামপন্থী পার্টিগুলোর ঐক্যসাধন, শহরে গ্রামে যুগপৎ তীব্র আন্দোলন সংগঠিত করে তোলা। এরকম একটা বক্তব্য বিভূতির জানাই ছিল, কিন্তু এই প্রথম পার্টির সভা ওর মনে তেমন দাগ কাটে নি, কারণ মস্তিষ্কের কোষে কোষে সমস্ত-সীমান্ত জুড়ে কেবল কুসুমের কথাই বেজেছে। এখনো বাজছে।
জ্যোতি একটা ছোট চৌকো লণ্ঠনের আলো নিয়ে ঘরে ঢুকলো। না, বিভূতিকে দেখে সে অবাক হলো না বরং সহজভাবেই বলল 'কলকাতা থেকে ফিরে বাড়ি

ঢোক নি কেন। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছো।'

বিভূতি জ্যোতির দিকে ফিরে তাকালো, 'হ্যাঁ, অন্ধকার। তোমাকে ডাকব ভাবছিলাম। জ্যোতি, আমি গোপালদার বউ কুসুমের সঙ্গে দেখা করেছি।'

জ্যোতি আলগাভাবে হাসলো, 'তাই নাকি? কুসুমদি তো শুনেছি—।'

'হ্যাঁ, উনি— ।' বিভূতি জ্যোতিকে বাধা দিয়ে কুসুমের বেশ্যা জীবনযাপনের কথা বলতে গিয়েও বলতে পারলো না। ও দেখলো, লণ্ঠন হাতে জ্যোতির চোখ দুটো প্রতিমার প্রদীপ্ত অপলক চোখের মতো আকর্ণ বিস্তৃত দেখাচ্ছে। তার দৃষ্টি নিবদ্ধ বিভূতির চোখের দিকে।

বিভূতির অতিকায় ছায়া মাটির দেওয়ালে। জ্যোতির ছায়া ঘরের মাটির মেঝেয় দরজার চৌকাঠ পেরিয়ে দীর্ঘ হয়ে পড়েছে। বিভূতির স্বর যেন দৈববাণীর মতো শোনালো, 'কুসুমদি বললেন, দেশে গাঁয়ে এত যে সব শত্রু লাটবেলাটি করে বেড়াচ্ছে, আমাদের যারা জেলে পুরেছে, তাদের মুণ্ডুগুলো কাটা হয় না কেন?'

জ্যোতির অপলক চোখ যেন আরো দীপ্ত দীর্ঘ হলো। প্রতিমার মুখে ঘাম তেল মাখানো। দৃষ্টি বিভূতির চোখের প্রতি। আলগা হাসিটা এখন আর নেই। ও লণ্ঠনটা রাখবার জন্য বিভূতির সামনে এগিয়ে গেল। একটা কেরোসিন কাঠের টেবিলের ওপরে লণ্ঠনটা রাখলো। ওর ছায়াটা এখন বিভূতির পাশে মাটির দেওয়ালে উঠে এলো।

বিভূতি মুখ ফিরিয়ে জ্যোতির দিকে তাকালো। জ্যোতির মুখ নিচু। বিভূতির মনে হলো ওর গলার কাছে কিছু ঠেলে আসছে, কোনো কথা অথচ উচ্চারিত না হয়ে কেবল শক্ত আর ভারি হয়ে উঠেছে।

জ্যোতি মুখ তুলে বিভূতির দিকে তাকালো। জ্যোতি হাসছে। অনেক দিনের পুরনো জ্যোতিকে যেন চেনা যাচ্ছে। এ হাসি আলগা না, এ হাসি জ্যোতির্ময়ী। জ্যোতি ওর আপন রূপে চেনা হয়ে উঠছে, চোখের দুই কোণে দুটি বিন্দুর কিরণে।



সাধ

নমিতার স্বরে কান্না থমকানো, কিন্তু ঝাপটার মতো ধিক্কার আর ঘৃণায় ফুঁসে উঠে বলে, 'ও মেয়ের মুখ দেখতে চাই না, ও মেয়ে মরুক।'

গোপীনাথ নমিতার পাশে শোয়া। ঘর অন্ধকার। মাথার টালির ওপরে টুপটাপ বৃষ্টির শব্দ। কাছের জলা থেকে ব্যাঙের ডাক ভেসে আসে। সংগে ঝিঁঝির ঝংকার। টালির মাথায় খুটখাট শব্দ, বোধহয় ইঁদুর ছুটোছুটি করে। গোপীনাথ নির্ভুলভাবে অন্ধকারে নমিতার বুকে একটি হাত রাখে। নমিতার বুকে আঁচল সরানো, গায়ে জামা নেই। গোপীনাথের হাত পড়ে নমিতার বুকের মাঝখানে, জেগে ওঠা হাড়ের ওপরে। অতি স্পষ্ট না, তবু হাড় টের পাওয়া যায়। পার্শ্বে আর নিচের দিকের নাভিতে শিথিল বুক, স্বাভাবিক গরম। গোপীনাথ নমিতার বুকের স্পন্দন টের পায়, কিন্তু স্বাভাবিক নিশ্বাসে ওঠানামা করে না। গোপীনাথ বোঝে, নমিতা বুকে কান্না আটকে রেখেছে। সে বললো, 'কেঁদো না।'

'কাঁদবো? আমার মরণ নেই, ও মেয়ের জন্য আমি কাঁদবো?' নমিতার মরণই হলো, একথা বলতে গিয়েই রুদ্ধ কান্না স্বরে স্ফুরিত হলো, 'আগে জানলে এই মেয়ে আমি পেটে ধরি?' যেন দুরন্ত যন্ত্রণা আর অনুশোচনায় তার স্বর ডুবে যায়।

এ কান্না বিগলিত না, প্রতি মুহূর্তে নিশ্বাসে ধরে রাখবার চেষ্টা। গোপীনাথ টের পায়। সে জানতো, সারা দিনের মতো রাগ ঝামটা, এইভাবে ফেটে পড়বার অপেক্ষায় ছিল। সে জানতো, নমিতা আর কেবলমাত্র রাগের দ্বারা দুঃখ আর যন্ত্রণাকে ভুলে থাকতে পারছে না। গোপীনাথ বউয়ের বুকে হাত চেপে চেপে বুলিয়ে দিতে লাগলো। কান্না থামাতে চাইছে না, সান্ত্বনা দিতে চাইছে। কিন্তু বলার কিছু নেই। সে বুক থেকে হাত তুলে নির্ভুলভাবে একবার নমিতার চোখের কোলে ছোঁয়ালো। ভেজা, গরম জলের ধারা। নমিতা হাত দিয়ে গোপীনাথের হাত সরিয়ে দিল।

গোপীনাথ জানে, নমিতার এ স্নেহ সান্ত্বনা সহে না। তার চেয়ে ওর দুঃখ আর যন্ত্রণা গভীর। কারণ দুঃখের থেকে বড় যে অপমান প্রাণে লাগে, তা অতি নিষ্ঠুর। গোপীনাথ উদ্গত দীর্ঘশ্বাস চাপে। তার আর একটি হাত, পাশেই অঘোর ঘুমে শায়িত মেয়ের গায়ে। মেয়ের বয়স চার পেরিয়ে পাঁচ। দু বছরের ছেলেটি নমিতার বাঁ দিকে ঘুমোচ্ছে। মেয়ে গোপীনাথের ডানদিকে। নমিতা এই মেয়ের কথাই বলে। নরম কৃশ ছোটোখাটো একটি প্রাণী। পরম নিশ্চিন্তে বাবার গা ঘেঁষে

কাত হয়ে গুটিসুটি ঘুমোচ্ছে। বাবার অন্য পাশে শুয়ে মা ওর মৃত্যু কামনা করছে, ও কিছুই শুনতে পারে না, জানতে পারে না। সংসারের যেটুকু যা কিছু বোঝে বা জানে, এখনো কথায় তা প্রকাশ করতে শেখে নি। হাসি পেলে হাসে, কান্না পেলে কাঁদে, রাগ হলে রাগ দেখায়, খিদে পেলে খেতে চায়, পড়তে শিখেছে, লিখতে শিখেছে, খেলার সময় খেলা করে। ওর মতো একটি মেয়ে-শিশুর পক্ষে যা যা করণীয়, তা-ই করে। হৃদয়ের অনুভূতিসমূহে যখন যা প্রতিক্রিয়া ঘটে, তার যেটুকু অবচেতনে ডুবে যাবার, ডুবে যায়। যা ভেসে ওঠার, তা ওঠে, আর শিশুর মতোই তা প্রকাশ করে। মালিন্য কী, কী-ই বা মাধুর্য, সম্যক কোনো জ্ঞান জন্মে নি। সংসার কী, কী তার নিরন্তরতায় বাধার সৃষ্টি করে, বাজে বা আঘাত করে, সে শিক্ষা কে ওর কাছে আশা করে? বাতুল ছাড়া কেউ করে না।

কিন্তু নমিতা বাতুল না, গোপীনাথ জানে। নমিতা কলির মা, একান্ত মা। মেয়ের কাছে তার কোনো দাবি নেই। কে-ই বা করে, এইটুকু মেয়ের কাছে। কেবল আশা পোষণ করা যায়। নমিতাও আশা পোষণ করে, তার মেয়ে কলি কেমন হবে। যেমনটি সে চায়, মেয়ে যেন তেমনটি হয়, এ আশা করে। সব মা করে।

নমিতার সব আশা ধূলিসাৎ হয়েছে। ওর কোনো দোষ নেই। আশাহত হলেও এতো যন্ত্রণা হতো না। বড় অপমানিত হয়েছে। তাই ও এমন করে বলে। অতি আদরের মেয়ের মৃত্যু কামনা করে। গোপীনাথের বাঁ হাত নমিতার অপুষ্ট বুকে, ডান হাত দিয়ে জড়ানো কলির গুটিসুটি নরম শরীর। ইজের পরা খালি গা। মশার ভয় নেই, একটা মোটা জালি কাপড়ের মশারি টাঙানো। চারজন এক মশারির নিচে। গোপীনাথের দুদিকে দুইরকমের গন্ধ। নমিতার গায়ে এ সংসারের যাবতীয় কাজ, বাসন মাজা, কাপড় কাচা, ঘরদোর পরিষ্কার করা, রান্না করা, ছেলেমেয়ে খাওয়ানো, দেখাশোনা, স্বামীর সান্নিধ্য ও সহবাস, সব মিলিয়ে একটি গন্ধ। আর একদিকে মৃদু সুগন্ধ, পাউডারের, গন্ধ তেলের। মেয়ের গন্ধ। এই দুই গন্ধে মাখামাখি গোপীনাথ, স্বামী ও পিতা, নিজের বাহির জগতের শ্রমের গন্ধ সে টের পায় না।

গোপীনাথ টের পায়, নমিতার বুক হঠাৎ অতিরিক্ত ফুলে ওঠে, তারপরেই গলা থেকে ছিটকে আসা কান্নার স্বর শোনা যায়, 'গলায় দড়ি এমন ভদ্দরলোক হবার। গলায় দড়ি আমার, এমন মেয়ের মা হবার। মরণ হোক আমার।'

গোপীনাথ নমিতার বুকে হাত চেপে ধরে, বলে, 'চুপ করো, ওরা উঠে পড়বে।'

নমিতা বলে, 'উঠুক, উঠে পড়ুক। ওই কালীমুখীটা উঠে পড়ুক, চুলের মুঠি ধরে ওকে আমি এই মাঝরাত্রে ঘরের বাইরে বিদেয় করে দেবো।'

গোপীনাথের অজান্তেই মেয়ের গায়ের ওপর হাত আরো নিবিড়ভাবে চেপে বসে। ভয় পায়, মেয়ের ঘুম না ভাঙে। জেগে উঠে এসব কথা যেন শুনতে না পায়। নমিতার গায়ের ওপরও তার হাত নিবিড়তর হয়ে সান্ত্বনায় বাহিত করে। বুকের পাশ থেকে ডানা চেপে ধরে। চুপ করাতে চায়।

'তা তুমি কিছুই পয়সা কড়ি দিতে না পারলে, পোয়াতি বউকে এখানে নিয়ে এসেছো কেন?' নার্সিং হোমের লেডি ডাক্তারের এই কথাটা গোপীনাথের মনে

পড়ে যায়।

নমিতার পেটে তখন তার প্রথম সন্তান, এই মেয়ে। কলি। নমিতা তখন আসন্ন-প্রসবা, পেটে ব্যথা উঠেছে। গোপীনাথ তখন মফঃস্বল শহরের অভিজাত অঞ্চলের কিন্ডারগার্টেনের মাইনে-করা সাইকেল রিকশাওয়ালা হয় নি। একজন মালিকের রিকশা চালাতো। মালিককে রোজ দিতে হতো পাঁচ সিকা, সারা দিনে যাত্রী জুটুক না জুটুক। কিন্তু সেই কাজটাকে বলা যেতো স্বাধীন ব্যবসা, যার অনিশ্চয়তার কোনো সীমা পরিসীমা ছিল না। কারণ স্টেশন একটা, বাজার একটা, রিকশা শত শত যার কোনো নির্ধারিত সীমা ছিল না। প্রতিযোগিতায় আর ভাগ্যের ওপর স্বাধীন রিকশাওয়ালার জীবিকা নির্ভর করে।

স্বাধীন রিকশাওয়ালাদের জগৎ আর পরিবেশটাও গোপীনাথের তেমন পছন্দ ছিল না। রিকশা চালাতে গিয়েছিল অভাবের তাড়নায়। ইস্কুলে ক্লাস এইট অবধি পড়েছিল। তার বাবার অভাব যেমন ছিল, সেও তেমনি লেখাপড়ায় একটুও মনো-যোগী ছিল না। বখাটে ছেলে বলতে যা বোঝায়, তাই ছিল। দেশ বিভাগের আগে, ওদের পরিবারে দরিদ্র মধ্যবিত্ত ভদ্রতার একটা নামাবলী ছিল। এদেশে এসে, কলোনীর জীবনে তাও গিয়েছিল। এক সময়ে গোপীনাথ ভাবতো, ভদ্রলোকের ছেলে ভদ্রলোক হয়েই জীবনটা কাটবে। তারপরে গায়ে হাতে পায়ে বড় হয়ে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছিল, কলে-কারখানায় একটা ভালো কাজ নিশ্চয়ই পেয়ে যাবে। তখন বিড়ি টেনে, তাস খেলে, রকবাজি করে কাটছিল। নাথতলার বস্তির এক তরকারির ফড়িয়ার মেয়ে নমিতার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টি করতো। নমিতার বাবা ভদ্রলোক ফরিয়া, ক্রেতাবাবুদের নমস্কার করে কথা বলতো, বাবুরা তাকে 'আপনি' করে বলতো।

গোপীনাথের চটকলে একটা কাজ হয়েছিল, বদলি কাজ। পঁচিশ টাকা হপ্তা। নমিতাকে বিয়ে করতে কে আর তখন আটকাচ্ছিল? নমিতাকেই বা আটকাচ্ছিল কে? চিরদিন কি বদলি থাকতে হবে নাকি। পাকা হবেই, দুদিন আগে আর পরে। কিন্তু চটের হালহদিস অন্যরকম ছিল সে সময়টায়। পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দিতে গিয়ে দুটো বছর খুব খারাপ চলছিল। বদলি তো দূরের কথা, প্রায় প্রত্যেকটা চটকলেই ছাঁটাই হয়েছিল।

গোপীনাথ চটকলের বিল্লিপত্র শুঁকে রিকশা চালাতে আরম্ভ করেছিল। মদ গাঁজা জুয়া যে ওকে আরো অনেক রিকশাওয়ালার মতো আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরতে পারে নি, সেটা নমিতার জন্য। নমিতা গোড়াতেই কালসাপের কোমরে ঘা মেরে-ছিল। ফুঁসলেও সে আর উঠতে নড়তে পারে নি। রিকশা চালাতে গেলেই যদি নেশা ভাং করে জুয়া খেলতে হয়, নমিতারই বা ঘরে ব্যবসা খুলে বসতে অসুবিধা কিসের?

এতো বড় কথা? হ্যাঁ, এতো বড় কথা। ব্যবসা না করতে পারে, নমিতা শহর জুড়ে হুজ্জোত বাধিয়ে দিতে পারে। এতো বড় কথা? হ্যাঁ, এতো বড় কথা। পরিণামে ঝগড়া বিবাদ থেকে গায়ে হাত তোলাও বাদ যায় নি। কিন্তু গোপী-নাথকেই পশ্চাদপসরণ করতে হয়েছিল। ইতিমধ্যে নমিতার গর্ভসঞ্চারও হয়েছিল।

নমিতা ব্যথায় অত্যন্ত কাতর হয়ে উঠলে, পাড়ারই এক বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক এসেছিল প্রসব করাতে। সে কোথায় কিসব হাত-টাত দিয়ে দেখে বলেছিল, 'সুবিধের বুঝছি নে, পেটের বাচ্চার মাথা খুব বড় ঠেকছে, তুমি বাপু হাসপাতালে নিয়ে যাও।'

শহরে কোনো হাসপাতাল নেই, নার্সিং হোম আছে। গোপীনাথ সাত-পাঁচ কিছু না ভেবে সোজা সেখানেই নমিতাকে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল। সব শুনে লেডি ডাক্তার সেই কথা বলেছিলেন। গোপীনাথ বলেছিল, 'দিদিমণি যখন ডাকবেন, ছুটে আসবো, মিনি মাগনায় আপনার সওয়ারি বইবো, যা কাজ বলবেন করে দেবো। আমাকে উদ্ধার করুন।'

লেডি ডাক্তার বিবাহিতা মহিলা। কয়েকটি সন্তানের জননী। নমিতার দিকে তাকিয়ে বোধহয় করুণা হয়েছিল। যদিও গোপীনাথকে বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের আবার কথার ঠিক। কাজ হয়ে গেলে আর তোমার পাত্তা আমি পাবো?'

পেয়েছিলেন। গোপীনাথের এই কৃতজ্ঞতাবোধ মহিলাকে খুশি করেছিল। নমিতার স্বাভাবিক প্রসব হলেও তিনি বিনা পয়সায় অনেকদিন ওষুধ দিয়েছেন। গোপীনাথের মেয়ের ওজন হয়েছিল আট পাউন্ড। তাতেও তিনি খুব খুশি হয়েছিলেন। নমিতাও প্রায়ই নার্সিং হোমে গিয়ে কিছু কাজকর্ম করে দিতো। একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। গোপীনাথের মেয়েটা যতো বড় হয়েছিল, ততো কলকল করে পাকা পাকা কথা বলতো। লেডি ডাক্তার নিজে নাম দিয়েছিলেন, কলকলি। তারপরে কলি। কলি দাস।

কলি যখন তিন বছরের তখন গোপীনাথের একবার অসুখ করেছিল। তখনো ওষুধ দিয়েছিলেন সেই মহিলা ডাক্তার। নমিতা তখন দ্বিতীয়বার গর্ভবতী। গোপীনাথ ভালো হবার পরে কিন্ডারগার্টেনের রিকশাওয়ালার কাজটা পেয়েছিল। সামনে পিছনে তিনটি শিশু মুখোমুখি বসে। হালকা ওজন, টানতে কষ্ট হয় না। বেতন একশো টাকা। দুপুরে টিফিন। সকাল ন'টা থেকে এগারোটা, বেলা একটা থেকে দুটো রিকশা টানা। শিশুদের বাড়ি থেকে নিয়ে আসা, বাড়িতে পৌঁছে দেওয়া। সাধারণ যাত্রী নয়, যথেষ্ট দায়িত্বের কাজ। শিশুদের নিয়ে সাবধানে তাকে চলাফেরা করতে হয়।

তারপরে বেতন বেড়ে হলো একশো পঁচিশ টাকা। দিদিমণিদের ছোটোখাটো ফাইফরমায়েশ খাটার দরুন। মাঝে মাঝে কিছু উপরি, জোটে শিশুদের অভিভাবকদের কাছ থেকে। গোপীনাথের জীবনটা সাধারণ রিকশাওয়ালাদের তুলনায় বদলিয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যেবেলা কলিকে নিয়ে পড়াতে বসতো। নিজেও নানান বইপত্র যোগাড় করে পড়াশোনা করে। কলিকে দেখা গেল, লেখাপড়ায়ও ও কলকলিয়ে উঠছে। মনোযোগ আছে, মনে রাখতে পারে।

গোপীনাথ আর নমিতার সাধ হলো, কলি কি কিন্ডারগার্টেন ইস্কুলে পড়তে পারে না? কলির মতো মেয়েদের গোপীনাথ যখন কোলে করে রিকশায় তোলে, সাবধানে নিয়ে যায়, তাদের সঙ্গে গল্প করে, গল্প করে ভুলিয়ে রাখে, কান্না থামায়, রাগ অভিমানে সান্ত্বনা দেয়, সামলায়, তখন নিজের মেয়ে কলির কথা বড়

মনে পড়ে। ইচ্ছা করে কলিকেও তেমনি করে নিয়ে যায়। দেখতে ইচ্ছা করে, ইস্কুলের মাঠে কলিও ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটে ছুটে খেলা করুক। দৌড়ঝাঁপ করুক, দিদিমণিদের আদর আর বকুনি খাক, লেখাপড়া শিখুক।
গোপীনাথের মনের কথাটি শোনা মাত্র, নমিতার প্রাণটাও উছলিয়ে উঠেছিল। আহা, কেন নয়? অতএব গোপীনাথ প্রথমে—আর সেই শেষ, এক ছোট দিদি-মণিকে মনের কথা বলেছিল। দিদিমণি অবাক আর বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, 'তুমি এ কথা বলছো কী করে গুপী? শহরের নামকরা বড়লোক ভদ্রলোকদের ছেলে-মেয়েরা যে কে.জি. ইস্কুলে পড়ে, তোমার মেয়ে সেখানে পড়বে? শোনা মাত্রই তো তাঁরা ক্ষেপে যাবেন। ওঁদের ছেলেমেয়েদের সঙ্গে একটা রিকশাওয়ালার মেয়ে পড়বে, এ কি ভাবা যায়?'
গোপীনাথ কেন্নোর মতো গুটিয়ে গিয়েছিল। মাথা নিচু করে চলে এসেছিল। নমিতা শুনে প্রথমে রেগে উঠেছিল, তারপরে কেঁদেছিল, 'বড় অপরাধ করেছি।' ...কিন্তু গোপীনাথের চিত্ত অশান্ত হয়েছিল। কথাগুলো শেলের মতো বিঁধছিল। কেন? কলি আমার মেয়ে বলে, ভদ্রলোকের মেয়ে নয়? গরীব হতে পারি, না হয় মাসে স্বামী-স্ত্রী চারবেলা খাবো না। না হয় আট বেলা। বড়লোক না হলে কি ওখানে মেয়েকে পড়ানো যাবে না? গোপীনাথ তো সব শিশুদের ভালবাসে। তাদের কারোর শরীর খারাপ হলে, ইস্কুল কামাই করলে, মন খারাপ হয়। কাজের অবসরে, বাড়ি গিয়ে খোঁজ নিয়ে আসে, কেমন আছে। তা না হলে মন খচ্‌খচ্‌ করে। আমার কলি কি এমন দুর্ভাগী, আমি নিজে তাকে নিয়ে যেতে পারবো না?
স্বামী-স্ত্রীতে মন্ত্রণা সভা হয়েছিল। খোঁজ পাওয়া গিয়েছিল এক বিধবা মহিলার, গোপীনাথদের বস্তির কাছেই দোতলা বাড়িতে থাকেন। তাঁর নামে নানান দুর্নাম, তবু শহরের সম্পন্ন ভদ্রলোকদের সঙ্গে তাঁর ওঠা বসা। বয়স হয়েছে, তাঁর চারটি মেয়ে আছে। দু'জনের বিয়ে হয়েছে, দু'জনের হয় নি। বিবাহিতা মেয়েরাও মায়ের কাছেই থাকে। মেয়েদের ঘিরেই দুর্নাম।
গোপীনাথ এবার অনেক ভেবেচিন্তে মা ঠাকরুণের কাছে প্রস্তাব রেখেছিল। মা ঠাকরুণ রাজী হয়েছিলেন। কলিকে নিজের দৌহিত্রী বলে পরিচয় দিয়ে, কে.জি. স্কুলে ভর্তি করাতে সম্মত হয়েছিলেন। গোপীনাথ আর নমিতা, কলিকে ওর মিথ্যা পরিচয়টা পাখির মতো পড়িয়েছিল। কলকলানি কলি তা বুঝতে পেরেছিল। ফিক করে হেসে, বাবার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলেছিল, 'তুমি এখন থেকে আমার রিকশাওয়ালা গুপীদাদা?'
কলির ইস্কুলের বেতন মাসিক আট টাকা গোপীনাথ খরচ করতে দ্বিধা করে নি। মাসিক রিকশা ভাড়া দশ টাকাও। বড় গোপন ব্যাপার। কাজটা খুব সাবধানে চালাতে হচ্ছিল। ইস্কুল কর্তৃপক্ষকে নিয়ে গোপীনাথের তেমন ভয় ছিল না। কলিকে কেউ তাঁরা গোপীনাথের মেয়ে বলে চিনতেন না। অন্য কোনোরকমের খোঁজ-খবরের দরকারও বিশেষ হতো না। গোপীনাথের ভয় ছিল ওর নিজের বস্তিবাসীদের নিয়ে, নিজের মেয়েকে নিয়ে, নিজের আবরণকে নিয়ে। সে যেন

কখনো না কলিকে নিজের মেয়ে বলে ভুল করে। কলি না করে নিজের বাবাকে দেখে। বস্তিবাসীদের অবিশ্যি এমন একটা ধারণা হয়েছিল, গোপীনাথ স্বতন্ত্র, তার মেয়ে ভদ্রলোকের মতো মানুষ হবে, সেটা এমন আশ্চর্যের কিছু না।

এক বছর ধরে সমস্ত ব্যাপারটি এমনভাবে চলছিল, গোপীনাথের চোখেও আর কোনোরকম অস্বাভাবিক ঠেকছিল না। মেয়ে বাড়ি থেকে ইস্কুলের য়ুনিফরম পরে চলে যেতো দোতলা বাড়ির ভিতর উঠোনে। গোপীনাথ রিকশার ভেঁপু ফুঁকলেই কলি চলে আসতো। কলি অন্যান্য ছেলেমেয়েদের সংগে গল্প করতো। দিদি-মণিদের সংগে কলকল করতো। আদর খেতো, দুষ্টুমি করলে চোখ পাকানো মিষ্টি বকুনি। মাথার চুলের ঝুঁটিতে বাঁধা রঙিন ফিতে উড়িয়ে মাঠে সকলের সংগে খেলা করতো। গোপীনাথ দূর থেকে লুকিয়ে দেখতো। মনটা ভরে উঠতো এক অনির্বচনীয় সুখে। মনে হতো, বাগানে ফুলের খেলা দেখছে, তার মধ্যে একটি তার নিজস্ব। তার আত্মজা।

কলি লেখাপড়ায় ভালো। অন্য বাড়ির শিশুদের মায়েরা ওর গাল টিপে আদর করতো, 'মেয়েটি ভারি মিষ্টি।' গোপীনাথ রিকশাওয়ালা মুখ ফিরিয়ে থাকতো। বুকে সুখের ঢেউ খেলতো, এমন কি চোখে জল এসে পড়তো। কোনো কোনো শিশু ছাড়তে চাইতো না, কলিকে জোর করে বাড়িতে নামিয়ে নিতো। খেলনা খাবার দিতো। ফিরে এসে বলতো, 'চলো গোপীদাদা।' ব্যথা কি একটু বাজতো না? সে ব্যথার মধ্যে সুখ ছিল আরো গভীর।

কলি না সত্যি মিষ্টি। নমিতার মনেও একই সুখের প্রস্রবণ। মেয়ের সংগে কথায় পারে না। কলির কচি মুখে আবার ইংরেজি বুলি! মাগো! নমিতার হাসতে চোখে জল। স্বামী স্ত্রী, দুজনেরই গর্ব।

একটা বছর কাটলো। কলি কে. জি. ওয়ানে উঠলো, ভেরিগুড মার্ক পেয়ে। গোলমালটা হলো আজ সকালে। গোলমালটা পাকাচ্ছিল কিছুদিন ধরেই। কলির প্রায়ই থেকে থেকে মন খারাপ। মুখ গম্ভীর। কথা বলে না, হাসে না। সব সময়েই কেমন ছিটকে ছিটকে যায়। কী হয়েছে তোর? কোনো কথা নেই। ঠোঁট টিপে থাকে। মুখ গোঁজ করে থাকে। এ আবার কেমন ধারা?

আজ রবিবার। আজ সকালে আসল কথা জানা গেল। নমিতা বিরক্ত হয়ে বললো, 'তোর হয়েছে কী? প্যাঁচার মতো মুখ করে থাকিস যে সব সময়?'

কলি ফুঁসে রুষে কলকলিয়ে উঠলো, 'প্যাঁচা আমি, না তুমি আর বাবা? আমি আর তোমাদের মেয়ে থাকতে চাই না।'

নমিতা প্রথমে যেন কথাটা বুঝতেই পারে নি। বললো, 'কী বললি?'

কলি বললো, 'তোমরা তো ছোটোলোক। আমি রিকশাওয়ালার মেয়ে হতে চাই না।'

নমিতার সহ্যের সীমা শেষ, কষালো এক থাপ্পড়। তারপরে দুই থাপ্পড়, 'মুখ-পুড়ি, তুই রিকশাওয়ালার মেয়ে না তো, কোন্ রাজার বেটি? কোন্ মন্ত্রী তোর বাপ, অ্যাঁ?'

গোপীনাথ এসে না পড়লে, আরো মার খেয়ে মরতো। কিন্তু কলির মুখ শক্ত, ঠোঁটে ঠোঁট টেপা, চোখে জল। তবু মেয়ে কাঁদলো না, বললো, 'আমি তোমাদের মেয়ে নই।'

সকাল থেকে বলতে গেলে, রান্না খাওয়া বন্ধ। গোপীনাথ কলিকে আদর করে সোহাগ করে অনেক বুঝিয়েছে। তারপরে বলেছে, 'আচ্ছা, তুই আমাদের মেয়ে নোস্, হলো তো?'

কলি বলেছে, 'ইস্কুল থেকে এ বাড়িতে আমার আসতে ইচ্ছে করে না।'

গোপীনাথের বুকটা বড় টনটন করেছে, বলছে, 'কোথায় যাবি?'

কলি ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছে, 'জানি না। তোমাদের ভালো লাগে না।'

গোপীনাথ বলেছে, 'বেশ, আর একটু বড় হ, আরো পড়াশোনা করে নে, তারপরে চলে যাস্।'

কলি আর কিছু বলে নি। কিন্তু নমিতার পক্ষে শান্ত থাকা সম্ভব ছিল না। রেঁধে বেড়ে সবাইকে খাইয়েছে, নিজে খায় নি। এখন বুকের মধ্যে পুড়েছে, জ্বলছে আর মুচড়ে মুচড়ে উঠছে, আর এইসব কথা বলছে।

গোপীনাথ শেষ কথা বললো, 'ঘুমোও। ছেলেমানুষের মন, আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।'

সকালবেলা কলি তেমনি গম্ভীর, মুখ অন্ধকার। মায়ের মুখের দিকে তাকালো না। গোপীনাথ নিজে কলিকে ইস্কুলের জন্য তৈরি করে, রিকশার হাজিরা দিতে চলে গেল। ইস্কুল থেকে রিকশা নিয়ে দোতলা বাড়ির সামনে এসে ভেঁপু ফুঁকতে লাগলো। কিন্তু কলি আর বেরোয় না। গোপীনাথ নিজে যখন রিকশা থেকে নামতে উদ্যত হলো, তখন কলি কাঁদতে কাঁদতে চোখ লাল করে বেরিয়ে এলো। গোপীনাথ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আবার কী হলো?'

কলির রুদ্ধ স্বর হঠাৎ কান্নায় ভেঙে পড়লো, 'মা আমাকে আজ আদর করে নি।'

গোপীনাথের মনটা হুহু করে উঠলো, বললো, 'তাতে কী হয়েছে? আয়, আমি তোকে আদর করি।'

কলি কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'না না, আমি ওই ইস্কুলে যাবো না। আমার মিছে কথা বলতে ভালো লাগে না।'

গোপীনাথ বললো, 'কেন?'

কলি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বললো, 'সকলের বাবা মা আছে। আমার নেই।'

গোপীনাথ কিছু বলতে গেল। কলি বললো, 'না না, আমি আর তোমাকে গুপী-দাদা বলতে পারবো না। আমি মায়ের কাছে যাচ্ছি।'

বলেই কলি বস্তির দিকে ছুটতে লাগলো। ওর মাথার ঝুঁটিতে ফিতে উড়ছে। হাতে বইয়ের ব্যাগ। গোপীনাথ তাকিয়ে রইলো। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে উঠলো, আর সকালের রোদ টলটল করে দুলতে লাগলো।

শানাবাউরীর কথকতা

তিন দিনের মত্ততার পর, সমস্ত গ্রামটা এখন অবসাদে ভেঙে পড়েছে। মুখ থুবড়ে পড়েছে রাস্তার ধারে, নালার পাশে, মন্দিরের চত্বরে, গোলায় গোলায় উঠোনে।

বৃষ্টি হয়ে গেছে কয়েক পশলা। সাঁওতাল পরগনার এ আরক্ত কার্তিক-মাটিতে সবে ধুলো উঠতে আরম্ভ করেছিল। বৃষ্টি পড়ে কাদা হয়েছে খানে খানে, ফাঁক হয়েছে জায়গায় জায়গায়, পেছল হয়েছে ঢালু চড়াইয়ে। মাটি থেকে গন্ধ বেরুচ্ছে একটা। তার সঙ্গে মিশেছে পচাই আর তাড়ির গন্ধ।

আকাশে এখনও আলুথালু মেঘ। ফাঁকে ফাঁকে অস্পষ্ট নক্ষত্র দেখা যায়। সাঁওতাল পরগনার পুবে, বীরভূম ঘেঁষে গ্রামটা। দূর-অন্ধকার পশ্চিমে রাজমহল মাথা তুলে আছে গাঢ় এক পোঁছ মেঘের মতো। আর পুবে পশ্চিমে, দুটি নদীর এপারে ওপারে শালবন। অন্ধকারে, গায়ে গায়ে জড়ানো বন মেঘের মতো জমে আছে এখানে ওখানে, উঁচু-নিচু উঁচুতে। শালবন, হঠাৎ খাড়া-খাড়া তালের সারি। সারি নয় তো ঘিরে থাকা জটলা। যেন কোনো এককালে মানুষ ছিল। এখন অভিশপ্ত, নিশ্চল বোবা।

কয়েক বছরের একটা বাঙালী গ্রাম। বাঙালীরা তখন ছিল গ্রামের রাজা। এখন মধ্যবিত্ত গেরস্ত। কুলটি আর বার্নপুরের লোহা-কারখানায় মেশিনঘরে গেজ মাপে, আপিসে কলম পিষে, খাদের কুলি-কামিনদের হাজিরা নেয়, কলকাতার রেলে সওদাগরী আপিসে কাজ করে। গ্রামে থাকে তারা স্মৃতির ভারে দুর্বল। দিন চলে গেছে, মনটা পড়ে আছে পিছনে।

এই সময়টা সবাই একত্র হয়। কালীপুজোর সময়ে। এক রাত্রি কি দুই রাত্রি। তারই চিহ্ন থাকে লেগে সবখানে। শূন্য মণ্ডপে মশা ডাকে, তাড়ি-পচুয়ের কলসী গড়াগড়ি যায়, হাঁড়িকাঠের কোল থেকে নিহত পশুর রক্ত জমে থাকে সারা গ্রামের পথে পথে, উঠোনে, মন্দিরের দেওয়ালে। গ্রামের আর আশেপাশের সাঁওতাল-বাউরীরা আদাড়ে-পাদাড়ে পড়ে মাটিতে মুখ ঘষে খোয়ারি কাটায়।

কর্তারা বাক্স-তোরঙ্গ নিয়ে ছোটেন রেল-স্টেশনে, দুমকার পথে বাসস্টপেজে। চাকরিস্থলে যাবেন।

শানা, হেই শানা কুথা গেলি রে!

ভদ্র-অভদ্রের এক ভাষা, মাতৃভাষা। সুন্দর রায় মশায় ডাকলেন বাউরীবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে, হেই তুরা কেউ ঘরকে নাই নাকি রে! শানা!···

সুন্দর রায় যাবেন জামসেদপুরের লোহা-কারখানায়। কোম্পানির কাজ, একদিন

দেরি হলে চলবে না।
শানার মা বুড়ি। তার খোয়ারি ভাঙে নি এখনও। কথা কানে গেল, জবাব দিতে পারল না।
সুন্দর রায়ের বাড়ি থেকে বড় ভায়ের ডাক শোনা গেল, এ সুঁদোর, তুর দেরি হয়ে গেছে। শানাকে পেলি ?
সুন্দর বললেন, না দেখছি।
দু দিনের জন্যে মেলা বসেছিল গাঁয়ের মধ্যে। তারই সব চিহ্ন পড়ে আছে এখনও। পড়ে আছে সাঁওতাল-নাচিয়ে মেয়েদের খোঁপার বাসী ফুল। খ্যাপা ভালুকের নখে ছেঁড়া কাপড়ের মতো সাঁওতাল-মেয়ের কাপড়ের টুকরোও চোখে পড়ে। বলির পশুর রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে সাঁওতাল-মরদের দ্বন্দ্বযুদ্ধের রক্ত। এখানে ওখানে ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে বলদহীন গাড়ি। কোথাও বা একাকী, বে-জোড় বলদ। গন্ধ শুঁকছে বলি দেওয়া মোষ-রক্তের।
দু দিনের জন্যে, সারা গ্রামটা তার শতাব্দীর আদিম উৎসব-মত্ত আসরে চলে গিয়েছিল। এখন আবার ফিরে আসছে। খারাপ কথায়, খোয়ারি ভাঙছে।
সুন্দর আবার ডাকলেন চেঁচিয়ে, শানা।
এবার জবাব পাওয়া গেল, বুলেন কেনে। কী বুলছেন ?
আশ্চর্য! দশ জায়গা ঘুরে শেষে এই গাড়ির তলায় শানা। জবাব দিল, মোটা ভারী গলায়।
সুন্দর বললেন, আরে, তু ওখেনে কী করছিস ?
ঘড়ঘড়ে গলায় জবাব দিল শানা, শুয়্যা আছি!
শুয়্যা আছিস ? কেনে ? ওখেনে কেনে ? ঘরে জাগা নাই ?
না।
মনে মনে হেসে বললেন সুন্দর, তাড়ি গিলে মরেছিস কেনে ?
না, ও মুতো খাই নাই।
একটু অবাক হলেন সুন্দর। শানা বাউরীর বড় রাগ-রাগ ভাব বোঝায়। বললেন, ইদিকে আমার যে আর দেরি নাই। ওঠ্ কেনে তাড়াতাড়ি।
কেনে ?
কেনে ? কথা বলার ছিরি দেখ। আজকাল সবাই এমনি করেই কথা বলে, তবে এতটা নয়। শানা বাউরীর মতো মুখের উপর অত কাটা-কাটা কেউ বলে না। আগের দিন হলে, চোখ তুলতে সাহস করত না। এখন মুখে মুখে কথা বলে।
সুন্দর বললেন, আরে, আমাকে জামশেদপুর যেতে হবেক নাই ?
শানার জবাব এলো গাড়ির তলা থেকে, এট্টা নাই, গাড়ি টানবে কে ?
কুথা গেল ?
কুন্ শালো লিয়ে গেল্ছে।
তবে মোটর-বাসে তুলে দিয়ে আসবি চ। মালটা লিতে হবেক।
মাল ?
হুঁ।

মাল ?
সুন্দর মনে মনে চটে উঠছিলেন। আবার বলেন, তাড়ি গেলে নি।
বললেন, হুঁ হুঁ, বেগার লয়, পয়সা দিব, চ কেনে ?
শানা বেরিয়ে এলো গাড়ির নিচে থেকে। কুচকুচে কালো গুলি-ভাঁটা চেহারা। মোটা ঠোঁট আর পাকানো চুল। কোকিলের মতো লাল চোখ। এক চিলতে কাপড় আছে কোমরে ; গায়ে জড়ানো পুরানো গামছা। পাশে লম্বায় অনেকখানি জীবটি কী করে গাড়ির তলায় ছিল, সেইটাই আশ্চর্য।
সুন্দর রায় আবার বললেন মনে মনে, হারামজাদা বলে তাড়ি খায় নি। জ্বরো রুগীর মতো গর্‌গর্‌ করছে। নেশায় চোখ খোলে না। তাড়ি খায় নি আবার !
নেশাখোরের মতোই বলল শানা, পয়সা দিবেন ছোট কত্তা ?
হুঁ।
ব্যাগারটা উঠে গ্যাল্‌ছে তা-লে।
হুঁ, ব্যাগারটা উঠে গ্যাল্‌ছে।
জমিদারিটাও উঠে গ্যাল্‌ছে কেনে ?
সুন্দর রায় ভালমানুষ, কিন্তু এই অযথা প্রশ্নে রাগ সামলাতে পারলেন না। যেন শানা কিছু জানে না। মুখ্যু, ঝগড়া যদি করতে চায়, তার কি এই সময় ? এই হাতে পাঁজি মঙ্গলবার। বললেন, গ্যাল্‌ছে গ্যাল্‌ছে তু কি জানিস্‌ না। অখন তু যাবি কিনা বল্‌ ?
গামছা ঝেড়ে বলল শানা, যাবেক কেনে নাই ? শরীলটো মন্দ, মনটা ভালো লয়। চলেন, কেনে যাবেক নাই ?
সুন্দর রায় আর দাঁড়ালেন না। হনহন করে চলে গেলেন বাড়ির দিকে। মন্দিরের এই চত্বরে জল জমে নি। রাস্তায় কাদা। একটু একটু বাতাসও ছেড়েছে। শানা সুন্দর রায়ের উঠোনে এসে দেখল, এক গোরুর-গাড়ির মাল। কোনোও কথা না বলে, মাথায় ট্রাঙ্ক আর বিছানা নিল, দু হাতে নিল সুটকেস আর বড় একটা পুঁটলি। সুন্দর রায়ের দাদা রতন রায় বললেন, এই শানা ট্রাঙ্কটা রেখে দে। ওটা যাবে না। এই চালের বস্তাটা লে।
ট্রাঙ্ক রেখে বস্তা নিল শানা। জামশেদপুরে বসে ঘরের চাল ফুটিয়ে খাবেন সুন্দর রায়। দু মন চাল নিয়েছেন। সুন্দর রায় পরিবারের কাছে বিদায় নেওয়ার আগে আরও দুজন এসে জুটল জামশেদপুরের যাত্রী। জীবন বাঁড়ুজ্জে আর হারান গাঙ্গুলী। দুজনেই কাজ করেন কারখানায়। হারান গাঙ্গুলী নিয়েছেন একটি হারিকেন, বাঁড়ুজ্জে একটি এক-ব্যাটারির টর্চ-লাইট। সেটাও নিবু-নিবু।
বেরুলেন তিনজনে। শানা ততক্ষণে অনেক দূরে।
হেই শানা।
সুন্দর রায় ডাকলেন চিৎকার করে। দূরে-অন্ধকার থেকে শানার গলা শোনা গেল, হুঁ, ছোটকত্তা, জমিদারিটো উঠে গ্যাল্‌ছে, কেনে ? সুন্দর রায় ক্ষুব্ধ বিস্ময়ে তাকালেন বাঁড়ুজ্জে আর গাঙ্গুলীর দিকে। তাঁরাও তাকালেন। সুন্দর বললেন, হারামজাদা কী বলে। চেঁচিয়ে জবাব দিলেন, হুঁ, হুঁ। তু কুথা ?

হেথা সাদা শিবের মন্দিরের কোণায়।—জবাব এলো শানার।

সাদা শিবের মন্দিরের কোণে। এই লতাগুল্মের ঘোর জটায় ভাঙা মন্দিরটার অন্ধকার কোণে কোন্ সাহসে গেছে শানা। সুন্দর বললেন, তু ওখেনে কেনে গেলছিস্? ঘাটের সাঁকো দিয়ে পার হবি নে?

আপনারা বাতি লিয়ে আসছেন, তাই ইদিকে আসলেন, সোজা পথে যাবেক। ছোটকর্ত্তা—

সাদা শিব অর্থাৎ শ্বেত শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত মন্দিরের কাছে এসে পড়ল তিনজনে। পুরনো হারিকেনের নানান ফুটোফাটা দিয়ে বাতাস ঢুকছে। ঘোর অন্ধকারে থরথর করে কাঁপছে তার ভুতুড়ে আলো। আলোর চেয়ে তিনজনের ছায়া বেশী। ছায়ার আড়ালে মানুষ দেখা যায় না।

শানাকে নিয়ে চারজন। তার মুখ দেখা যায় না। বোঝার ভারে ছায়াটাও অমানুষিক। যেন একটা পাহাড় মাথায় মানুষের দেহ। কালো শরীরে সর্পিল স্ফীত শিরাগুলি কিলবিল করছে। থ্যাবড়া-থ্যাবড়া খালি পা দুটি লাল কাদায় মাখামাখি হয়ে দেখাচ্ছে দগদগে ঘায়ের মতো।

মন্দিরের কাছ থেকে জমিটা নেমেছে। এলোমেলো পাথর ছড়ানো। নুড়ি আর চাংড়া। নামতে নামতে গিয়ে ঠেকেছে নদীতে। যার কলকল শব্দ শোনা যাচ্ছে অনেক নিচে। চার হাত চওড়া নদী। আসলে একটি কাঁদর।

তারপর আবার উঠেছে। উঠেছে শালগাছের শিকড় বেয়ে বেয়ে।

শানা বলল, হুঁ ছোটকর্ত্তা—

কী? কী বুলছিস তু?

বুলছি, পাপটো উঠে নাই।

কী পাপ?

শানা নামছে কর্দমাক্ত ঢালু জমি দিয়ে। মাথার বোঝার ভারটা চেপে চেপে বসেছে তার পায়ের তলায়। হড়কে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। বাঁড়ুজ্জে, রায়, গাংগুলী জুতো হাতে করেছেন।

শানা বলল, প্যাটের। পাপটো প্যাটের। জমিদারিটো খারিজ হয়্যা গেল্ছে, ব্যাগার নাই, কিন্তুক আমাকে ভাত দিবার কুনকালে কেউ নাই।

সুন্দর ভাবছিলেন, ঠিক কথাই তো। আমরা রাজা ছিলাম এককালে। দানার অভাবে গ্রাম ছেড়েছি। আর এই গ্রামের সাত ঘর বাউরী, সব ছিল, কেনা গোলাম। এখন আমরাও গোলাম। হিসেবে, শানারা গোলামের গোলাম। কে ভাত দেবে ওদের?

কাঁদরের এক হাঁটু জলে কলকল ডাক। নুড়ি পাথরে জলের স্রোত লেগে ধাতব শব্দ উঠেছে।

শানা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বোঝাসুদ্ধ নত হয়ে পায়ে হাত দিল সুন্দর রায়ের।

সুন্দর বললেন, এই হেই, তু কী করছিস্ রে?

এই ছোটকর্ত্তা, আপনকার পায়ে হাত দিয়ে বলছি, ও মুতটো আমি খায় নাই। খায় নি কিন্তু ওর ভাবভঙ্গিটা তাড়ি খাওয়ার মতোই।

সুন্দর বললেন, তা পা ছাড়্ কেনে !
কাঁদরের জলে হারিকেনের আলো পড়েছে, বাতাস ঘা খাচ্ছে চড়াইয়ের অন্ধকারে, শালবনে।
শানা বলল, ঐ কাঁদরের জলে বাউনদের আত্মা আছেন। মলে সবাই আসেন ইখ্যানে। মিছে বুললে আমার ঘাড় মটকাবেন ওঁয়ারা। হুঁ ছোটকত্তা।
কাঁদরের হাঁটু জলের স্রোতে কারা যেন হাসছে খিলখিল করে। হারান গাঙ্গুলীর গলা দিয়ে বেরিয়ে এলো, হেই শানা বাউরী—
হারিকেনের শিষটা কাঁপছে। মড়ুইপোড়া ঘাটের কাছে। মুচকুন্দের বাতাসের ঝাপটায় পাক খাচ্ছে অস্থির জোনাকিরা।
সুন্দর গলা বাড়িয়ে বললেন, কাঁদরটা পার হ, হেই শানা।
পার হয়ে গেল শানা। পিছনে পিছনে পার হলো বাকী তিনজনে।
এবড়ো-খেবড়ো চড়াই, পাথরে আর শালের গোড়ায় জল পড়ে পিছল হয়ে আছে। অন্ধকার এখানে ভারী। এলোমেলো শালগাছ। বাতাসে গায়ে গায়ে পড়ে। বড় বড় পাতায় সাঁ-সাঁ ডাক দেয় উত্তুরে বাতাস। হারিকেনের আলোয় শালের ছায়ায়, মানুষের ছায়ায় জড়াজড়ি হয়ে যাচ্ছে।
শানা আবার বলল, আমার মনটো অবুঝ হয়ে গেল্‌ছে ছোটকত্তা, আমার পানটো জবলে।
কথা বলে যেন শানা এই কার্তিকে বর্ষা-অন্ধকার শালবনে মানুষের অস্তিত্বটা ঘোষণা করল। সুন্দর বললেন, কেনে ?
কেনে ? এই মাজি-মাজিনরা নাচ-ফুর্তি করে গেল আমি দেখি নাই।
কেনে ?
দেখি নাই। এত বলি হলো, পাঁটা মোষ খাওয়া হলো, তাড়ি পচুই ভেইস্যা গেল লদীর জলের মতন, আমি দেখি নাই !
কেনে ?
আমার মনে সুখ নাই।
সুখ নাই, তু গাড়ির তলায় শুয়্যাছিলি ?
হুঁ।
ঘরকে যাস্ নাই কেনে, তুর ঘরকে মানুষ নাই ?
না। নাই।
সুন্দর দেখবার চেষ্টা করলেন শানার মুখ। দেখা যায় না। বাতাসের ভয়ে কাঁপা হারিকেনের আলোর শুধু কিলবিলে শিরাগুলি আরও স্ফীত হচ্ছে। কালো রঙ চকচক করছে উরুতের পেশীতে, পিঠের শিরদাঁড়ার দু পাশে।
ঘন শালবন ফিকে হয়ে এলো। একটা দূর-উতরাই হারিয়ে গেছে নিচের অন্ধকারের কোলে। তারপরে আর কিছু নয়।
সুন্দর বললেন, তুর মা—
মাটো আমার কুটনী।
হেই শানা, আপন মাকে গালি দিস্ না।

কেনে ?
দিস্ না।
কেনে ?
থেমে আসে শানার পা। সুন্দর চুপ করে গেলেন।
জীবন বাঁড়ুজ্জে বললেন, তুর মা-টোর কী দোষ ?
দোষ ?
হুঁ।
আপনকার ঘর থিকে দু ধামা ধান আনতে গিয়ে, উ আমার বউকে শুতে দেয়।
শুতে দেয় ?
হুঁ, আপনকাদের সংগে, আপনকাদের ব্যাটা-লাতীদের সংগে, বুইলেন ন-জামাই-ঠাউর। অ ছোটকত্তা, আমার ঘরে কেউ নাই। বউটো পলায়ে গেল্‌ছে উয়ার বাপ ভায়ের কাছে।
রায় বাঁড়ুজ্জে গাংগুলী নিজেদের অজান্তেই একবার চোখাচোখি করলেন। একটা অস্বস্তি ঘিরে ধরেছে যেন তিনজনকেই। এই অন্ধকারের মতো। পায়ের তলার রক্তবর্ণ পাঁকের মতো আঁকড়ে ধরছে। চুপ করে থাকলেই বাতাসের ডাকটা যেন বুকে চেপে বসতে চায়। আগে আগে বোঝা-মাথায় শানা। আলোর প্রয়োজন নেই তার। অন্ধকারেই ভালো দেখতে পায়।
সুন্দর বললেন, থাক্, উ কথা থাক্। তু বউটাকে লিয়ে আয়।
যেন বাতাসের গায়ে ঝাপটা দিল শানার গলা : না। বউটো আমার ছেলেমানুষ, উয়ার নাম সুখী। এই সবে ডাগর হয়্যা উঠেছে। কিন্তুক ছোটকত্তা, উয়ার সুখ নাই। মা-টো আমার কুটনী। আপনকাদের ব্যাটা-লাতীরা বাউরীপাড়ার আঁস্তা-কুড়েতে ঘুরর ঘুরর করে। পরের বাগানের অসাল্ ফল দেখলে ছেলেমানুষেরা যেমন করে। নোলা যেমন ছোঁক-ছোঁক করে, সি ধরন। তা বাউরীপাড়ার বাগানে যায় উয়ারা। আপনকাদের ঘরবাসী ব্যাটারা, মায়ের হাতে দুটো পয়সা দিলে, বউকে জোর করে তুলে দেয়। শহরে বাজারে মেয়েমানুষের পাড়া আছে, ইখ্যানে বাউরীপাড়াটো আছে। উয়াদের ঘরে ধান আছে, এট্টা শানা বাউরীর ডাগর বউকে লিয়ে শুতে উয়াদের রক্তে বড় দপ্‌দপানি। ছোটকত্তা, বউটো আমার ছেলেমানুষ, সবে ডাগর হয়্যা উঠেছে, উয়ার নাম সুখী, কিন্তুক সুখ পায় না। উয়ার সুয়ামিকে উরেয়াত করে, ভালবাসে, কাঁদে। জমিদারিটো উঠে গেল্‌ছে, ব্যাগার নাই, কিন্তুক পাপটো যেছে না।
জীবন বাঁড়ুজ্জে বলে উঠলেন, এই শানা, চুপ যা।
কেনে ?
হারান গাংগুলীও বলে উঠলেন, হুঁ, তু চুপ যা।
কেনে ?
সুন্দর বললেন, তু বউটোকে ফিরিয়ে লিয়ে আয়।
শানা বলল, না।
লাল কাদায় হারিকেনের আলো পড়ে গাঢ় রক্তের মতো দেখাচ্ছে। সেই গাঢ় ভারী

রক্তে মানুষ আর জানোয়ারের পায়র দাগ, গোরুর গাড়ির চাকার সর্পিল ক্ষত। কয়েকটা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে আবার শালবন। রাজমহলের কালো রেখা যেন গুঁড়ি মেরে কাছে এগুচ্ছে।

শানা বলল, না। দুবার পলায়ে গেলছে, দুবার লিয়ে আসছি। কেনে? না, মেয়েমানুষটার জন্যে আমার পান কাঁদে। উকে দেখতে না পেলে মনটো কেমন করে। উ আমার কাছে সব আপন মুখে বুলেছে। মনে উয়ার অং নাই। সব বুলেছে। পেথম-বারে যখন শুনলাম, আমার পানটো জ্বলতে লাগল। বউটোকে খুব পিটলাম। মা-টোকে পিটতে গেলম, কাপড় খুলে ন্যাংটো হয়্যা পলায়ে গেল। কিন্তুক, বউটো রইল নি। মাসখানেক পর, পলায়ে গেল বাপের কাছে। তখন আষাঢ় মাস। ছোটকত্তা, আপনাদের সি বড় লদীর পারে জমিতে কাজ হচ্ছিল। কিন্তুক মনটো মানল না। সবাই বলতে লাগল, শানা বাউরীর বউটো এট্টা সাঙা করছে। বিষ্টি মাথায় করে গেলম শাউড়বাড়ি। তো বউটো আমার ছেলেমানুষ। যেতেই আমার পায়ে পায়ে চলে আসল গুটি-গুটি। মাঠে পড়ে, ছোট দুখান হাত দিয়ে আমাকে মারতে লাগল। বুললে, কেঁদে কেঁদে বুললে, 'কেন লিয়ে যেছে আমাকে? ই মাঠে পুঁতে কেনে আকো না? আমার মনটো পোড়ে, বাপের ঘরকে মন বসে না, সুয়ামির ঘরে টিকতে পারি না।' হুঁ, বুললে বউটো…'মাঠে পুঁতে আকো, তাল গাছ হয়্যা জন্মাবো।'

তালগাছ, খাড়া খাড়া, একটু বা বাঁকা-বাঁকা, হঠাৎ যেন দল বেঁধে নেমে চলেছে উতরাইয়ের ঢালুতে। তালপাতার শত শত খাঁজে বাতাস যেন চাপা রাগে ডাক ছাড়ছে গরগর করে।

সুন্দর বললেন, শুন্, শানা, তু বউটোকে লিয়ে আয় কেনে।

না।

পিছলে পড়তে পড়তে শানা সামলে গেল। এখানে মাটি বেশী, পাথর কম। সামনে ধানক্ষেত। যত বাতাস, অন্ধকার তত গাঢ় হয়। দুমকার মোটর-বাসের রাস্তাটা ঠাওর করা যায় না। দিনের বেলা দেড় ক্রোশ দূরের চড়াই থেকে দেখা যায়। রাত্রে দেখা যায় দু-একটা আলো। এখন লেপে মাটি।

শানা আবার বলল, না, আর না। আমি ভাতের ধান্দায় ফিরি, পুরুষমানুষ কত-ক্ষণ ঘরে থাকবে। কিন্তুক আমার মা-টো আন্ কথা শুনায় বউকে। বলে, এত বড় জোয়ান, যোবতী বউ, তার শাউড়ী সুয়ামির কেনে এত দুঃখুক। মাগীটো চোখ চেয়ে কিছু দেখে কেনে নাই? বলে, আর ভর-দুকুরে পাড়ায় বার হয়্যা যায়। সি সময়ে আসে আপনাদের লারান মুকুজ্জে মশায়ের লাতী ক্যাদার বাবু। শালো বাবুটোর চার কুড়ি বিঘা ধানী জমি আছে—

হারান গাঙ্গুলী বলে উঠলেন, আচ্ছা আচ্ছা, তু চুপ যা।

কেনে?

বাতাসের ঝাপটাও যেন একই কথা জিজ্ঞেস করে, কেনে?

রায় বাঁড়ুজ্জে গাঙ্গুলী গায়ে গায়ে চলেন। কী যেন কী একটা জড়িয়ে ধরতে আসছে তাদের তিনজনকে। যেন হারিকেনটা নিবিয়ে অন্ধকারটাই ঠেসে ধরতে

চাইছে।

শানা আবার বলে, উয়ার চার কুড়ি বিঘা জমি আছে তো, ভর-দুকুরে উয়ার জল-তিস্টা পাবে কেনে নাই। ক্যাদার মুখুজ্জ্যের মন বড় ভালো, উ বাউরীর ঘরে জল খেতে চায়। ঘরের দরজায় গিয়া বলে, ই বউ, হেই কুথারে, ইট্টুস জল দে দেনি, খাই। ইয়ার ঘরে ধান আছে, তো উ শানা বাউরীর ঘরে ঢুকে যায়। উয়ার ধান আছে, তো বউটোর শাউড়ী ই সময়ে বাড়ি আসে। দরজায় খাড়া হয়্যা বউটোকে শাসায়, হুঁ, তুর শাউড়ী ঘরে নাই, দুকুর ঘোরে তু বাবু ঢুকিয়ে লিছিস, অখন কেঁদে কেটে ঢং মারছিস্। ইসব ছিনালী আমরা জানি না, কেনে ? উয়ার ধান আছে, খাবার ধান, বিক্বার ধান, তো সোমসারটা কাঁদরের জলের পারা উয়ার গা ভাসিয়ে যায়।

কী যেন বলতে চান সুন্দর রায়। বলতে চান গাঙ্গুলী, বাঁড়ুজ্জেও, কিন্তু কথা ফোটে না গলায়। কেবলই মনে হয় হারিকেনের আলোর বেষ্টনীটা ক্রমেই যেন ছোট হয়ে আসে। বড় হয়ে আসে অন্ধকার। সামনে অনেকখানি মাঠ। যুদ্ধের সময় সৈন্য-ব্যারাক হয়েছিল। এখন চারদিকে ভাঙা-চোরা, ছড়ানো, এলোমেলো, কেমন যেন মড়কে সব ফেলে পালিয়ে যাওয়া প্রেতপুরীর মতো। বাতাসটা এখানে কেমন কেমন শব্দ করে। আশেপাশে বড় গাছ নেই একটিও। ছিল শাল তাল—কেটে ফেলেছে। এখন শুধু বাবলা—বাবলার ঝাড়। পাথরে কাদায় মাখামাখি পথটা অনেক পায়ের দাগে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে আছে। অনেক মানুষ আর গোরু আর গাড়ির চাকার দাগ। ভারী বোঝা টেনে, শানার শরীরের পেশীগুলি আরও শক্ত হয়ে উঠেছে, শিরা-উপশিরাগুলি আরও স্ফীত সর্পিল দেখাচ্ছে। ঘামও দেখা দিয়েছে বিন্দু বিন্দু। শুধু ওর মুখটা দেখা যায় না।

বলে, এই বিশাল প্রান্তর ব্যাপ্ত, আকাশবিস্তৃত অন্ধকারের মতো যেন অশেষভাবে বলতে থাকে, বউটো আমার ছেলেমানুষ, হুঁ ছোটকত্তা। উয়ার সুয়ামীর ধান নাই, তাই বউটোর বড় পাপ। তো ফের পলায়ে গেল। হুঁ, পলায়ে গেল ফের। আর ই শালো শানা বাউরীটো ই শালোর পানটো আমাদিগের কাঁদরের জলের মতন সি জলটো যেমন বড় লদীতে গিয়া পড়ছে, ই মনটা শালোর তেমনি বউয়ের কাছে ছুটতে নাগল। মাটো আমার কুটনী। উকে মারলম, খুব মারলম, কাঁদরের পারে দুদিন শুয়্যা রইলাম, তাপরে গেলম বউটোর বাপের বাড়ি। লিয়ে আসলম। তো মাঠে পড়ে, সি ওই সায়েব-শালবনের মুখে এসে বুললে, 'সুয়ামিটো আমাকে কুথা লিয়ে যেছে ? শরীলের কাপড়খান খুলে লিয়ে আমাকে শালবনে ফাস কেনে লটকায় না। সায়েব শালবনে আমি শাল গাছ হয়্যা থাকব। আমার বাঁচতে সাধ নাই।' শালবনে মাথা কুটে মরতে ইচ্ছা করল আমার। কিন্তুক, বউটোকে পেয়ে মরতে পান চায় না।

সুন্দরের গলাটা কেমন গম্ভীর শোনাল, এই শানা, তু বউটোকে ফিরিয়ে লিয়ে আয়।

না। ছোটকত্তা, আমি মরতে পারি না। কিন্তুক ক্যাদার মুখুজ্জার ধান আছে, তো উয়ার আপনকারা আছে, পুলিশ দারোগা আছে, দুমকা সদরটো আছে।

আমার কী আছে ? বউটো আছে, ই গতরটো আছে।
হারান গাঙ্গুলী বললেন, শুন শানা, তু বউটোকে লিয়ে আয়।
না। আর লয়। পুজো পাবোন গেল, বলি হলেন, মাজিমাজিনরা নাচল, সবাই কত তাড়ি পচুই খেল, আমার মাটোর এখনো খোয়ারি কাটে নাই, ক্যাদার উকে এক ভাঁড় তাড়ির পয়সা দিছে। উয়ার ধান আছে। আমি গাড়ির তলায় পড়ে ছিলম।
সামনে একটা সুন্দর চড়াই। আস্তে আস্তে উঠছে, উঠতে উঠতে গিয়ে ঠেকেছে সেই সাঁকোর বাঁশের খোঁচা নিয়ে, অস্পষ্ট আকাশের সীমায়। সাঁকোর নিচে নদী। উঠতে দম নিতে হয়, কাদায় হড়কে যেতে চায় পা বারে বারে। হারিকেনের আলোয়-ছায়ায় একটা আদিম যাত্রার ছবি উঠছে ভেসে। রায় গাঙ্গুলী বাঁড়ুজ্জে তিনটে ছায়া একরকম। শানার ছায়াটা একটা ভয়াবহ জানোয়ারের মতো থলথলে রক্ত-পাঁকে কাঁপছে। ওপারের ওপরের উতরাইয়ে এসে আটকে গেছে যেন বাতাসটা।
জীবন বাঁড়ুজ্জে বললেন, ক্যাদারকে সামলে দেওয়া যাবে। তু বউটোকে লিয়ে আয়।
শানা বলে, না। ন-জামাইঠাউর, ক্যাদার মুখুজ্জ্যের ধান আছে, উকে আপনকারা সামলাতে লারবেন। না, আর লয়। বউটো চলে গেলছে আবার ছোটকত্তা—
হুঁ।
জমিদারিটা উঠে গেলছে ব্যাগারটো নাই, ক্যাদারটো আছে, উয়ার অনেক ধান আছে, তো আমার বউটো সুয়ামির সংগে ঘর করতে পারে না।
সুন্দর আবার বললেন, আরে শুন, তু মন গুমরে মরিস না, বউটোকে লিয়ে আয়।
না।
শানা বলে আর ঠেলে ঠেলে চড়াই ওঠে। তারপর হঠাৎ গলাটা কেমন হিংস্র হয়ে ওঠে শানার, আপনকারা এত বলি দিলেন মার থানে, ক্যাদার পাঁটাকে বলি দিলেন কেনে না ?
এই শানা, চুপ যা।
কেনে ?
আবার সব চুপ। চড়াইটা উঠছে ঠেলে ঠেলে।
শানা আবার বলে, শানা বাউরীর ধান থাকলে, ক্যাদারের বউটোকে লিয়ে শুতে যেত ?
সুন্দর বললেন, হেই শানা, গালি দিস না।
কেনে ?
জীবন বাঁড়ুজ্জে চিৎকার করে উঠলেন, না, দিস না।
কেনে ?
হারান গাঙ্গুলীও হেঁকে উঠলেন, না, গাল দিস না।
কেনে, কেনে ?
দাঁড়িয়ে গেল শানা। তিনজনেই দাঁড়িয়ে গেলেন শানাকে ঘিরে। বোঝা মাথায়

গভীর অন্ধকার থেকে, দুটি শ্বাপদ-চোখ চকচক্ করছে। কেউ কোনো কথা বলে না। রায় গাঙ্গুলী বাঁড়ুজ্জে, তিনজনেই বিস্মিত ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ। কিন্তু সাত-পুরুষের গোলামটাকে একলা পেয়েও তিনজনে কিছু বলতে পারছেন না। দেড়-শো বছরের মধ্যে তিনটে বাউরীকে শুধু পিটিয়েই মারা হয়েছে কর্তাদের আত্ম-সম্মানের জন্যে। আর একটা শানা বাউরী, বোঝা মাথায় গোলামটাকে অসুরের মতো মনে হচ্ছে। যেন কী মায়া আছে লুকিয়ে শানার চোখে। যেন ওপরের উতরাইয়ের কোলে কারা ঘাপ্‌টি মেরে আছে—শানার একটি ইশারায় উঠে আসবে তারা। চড়াইটাসুদ্ধ ধরিত্রীকে উলটে দেবে।

হারিকেনের আলোটা সত্যি কমে এসেছে। তেল আছে কিনা ঝুঁকে দেখতে পারছেন না জীবন বাঁড়ুজ্জে। নিচের একটা তালগাছের মাথা প্রায় এই চড়াইয়ের গায়ে এসে ঠেকেছে। তার পাতার বাতাস ডাকছে কানের কাছে।

শানা আবার উঠতে আরম্ভ করে। তিনজনে পিছু নেন আবার। আর শানা বলতেই থাকে : ক্যাদার শালো, উয়াদের মতন মানুষের ঘরে কত বেজম্মা আছে আমি জানি। গগন বাঁড়ুজ্জে মশায়ের দশ কুড়ি বিঘা ধানী জমি আছে, ওঁয়ার ছোট ব্যাটা ক্যাদারের আইবুড়ো বুনটার সঙ্গে শোয়। কেনে? না, চার কুড়ি দশ কুড়িতে অনেক তফাত আছে হিসেবে। বিশ কুড়ি বিঘার মানুষ নাই আর গাঁয়ে, না হলে গগন বাঁড়ুজ্জা মশায়ের টুকটুকে লাতীনটাকে মন্দিরে লিয়ে শুয়্যা থাকত আর একজনা।

তিনজনে প্রায় একসঙ্গে ফুঁসে উঠলেন, তু চুপ যা শানা বাউরী।

কেনে?

হুঁ, চুপ যা।

কেনে?

বাঁশের সাঁকোটা দুলছে বাতাসে। মানুষের পায়ের চাপে মড়মড় করছে। নিচে কলকল করছে নদীর জল।

শানার গলাটা আরও চড়ল, হিসাব করেন কেনে, আপনকাদের চেয়ে ক্যাদার শালোর জমি বেশী আছে।

একটা ভয়ংকর ইঙ্গিতে সুন্দর এবার শানার মতোই চিৎকার করে উঠলেন, হেই শানা বাউরী!

শানা বলে, আপনকারা বাউরী লয়। ক্যাদারের ধান আছে, উয়ার চোখে সবাই বাউরী।

জীবন বাঁড়ুজ্জে প্রায় ভয়ে ভয়ে চাপা গলায় চিৎকার করে উঠলেন, হেই হেই রে!

অন্ধকার উতরাইয়ের পাঁকে প্রায় গড়িয়ে নামছে শানা। বলে, হুঁ, আপনকারা শহরকে যান, বউঝিগুলান গাঁয়ে থাকে। আপনকাদের সোঁত বছরের ধান নাই, বিকবার ধান নাই, কিন্তুক আপনকারা বাউরী লয়। ক্যাদারের চোখে সবাই বাউরী।

রায় বাঁড়ুজ্জে গাঙ্গুলী—তিনজনে গায়ে গায়ে ঠেলাঠেলি করছেন। রাগ নয়,

ভয়ে যেন তিনজনে মিলে একটা দেখাচ্ছে একটা ছায়া নামছে উতরাই বেয়ে।
তারপরে হঠাৎ অদূরেই, একটি চড়াইয়ের মুখ থেকে মোটরবাসের হেড-লাইট ঝলসে উঠল। এই উতরাইটার নিচেই, পূবে-পশ্চিমে লম্বা, নিচে রাস্তাটায় এসে দাঁড়াবে।
শানা বলে, আমি শানা বাউরী, আমার ধান নাই। ই গতরটো আছে, বউটো ছিল, চলে গ্যাল্‌ছে। গতরটোর মধ্যে পানটো আছে—
মোটরবাসটা এগিয়ে আসছে উঁচু-নিচু দিয়ে, শাল-তালের ছায়া ফেলে, ছায়া গিলে। সুন্দর শানার কাছে কাছে যান। চাপা গলায় মোলায়েম করে ডাকেন, ই, হেই শানা, আরে, তুর গা পুড়ে যেছে রে।
শানার গলাটাও নেমে গেল। আর কেমন যেন গোঙাতে লাগল, হুঁ, ছোটকত্তা, শরীলে বড় আগুন জ্বলছে।
শানা, শুন, তুই বউটোকে লিয়ে আয়।
না।
হুঁ, লিয়ে আয়, উয়ার প্রাণটাও কাঁদছে তুর জন্যে। কেনে ? অ্যাঁ ?
জীবন বাঁড়ুজ্জে আর হারান গাঙ্গুলীও কাছে আসেন, তেমনি চাপা গলায় বলেন, হুঁ লিয়ে আয় তু বউটাকে।
না।
মোটরবাসটা এসে পড়ল। সুন্দর বললেন, তুর বউটো তুর, উয়ার ইজ্জতটো সুয়ামীর হাতে, কেনে ? তু বউটোকে লিয়ে আয়।
না। ছোটকত্তা, মোষ-পাঁঠার অক্ত দেখে দেখে, আমার পানটো অক্ত চাইছিল গ। বউটো চলে গ্যাল্‌ছে, আমার পানটো অক্ত দর্শন করতে চাইছিল, আমি পলায়ে ছিলম।
মাথার বোঝা খালি করে গাড়িতে তুলে দিল শানা। দেখা গেল কোকিলের মতো লাল চোখ তার। চুলগুলি ভাল্লুকের মতো ঘাড়ে কপালে ছড়িয়ে পড়েছে।
সুন্দর বললেন, তবু তু আমার কথা শুন্‌ শানা, তু আপন বউটোকে ফিরিয়ে লিয়ে আয়। আর এই নে, ধর্‌ কেনে ?
চার আনার পয়সা বাড়িয়ে ধরলেন সুন্দর রায়।
শানা পায়ে হাত দিল সুন্দর রায়ের, বলল, ব্যাগারটো উঠে গ্যাল্‌ছে ছোটকত্তা, গাঁয়ের পীরিতটো ওঠে নাই, উতে আমার ধম্মো লষ্ট হবেক।
গাড়ি গর্জন করে ছেড়ে দিল। তিনজনেই ডাকতে লাগলেন, হেই শানা, হেই।
শানা বলতে লাগল, না—না—
গাড়িটা হারিয়ে গেল একটা উতরাইয়ের ঢালুতে। শব্দটাও থেমে গেল আস্তে আস্তে।
সব নিস্তব্ধ হয়ে গেল। অন্ধকারটা যেন আস্তে আস্তে সুন্দর বিচিত্র মায়ায় উঠতে লাগল ভরে। বাতাসে দুলতে লাগল অন্ধকার, ঝিঁঝি বাঁশী বাজাতে লাগল। শানা বলতে লাগল আপন মনে, তবু বউটোকে লিয়ে আসব, কেনে ? কিন্তুক ক্যাদারটো তবে মরবেক শানা বাউরীর হাতে, আপনকারা বুঝেন না। হুঁ…

পিচের রাস্তাটা শুকনো মাটির চেয়ে খারাপ নয়। শরীরটা টলছে শানার। গামছা-খানা পেতে শুয়ে পড়ল রাস্তার উপর। আবার সেই বেলা দশটায় গাড়ি আসবে, তার আগে রাস্তা ফাঁকা থাকবে।

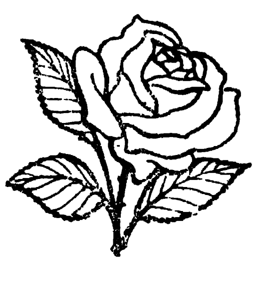
কিন্তু বাতাসটা বার বার বলতে লাগল, তবু তু আপন বউটোকে লিয়ে আয়—হুঁ—

গাটা পুড়ছে, চোখ জ্বলছে শানার, জ্বলে জ্বলে জল পড়ছে। ভোরবেলা উঠে দাঁড়াল সে।

দিগন্তবিস্তৃত মাঠ। চড়াই, উতরাই, বিচিত্র এক অনিয়মে সব সেজে আছে যেন। কোথাও চড়াই ঠেকেছে আকাশে, কোথাও শাল-পলাশের মাথায় এসে ঠেকেছে আকাশ। অনেকগুলি পথ এসে মিশেছে এখানে। ঠিকানা হারাবার মতো দিশে-হারা দিগ্‌দিগন্তে চলা পথ। কাদা পাঁক শুকু শুকু। রাজমহলটাকে মনে হচ্ছে একটা পাশ্নুটে দৈত্য আসতে আসতে থমকে গেছে। আর তার মাঝখানে, এবড়ো-থেবড়ো কালো শানাকে দেখাচ্ছে যেন একটা আদিম মানুষ দাঁড়িয়ে আছে দিশে-হারা হয়ে।

শানা তার রক্তাভ চোখ দুটো তুলে তাকাল পুবে। বলল, হুই দেখা যাচ্ছে সায়েব শালবন। দুবার হয়েছে, ইয়ারে তিনবার।

সায়েব শালবনের পরে দুটো ছোট ছোট মাঠ। তারপরে ছেলে মানুষ বউটোর বাপের বাড়ি। কাঁদরের নিরন্তর জলের মতো শানার লাল কাদামাখা থ্যাবড়া পা দুটো একটা উতরাই ধরে নামতে লাগল সায়েব শালবনের দিকে। হুঁ, বউটো ছেলেমানুষ তার। ধান নাই, সুয়ামীটোর পানও নাই, কেনে?



শহীদের মা

শরীরের মধ্যে যেন কেঁপে উঠল। বিমলা চোখ বুজলেন। তাঁর যেন স্পষ্ট মনে হলো, পেটের মধ্যে কী একটা নড়ে উঠল। চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপে পেটের মধ্যে নড়ে ওঠাটা অনুভব করতে চাইলেন। সামনের উনোনে তরকারি চাপানো, চড়বড় করে শব্দ হচ্ছে। জল নেই, এখুনি কড়ায় লেগে পুড়ে যাবে, বিমলা তথাপি নড়তে পারলেন না। সমস্ত অনুভূতি দিয়ে নিজের গর্ভে যেন কান পেতে রইলেন, আর তাঁর বুকের মধ্যে যেন নিঃশব্দে বাজতে লাগলো, 'বাদল! বাদল রয়েছিস?' পরমুহূর্তেই তাঁর শরীরটা আর একবার কেঁপে উঠল। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়তে লাগলো। চোখ খুলে উনোন থেকে কড়াটা নামিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। চোখের দৃষ্টিতে একটা ব্যাকুল অস্থিরতা। বাইরের দিকে কান পেতে কিছু যেন শুনতে চাইলেন। তারপরে দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালেন। তরকারিটা ওভাবে ফেলে গেলে নষ্ট হয়ে যাবে। উনোনের কাছে নামানো কড়াটার দিকে একবার তাকালেন। কিন্তু বিমলা স্থির থাকতে পারলেন না। নষ্ট হয় হোক। কাঁচা থাকুক, ছাই হয়ে যাক। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে রান্নাঘরের বাইরে এলেন।

আকাশে ঘন মেঘ। পুবে বাতাস বইছে। উঠোনের এক ধারে টগর গাছটা বাতাসের ঝাপটায় নুয়ে পড়ছে। এক বছরের শিউলি গাছটাও মাটিতে নুয়ে পড়তে চাইছে। বাড়িটা নিঝুম। কাঠের ফ্রেম, টিনের দেওয়াল, মাথায় টিনের চাল। মনে হয় বাড়িতে কেউ নেই। তথাপি বিমলা যেন পা টিপে টিপে উঠোনে নেমে এলেন। পাশের বাড়িতে কণার মা যেন কাকে কী বলছে। বিমলা ফণিমনসার বেড়া ডিঙিয়ে সেদিকে একবার দেখলেন। কণাদের বাড়িটা দেখা যায়। লোকজন দেখা যায় না। তিনি চোখ ফিরিয়ে আবার ঘরের দরজা খোলা বাড়িটার দিকে তাকালেন। কারোর কোনো সাড়াশব্দ নেই। বাতাসে তাঁর মাথার চুল কপালে পড়ছে। দূর থেকে দেখলে কাঁচা চুল বলে মনে হয়। কিন্তু পাক ধরেছে। চওড়া সিঁথেয় বাসি সিঁদুরের দাগ। হাতে শাঁখা নোয়া আর বিবর্ণ কয়েক গাছা সোনার চুড়ি। সেমিজের ওপরে খয়েরি পাড়ের সাদা শাড়ি। ময়লা হয়েছে, হলুদের দাগ লেগেছে। প্রৌঢ় বয়সেও শরীর বেশ শক্ত। মুখের রেখাতেই বয়সটা যেন বাড়িয়ে দিয়েছে। দেখলে মনে হয়, অল্প বয়সে সুশ্রী আর সবল ছিলেন। এখন তাঁর চওড়া শরীর যেন শক্ত আর কঠিন।

বিমলা কয়েক মুহূর্ত উঠোনে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরে সামনের দিকে না গিয়ে রান্নাঘরের পিছনে গেলেন। ফণিমনসার বেড়া ঘেঁষে বাড়ির পিছন দিয়ে এগিয়ে চললেন। ঘরগুলোর পিছন দিকের সব জানালাই বন্ধ। ঘর যেখানে শেষ, কোণে

একটা জবাফুলের গাছ। বিমলা দাঁড়ালেন। সামনে রাস্তা, উত্তর দক্ষিণে লম্বা। কলোনির রাস্তা, পাকা না, ঘেঁস ছাইয়ের রাস্তা। বিমলা উত্তর দিকে মুখ ফিরিয়ে তাকালেন। উত্তর দিকে রাস্তা যেখানে পশ্চিমে মোড় নিয়েছে সেই দিকে তাকালেন। যেখানে মোড়ের এক পাশে কয়েকটা ইঁট এক জায়গায় এখনো জড়ো হয়ে পড়ে আছে, সেইখানটা দেখলেন। ওখানে শহীদ বেদী হয়েছিল। কয়েক মাসের মধ্যে ভাঙতে ভাঙতে গোটা কয়েক ইঁটে এসে ঠেকেছে। কেউ তুলে নিয়ে গেলেই আর কোনো চিহ্ন থাকবে না। কারা বেদীটা ভাঙলো, ইঁটগুলো কোথায় গেল, কেউ জানে না। বিমলা দেখেছেন, প্রথম প্রথম পাড়ার একটা কুকুর বেদীটার গা ঘেঁষে শুয়ে থাকত। এখন থাকে না। গোটা কয়েক ইঁট ছাড়া এখন আর কিছু নেই।

বিমলা আপন মনে মাথা নাড়লেন। তাঁর ঠোঁট নড়লো। না, বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানেই দাহ করা হয়েছিল। মাস তিনেক আগে, বেদীটা যখন তৈরি হলো, তখন ওরা বিমলাকে ডাকতে এসেছিল। বাদলের মা বিমলা, শহীদের মা। তাই ওরা ডাকতে এসেছিল, বাদলের বন্ধুরা, পার্টির ছেলেরা। শুধু বিমলাকেই ওরা ডাকতে এসেছিল। এ বাড়িতে আর কাউকে না। বাদলের বাবাকে না, বাদলের দুই দাদাকেও না। বাদলের বাবা হরপ্রসাদ অন্য পার্টির লোক। দুই দাদা কৃপাল আর দয়াল, দুজনেই দুটো আলাদা আলাদা পার্টির মেম্বার। চারজন চার পার্টির লোক। বাদলের দলের ছেলেরা কেবল বিমলাকেই ডাকতে এসেছিল। শহীদের মাকে।

বিমলা গিয়েছিলেন। ওইখানে, ওই একটু দূরে, পশ্চিমের মোড়ে, রাস্তার ধারে, এখন যেখানে কয়েকটা ইঁট জড়ো হয়ে পড়ে আছে। শহীদ বেদীর শেষ চিহ্ন। কেন গিয়েছিলেন বিমলা জানেন না। বাদলের পার্টির ছেলেরা এসে বলেছিল, 'মাসীমা আপনি একবার চলুন।' বিমলা গিয়েছিলেন যেন ঘোর লাগা আচ্ছন্নের মতো। তার দুদিন আগে, আঠারো বছরের বাদলকে ওইখানেই কারা পিটিয়ে মেরেছিল। বিমলার চোখের সামনে এখনো স্পষ্ট। ক্ষতবিক্ষত বাদল। মুখে মাথায় শরীরের নানান জায়গায় রক্ত জমাট। নিথর বাদলকে এ বাড়ির উঠোনে ওরা নিয়ে এসেছিল। বাদল সব থেকে ছোট ছেলে। বিমলার শেষ সন্তান না। তারপরেও দুটি হয়েছিল, বাঁচে নি। বাদলের পরে আর কেউ ছিল না।

নিহত বাদলকে দেখে বিমলা একবার চিৎকার করে কেঁদে উঠেছিলেন। উঠোনে পড়ে বাদলকে একবার জড়িয়ে ধরেছিলেন। আপন মনেই কেঁদে উঠে বলেছিলেন, 'কে তোকে এমন করে মারল। ওরে বাদল।' উঠোন জুড়ে মানুষের মেলা। কিছুক্ষণ পরে চালিতে করে ফুল ছড়িয়ে মালা জড়িয়ে ওরা বাদলকে নিয়ে গিয়েছিল। হরিবল্ ধ্বনি দেয় নি। স্লোগান দিয়েছিল। 'কমরেড বাদল, জিন্দাবাদ! খুন কা বদলা খুন।'···কিন্তু বিমলা আর ভালো করে কাঁদতে পারেন নি। ডাক ছেড়ে কান্না যাকে বলে, তেমন করে কাঁদতে পারেন নি। সময়ে অসময়ে, কাজে অকাজে, হঠাৎ চোখে জল এসে পড়েছে। জল মুছেছেন।

দু দিন পরে ওই বেদীটা তৈরি হয়েছিল। বাদল যেদিন খুন হয়, সেদিন কলোনির স্কুলের মাঠে একটা সভা হচ্ছিল। অন্য কোনো দলের সভা, বাদলের না। সেখান

থেকেই কী একটা গোলমাল পাকিয়ে উঠেছিল। সঠিক কথা কেউ কিছুই বলতে পারে নি। সন্ধের ঘোরে বাদলকে নাকি কারা তাড়া করেছিল। বাদল বাড়ির দিকে দৌড়েছিল। কিন্তু মোড় পেরিয়ে আসতে পারে নি। কেউ বলে, বাদল একলা ফিরছিল। ওর খুনীরা আগে থেকেই মোড়ে অপেক্ষা করছিল। আরো অনেক রকম কথা। কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা, বিমলা বুঝতে পারেন না। বাদলের চিৎকারে লোকজন ছুটে গিয়েছিল। যখন গিয়েছিল, তখন সব শেষ। রক্তাক্ত নিহত বাদল ছাড়া, সন্ধের ঘোরে সেখানে আর কাউকে দেখতে পাওয়া যায় নি। পুলিস এসেছিল। বাদলের পার্টির লোকেরা নাকি কার নাম বলেছিল। তাদের কাউকেই কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নি। পুলিস কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি। হত্যাকারী বলে যাদের নাম করা হয়েছিল, তাদের মামলা দায়ের করা হয়েছিল। তারা এখন সকলেই জামিনে খালাস পেয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেস চলছে। কেস চলছে অথচ যেন ব্যাপারটা কিছুই না।

বাদল খুন হবার দু দিন পরে শহীদ বেদী তৈরি হয়েছিল। এই দু দিনের মধ্যেও ছোটখাটো সঙ্ঘর্ষ হয়েছে। একটা দোকানঘর পুড়ে ছাই হয়েছিল। কেন, তা বিমলা জানেন না। বিমলা কেন শহীদ বেদীর কাছে গিয়েছিলেন তাও জানেন না। গিয়ে একবার দাঁড়িয়েছিলেন। পনের ষোলটা ইঁট ধাপে ধাপে সাজিয়ে চুনসুরকি দিয়ে গাঁথা হয়েছিল। চুন দিয়ে লেপে সাদা বেদীর গায়ে বাদলের নাম লেখা হয়েছিল। বিমলাকে ঘিরে বাদলের পার্টির ছেলেরা সেই একই স্লোগান দিয়েছিল, 'কমরেড বাদল জিন্দাবাদ। খুন কা বদলা খুন'…ইত্যাদি। কে একটি ছেলে যেন বাদলের নাম করে কী সব বক্তৃতা করেছিল। সব কথা বিমলার কানে যায় নি। তিনি আচ্ছন্নের মতো দাঁড়িয়েছিলেন। আবার আচ্ছন্নের মতোই বাড়ি ফিরে এসেছিলেন। রান্নাঘরে গিয়ে রাঁধতে বসেছিলেন। বাড়িতে আর কেউ নেই। হরপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল খাবে, রান্না না করলে চলবে কেন। যেমন আচ্ছন্নের মতো গিয়েছিলেন, তেমনিভাবেই এসে রান্নার কাজে লেগেছিলেন। কিন্তু কারোর সঙ্গে কথা বলেন নি। কৃপা দয়ালের সঙ্গে না, হরপ্রসাদ নিজে এসে রান্নাঘরের দরজায় দাঁড়িয়েছিলেন। যেন খানিকটা আপন মনেই বলেছিলেন, 'কত দিন বলেছি, ওই দলটার সঙ্গে মিশিস না। কথা শুনলে তো।'

বিমলা কোনো জবাব দেন নি। হরপ্রসাদ তবু দাঁড়িয়েছিলেন। একটু থেমে, একটা নিশ্বাস ফেলে আবার বলেছিলেন, 'এখনকার এ সব পার্টি, খুনখারাপি ছাড়া কিছু জানে না। কিন্তু যার গেল, তার গেল, কেউ দেখতে আসবে না। বাদলকে তো আর ফিরে পাব না।'

হরপ্রসাদ চুপ করেছিলেন। বিমলা কোনো জবাব দেন নি। উনোনের দিকে ঝুঁকে বসেছিলেন। হরপ্রসাদ যেন একটা নিশ্বাস ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, 'যাই হোক, মনকে শক্ত কর। এ ছাড়া আর কী করবার আছে। আমার দেরি হয়ে গেছে, অফিসে চলে যাচ্ছি। খাবার একদম ইচ্ছে নেই।'

হরপ্রসাদ চলে গিয়েছিলেন। এ ছাড়া আর কোনো কথা হয় নি। তবে এই তিন মাসে মাঝেমধ্যেই ওই কথাটা বলেছেন, 'মনকে শক্ত কর। বাদলকে তো আর ফিরে

পাওয়া যাবে না।'
বিমলা সে কথার কোনো জবাব দেন নি। সংসারের কথা বলেছেন। দৈনন্দিন জীবনে কী দরকার, কী আনতে নিতে হবে, এই সব কথা। কিন্তু বাদলের বিষয়ে কোনো কথা বলেন নি। কৃপাল দয়াল কোনো কথাই বিমলাকে বলে নি। কৃপাল চাকরি করে। দয়াল বেকার। ওরা ভিন্ন ভিন্ন দলের লোক। বাড়িতে ওরা নিজেদের মধ্যে কম কথা বলে। গামছা-তেল-সাবান, চান করার কথা বলে, সিনেমা থিয়েটারের কথাও বলে। দলের কথা একেবারে না। খিদে পেলে বিমলার কাছে শুধু খেতে চায়। দোকান বাজার করে দেয়। কী আনতে হবে না হবে, জিজ্ঞেস করে। বাদলের বিষয়ে কোনো কথা হয় না। যেন ওদের ভাই মরে নি। অন্য পার্টির একটা ছেলে মরেছে। হয়তো নিজেদের পার্টির লোকের সঙ্গে কথা হয়। বাড়িতে কোনো কথাই নেই।
বিমলা জবাগাছের গা ঘেঁষে ভাঙা বেদীর দিকে দেখছেন। বাদল ওখানে নেই। বাদলকে শ্মশানে দাহ করা হয়েছিল। কিন্তু বাদল আজ বিমলার সারা শরীরে জেগে রয়েছে। আজ উনিশে শ্রাবণ। আজ সেই দিন। এখন এগারোটা বাজে। আঠারো বছর আগে এই দিনে, এ সময়ে বাদল পৃথিবীর মুখ দেখবার জন্য বিমলার পেটে অশান্ত হয়ে উঠছে।
বাড়িতে তখন কেউ নেই। বিমলা একলা। পূর্ণ গর্ভ, যে কোনো সময়েই বাদল ভূমিষ্ঠ হতে পারে। এ সময়েই ব্যথা উঠেছিল। ডাক্তার কবিরাজের দরকার ছিল না। বিমলা নিঃশঙ্ক। তিনি সবই বুঝতে পারছিলেন। অভিজ্ঞতা তাঁর শরীরের প্রতিটি অনুভূতির মধ্যে। ব্যথা উঠতেই বুঝতে পেরেছিলেন, সেটা নিষ্ফল ব্যথা না। সময় আসন্ন। আঠারো বছর আগে এই দিনে, এই সময়ে উপরঝাপ্তি বৃষ্টি পড়ছিল। একেবারে একলা থাকা উচিত না। বিমলা কোনোরকমে পাশের বাড়িতে কণার মায়ের কাছে গিয়েছিলেন। ব্যথায় রুদ্ধ চুপিচুপি স্বরে বলেছিলেন, 'দিদি, আর সময় নেই।'
কণার মা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তাড়াতাড়ি সব কাজ ফেলে বিমলার সঙ্গে চলে এসেছিল। কণা তখন ছ' সাত বছরের মেয়ে। তাকে পাঠিয়েছিলেন মেঘুর মা বিধবা বুড়িকে ডাকতে। আজকালকার মতো ঢাকঢোল পিটিয়ে বিমলাদের প্রসব হতো না। মেঘুর মা-ই খালাস করাত। মেঘুর মা বুড়ি এসেছিল। বিমলাকে দেখেছিল। বলেছিল, হ্যাঁ, আসল ব্যথা। আর বেশি দেরি নেই।
কণার মা তাড়াতাড়ি রান্নাঘর খালি করে দিয়েছিল। সেই ঘরেই বাদল হয়েছিল। তখন এ বাড়ির চেহারা অন্যরকম ছিল। টিনের দেওয়াল ছিল না। পাকা মেঝে ছিল না। ছেঁচা বেড়ার দেওয়াল। মাথায় তখনো টিনের চাল, কাঁচা মাটির মেঝে। বিমলা রান্নাঘরে মাদুরের ওপর শুয়ে বসে ব্যথার তীব্রতা সহ্য করছিলেন। কণার মা কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। তারও যেন ব্যথা উঠেছিল। বিমলা নিশ্বাস বন্ধ করে ব্যথা খাচ্ছিলেন। দাঁতে দাঁত চেপে স্থির থাকবার চেষ্টা করছিলেন। তার মধ্যেও ভেবেছিলেন, কী আসছে। ছেলে না মেয়ে। হরপ্রসাদের সাধ ছিল মেয়ে হয় যেন। হরপ্রসাদের সাধ, বিমলারও সাধ। দুই ছেলের পরে একটি মেয়ে।

কিন্তু তার শেষ গোঙানির সঙ্গে, যে ভূমিষ্ঠ হয়েছিল, সে ছেলে। মেঘুর মায়ের হাত, বিমলার পেটে চেপেছিল। তখনো ফুল পড়ে নি, আর একটি ব্যথার অপেক্ষা। তার মধ্যেই, বিমলা লহমায় দেখে নিয়েছিলেন। রক্তে আর লালায় মাখানো একটি ছেলে। তখনো গলায় কান্না ফোটে নি। ছোটখাটো এক-আধটা গোঙানি মাত্র। ফুল পড়ার পরে প্রথম গম্ভীরস্বরে কেঁদে উঠেছিল, ওঁয়া ওঁয়া।

মেঘুর মা নাড়ি কাটতে কাটতে বলেছিল, কত বড়। যেন পেট থেকেই এক বছরের ছেলে বেরুলো। দেখে মনে হচ্ছে, মাতৃমুখী।

মাতৃমুখী। বিমলা তাকিয়ে দেখেছিলেন। বুঝতে পারেন নি। মেঘুর মায়ের কোলের দিকে তাকিয়েছিলেন আর হঠাৎ-ই নিজের কোলটা বড় ফাঁকা মনে হয়েছিল। মেয়ে [illegible]হোক, নাড়ি ছেঁড়া ধন। কোলে নিতে ইচ্ছা করেছিল। সে কথা বলতে পারেন নি। মনে মনে বলেছিলেন, মাতৃমুখী ছেলে সুখী হয়।

বাইরে তখনো মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল। কণার মা বিমলাকে সাব্যস্ত হয়ে উঠতে সাহায্য করেছিল। দুধ গরম করে খেতে দিয়েছিল। মেঘুর মা নতুন শিশুকে গরম জল দিয়ে ধুয়ে মুছিয়ে, কাঁথায় মুড়ে বিমলার কোলে তুলে দিয়েছিল। বলেছিল, 'বুঝেছি রে বাপু। জলের তোড়ে এলি, বাপের যেন এরকম তোড়ে টাকা আসে। কী বাদুলে ছেলে বাবা, জগৎ ডোবানো বিষ্টি মাথায় করে এলো।'

জগৎ-সংসার ভাসানো বৃষ্টিই বটে। উঠোনটা জলে থৈথৈ করছিল। তখন রান্নাঘরের অবস্থাই বা কী। এখন তো অনেক পাকাপোক্ত ব্যবস্থা। তখন মাথার ওপরে ক্যানেস্তারার গোঁজামিলের চাল। ঘরের এখানে সেখানে টপটপ করে জল পড়ে। বিমলা একটা কোণ বেছে নিয়ে ছেলেকে বুকের কাছে ঢেকে শুয়েছিলেন। কণার মা চলে গিয়েছিল। তার তো সংসারের কাজ। মেঘুর মা ছিল। তার ওটাই কাজ। নবজাতককে বুকের কাছে নিয়েও কৃপাল দয়ালের কথা বিমলার মনে পড়েছিল। ওরা তখন স্কুলে গিয়েছিল। বিমলার দুশ্চিন্তা, যা দুরন্ত তাঁর ছেলেরা। বৃষ্টি মাথায় করে, স্কুল থেকে বেরিয়ে পড়েছে কিনা কে জানে। বৃষ্টিতে ভেজার ইচ্ছে হলে, মাস্টারমশাইরা কি আর ধরে রাখতে পারবে। হরপ্রসাদের কথা মনে পড়েছিল। অফিসে যাবার ইচ্ছা ছিল না। বিমলা-ই জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। হরপ্রসাদ বাড়িতে থেকে কী করবে। খানিকটা ছটফট করা ছাড়া করার কিছুই নেই। তার চেয়ে অফিসের কাজে থাকলে ভালো থাকবে। এদিককার ব্যবস্থা যা করবার বিমলাই করে রেখেছিল। কণার মাকে খবর দেওয়া। মেঘুর মাকে ডেকে নিয়ে আসা। এমন কিছু হাতি ঘোড়া ব্যাপার তো নয়। পোয়াতী মেয়েমানুষ ছেলে বিয়োবে, তার জন্য পাড়া দুরের কথা, বাড়ি মাথায় করার কিছুই নেই। ভালোভাবেই সব হয়ে গিয়েছিল। কাকপক্ষীতেও টের পায় নি। ঝমঝম বৃষ্টির শব্দে, আশেপাশে কেউ নতুন ছেলের কান্নাও শুনতে পায় নি।

বিমলা নবজাতককে স্তন চেনাবার চেষ্টায় মুখের কাছে ছুঁইয়ে দিচ্ছিলেন। প্রথমটা একটু ধরিয়ে দিতে হয়। শিশুর মুখের দিকে চেয়ে ভেবেছিলেন, এটি আবার কেমন হবে কে জানে। সকলের বেলাতেই এই কথাটি মনে হয়েছে। কৃপাল দয়ালের বেলাতেও। সব মায়ের কি এমনি মনে হয়? কে জানে। কৃপাল দয়ালের পরে

আরও দুটি হয়েছিল। তারা বেঁচে নেই। এটি কী করবে, কে জানে। ভাবতে ভাবতে, বুকের কাছে আরও চেপে ধরেছিলেন। মুখের দিকে তাকিয়ে দেখেছিলেন। মেঘুর মা বলেছে, মাতৃমুখ। বলেছে, খুব দুষ্টু হবে এই ছেলে। মাতৃমুখী ছেলে কেবল সুখী হয় না, দুষ্টুও হয়। কী দুষ্টুমি করবে? বিমলাকে জ্বালাতন করবে?

বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন। কোন্ ছেলেটা না জ্বালিয়েছে। কৃপাল দয়াল যে রকম দুরন্ত, এও সেইরকম হবে। একই গাছের ফল তো। তা হোক, ছেলেপিলে তো দুরন্ত হবেই। তার জন্য বকুনি খাবে, মার খাবে, আবার ভুলেও যাবে। কৃপাল দয়াল যে-রকম করে। ওদের দৌরাত্ম্যে এক এক সময় অস্থির হয়ে পড়েন। তখন না মেরে উপায় থাকে না। এও দুষ্টুমি করলে মার খাবে।

নবজাতক কেঁদে উঠেছিল। বিমলা মনে মনে হেসেছিলেন, বলেছিলেন, 'এখন তো মারছি না, কাঁদছিস কেন? বড় হ, তখন দেখব।'

বলতে বলতে বুকের কাছে তুলে, স্তন গুঁজে দিয়েছিলেন। সদ্যোজাত শিশু তা নিতে পারে নি। তখন দুধেতে পলতে ভিজিয়ে মুখে দিয়েছিলেন। চুষে চুষে খেয়েছিল। বিমলা কোনো কথাই ভোলেন নি। এই তো যেন সেদিনের কথা। প্রত্যেকটা কথাই স্পষ্ট মনে আছে। কৃপাল দয়ালের কথাও মনে আছে। ওরা জন্মেছিল পদ্মার ওপারে, নিজেদের ভিটেয়। বাদল এই বাড়িতে জন্মেছিল।

বৃষ্টি একটু ধরতেই, কাক ভেজা হয়ে, কৃপাল আর দয়াল বাড়ি এসেছিল। আঁতুড় মানতে চায় নি, আগেই ভাইকে দেখতে এসেছিল। দয়াল তো বায়না ধরেছিল, সে ভাইকে কোলে নেবে। মেঘুর মা ধমক দিয়েছিল, বিমলা সস্নেহে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ওকে নিরস্ত করেছিলেন। বলেছিলেন, 'কাল চান করবার আগে ভাইকে কোলে নিস।'

সন্ধেবেলা হরপ্রসাদ বাড়িতে এসে আগেই আঁতুড়ের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। গলা খাঁকারি দিয়েছিলেন। দরজাটা বন্ধ ছিল। বিমলা বুঝতে পেরে মেঘুর মাকে বলেছিলেন, 'কৃপার বাবা এসেছে, দরজাটা খুলে দাও।'

মেঘুর মা দরজা খুলে দিয়েছিল। হরপ্রসাদ বিমলাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুমি কেমন আছ?'

বিমলা সে কথার কোনো জবাব দেন নি। হারিকেনের আলোর সামনে ছেলেকে তুলে ধরেছিলেন। হরপ্রসাদ গম্ভীরভাবে শব্দ করেছিলেন, 'হুম্।' তারপর হঠাৎ হেসে বলেছিলেন, 'রূপবান ছেলে হয়েছে মনে হচ্ছে। এ ব্যাটা বাপের মতো হয় নি।'

বিমলা ওসব কথা ভোলেন না। সব কথা মনে থাকে, আছেও। হরপ্রসাদ কেন ও কথা বলেছিলেন, তাও তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। একবার হরপ্রসাদের মুখের দিকে তাকিয়েছিলেন। বাপের খুশি মুখ দেখলে বোঝা যায়। হরপ্রসাদ খুশিই হয়েছিলেন। বিমলা একটু গর্ব বোধ করেছিলেন। ভেবেছিলেন, এই মুখ দেখে হরপ্রসাদ এখন আর মেয়ের কথা মনে রাখে নি।

মেঘুর মা বলেছিল, 'রূপবান তো হবেই, মাতৃমুখ যে।'

তখনো বৃষ্টি পড়ছিল। হরপ্রসাদ রান্নাঘরের দরজায় ছাতা মাথায় দিয়েই দাঁড়িয়ে-

ছিলেন। নামটা তখনই তাঁর মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছিল, 'ব্যাটা জবর বাদুলে, একেবারে বাদলা।'
ইতিমধ্যে বীণা এসে পড়েছিল। কলোনীরই বিধবা মেয়ে। আগে থেকেই ঠিক করা ছিল। বিমলার প্রসব হলে সে রান্না-বান্না করবে। বীণা বড় ঘরের বারান্দায় রান্না চাপিয়েছিল। হরপ্রসাদ কৃপাল আর দয়ালকে নিয়ে গল্পে মেতেছিলেন। সেদিন আর ওদের পড়তে বসতে বলা হয় নি। বিমলা সবই শুনতে পাচ্ছিলেন। এদিকে মেঘুর মা নানানখানা বকবক করছিল। বিমলা বুকে সন্তান নিয়ে কেমন একটা নিবিড় স্বস্তি বোধ করছিলেন।
আজ সেই দিন। আঠারো বছর আগের সেই দিন এখন, বেলা এগারোটা। চুপ করে বসে, চোখ বুজলে, বিমলা চমকে চমকে উঠছেন। পেটের মধ্যে যেন কিছু নড়েচড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল! ঘরের কোণে জবাগাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছেন বিমলা। ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে তাকিয়ে চোখ বুজলেন। হ্যাঁ, আবার, আবার মনে হচ্ছে পেটের মধ্যে ভ্রূণ নড়ছে। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, বুকের কাছে হাত দুটো জড়ো করলেন। এ আবার কী, এরকম মনে হচ্ছে কেন? সন্তান জন্ম দেবার ক্ষমতা তাঁর, অনেককাল গত হয়েছে। আজ কে এমন করে তাঁর গর্ভের মধ্যে নড়ে-চড়ে বেড়াচ্ছে। বাদল কি তাঁর শরীরের মধ্যে মিশে আছে! তিনি মনে মনে ডাকলেন, 'বাদল, বাদল।'
'মা! ও মা!'
কৃপালের গলা। কৃপাল ডাকছে, বিমলা সাড়া দিলেন না, নড়লেন না। যেমন দাঁড়িয়েছিলেন তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। তাঁর মুখ শক্ত হয়ে উঠল। সমস্ত শরীরটাই শক্ত হয়ে উঠল। দৃষ্টি, ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে। ছেলেদের ডাকে কোনোদিন সাড়া দিতে ভোলেন না। আজ বিমলার মুখে সাড়া নেই। আজ তিনি সাড়া দেবেন না।
দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে আস্তে আস্তে তাঁর মনে পড়ল, কৃপাল দয়াল ভাইকে নিয়ে ছেলেবেলায় কেমন খেলা করতো। কৃপাল-দয়াল পিঠোপিঠি ছিল। বাদলের বয়স কম ছিল। মাঝখানে দুজন মারা গিয়েছিল। দয়ালের প্রায় সাত বছরের ছোট বাদল। বাদলকে ওরা কোলে করে বেড়িয়েছে। মায়ের কাজের সময় দেখাশোনা করেছে। ছোট্ট ভাইটিকে দুজনেই ভালবাসতো। কাড়াকাড়ি করে খেলতো। ছোট ভাইকে কিছু না দিয়ে দুজনে মুখে তুলতো না। পিঠোপিঠি হলে তা হতো না। কৃপাল দয়ালের তো রোজ ঝগড়া মারামারি লেগেছিল। ওরা দুজনে ছিল সমানে। ওদের মারামারি থামাতে বিমলাকে লাঠি তুলতে হতো। হরপ্রসাদও শাসন করতেন। কিন্তু বাদলকে নিয়ে দুজনেই কাড়াকাড়ি। সব কথাই মনে আছে বিমলার। বাদল যখন কথা বলতে শিখেছিল তখন কৃপাল দয়াল জিজ্ঞেস করত, বাদল কাকে বেশি ভালবাসে। কার কাছে থাকতে চাইতো। লোভী শিশু, সে বুঝতে পারতো, কাউকেই সে হারাতে চায় না। দুই দাদারই মন যুগিয়ে কথা বলত। বিমলা আড়ালে মুখ টিপে হাসতেন, মনে মনে বলতেন, 'একফোঁটা ছেলের চালাকি দেখ।'
হরপ্রসাদও ছোট ছেলেটিকে ভালবাসতেন। কৃপাল দয়াল যত না আদর কাড়তে

পেরেছে, কোলে চাপতে পেরেছে, বাদল সব কিছুই বেশি পেয়েছে। কিন্তু সে সবই ছেলেবেলার কথা। তখন সংসারের চেহারা ছিল অন্য রকম। হরপ্রসাদ চাকরি করতেন আর প্রকাশ্যেই রাজনীতি করতেন। অবসর সময়ে, নিজের দল নিয়ে মেতে থাকতেন। বিমলার তাতে কোনোদিন কিছু যায় আসে নি। পুরুষমানুষ কত কী নিয়ে থাকে। মেয়েদের সে সব ভাবতে গেলে চলে না। বিমলা বরং মনে মনে খুশিই ছিলেন। হরপ্রসাদ দশজনের সংগে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সভা-সমিতি করছে। তবু নেশা ভাঙ করে বাজে আড্ডায় তো সময় নষ্ট করে না। টাকাও নষ্ট করে না। সবাই হরপ্রসাদ বলে ডেকে নিয়ে যায়। পাড়ার একজন গণ্যমান্য লোক বাইরে বাইরের মতো, সংসারে সংসারের মতো। স্ত্রী পুত্রদের নিয়ে, গরীব মধ্যবিত্তের জমজমাট পরিবার।

আস্তে আস্তে কৃপাল দয়াল বড় হয়ে উঠতে লাগলো। ওদের পিছনে বাদল যত বড় হয়ে উঠতে লাগল সবাই যেন কেমন বদলে যেতে লাগলো। বাদল দাদাদের সংগ আর পাচ্ছিল না। ওরা তখন বাইরের জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। ওদের কোথায় কী দল, বন্ধু, সেসব নিয়েই ব্যস্ত। বাড়িতে ওদের দেখা পাওয়া ভার। বাদলও ওর জগৎ খুঁজে নিয়েছিল। ওরও বন্ধু ছিল, খেলাধুলো ছিল। বিমলা এসব দেখেছেন, বিশেষ করে কখনো কিছু ভাবেন নি। বরং মনে হয়েছে, এরকমই হয়। সকলেরই হয়। বড় হচ্ছে তো সব। সকলেই যে যার আলাদা পথে ফিরছে।

কেবল হরপ্রসাদ বিরক্ত হচ্ছিলেন। কখনো রাগ, কখনো ক্ষোভ প্রকাশ পাচ্ছিল। বিশেষ করে কৃপাল আর দয়ালের ওপরে। বিমলা হরপ্রসাদের কাছে শুনতেন, কৃপাল দয়াল কলেজে ঢুকে নাকি রাজনীতি করছে। ছাত্ররা সবাই করে। কৃপাল দয়ালের কী দোষ বিমলা ভেবে পেতেন না। একটা কথা বুঝতে পারতেন, হরপ্রসাদ যে রাজনীতি করে কৃপাল দয়াল তা করে না। বিমলা বলতেন, 'কলেজে ওরা কী করছে তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে কী লাভ?'

হরপ্রসাদ রেগে জবাব দিতেন, 'ওসব রাজনীতির নামে গুন্ডামি। আমার পয়সায় কলেজে পড়ে ওসব চলবে না। তোমার ছেলেদের এ কথা জানিয়ে দিও।'

হরপ্রসাদের কথার ধরনে বিমলা মনে মনে রুষ্ট হতেন। আবার ভাবতেন, বাবা যে রকম বলে ছেলেদের সেরকম চলাই উচিত। তাহলে আর সংসারে কোনো গোলমাল থাকে না। কৃপাল দয়ালকে তিনি বলেছেন, 'কলেজে যাস্ পড়তে, সেখানে আবার ওসব কী। তোদের বাবা পছন্দ করে না।'

ওদের এক জবাব, 'ওসব তুমি বুঝবে না মা।'

একমাত্র বাদলকে নিয়ে তখন কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। হরপ্রসাদেরও কোনো অভিযোগ ছিল না। মায়ের সংগেই বাদলের ভাব বেশি। সংসারের কাজে কর্মে, বাদলকেই পেতেন। বকে ধমকেই করাতে হতো, তবু করত। কিন্তু দিনে দিনে সংসারের চেহারাটা বদলে যাচ্ছিল।

কৃপালের সংগেই প্রথম হরপ্রসাদের লাগলো। বাইরের বিবাদ ঘরে এসে ঢুকেছিল। কেবল তর্কাতর্কিতেই সব শেষ হতো না। হরপ্রসাদ ক্ষেপে উঠতেন। ক্ষেপে উঠে যা তা বলতেন। কৃপাল মাথা নোয়াতো না। সে হরপ্রসাদের দিকে জ্বলন্ত চোখে

চেয়ে থাকতো। বিমলা এসে কৃপালকে সরিয়ে দিতেন, 'সরে যা এখান থেকে। বাপের মুখে মুখে কথা বলতে লজ্জা করে না!'

বিমলা হরপ্রসাদের ওপর খুশি হতেন না। কৃপাল তো ওঁর ছেলে, বাইরের শত্রু না। কিন্তু শুনলে সেইরকমই মনে হতো। কেবল কৃপালের সঙ্গে না, দয়ালের সঙ্গেও হরপ্রসাদের একই ব্যাপার ঘটতো। বিমলা মনে করতেন, কৃপাল দয়াল একই দল করে।

বিমলার সে ভুল ভাঙতেও দেরি হয় নি, যখন দেখেছিলেন, দুজনের মধ্যে তর্ক ঝগড়া। নিতান্ত বাড়ির মধ্যে, আর বিমলা সামনে থাকতেন বলে ওরা মারামারিটা করতে পারতো না। এত দলাদলি কিসের, বিমলা বুঝতে পারতেন না। সবাই মিলে একটা দল করলেই তো সব মিটে যায়। কিন্তু বাড়িতে তখন তিনটে দল। হরপ্রসাদ কৃপাল দয়াল। আর এক দলে বিমলা আর বাদল। তবে বাদল একেবারে নিরপেক্ষ ছিল না। ছোড়দা দয়ালের দিকে ওর টান বেশি। বলতো, 'ছোড়দা ঠিক বলে।'

বিমলা জিজ্ঞেস করতেন, 'কেন?'

বাদল বলতো, 'আমাদের স্কুলের সব ওপর ক্লাসের ছেলেরা ছোড়দাকে মানে—ছোড়দা গেটে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিলে সব ছেলেরা ধর্মঘট করে বেরিয়ে আসে।'

'তাই বুঝি ছোড়দার মতো হবি!'

সে বিষয়ে বাদল কিছু বলতো না। ওর জবাব ছিল, 'তা আমি কি করে জানবো।'

বিমলা বলতেন, 'তুই ওসবের মধ্যে যাস নি। দেখছিস্ না, বাড়িতে কী রকম অশান্তি।'

যত দিন যাচ্ছিল, অশান্তির চেহারাটা বদলে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ, কৃপাল, দয়াল কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলতো না। বিমলা রান্না-বান্না করেন, ওরা এসে খায়। রাত্রে শোয়। কৃপাল দয়াল রোজ রাত্রে বাড়িতেও থাকতো না। পড়াশোনা হচ্ছিল না। কৃপাল একটা চাকরি যোগাড় করে নিয়েছিল। দয়ালেরও সেই অবস্থা। পড়া হবে না। কিন্তু কেবল পার্টি করলে চলবে না। ওরও একটা চাকরি চাই।

ইতিমধ্যে বাদল বড় হয়ে উঠেছিল। ক্লাস টেনে পড়বার সময় ওর টাইফয়েড হয়েছিল। বিমলার ভিতরটা ভয়ে গুটিয়ে গিয়েছিল। নানা অশুভ চিন্তা তাঁর মাথায় এসেছিল। এতখানি বড় বয়সে কোনো সন্তান তাঁকে হারাতে হয় নি। এমন ভারী রোগও কারোর হয় নি। তখন দেখা গিয়েছিল, কৃপাল ডাক্তার ডেকে এনেছিল। দয়াল বসে বসে বাদলের মাথায় বরফ দিয়েছে। রক্ত বিষ্ঠা পরীক্ষা করাবার জন্য নিয়ে গিয়েছে। হরপ্রসাদ উদ্বিগ্ন মুখে, বাদলের বিছানার সামনে বসে থেকেছেন।

তখন তো বাদল কোনো পার্টি করে না। করলে কী চেহারা হতো, কে জানে।

বিমলার চোখের সামনে ভেসে উঠলো শ্মশানযাত্রার ছবি। এ বাড়ির উঠোন থেকেই, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত বাদলকে শ্মশানে দাহ করতে নিয়ে গিয়েছিল। মৃতদেহ ঘিরে ছিল বাদলের বন্ধুরাই, ওর পার্টির লোকেরা। কৃপাল দয়াল সেখানে এসে দাঁড়ায় নি। বোধহয় দাঁড়াতে পারে নি। হরপ্রসাদ একটু দূরে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে

কেউ একটা কথা বলে নি। তিনিও বলেন নি। বাদলকে ওর বন্ধুরাই কাঁধে করে নিয়ে গিয়েছিল। বাবা নয়, ভাইয়েরা নয়. পার্টির ছেলেদের কাঁধে বাদলের মৃত-দেহ শ্মশানে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ চুপ করে দাঁড়িয়েছিলেন। দাদারা বাড়িতে ছিল না।

টাইফয়েডের সময়, বাদল যদি পার্টি করতো, তাহলে কী হতো কে জানে। শ্মশান-যাত্রার মতোই হয়তো, বাবা দাদারা দূরে সরে থাকতো। পার্টির কাছে বাবা ছেলে ভাই বলে কিছু নেই। পার্টির পরিচয়ই একমাত্র পরিচয়। একে কেমন পার্টি করা বলে, বিমলা বোঝেন না। বিমলা শুধু সংসারটা মাথায় করে রেখেছেন।

কিন্তু পার্টিই তা হলে সব। বিমলার চোখে যেন আগুনের আঁচ লাগে। এক মুহূর্তের জন্য তাঁর দৃষ্টি ফিরে আসে শহীদ বেদী থেকে। তিনি বাড়ির দিকে ফিরে তাকান। ঘাড় ফিরিয়ে, পিছনে তাকিয়ে গোটা বাড়িটাকে যেন একবার দেখে নেবার চেষ্টা করেন।

'কোথায় গেলে অ্যাঁ ? শুনছ।'

হরপ্রসাদের গলা। বিমলাকে ডাকছেন। বিমলা সাড়া দিলেন না। মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার তাকালেন ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে। তাঁর মনে পড়ল, আজ যেন কিসের ছুটি। কৃপাল, হরপ্রসাদ কেউ-ই কাজে যায় নি। কিন্তু বিমলা সাড়া দেবেন না। আজ আর এ সময়ে তিনি সাড়া দিতে পারছেন না। তাঁর ভিতরে কী যেন ঘটছে। আঠারো বছর আগে, এই দিনে, এই সময়ে যা ঘটেছিল, তাঁর সারা শরীরে যেন সেই ভাব। ওই বেদীতে না, শ্মশানে না, বাদল যেন তাঁর ভিতরে রয়েছে। বাদল পৃথিবীতে আসতে চাইছে।

বাদল যখন টাইফয়েড থেকে সেরে উঠেছিল, তখন ছেলেটা বড় রুগ্ন হয়ে গিয়ে-ছিল। মনে হতো, ওকে শিশুর মতো কোলে নেওয়া যায়। প্রায় একটা বছর পড়া নষ্ট হয়েছিল। তা হোক, তবু প্রাণে বেঁচেছিল, বিমলার সেটাই সান্ত্বনা। কৃপাল দয়ালের অসুখ হলেও সেইরকম হতো। হরপ্রসাদের অল্পস্বল্প অসুখ করলেও বিমলা উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন। লোকটা যাই করে বেড়াক, শরীরের দিক থেকে খুব শক্ত না। তাছাড়া, হরপ্রসাদই তো একমাত্র কাণ্ডারী। স্বামীকে তিনি কখনো কোনো কারণে অযত্ন করেন নি।

বাদল রুগ্নতা কাটিয়ে আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠেছিল। আগের মতো স্বাস্থ্য না, তার চেয়েও যেন সুন্দর হয়ে উঠেছিল। ও বরাবরই একটু কথা কম বলতো। বিমলার মতো। বিমলা কথা কম বলেন। বেশি বলবার অবকাশ এ সংসার তাকে দেয় নি। সারাটা সংসার তাঁর মাথায়। স্বামী পুত্রদের খাওয়া-দাওয়া দেখা-শোনা। বাসন মাজা আর ঘর পরিষ্কার করা ছাড়া, সবই তাঁর নিজের হাতে।

বাদল কথা কম বলতো। বিমলা মনে করতেন, বাদল, কৃপাল দয়ালের পথ ধরবে না। বাড়িতে তিনটে পার্টির লোক। কারোর সঙ্গে কারোর সদ্ভাব নেই, কথাবার্তা বন্ধ। বাদল সব দেখেছে শুনেছে। দেখে শুনে ও আর ও-পথে যাবে না।

বিমলা ভুল ভেবেছিলেন। কলেজে ঢোকবার আগেই বিমলার কানে এলো, বাদল আর একটা পার্টিতে ঢুকেছে। বিমলা বলেছিলেন, 'তুইও ওসব পার্টি করতে

যাচ্ছিস।'

বাদলের কথা কম। সে মায়ের কথার জবাব দেয় নি। কিন্তু হরপ্রসাদ ছাড়েন নি। কৃপাল দয়ালের সঙ্গে যে রকম ঝগড়া করেছেন, তেমনি করেই বাদলকে বকেছেন, ধমকেছেন। বলেছেন, 'তুই গিয়ে একটা খুনী পার্টির সঙ্গে জুটেছিস।'

বিমলা অবাক হয়ে শুনেছিলেন, বাদল ওর বাবাকে বলছে, 'আমাদের পার্টি খুনী পার্টি না।'

হরপ্রসাদ চিৎকার করে বলেছেন, 'আলবৎ খুনী পার্টি। কতগুলো গুন্ডা বদমাইস লোচ্চা ছাড়া ও-পার্টিতে কোনো ছেলে নেই। তুই আমাকে শেখাতে আসিস না।'

বাদল বলেছিল, 'আমি কাউকেই কিছু শেখাতে যাচ্ছি না।'

বিমলার মনে হয়েছিল, বাদলকে তিনি যেন চিনতে পারছেন না। ও শান্ত আর গম্ভীরভাবে ওর বাবার কথার জবাব দিচ্ছিল। কৃপাল দয়ালের মতো গলা চড়িয়ে, উত্তেজিত হয়ে কথা বলে নি। বিমলা অবাক হয়ে ভেবেছিলেন, বাদল কবে থেকে ওরকম কথা বলতে শিখলো। ও যেন কত বড় হয়ে গিয়েছে, কত কী বোঝে। অবাক হওয়ার সঙ্গে, একটু একটু রাগও হয়েছিল। বাদল যদি ছেলেমানুষের মতো চিৎকার চেঁচামেচি করতো, তা হলেই যেন বিমলা খুশি হতেন। অথচ, আবার, বাদল ওরকম করে কথা বলেছিল বলে, একটা কেমন গর্ববোধ করেছিলেন।

কিন্তু হরপ্রসাদ দুরকম কথা জানতেন না। ঠিক যেমনভাবে কৃপাল দয়ালকে বলেছিলেন, তেমনিভাবেই বাদলকে বলেছিলেন, 'ওসব কোনো কথা আমি শুনতে চাই না। এ বাড়িতে থাকতে হলে, তোকে ওই পার্টি ছাড়তে হবে।'

হরপ্রসাদের এ ধরনের কথা, বিমলার কখনো ভালো লাগে না। মানুষটা কথায় কথায় বাড়িতে থাকার খোঁটা দেয় কেন। বাদল ওর বাবার সে কথার কোনো জবাব দেয় নি। সামনে থেকে সরে গিয়েছিল। হরপ্রসাদ নিজের মনেই গজগজ করেছিলেন, 'যারা দেশ গড়তে জানে না, কেবল ধ্বংস করতে চায়, তাদের আমি আমার বাড়িতে চাই না। তারা যে যার নিজের রাস্তা দেখে নিক গিয়ে…।' এমনি অনেক কথা বলেছিলেন। বিমলাও হরপ্রসাদের সামনে থেকে সরে গিয়েছিলেন। লোকটা কেবল বকতে ধমকাতেই জানে। কখনো দেখা গেল না, মাথা ঠান্ডা করে ছেলেদের কিছু বোঝাবার চেষ্টা করছে। যেমন কৃপাল দয়ালের সঙ্গে করেছে, বাদলের সঙ্গেও সেইরকম করে কথা বলেছিল।

বিমলার বুকভরা অশান্তি আর উদ্বেগ। শেষপর্যন্ত বাদলের ওপরেই তাঁর রাগ হয়েছিল। সংসারে এত কিছু থাকতে পার্টি ছাড়া, আর কি কিছু করার নেই। বাদলটাও শেষপর্যন্ত সেই একই পথে চলে গেল। তিনি বাদলকে বলেছিলেন, 'তুই লেখাপড়া করবি, খাবিদাবি খেলা করবি। তুই কেন আবার পার্টি করতে গেলি?'

বাদল শান্তভাবেই বলেছিল, 'আমি তো কারোর কোনো ক্ষতি করছি না।'

বিমলা রেগে বলেছিলেন, 'ওসব ক্ষতি-টতি জানি না। একটা সংসারের মধ্যে, তোরা সব এক একটা পার্টি নিয়ে থাকবি, নিজেদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করবি, এসব আর আমি সহ্য করতে পারছি না। তুই ওসব পার্টি-টার্টি ছাড়।'

বাদল গম্ভীরভাবে বলেছিল, 'আমি বাড়িতে কারোর সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ করতে চাই না। পার্টি আমি ছাড়তে পারবে না।'

বিমলা বলেছিলেন, 'তা ছাড়বি কেন। তাহলে যে আমার একটু সুখ হয়। বুঝেছি আমি না মরলে তোরা বাপ ভাইয়েরা কেউ পার্টি ছাড়বি না। এ আমি কোথায় আছি। এটা কি একটা সংসার। কতগুলো পার্টি ছাড়া এ বাড়িতে কিছু নেই।'

বিমলার গলা বন্ধ হয়ে এসেছিল। চোখে জল এসে পড়েছিল। আবার বলেছিলেন, 'এবার আমাকেও একটা পার্টিতে গিয়ে ঢুকতে হবে।'

মায়ের কথা শুনে বাদল বোধহয় একটু বিচলিত হয়েছিল। বলেছিল, 'তুমি এরকম করছ কেন। বলেছি তো, আমি বাবা দাদাদের কারোর সঙ্গে লড়তে যাচ্ছি না।'

কিন্তু বাদলের সে-কথা টেকে নি। কখনো কৃপাল, কখনো দয়াল, কখনো বা হরপ্রসাদের সঙ্গে, তর্কাতর্কি বিবাদ লেগেই ছিল। বাইরের অশান্তি বাড়িতে দানা বেঁধে উঠেছিল। বাইরের যত গোলমাল, বাড়িতে এসে তার বোঝাপড়া চলছিল। সকলেই আলাদা আলাদা করে, বাদলের সঙ্গে বোঝাপড়া করছিল। বিমলা সেই সব কথা থেকেই বুঝতে পারতেন, বাদল রীতিমতো পার্টির কাজ করছে। লেখাপড়া ওর মাথায় ছিল না।

প্রথম কৃপালই একদিন বিমলাকে বলেছিল, 'বাদলা খুব বেড়ে উঠেছে। ওকে সাবধান করে দিও। কোনদিন একটা কি ঘটে যাবে, তখন আর কিছু করার থাকবে না।'

বিমলা বলেছিলেন, 'আমাকে বলতে এসেছিস কেন। নিজের ভাইকে নিজেরা বোঝাতে পারিস না।'

'ও বোঝাবার বাইরে চলে গেছে!'

বিমলা তিক্ত করেই জবাব দিয়েছিলেন, 'আর তোরা বুঝি ভেতরে আছিস। তুই নিজে পার্টি ছাড়তে পারিস না?'

কৃপাল বলেছিল, 'আমার যা বলবার বলে দিলাম। বাদলা আগুন নিয়ে খেলা করছে। রোজ মাস্তানি আর মারামারি করে বেড়াচ্ছে।'

সকলেরই সকলের বিরুদ্ধে এক অভিযোগ। বিমলার সামনে এসে কৃপালই যে কেবল বাদলের বিরুদ্ধে শাসিয়েছে, তা না। দয়ালও একইভাবে শাসিয়েছে। বিমলার সব থেকে অবাক লেগেছিল, হরপ্রসাদও যখন একরকমভাবেই শাসিয়েছে। বলেছে, 'তোমার ছোট ছেলেকে বলে দিও, এখনো সময় আছে। ও যেন সাবধান হয়ে যায়। ওর বড় পাখনা গজিয়েছে। ও পাখনা পুড়ে যাবে।'

বিমলার বুকের মধ্যে সেদিন একবার কেঁপে উঠেছিল। কিন্তু হরপ্রসাদের ওপর রাগও হয়েছিল। বলেছিলেন, 'নিজের ছেলেকে নিজে বোঝাতে পার না। তুমি তো আর ছেলেমানুষ নও। তুমি পার্টি ছাড়তে পার না? তারপরে ছেলেকে বলতে পার না? সবাই এসে আমার কাছে বলছ?'

হরপ্রসাদ বলেছিলেন, 'তুমি ওসব বুঝবে না। আমার পার্টি ছাড়ার কিছু নেই। আমি ওদের মতো গুন্ডা পার্টি করছি না। কিন্তু বাদলা যেভাবে বাড়িয়ে তুলেছে,

ও একটা কিছু না ঘটিয়ে ছাড়বে না।'

বিমলা তিক্ত রাগে বলেছিলেন, 'আমাকে ওসব কথা বলে লাভ নেই। আমি তোমাদের সংসারে একটা দাসী বাঁদি আছি। তোমাদের খেদমত খাটছি। আর তোমরা লড়াই করছ। এবার আমাকে তোমরা রেহাই দাও।'

বিমলা হরপ্রসাদের কাছ থেকে সরে গিয়েছিলেন। শুনেছিলেন, তারপরেও হরপ্রসাদ আপনমনে বকবক করছিলেন, 'বাদলার মরণ ধরেছে। পার্টির নেতাদের উস্-কানিতে, ও নিজেকে কী একটা ভাবতে আরম্ভ করেছে।'

বিমলার বুকের মধ্যে আবার কেঁপে উঠেছিল। বাবা হয়ে হরপ্রসাদ কেমন করে বলেছিল, ছেলেটার মরণ ধরেছে। কেবল বাদলের বেলায় না। হরপ্রসাদ সকলের বেলাতেই ও কথা বলেছেন। কৃপাল দয়ালের কথাতেও বলেছেন, ওদের মরণ ধরেছে। হরপ্রসাদ কি ছেলেদের বাবা নয়? পিতৃত্বের থেকেও পার্টি কি বড়? ওদের কি ভ্রাতৃত্ব বলতে কিছু নেই? পার্টি কি তার ওপরে? এই সংসারের মাঝখানে বসে, এ কথাটা কোনোদিন তিনি বুঝতে পারেন নি। কেবল ভেবেছেন, তাঁর ঘরে কেন এত অশান্তি। বাপছেলেরা মিলে, একটা সুখের সংসার কি ওরা গড়তে পারতো না। তার বদলে ওরা এক একজন, এক একজনের বিরুদ্ধে কেবল মরণ ধরাটাই দেখতে পেয়েছে।

বিমলা বাদলকে বলেছিলেন, 'তোর বাবা দাদারা সবাই তোর নামে নালিশ করছে। তুই কি একটা বিপদ-আপদ না ঘটিয়ে ছাড়বি না?'

বাদল বলেছে, 'বিপদ-আপদ আবার কী। ওরা চায়, ওরা পার্টি করবে, আমি চুপচাপ বসে থাকব। তা আমি থাকব কেন? ওদের শাসানিকে আমি কাঁচকলা ভয় পাই। বেশি ট্যান্ডাই-ম্যান্ডাই করতে এলে, আমরাও ছেড়ে কথা বলব না।'

বিমলা তবু ধমকে বলেছেন, 'তুই কেন ওদের সঙ্গে লাগতে যাস্?'

বাদল বলেছিল, 'আমি কেন লাগতে যাব। ওরাই আমাদের সঙ্গে লাগতে আসে।'

'কেন, তুই বাবা দাদাদের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকতে পারিস না?'

'বাবা দাদারা বুঝি মিলে-মিশে আছে? পার্টির ব্যাপারে কারোর সঙ্গে কারোর মিল-মিশ হবে না।' একটু চুপ করে থেকে, আবার বলেছে, 'পার্টির সঙ্গে আমি বেইমানি করতে পারব না। তা বাবা আর দাদারা আমাকে যতই শাসাক। সবাই তো নিজেদের মধ্যে মারামারি করছে, আমার বেলাতেই খালি শাসানি। আমি কারোর পরোয়া করি না।'

বিমলা তারপরেও মোক্ষম কথাটি বলতে ছাড়েন নি, 'বাপের অমতে এসব করছিস। এর পরে যদি তোর বাবা তোকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে বলে?'

বাদল অনায়াসে জবাব দিয়েছে, 'বের করে দেয়, চলে যাব। তা বলে বাবাকে, বাবার পার্টিকে সমর্থন করতে পারব না।'

বিমলা যেন শাঁখের করাতের তলায় পড়েছিলেন। কোনোদিকে তাঁর শান্তি ছিল না। স্বামী পুত্রদের কারোকে তিনি বোঝাতে পারেন নি। সংসারের মধ্যে চারটে পার্টির লড়াই চলছিল। এক সঙ্গে বসে বাবা ছেলেদের খাওয়া উঠে গিয়েছিল। যদি বা কোনোদিন সবাইকে একসঙ্গে খেতে দিতেন, কেউ কারোর সঙ্গে একটি

কথা বলতো না। কলের পুতুলের মতো সবাই নিঃশব্দে খেয়ে উঠে যেত।
'মা। মা কোথায় গেলে?'
এখন দয়াল ডাকছে। এর আগে কৃপাল ডেকেছে। হরপ্রসাদও ডাকাডাকি করেছে। বিমলা কোনো সাড়া দেন নি। এবারও সাড়া দিলেন না। ওদের সকলের ডাকে চিরদিন সাড়া দিয়ে এসেছেন। আজ তিনি ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না। এইখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওই মোড়ের অবহেলিত ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে তাকিয়ে থাকবেন। ওইখানেই বাদলকে খুন করে ফেলে রেখে গিয়েছিল। আকাশ জুড়ে ঘন কালো মেঘ। শনশন পুবে বাতাসের সঙ্গে এবার ইলশেগুঁড়ি ছাটের মতো বৃষ্টি নেমে এলো। জবাগাছটা ঝাঁপিয়ে ঝাঁপিয়ে বিমলার গায়ে মুখে পড়তে লাগল। তিনি নড়লেন না। তিনি আর ওই রান্নাঘরটায় গিয়ে ঢুকতে পারছেন না। আঠারো বছর আগে, বাদলের ওই আঁতুড়ঘরে গিয়ে ঢুকলেই, তাঁর সমস্ত শরীরের মধ্যে কেমন করছে। বিমলা স্থির থাকতে পারছেন না। তাঁর পেটের মধ্যে যেন কেবলই কী নড়ে চড়ে উঠছে। বাদল নাকি? বাদল কি এখনো তাঁর গর্ভে ।
বিমলা চোখ বুজে ঠোঁটে ঠোঁট টিপলেন। ব্যথা উঠছে নাকি তাঁর পেটে। তাঁর চোখের সামনে বাদলের সেই চেহারাটাই আবার ভেসে উঠল। ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত মৃত বাদল। সেই মূর্তির দিকে তাকিয়ে, সকলের শাসানির কথা তাঁর মনে পড়েছিল। এই তিন মাস ধরে, বারে বারে মনে মনে জিজ্ঞেস করেছেন, কারা মেরেছে বাদলকে। কৃপালের দল? দয়ালের দল, না হরপ্রসাদের দল? সবাই অস্বীকার করেছে, তাদের দল বাদলকে মারে নি। পুলিস যাদের বিরুদ্ধে খুনের মামলা রুজু করেছে, তারাও অস্বীকার করেছে, বাদলকে তারা মারে নি। অথচ সবাই শাসিয়েছে, সাবধান করে দিয়েছে। কৃপাল দয়াল হরপ্রসাদের পার্টি ছাড়াও, আরও পার্টি আছে। কিন্তু স্বীকার করে নি, বাদলকে কারা মেরেছে। বিমলাও জানেন না, কাদের হাতে বাদলের রক্ত লেগে আছে।
যতই অস্বীকার করুক, কোনো না কোনো পার্টির হাতেই বাদলের রক্ত লেগে আছে। সেটা কোন্ পার্টি? কৃপাল, দয়াল, হরপ্রসাদের কথাই আগে মনে আসে। ওরা সকলেই বলেছে, বাদলের মরণ ধরেছে। অথচ তারা বিমলার স্বামী পুত্র। বাদল কি হরপ্রসাদের ছেলে ছিল না? কৃপাল দয়ালের ভাই ছিল না? কেবল কি একটা পার্টির ছেলে। ওদের বিরুদ্ধ পার্টির ছেলে একটা? বাদল কি এই সংসারে একমাত্র বিমলারই ছেলে? তাই যদি হয়, তবে বিমলা আজ ওদের ডাকে সাড়া দেবেন না।
বিমলা শুনতে পাচ্ছেন, ওরা সবাই তাকে ডাকাডাকি করছে। কৃপাল ডাকছে, হরপ্রসাদও ডাকছেন। ওরা নিজেরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। আলাদা আলাদা ডেকে চলেছে।
'মা, ও মা!'
'মা কোথায় গেলে?'
'কই গো শুনছো, কোথায় গেলে?'
বিমলা টের পাচ্ছেন, উঠোনে, ঘরে ঘরে, রান্নাঘরে, সবাই তাঁকে ডাকাডাকি করছে।

বৃষ্টির ছাটে ছুটোছুটি করছে। শুনতে পাচ্ছেন, দয়াল রান্নাঘরের কাছ থেকে কণার মাকে চিৎকার করে ডাকছে, 'মাসীমা, ও মাসীমা।'

কণার মায়ের জবাব শোনা গেল, 'কী বলছিস রে দয়াল।'

'মা কি আপনাদের বাড়িতে আছে ?'

'না তো। সকাল থেকে একবারও আসে নি তো। কোথায় গেল তোর মা ?'

'কী জানি, দেখতে পাচ্ছি না। রান্নাঘরের দরজা খোলা। কুকুর ঢুকে, কড়ার তরকারি খেয়ে গেছে। রান্নাবান্না কিছু হয় নি।'

কণার মায়ের উদ্বিগ্ন গলা শোনা গেল, 'সে কি রে। তোর মায়ের তো এরকম কখনো হয় না। দ্যাখ্ খুঁজে, কোথায় গেল। আমিও দেখছি।'

কোথাও যান নি বিমলা। বাড়িতেই আছেন। ভাঙা শহীদ বেদীর দিকে দেখছেন। যারা বেদী তৈরি করেছিল, তারাই বা আজ কোথায়। একটা শহীদ বেদী করেছিল। তিন মাসের মধ্যেই সেটা ভেঙে পড়েছে। তাদেরই বা কী হারিয়েছে। তারা সেই যে শহীদ বেদীতে বিমলাকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, তারপরে আর আসে নি। তারা যেমন পার্টি করছিল, তেমনি করছে। এ বাড়ির বাবা ছেলেরাও করছে। বিমলারই শুধু হারিয়েছে। দশ মাস বাদলকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। তাঁর নাড়ি ছিঁড়ে বাদল এই পৃথিবীতে এসেছিল। আঠারো বছর আগে, এতক্ষণে বাদল পৃথিবীতে এসেছে। এতক্ষণে মেঘুর মা বাদলকে ধুয়ে মুছে, তাঁর বুকের কাছে তুলে দিয়েছে। গম্ভীর স্বরে ওঁয়া ওঁয়া করে কাঁদছে। বিমলা তাকে স্তন চেনাবার চেষ্টা করছেন।

বিমলার গায়ের মধ্যে কেঁপে উঠল। বাদলকে তিনি যেন বুকের মধ্যে অনুভব করছেন। বাদল কোথাও নেই, শ্মশানে না, শহীদ বেদীতে না। তাঁর বুকেই আছে।

'বড়বৌ!'

হরপ্রসাদ ছাতা মাথায় দিয়ে এসে দাঁড়ালেন। বিমলার শরীর শক্ত হয়ে উঠল। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে রইলেন। হরপ্রসাদ তাঁর ভাইদের মধ্যে সকলের বড়। পূর্ববঙ্গে, একান্নবর্তী পরিবারে, বিমলাকে বড়বৌ বলেই ডাকা হতো। হরপ্রসাদ কখনো কখনো তাকে ওই নামে ডাকেন। বিমলা কোনো জবাব দিলেন না।

হরপ্রসাদ বললেন, 'আমরা তোমাকে সারা বাড়ি খুঁজে বেড়াচ্ছি, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কী করছ ?'

সে কথা হরপ্রসাদকে বলবার দরকার নেই। বিমলা জানেন, আজ বাদলের জন্মদিন, হরপ্রসাদের সে কথা মনে নেই। ছেলেদেরও কারোর মনে থাকে না। বিমলা ভুলতে পারেন না, কবে কোন্ ছেলেকে তিনি প্রসব করেছেন। মুখে কিছু বলেন না। কেবল তিন ছেলের জন্মদিনে, ওদের একটু পায়েস রান্না করে খাইয়ে দেন। এতকাল দিয়ে এসেছেন। গত বছরও এই দিনে, বাদলকে পায়েস রান্না করে খাইয়েছিলেন। বাদলের জন্য আর তাঁকে পায়েস রান্না করতে হবে না।

হরপ্রসাদের গলায় অসহায় বিস্ময়, কারণ তিনি বিমলার কিছুই বুঝতে পারছেন না। বলেই চলেছেন, 'রান্নাবান্না কিছু কর নি। আধকাঁচা তরকারি কুকুরে খেয়ে

গেছে। কী ব্যাপার তোমার ?'

হরপ্রসাদ ব্যাপার কিছুই বুঝবেন না। বিমলা কিছুই বলতে চান না। তাঁর চোখের সামনে শিশু বাদল খেলা করে বেড়াচ্ছে। দুরন্ত দুষ্টু ছেলে ছুটে বেড়াচ্ছে। গায়ে হাতে পায়ে কাদা মাখা। তারপরে বাদল বড় হচ্ছে। কিশোর বাদল স্কুলে যাচ্ছে। মায়ের কাছে দুটো পয়সার জন্য হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছে। বাদল ছাড়া বিমলার কাছে এখন আর কিছু নেই। বাদল বাদল বাদল। সকলের কাছে ও ছিল একটা পার্টির ছেলে। সন্তান শুধু বিমলার।

হরপ্রসাদের গলার শব্দে কৃপাল দয়ালও এসে দাঁড়াল। ওরা অবাক হয়ে মায়ের দিকে তাকাল। ওরা কেউ কারোর সঙ্গে কথা বলে না। নিজেদের মধ্যে কিছু আলোচনা করতে পারছে না। বিমলাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থ হয়ে গিয়েছে।

কৃপাল বলল, 'মা, তুমি এখানে কী করছ ?'

দয়াল জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে ?'

সবাই অবাক। সবাই বিমলাকে বুঝতে চাইছে। কিন্তু ওদের বোঝার কিছু নেই। এরা তাঁর স্বামী পুত্র। এদের ছেড়ে তিনি কোথাও যাবেন না। কিন্তু আজ তিনি ওদের সঙ্গে নেই। আজ ওরা সারাদিন পার্টি করতে চলে যাক। বিমলা আজ বাদলকে নিয়ে থাকবেন। বাদল এখন তাঁর বুকে।

হরপ্রসাদ বলল, 'ঘরে চল বড়বৌ। এখানে দাঁড়িয়ে ভিজো না।'

বিমলার দৃষ্টি মোড়ের ভাঙা বেদীর দিকে। স্পষ্ট করে বললেন, 'যাব না।'

তিন পার্টির লোক নিজেদের মধ্যে অবাক হয়ে চোখাচোখি করল। কৃপাল বলল, 'রান্না-বান্না করো নি, আমরা খাব কী ?'

বিমলা নিচু পরিষ্কার গলায় বললেন, 'আজ আমি খেতে দিতে পারব না।'

তিনটে পার্টির লোক অবাক। বিমলা তাদের কাছে পার্টির থেকেও যেন জটিল হয়ে উঠেছে। দয়াল বলে উঠল, 'আমরা তবে কী কবব এখন ?'

বিমলা বললেন, 'তোরা আজ তোদের পার্টির কাজে যা। আমাকে ডাকিস না।'

অন্তহীন বিস্ময়ে তিনজনেই চুপ। বিমলা ওদের সামনে থেকে সরে গিয়ে ফণি-মনসার বেড়া ঘেঁষে দাঁড়ালেন। তিনজনেই দেখল। তিনজনের চোখেই অপরিচয়ের দৃষ্টি। যেন স্বামী চিনতে পারছে না স্ত্রীকে। ছেলেরা মাকে। অথচ কোনো কথা বলতেও যেন আর তাদের সাহস হচ্ছে না। এই প্রথম, তারা শুধু অবাক না, বিমলাকে যেন তাদের কেমন ভয় করছে।

তিনজনেই আরও একটু সময় দাঁড়িয়ে রইল। বাতাসের ঝাপটায় আর বৃষ্টির ছাটে দাঁড়িয়ে থাকা যায় না। তিনজনেই একটা অসহায় অস্বস্তি আর বিস্ময় নিয়ে একে একে চলে গেল।

বিমলা তেমনি দাঁড়িয়ে রইলেন। বৃষ্টির ছাটে ধুয়ে যাচ্ছেন। তাঁর বুকের কাছে এখন কিছু ঠেলে উঠছে, গলার কাছে উঠে আসছে। তাঁর চোখে এখন জল আসছে, বৃষ্টির জলে গাল ধুয়ে যাচ্ছে। তিনি বুকের কাছে হাত রেখে মনে মনে ডাকলেন, 'বাদল, বাদল, তুই আমার কাছেই রয়েছিস। আমার কাছে থাক।'

শান্তিপ্রিয়

লোকটা পাদানির ওপরে, দরজা আগলে রড ধরে দাঁড়িয়েছিল। বিরক্তিকর। অপেক্ষমান বাস, দাঁড়িয়ে আছে. কত লোক উঠবে। এভাবে দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকলে হয় না। আমি শান্তিপ্রিয় লোক, পিসলাভিং যাকে বলে। অকারণ ঝগড়া-বিবাদ করার ইচ্ছা আমার নেই। তা ছাড়া রাত্রি নটা বাজে। বাস যে পাওয়া গিয়েছে, এটাই যথেষ্ট। অনেক দিন তো এসে দেখি, বাসের কোনো পাত্তাই নেই। বাস অ্যাট অল যাবে কিনা, কেউ বলতে পারে না। বিশেষ করে এই রুটে। উত্তর কলকাতা থেকে ছেড়ে, প্রায় শহরতলির সীমানায় বাসের গন্তব্য।

এ সময়ে যতটা ভিড় আশঙ্কা করা গিয়েছিল, সেই পরিমাণে যাত্রীর সংখ্যা কমই বলতে হবে। জানি না, এখানে কোনো খুন-টুন হয়েছে কিনা অথবা কোনোরকম বোমাবাজি ঘটেছে কিনা। তা ঘটলে বোধহয় বাসটা থাকতোই না। একে প্রাইভেট বাস। সার্ভিস আগেই গুটিয়ে নিত। তবে আজকালকার দিনে, রাত্রি ন'টা নাগাদ বাসে যাত্রীর সংখ্যা নগণ্য। সেই হিসাবে, লোক একেবারে কম নেই। বসবার জায়গা একটিও খালি নেই। সেই বাইরে থেকেই দেখতে পাচ্ছি। তবে ভিতরে দাঁড়াবার জায়গা অনেক। সেই হিসাবে বাসটাকে খালিই বলতে হবে। কলকাতার অবস্থা আগের মতো হলে, এখন তিল ধারণের জায়গা থাকতো না। আজ দেখছি, কিছু মহিলা যাত্রীও আছে। আজকাল এ সময়ে, এক আধজন মহিলা যাত্রী দেখা যায়। সেই তুলনায় একটা গোটা লম্বা সীট ভরতি মহিলা। হয়তো দল বেঁধে একসঙ্গে উঠেছে। আবার তা নাও হতে পারে।

কিন্তু ও সব ভেবে আমার লাভ নেই। লোকটা এরকম দরজা আগলে রড ধরে দাঁড়িয়ে আছে কেন। লোকটা বললে ভুল বলা হয়। রোগা মতো মাঝারি লম্বা পঁচিশ-ছাব্বিশ বছরের একটা ছেলে। পোশাকের কোনো নতুনত্ব নেই। যেটা আজকাল সকলের গায়েই দেখা যায়, তিন ফুট প্যান্ট, দেড় ফুট জামা সেই-রকমই। বুকের বোতামগুলো খোলা। ভিতর থেকে গেঞ্জি দেখা যাচ্ছে। বাসের কনডাকটর ভিতর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দরজা আগলে দাঁড়ানো ছেলেটাকে—ওকে অবিশ্যি আমার ছেলেও বলতে ইচ্ছা করছে না, কী বলব, কিছু বুঝতে পারছি না। লোক না, ছেলেও নয়, এদের কী বলতে হয়, আমি জানি না। হাতে একটা বাঁধানো খাতা থাকলে, ছাত্র মনে করা যেত। একে তাও মনে হচ্ছে না। ছোট ছোট চুল, রুক্ষ, কপালের ওপর এসে পড়েছে। একজোড়া সরু গোঁফ আছে। ভুরু কোঁচকানো। ঠিক অসুখী বলা যাবে না, যেন কোনো কারণে, তার মুখ শক্ত হয়ে আছে। শক্ত চোয়াল দেখে, তাকে রাগী আর অসন্তুষ্ট মনে

হচ্ছে।
হতে পারে, কিন্তু সকলের অসুবিধা করে, দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকবার মানে কী। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতেও, সে যেন আমাকে দেখতেই পেল না। কনডাকটারও তাকে সরে যেতে বলল না, কেবল আমার দিকে একবার উদাসভাবে তাকালো। সাধারণত এরকম হবার কথা না। আমি বললাম, 'একটু সরুন তো, ভেতরে যাই।'
সে দরজা থেকে নড়ল না, একটু সরে গেল। সেই ফাঁক দিয়ে আমি ঢুকলাম, এবং ঢোকার সময় মনে হলো, আমি যেন হাল্কা একটা গন্ধ পেলাম। মদের গন্ধ। মাতাল নাকি! অতিরিক্ত নেশায়, একেবারে শিব হয়ে দাঁড়িয়ে আছে বোধহয়। যাই হোক গিয়ে, আমার কিছু বলবার নেই। আমি পিসলাভিং ম্যান। সারাদিন অনেক খাটুনি গিয়েছে। এক নাগাড়ে প্রায় দেড় ডজন স্কেচ আঁকতে হয়েছে। কমারশিয়াল শিল্পের কাজ। মেরুদণ্ডটা টনটন করছে। চোখে জ্বালা, সারা শরীরে একটা অবসন্নতা। তারপরে মীনাক্ষী এসেছিল। মীনাক্ষী আসাতেও সন্ধেটা যে ভালো কেটেছে, তা মোটেই বলতে পারি না। অথচ আশা ছিল, তাতেই সন্ধেটা ভালো কাটবে। মীনাক্ষী আজকাল আমাকে একটু সন্দেহের চোখে দেখছে। কিছুকাল ধরেই একটা সন্দেহ ওকে পেয়ে বসেছে, আমি বোধহয় শেষপর্যন্ত কথা রক্ষা করব না। অর্থাৎ ওকে বিয়ে করব না। আজকাল আমার কাজের ব্যস্ততাকে ও ওর প্রতি অবহেলা বলে মনে করে। সে-কথা স্পষ্ট করে বলতে পারে না। গুম্ খেয়ে থাকে। হাসে না, ভালো করে কথা বলে না…। যাক গিয়ে, এখন কী হবে এসব কথা ভেবে! মীনাক্ষীটা ঠিক থাকলে মন মেজাজ আর একটু ভালো থাকতো!
কাঁধের ব্যাগটা ঠিক করে, আমি একবার বাসটার এদিক ওদিক দেখলাম। না, বসবার জায়গা একটিও নেই। বাসের সামনের দরজাতেও কনডাকটর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আমার মতো আরো দু-তিন জন দাঁড়িয়ে। এতেই বোঝা যায় যাত্রী সংখ্যা কত কমে গিয়েছে। রাত্রি মাত্র ন'টা বাজে! এখন ঠাসাঠাসি ভিড় থাকার কথা। এ সময়ে কনডাকটরদের চিৎকার করার কথা। যাত্রীরাও কেউ তেমন কথাবার্তা বলছে না। আজকাল এই রকমই হয়েছে। কেউ বিশেষ কথা বলতে চায় না। যেন মুখ খুললেই এমন বেফাঁস কিছু বেরিয়ে পড়বে, তাইতে বিপদে পড়ে যাবে। অথচ, আগে বাসে উঠলে কান পাতা দায় ছিল। সেটাও বিরক্তিকর। কিন্তু এরকম চুপচাপ থাকাও অস্বস্তিকর। এ রুটের, বিশেষ করে এ সময়ের অনেক যাত্রীই মুখ চেনা। কারোর সঙ্গেই বাক্যালাপ করবার মতো পরিচয় নেই। তবে মোটামুটি অনেকেই অনেকের মুখ চেনা।
কারা যেন গলা নামিয়ে কী সব কথা বলছিল। ড্রাইভার তার জায়গায় বসে। কনডাকটররাও যে যার দরজায়! একজনই শুধু বকর-বকর করছিল, একজন আধ-বুড়ো মানুষ, 'কোথাও শান্তি নেই। বাজারে যাবেন. বেগুনের দাম শুনলে…।'
আমার শোনবার কোনো উৎসাহ নেই।
'ছাড়বার তো সময় হলো, কখন ছাড়বে?'

একজন যাত্রী গলা তুলে জিজ্ঞেস করল। কনডাকটররা কেউ কোনো জবাব দিল না। যেন কথাটা তারা শুনতেই পায় নি। দরজা আগলে দাঁড়ানো সেই লোকটা বা ছেলেটা, যাই হোক, কনডাকটরের দিকে একবার ফিরে তাকাল। তার চোখের পাতা কোঁচকানো, চোখ দুটি যেন ধারালো ছুরির মতো চকচকে। কী ব্যাপার কিছু বুঝতে পারছি না। আর যে প্যাসেঞ্জার হবে না, সে তো পরিষ্কার। বাসটা ছাড়ছে না কেন। অবিশ্যি আমার কিছু বলার নেই, আমি পিসলাভিং ম্যান। একজন শান্তিপ্রিয় আর্টিস্ট। আমি কোনো কথা বলতে চাই না।

হঠাৎ ধমক বেজে উঠল, 'দরজায় দাঁড়িয়ে কেন. ভেতরে যাওয়া যায় না? ভেতরে তো অনেক জায়গা। উঠুন, না হয় নেমে যান।'

তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় বছর পঞ্চাশ বয়সের একটি লোক। দরজায় দাঁড়ানো ছেলেটাকে বা লোকটাকে, বেশ ঝাঁজের সংগেই কথাগুলো বললেন। কথার শেষ দিকে, ভদ্রলোকের গলাটা শোনালো প্রায় আদেশের মতো। খুবই স্বাভাবিক। এভাবে দাঁড়িয়ে থাকার মানে কী। তথাপি সেই লোকটা বা ছেলেটা নড়লো না। ভদ্র-লোকের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি তার মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না।

ভদ্রলোক আবার হাঁকলেন, 'কী হলো, আমাকে উঠতে দিতে হবে তো।'

বলে ভদ্রলোক পা বাড়ালেন। আর সেই তিন ফুট প্যান্ট, দেড় ফুট জামা নেমে দাঁড়ালো। ভদ্রলোক উঠলেন, মহিলাদের সীট ঘেঁষে, রড ধরে দাঁড়ালেন, বলতে লাগলেন, 'যত সব বেয়াড়া ব্যাপার, দরজা আগলে দাঁড়িয়ে থাকবে যেন আর কারোর ওঠার দরকার নেই…।'

ভদ্রলোককে মনে মনে সায় দিলেও, আমার মতোই সবাই শান্তিপ্রিয়। কেউ কোনো কথা বলল না। তবে ভদ্রলোকের সাবেকি চাল দেখে—সাবেকি-ই বলতে হবে, আজকাল কেউ এ রকম করে বলে না, সবাই বেশ খুশি হয়েছে বোঝা যায়। গাড়িটার কিন্তু ছাড়বার নাম নেই। আবার একজন আওয়াজ দিল, 'কী হলো, বাস ছাড়ছে না কেন?'

সে আবার বাসের পাদানিতে উঠে দাঁড়াল, ছেলেটা বা লোকটা প্রায় মিনিটখানেক পরে, বলে উঠল, 'নাঃ, শালা আসবে না, ছেড়ে দাও।'

বলা মাত্রই কনডাকটর ঘন্টি বাজিয়ে দিল। ড্রাইভার গাড়ি স্টার্ট করল। কনডাকটর টিকেট বিক্রি শুরু করল। বোঝা গেল, ছেলেটা—ছেলেটা বলাই ভালো, তার হুকুমের জন্যই বাসটা ছাড়ছিল না। কেন? ও কে? আমার অবিশ্যি জানবার দরকার নেই। কোনোরকমে গন্তব্যে পৌঁছুতে পারলেই হলো। মনে হলো ছেলেটার কেউ আসবার কথা ছিল, এলো না তাই বাস ছেড়ে দিতে বলল। ওর কথাতেই কি বাস চলে? ও কে? কথাটা আবার আমার মনে হলো। মনে হয়ে কোনো লাভ নেই। যে-ই হোক, আমার জানবার দরকার নেই। তবু মনটা একটু খচখচ করতে লাগলো। কোনো দিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না, কিংবা হয়তো দেখেছি, মনে করতে পারছি না।

ছেলেটা এবার পাদানি ছেড়ে বাসের মধ্যে উঠে এলো। এসে, সেই ভদ্রলোকের মুখোমুখি দাঁড়ালো। তার মুখটা আরো শক্ত দেখাচ্ছে, চোখ দুটো চিতার মতো

জবলছে। কোনো কিছু বুঝে ওঠবার আগেই শুনতে পেলাম, 'খুব যে চোখ গরম করে কথা হচ্ছিল, অ্যাঁ ?'

ভদ্রলোক এবার যেন একটু অবাক, বললেন, 'মানে ?'

এখন আর ছেলেটা নয়, লোকটা ঠাস করে ভদ্রলোকের গালে একটা চড় কষিয়ে দিল, 'শালা কার সঙ্গে কথা বলছ জান না ? আমাকে রোয়াব দেখানো হচ্ছে। তোমার গর্দান নিয়ে নেব আজ।'

বলেই ভদ্রলোকের বুকের কাছে জামা মুচড়ে চেপে ধরল। বাসের সবাই চকিত হলো। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলল না। আমি কাছেই ছিলাম। একটু সরে দাঁড়ালাম। ভদ্রলোক গালে হাত রেখে বললেন, 'এ সবের মানে কী ? আমি কী করেছি ?'

'কী করেছ জান না ?'

লোকটা ভদ্রলোকের মুখে আবার হাতের পিছন দিয়ে আঘাত করলো। জামাটা আরো মুচড়ে ধরে বলল, 'মদ মেরে এসে রমজানি হচ্ছে, এখন আবার মা-বোনের ইজ্জৎ নিয়ে মজাকি করছ ?'

হঠাৎ হাঁটু তুলে, ভদ্রলোকের পেটে গুঁতিয়ে দিল। ভদ্রলোক একটা আর্তনাদ করে উঠলেন। লোকটাকে এখন ভয়ংকর দেখাচ্ছে, যেন চিতার মুখের গরাসে ছটফটে শিকার। কেউ কোনো কথা বলল না, কেন না, সকলেই শান্তিপ্রিয়, আমার মতোই। এসব বিষয়ে কেউ মাথা গলাতে চায় না, যা হচ্ছে হোক। কিন্তু আমার মনে হলো ভদ্রলোকের প্রতি আঘাতগুলো যেন আমার গায়েই পড়ছে। আমার ভিতরটা কুঁকড়ে যাচ্ছে। দেড় ডজন স্কেচ বা মীনাক্ষী, কোনো কথাই আমার মনে পড়ছে না। আমি শুধু আমার অস্তিত্বটাকে নিয়ে একটা ভয়ংকর ভয়ে যেন কাঁপছি। সকলের, মেয়ে-পুরুষদের চোখে ত্রাস।

ভদ্রলোক আর্তস্বরে বললেন, 'মা বোনের ইজ্জৎ নিয়ে কী করেছি ?'

লোকটা ভদ্রলোকের মুখে একটা ঘুষি কষালো, গর্জে বললো, 'মনে করেছ আমি দেখি নি, হাঁটু দিয়ে মেয়েদের গায়ে ঘষছিলে। ওই জন্য শালা এখানে এসে দাঁড়িয়েছ। আমাকে রোয়াব ?'

ভদ্রলোকের ঠোঁটের কষ ফেটে রক্ত পড়ছে। বললেন, 'মিথ্যে কথা।'

'চোপ্ !'

আবার একটা ঘুষি মারলো কানের পাশে। এ সময়ে কনডাকটর বাস থামাবার ঘন্টি বাজালো। লোকটা চীৎকার করে বলল, 'গাড়ি এখানে দাঁড়াবে না। স্টপেজ ছাড়িয়ে দাঁড়াবে। প্যাসেঞ্জার নামবে, তুলবে না। তা না হলে গাড়ি জবলে যাবে বলে দিলাম।'

গাড়ি স্টপেজে দাঁড়ালো না। কেউ কোনো কথা বললো না। আমার মতো শান্তিপ্রিয় যাত্রীরা সবাই সন্ত্রস্ত চোখে ঘটনাটা দেখছিল।

ভদ্রলোক রড ধরে ঝুঁকে পড়েছেন, এবার পড়ে যাবেন মনে হচ্ছে। কিন্তু তাতে মার থামছে না। ভয়ংকর রাগে আর ঘৃণায়, লোকটা যেন ফুঁসছিল আর এলো-পাতাড়ি মেরে যাচ্ছিল। ভদ্রলোকের হাত রড থেকে খসে পড়ল, কিন্তু বললেন,

'আমি মদ খাই নি, মেয়েদের বেইজ্জৎ করি নি। কেন শুধু শুধু মারছ আমাকে?'
'ফের মিথ্যে কথা? আমি নিজের চোখে দেখেছি। ওই জন্যই শালা আমাকে রোয়াব দেখিয়ে ভেতরে ঢুকতে চেয়েছিলে।'
এবার একটা ঘুষি লাগালো গলার কাছে। ভদ্রলোক আর্তনাদ করে উঠলেন, বললেন, 'আমাকে বাঁচান, আমাকে মেরে ফেলছে।'
গাড়িটা স্টপেজ ছেড়ে দাঁড়ালো। দুজন মহিলা সমেত, কয়েকজন প্যাসেঞ্জার নেমে গেল। আবার সঙ্গে সঙ্গে ছেড়ে দিল। প্রাইভেট বাসের কনডাকটর টিকেট বিক্রি করে যাচ্ছে। সবাই টিকেট কিনছে। কিন্তু কেউ কোনো কথা বলছে না। সকলেই উদ্বিগ্ন মুখে চুপচাপ বসে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, সকলেই গন্তব্যের জন্য অধীরভাবে অপেক্ষা করছে। সকলেই আমার মতোই উৎকণ্ঠিত ভয়ে আর অস্বস্তিতে অস্থির। শান্তিপ্রিয় লোকেরা কে-ই বা এ সবের মধ্যে থাকতে চায়। কিন্তু আমি যেন আর বাসের মধ্যে থাকতে পারছি না। অজ্ঞান হয়ে যাব বা আর কিছু, কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি যেন নিজেকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। আমার ভিতরে যেরকম কাঁপছে, তাতে বুঝতে পারছি, অবস্থা খুবই খারাপ। আমি হয়তো ভদ্রলোকের মতোই আর্তনাদ করে উঠব।
'বাঁচান, আমাকে বাঁচান, আমাকে মেরে ফেলছে।'
ভদ্রলোক এখন আর নিজের শরীরের ওপর ভর করে দাঁড়িয়ে নেই। লোকটাই তাকে দাঁড় করিয়ে রেখেছে, আর সমানে মেরে চলেছে। ভদ্রলোকের মুখটা রক্তে ভাসছে। চোয়াল চিবুক ভুরুর পাশে ফুলে উঠেছে।
এ সময়েই, হঠাৎ সবাইকে চমকে দিয়ে, একটি মেয়ের গলা শোনা গেল, 'উনি তো আমাদের কাউকে অসম্মান করেন নি। ও কথা বলছেন কেন?'
লোকটার সঙ্গে সবাই মেয়েটার দিকে ফিরে তাকালো। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হবে, মাজা মাজা রঙ, স্বাস্থ্যবতী একটি মেয়ে, হাতে একটা ব্যাগ। লোকটা ঘুরে বলল, 'আপনি চুপ করে থাকুন, আপনার সঙ্গে কোনো কথা হচ্ছে না।'
মেয়েটিকে রীতিমত বীরাঙ্গনা বলে মনে হচ্ছে। অনেকটা যেন মীনাক্ষীর মতো দেখাচ্ছে। এত সাহস পেল কোথা থেকে। বলল, 'কেন চুপ করে থাকব। আপনি বলছেন, উনি মেয়েদের বেইজ্জৎ করেছেন। আমরা তো বসে আছি, উনি তো কিছু করেন নি।'
লোকটা আরো জোরে গর্জে উঠল, 'লাইনের বুঝি? চুপ করে থাকতে বলছি, চুপ করে থাকুন।'
মেয়েটিও গলা তুললো, 'লাইনের মানে? কী বলতে চান?'
লোকটা মেয়েটার দিক থেকে আবার ভদ্রলোকের দিকে ফিরলো। আবার হাত তুললো মারবার জন্য, আর ঠিক সে সময়েই আমি আমার গলা শুনতে পেলাম। 'কেন, মিছিমিছি মারছেন ভদ্রলোককে? উনি তো আপনাকে কিছু বলেন নি।'
লোকটা আমার দিকে ফিরে তাকালো। ঠিক যেন শিং বাঁকানো ক্ষ্যাপা ষাঁড়ের মতো। কেন যে এরকম বলতে গেলাম নিজেই জানি না। এই কারণেই আমি নিজেকে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। আসলে ভদ্রলোকের মতো আর্তনাদ করে

ওঠা নয়, এ কথাটাই আমার ঠোঁটের ডগায় এসে আটকেছিল। অথচ আমার বিশ্বাস ছিল, আমি শান্তিপ্রিয় মানুষ, কোনো কথা বলব না। মেয়েটাই গোলমাল করল। বেশ ভালভাবেই সব মিটে যাচ্ছিল, ভদ্রলোক মরছিলেন। এখন লোকটার দিকে তাকিয়ে, আমার বুকের মধ্যে যেন কাঁপতে লাগল।

লোকটা আমার দিকে চেয়ে ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?'

এখনো সময় আছে, কথা না বলাই উচিত। কিন্তু নিজের প্রতি আর আমার আস্থা রইল না। আমি শান্তভাবেই বলবার চেষ্টা করলাম, 'কেন শুধু শুধু মারছেন ভদ্রলোককে। উনি তো কিছু করেন নি।'

যেন আমি বললাম না। আর কেউ আমার ভিতর থেকে কথাগুলো বলে উঠলো। আমি কোনো দিকে তাকিয়ে দেখলাম না। কেবল একটা গর্জন শুনতে পেলাম, 'এই গাড়ি রোখো।'

বাসটা দাঁড়িয়ে পড়লো। লোকটা ভদ্রলোককে ছেড়ে দিল। ভদ্রলোক মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন। লোকটা আমার দিকে এগিয়ে এলো। থাবা বাড়িয়ে সে আমার গলার কাছে জামা চেপে ধরল, বললো, 'এসো বুঝিয়ে দিচ্ছি।'

লোকটা আমাকে হ্যাঁচকা টান দিল। আমি আটকাবার চেষ্টা করলাম। সে আমাকে দরজার দিকে টেনে নিয়ে চলল। আমি চিৎকার করে বললাম, 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ। ছেড়ে দাও আমাকে।'

লোকটার গলায় চিৎকার নেই। আমাকে জোরে টানতে টানতে বলল, 'ছেড়ে তোমাকে দেব। কেউ তোমাকে ধরে রাখতে পারবে না। কার পেছনে লাগতে এসেছে তুমি জান না।'

আমি চেষ্টা করেও নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। সেই মেয়েটার দিকে আবার একবার ফিরে তাকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করল। পারলাম না। আর কারোর দিকে তাকিয়ে দেখবার ইচ্ছা হলো না। লোকটা আমাকে গাড়ি থেকে টেনে নিচে নামালো। চিৎকার করে হুকুম দিল, 'গাড়ি ছেড়ে দাও।'

বাসটা এঞ্জিন বন্ধ করে নি। হুকুম পাওয়া মাত্র গোঁ গোঁ শব্দ তুলে তাড়াতাড়ি চলে গেল। লোকটা আমাকে একইভাবে টেনে নিয়ে চলেছে। আমি বাধা দেবার চেষ্টা করছি। জায়গাটা আমি চিনতে পারছি না। অথচ চেনার কথা। কোনো দিকে তাকিয়ে দেখবার সুযোগ নেই। মনে হলো, একটা রাস্তা, টিমটিম করে আলো জ্বলছে।

হঠাৎ আমার মুখের ওপর একটা ঘুসি পড়ল, 'শালা, তোমার জান খেয়ে নেব আজ।'

আমি তখনো লোকটার হাত থেকে নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করছি। আমার ঠোঁটের কষ ভিজে উঠেছে। লোকটা আমার জামা ছেড়ে দিয়ে এলোপাতাড়ি ঘুষি মারতে আরম্ভ করল। আমি চোখে অন্ধকার দেখলাম। ঠোঁট, নাক, চোখ, কোথাও ঘুষি পড়তে বাকী থাকল না। লোকটা শুধু-হাতে মারছে কিনা বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে, আমার সমস্ত মুখটা ফেটে যাচ্ছে, রক্ত পড়ছে। সেই অবস্থাতেই সে আমাকে ঠেলে ঠেলে একদিকে নিয়ে যাচ্ছে। আমার কাঁধ থেকে ব্যাগটা পড়ে গেল।

সেই ভদ্রলোকের কথা আমার মনে হলো, আর মনে হলো, এরকম কিছুক্ষণ চললে আমি মারা যাব। আমাকে খুন করার জন্যই মারা হচ্ছে। লোকটাকে বলে বোঝাবার কিছু নেই। আমি ওর কিছুই বুঝি না। কিন্তু যে মুহূর্তে মনে হলো, লোকটা আমাকে খুন করতে চাইছে, সেই মুহূর্তে আমি সোজা হলাম। মার আটকাবার চেষ্টা করলাম, আর জীবনে এই প্রথম, জ্ঞান হওয়ার পরে একটা লোকের মুখের ওপরে আমি ঘুষি ছুঁড়ে মারলাম।

'আমার গায়ে হাত?'

এই কথাটা আমি শুনতে পেলাম। লোকটা আমার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এ সময়েই কাদের গলার স্বর যেন আমি শুনতে পেলাম। লোকটা তখন আমাকে মাটিতে ফেলে, গলাটা চেপে ধরবার চেষ্টা করছে। আমি যেন একটি মেয়ের গলাও শুনতে পেলাম, 'ওই তো ওখানে।'

আমি লোকটাকে দু' হাতে ঠেলে রাখবার চেষ্টা করছি। সে আমাকে হাঁটু দিয়ে শরীরের সবখানে মারছিল। কতগুলো পায়ের শব্দ এদিকে ছুটে আসছে মনে হলো। একটা পাথরের মতো কিছু আমার মুখের ওপর আছড়ে পড়ল। তারপরে আর কিছু মনে করতে পারছি না।…

এখন আমি হাসপাতালের বিছানায় শোয়া। মুখে মাথায় ব্যাণ্ডেজ। শরীরের অন্যান্য অংশেও ব্যথা, ওষুধ লাগানো আছে। এখনো পর্যন্ত আমাকে কেউ দেখতে আসে নি। লোকটার মুখটাই আমার চোখে ভাসছে। ওর একটা স্কেচ আমি এঁকে ফেলতে পারব। কি জন্য খুন হই নি, এখনো জানি না। লোকটা কে, কেন তার এত রাগ আর ঘৃণা, কেন সে খুনে হয়ে উঠেছে, আমি কিছুই জানি না। আমি শান্তিপ্রিয় থাকতে চেয়েছিলাম, ওটাকে শান্তিপ্রিয়তা বলে, না আর কিছু, বুঝি না। কিন্তু তা আমি থাকতে পারলুম না।



বিষের ঝাড়

মান্ধাতার আমলের পুরনো নোনাধরা দোতলা বাড়িটা পশ্চিম দিকে হেলে পড়েছে এমনভাবে যেন হুমড়ি খেয়ে পড়ার মুহূর্তে হঠাৎ ঠেকো দিয়ে দাঁড় করানো হয়েছে। বাড়িটা পুবমুখো। সেদিকের সদর দরজার ঠিক মাথার উপর দিয়ে একটা অশ্বত্থের শিকড় বাড়িটার একটা অংশ দীর্ঘদেহ অজগরের মতো বেড় দিয়ে সেই পশ্চিমে ডালপালাপত্র-পল্লবে ঝুঁকে পড়েছে। বাদবাকি একটা অংশ ভেঙে-চুরে একটি মস্ত স্তূপ হয়ে উঠেছে আধলা ইঁটের। বাড়িটার চারপাশ ঘিরে আছে আগাছা জঙ্গলে ; আর বড় বড় আম জামের ছায়ায় কেমন একটা ভূতুড়ে অন্ধকার থমথমিয়ে আছে। পুবদিকে ভাঙাচোরা ফাটল-ধরা রকটা ছাগল-বিষ্ঠায় ভরা। সদর দরজাটার সামনেই একগাদা গোবর। আগাছার মাঝখান দিয়ে একটু সরু পথ দরজা থেকে পাড়ার গলিপথটায় গিয়ে মিশেছে।

সন্ধ্যা প্রায় ঘনায় ! বাড়িটারও রূপ বদলায়। ঝুপসিঝাড়ের কোল থেকে অন্ধকার গলে গলে পড়ে বাড়িটাকে ঢেকে ফেলতে শুরু করেছে।

মনে হয় বাড়িটাতে মানুষ নেই। অথচ পোড়ো বাড়ির মতো বাতাস এখানে হাহা-কার তোলে না। নৈঃশব্দ্য নিরেট নয়, যেন ছটফট করছে। সেই ছটফটানি টের পাওয়া যায় আচমকা শিশুকণ্ঠের দুর্বোধ্য স্বরে কিংবা যেন হঠাৎ ঝোড়ো হাওয়ায় ভেসে-আসা কিশোরী গলার গানের সুরে। আর সে সুরের কোনো বৈচিত্র্য নেই। একই সুর, একই কথা। ধনধান্যে পুষ্পেভরা আমাদের এই বসুন্ধরা···

সদর দরজার চৌকাঠ আছে, পাল্লা নেই। সেই দরজা দিয়ে ভিতর থেকে বেরিয়ে এলো হারাধন চক্রবর্তী, এ বাড়ির বাসিন্দা। মালিক নয়, ভাড়াটিয়া। মালিকেরা চার শরিক, চার মুলুকে থাকে। মাঝে মাঝে তারা এসে তম্বি করে হারাধনের উপর এবং যাবার সময় শুনিয়ে যায়, দাঁড়াও মামলাটা হোক, তখন তোমাকে দেখব। কিন্তু মামলা আর তাদের হয় না, সেজন্য কোনো গতিও হয় না ভাগের মায়ের। সেই পড়ে-থাকা ভাগের মায়ের কোল আঁকড়ে পড়ে আছে হারাধন।

দুই পুরুষের ভাড়াটে তারা। এক পুরুষ ভাড়াটা কড়ায় গণ্ডায় শোধ করে গেছে, কারণ তখন চার শরিকের একটা বাপ ছিল। শরিক বলে কথা নয়, হারাধন ভাড়া দিতে পারে না। সে বলে, 'মুরোদ বড় মান, তার ছেঁড়া দুটো কান। মামলা হয়ে যদি কোনো বিলিব্যবস্থা হয়ে যায়, তবু ওই চার শরিকের বাড়িটা ভাগাভাগি করে গড়তে হবে তো! সে হবেও না, আর এ বাড়ি না ধসলে আমারও ছেরাদ্দ হবে না।'

সুতরাং এ সব বৈষয়িক বিষয়ে হারাধন মাথা ঘামায় না।

দরজার মুখে পিছল মাটির উপর গোবর দলাটা দেখেই খিঁচিয়ে ওঠার মতো তার একপাটি অসমান দাঁত বেরিয়ে পড়ল, হিংস্র জানোয়ারের যেমন সামান্য বিরক্তিতে ভয়ংকর দাঁতগুলো একবার ঝকমকিয়ে ওঠে। তা ছাড়া হারাধনের সিংহরাশি কিনা জানা নেই, চেহারার মধ্যে পশুপতির ছাপ আছে খানিকটা। তবে উপবাসী এবং সেইজন্য খ্যাপাটে পশুপতি। দাঁত খিঁচিয়েই আছে। শক্ত মোটা হাড়ের চামড়া লম্বাও নেহাত কম নয়, কিন্তু মাংস নেই। তার মাঠের মতো পাথুরে কপালটার ঠিক মাঝখান থেকে সূক্ষ্মাগ্র তীরের মতো উঠে সারা মাথায় সিংহের পাকানো কেশরের মতো চুল ছড়িয়ে পড়েছে। এককালে এ চুল কালো ছিল। এখন হয়েছে খানিকটা মেটে আর জায়গায় জায়গায় পাক ধরে সাদা কালোর মাঝামাঝি ধোঁয়া ধূসর বর্ণ। নাকটা মন্দ ছিল না কিন্তু নিচের দিকে একেবারে থ্যাবড়া হয়ে গেছে। চোখ দুটো সামান্য গোলাকৃতি, তাতে গাছের শিকড়ের মতো লাল ছড়ের ছড়াছড়িতে কিছুটা হিংস্র হয়ে উঠেছে। অনবরত কুঞ্চনের ফলে ঠোঁটের ডানপাশটা কুঁচকে বেঁকেই থাকে। শরীরটা সব সময়েই ঝুঁকে থাকে সামনের দিকে। পরিশ্রম হলে তো কথাই নেই। তখন এই চার শরিকের বাড়িটার মতো হারাধনকেও মনে হয় মুখ থুবড়ে পড়তে গিয়ে কোনোরকমে চলেছে। আর এই হারাধন, যার আঠারো বিশে হয়তো শরীর ছিল সটান, আজ তার জঙ্ঘা থেকে ঠ্যাং দুটো নেমেছে যেন পাকা বাঁশের বাঁকা গোড়া। গোড়ালিতে গোড়ালি ঠেকলে দু-পায়ের মাঝখানে একটা বিরাট ফাঁক থেকে যায়। বয়স মাত্র চল্লিশের কোঠা ধরব ধরব করছে। এই হলো হারাধন চক্রবর্তী। সব নয়, চেহারায়। কাজের মধ্যে গল্প, সর্বদর্শন এবং ডাক্তারি। হ্যাঁ, ডাক্তারিটাই প্রধান। ডাক্তারিও আজব, সৃষ্টিছাড়া। তার কোনো ডিসপেনসারি নেই, তার ঘরে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না একটা ওষুধের শিশি বা কোনো সরঞ্জাম। সে তো অনেক দূরের কথা, ঘরের মানুষের রোগে এক ফোঁটা ওষুধ কেউ হারাধনকে হাতে করে আনতে দেখে নি। কোনো রোগীকে এসে দাঁড়াতে দেখা যায় নি আজ অবধি ওই চার শরিকের ফাটা ভাঙা রকের উপর, হারাধন ডাক্তারের অপেক্ষায়। তার জীবনে সে কারো নাড়ি দেখে নি, দেখে নি জিভ চোখ বা পেট টিপে। তবু হারাধন ডাক্তার। পাড়ার ফক্কড় ছোঁড়াগুলো বলে, ডবল এম্ বি। পাড়ার এম বি ডাক্তার বলেন, ব্যাটা আমেরিকা-ঘোরা ভি-ডি স্পেশালিস্ট। হোমিওপ্যাথি ডাক্তার নন্দদুলাল বলেন, মরা হ্যানিমানের ভূত হারাধন। ওর জুড়ি নেই। বলেই অবশ্য তাড়াতাড়ি জরি দিয়ে বোনা হ্যানিমানের কোটের কলারের দিকে তাকিয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করেন হাত জোড় করে। অর্থাৎ হ্যানিমানের আত্মা যেন ক্ষুন্ন না হন।

আর হারাধন মাঝে মাঝে চৌমাথার জনারণ্যের কিংবা দু-ধারে কারখানার উঁচু পাঁচিলে আড়াল করা শহরের পাকা সড়কে আচমকা ঝুঁকে দাঁড়িয়ে পড়ে প্রায় দেড়ফুট ঠ্যাং ফাঁক করে। ঠোঁট কুঁচকে মনে মনে বলে, এঃ সত্যি সত্যি ডাক্তার হয়ে গেছি।...

তারপর ঘাড় ফিরিয়ে তাকায় ইলেকট্রিক পাওয়ার হাউসের চিমনি চারটের দিকে, আশেপাশের কারখানা বাড়িগুলোর দিকে। দুনিয়াজোড়া মানুষ এসে একটা

গতি করে নিয়েছে এখানে কিন্তু তার সামনে সমস্ত ফটক বন্ধ হয়ে গেছে কেবলি। বাপ ছোটকাল থেকে যজমানের বাড়ি নিয়ে ঘুরেছে। ছেলেকে একটি অকালকুষ্মাণ্ড করে দিয়ে মরেছে। সে বলে, শালা মন্তর বলাটাও ভালো করে শিখিয়ে দিয়ে যায় নি। যজমানি করা দূরের কথা, হপ্তায় নারায়ণপুজোটার জন্যেও কেউ ডাকে না। দুটো চাল কলা এলেও বা··· । না, সে তার জীবনের প্রথম দিকেই শেষ হয়ে গিয়েছে। বাপের মৃত্যুর পর যজমানেরা ডেকেও জিজ্ঞেস করে নি। বলেছে, বামুনের ঘরের আকাট। ও কোষাকুষিতে হাত দিলে তা অপবিত্র হবে।

গোবর দলাটার দিকে আর একবার দেখে সে উপরের দিকে তাকিয়ে কাকে যেন ডাকতে উদ্যত হয়ে থেমে গেল। তার কানে এলো সেই গানের কলি, ধনধান্যেপুষ্পে ভরা···নিজেই সে উৎফুল্ল হয়ে তাড়াতাড়ি খাবলা খাবলা গোবর হাতে তুলে নোনা-ধরা ইঁটের গায়ে চাপটি মেরে দিল। বাড়ির পেছনে পানাপুকুরটায় হাত ধুয়ে ঘাড় দুলিয়ে দুলিয়ে চলতে শুরু করল বড় রাস্তার দিকে। আশেপাশে দেখে না, সামনে মুখ তোলে না। দূর থেকে মনে হয় পিঠে বোঝা নিয়ে বুঝি একটা মানুষ আসছে।

আশপাশ থেকে নানান কথা ছিটকে আসে ওকে উদ্দেশ করে। উৎকট কুৎসিত সব মন্তব্য। সিনেমার ধারে চা-খানার কাছ থেকে একজন চেঁচিয়ে ওঠে—

হারাধনের দশটি রোগী ঘোরে বাজারময়
একটি মল গরমী রোগে রইল বাকী নয়।

হারাধন নির্বিকার। কোনো দিকে দৃক্‌পাত না করে বোজকার মতো লাইটপোস্ট গুণতে গুণতে এগোয় সে। সতের, আঠার···। তেত্রিশ হলেই ডানদিকের অন্ধকারে হারিয়ে-যাওয়া গলিটার মধ্যে ঢুকে পড়ে। এমনি রোজ। কেমন করে যেন এটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে। বোধহয় সামনে তাকায় না বলেই।

অচেনা লোককে হঠাৎ হকচকিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়তে হয় গলিটার মোড়ে। মনে হয় একটা অন্ধকার গুহা, তার মধ্যে দূরে দূরে কতগুলি জোনাকি জ্বলছে টিপটিপ করে। আর অশরীরী ছায়ার মতো যেন কারা ঘোরাফেরা করছে সেখানে। ভিড় করে আছে কারা সারবন্দী হয়ে গুহার গায়ের পাথরে মূর্তির মতো। নিঝুম নয়। হাসি, গান, গল্প, মারধোর, কান্না, হাঁক, হল্লা কী নেই। তবু যেন হাওয়া নেই, আকাশ নেই গলিটার মাথায়। রুদ্ধশ্বাস দমবন্ধ, পাথরে ঠেসে ধরতে চাইছে।

'সেলাম হো ডগদরবাবু।' জং-ধরা গলায় প্রথমেই একজন অভিনন্দন জানায় হারাধনকে।

লোকটাকে এ মহল্লার মালিক বলা চলে। মোষের মতো বিশাল কালো লোমশ চেহারা, গলায় সোনার সরু চেন, কানে দুটো সোনার মাকড়ি।

হারাধন তার কথার জবাব না দিয়েই এগুল।

মাতাল মেয়ে-গলার বেসুরো গান এক কলি শোনা গেল—

প্রেমের বাজারে যাবে লো সজনী,
দেখে শুনে আনব কিনে প্রেমের পশরাখানি।

কে একজন মুখে জিভ্ দিয়ে তবলা বাজিয়ে উঠল, তাক্ ডিমা ডিম্।

শ্লথগতি হয়ে এলো হারাধনের। দাঁতে দাঁত চেপে প্রায় ভেংচে উঠল চাপা গলায়, 'প্রেমের পশরাখানি!'

'বাউনবাবা নাকি গো।' একটা মধ্যবয়সী মেয়েমানুষ রকের উপর হারাধনের কাছে এসে দাঁড়াল।—'এই তোমার জন্যই বসে আছি। সময় দেখি আর তোমার হয় না আজকাল!'

সামান্য আলোর একটা রেখা পড়েছে হারাধনের মুখে। মুখটা তার আরও বিকৃত হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো তীক্ষ্ম, খোঁচা খোঁচা দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়েছে হিংস্র জন্তুর মতো। বলল, 'কেন, এখনো তো মর নি, তবে এত তাড়াতাড়ি কেন?'

'উর্বশী নাচুনির বোন না আমরা? আমাদের কি মরণ আছে?' মোটা গলায় হাসল মেয়েমানুষটি।

'তবে আর তাড়া কিসের। তোদের না মেরে তো আমি মরছি না।' বলে হারাধন লম্বা লম্বা ঠ্যাং ফাঁক করে এগুলো সামনের অন্ধকারের দিকে।

'কি হলো, আসবে না?' মেয়েমানুষটি আবার বলল।

'আসছি পুতুলের ঘরটা ঘুরে।'

আশপাশ থেকেই অনেক মেয়ে বাউনবাবাকে ডেকে ওঠে, অকারণ দুটো কথা বলে জবাবের প্রত্যাশা না করে। যে সব পুরুষেরা ভিড় করেছে, তাদের কেউ মুখ লুকোবার চেষ্টা করছে হারাধনকে দেখে, কয়েকটা পাড়ার ছোকরা ছুটে পালায় এদিক ওদিক দুড়দাড় করে।

হারাধন এ পাড়ায় 'বাউনবাবা' বলে পরিচিত, আসলে এখানেই সে ডাক্তাবি করে। সে কয়েক বছর আগের কথা। হারাধনের তখন ছ-মেয়ের পর একটি ছেলে হয়েছে। তার বিশিষ্ট বন্ধু, ইতরশ্রেণীর মহাপুরুষ বলে যার খ্যাতি সেই পরাণ ভট্চার্য এসে বলল, 'দেখ্ হেরো, কারখানার দরজা ধাক্কিয়ে তো সে মন্দিরের দরজা খুলতে পারলি নে, মাঠের ঘোড়াও তোকে খালি ল্যাং মেরেই গেল আর বড় বড় কথা বলে কার পেট ভরাবি? তার চে এক কাজ কর। ছুঁচ ফুঁড়তে পারবি?'

হারাধন প্রথমটা ঠাওর করতে পারে নি। বলেছিল, 'ছুঁচ ফুঁড়ব মানে?'

'মানে ডাক্তারি করতে হবে।' বলে পরাণ ভট্চার্য বুঝিয়ে দিয়েছিল যে বাজার-ঘরের মেয়েদের তো চিকিৎসার কোনো বালাই নেই। অথচ সবগুলোই ব্যামোতে ভোগে। ওদের যারা কর্তা, তারা রোজের টাকাটা উঠিয়ে খালাস। কেমনো বাঁচলো সে-সব ওরা দেখে না। তা মেয়েগুলোর তো আর রোগ পুষে রাখা চলে না। রোজগার করতে হবে যে। লুকিয়ে চুরিয়ে কিছু পয়সা ওরা রেখে দেয়, সেটা দিয়েই ওষুধ কেনে। তবে কর্তারা তা জানে, বিশেষ কিছু বলে না। আর বাজারের ডাক্তারদের খাঁই মেটানো ওদের পক্ষে সম্ভবও নয়। আমি ওদের বুদ্ধি দিয়েছি, তোরা পয়সা দিয়ে বাপু ওষুধগুলো কিনে আনিস, আমি ফুঁড়ে দেব। যা হয় দিস্ আমাকে, আর যদ্দিন পারিস্ রোগ সারিয়ে বেঁচে থাক। তা ফলটা কিছু খারাপ হয় নি রে। তবে বাজার সবখানেই মন্দা। খদ্দের আছে কাঁড়ি

কাঁড়ি, পয়সা নেই। ছুঁচ ফোঁড়াও কিছু খারাপ নয়, লক্ষণটা একটু বুঝে নেওয়া। সে দু-দিন দেখলেই হয়ে যাবে। বাজারের ডাক্তারে তাও দেখে না।

হারাধন প্রথমটা পরাণ ভট্‌চাযের কথা বিশ্বাস করতে পারে নি। খোঁচা খোঁচা দাঁতগুলো বের করে হাসবার চেষ্টা করেছিল পরাণের রসিকতায়। কিন্তু পরাণ রসিকতা করে নি। রেগে বলেছিল, 'তবে ঘর ভরা মা ষষ্ঠীর কৃপা নিয়ে বসে থাক! ঘোড়ার ল্যাথি আর পাঁচ-জনের ভিক্ষেতে শালা পো-পেটা পড়ে থাকগে। ব্যাটা বামুনের ঘরের আকাট হয়েছিস্, বেশ্যার ডাক্তার হতে পারবি নে?'

সত্যি, ঘোড়া ঠিক দৌড়তে পারলে ভাগ্য ফেরে, তার ল্যাং খাওয়া যায়। গয়লার ছেলে কেনোও একটু চা দিতে হলে জাত নিয়ে গালাগালি দেয়। কেউ কেউ তাকে দু-চার আনা পয়সা দিত, যাদের ঘোড়ার টিপ্ ধরে দিত সে। যারা পেয়েছে এক আধবার, তারা হারাধনকে একটু ভালো নজরেই দেখে। তা ছাড়া মিছে মামলার হক্-দার সাক্ষী সে বাঁধা, সত্য বই মিথ্যা না বলবার প্রতিজ্ঞা বোধ করি তার জীবনের গোড়া থেকেই শুরু হয়েছিল। তবু বড়মানুষ ছোট জাতের যজমানি হারাধন নেয় নি। বামুনে শুয়োরের ব্যবসা করে, তা বলে কি রাঢ়ী কখনো বারেন্দ্র হয়, না, নিজেকে ভঙ্গ করে। আর খিদের সময় নিজের সন্তানদের কাড়া-কাড়ি, বাপ হয়ে বাটপাড়ি, তার ফাঁকে ফাঁকে বৌয়ের মাটির পুতুলের মতো চোখ জোড়ার বিচিত্র অবাক অলস চাউনি, এসব ভেবে গয়লা কেনোর আর-না-চাওয়ার দিব্যি-দেওয়া চা গিলে সে উঠেছিল এসে পরাণ ভট্‌চাযের কাছে।

সেই থেকে শুরু। পরাণ ভট্‌চায সব ভার বুঝিয়ে দিয়ে কবে কোথায় উধাও হয়ে গেছে, রয়ে গেছে হারাধন। মেয়েরা পরাণকে বলত ভট্‌চায, কেননা সে ছিল তাদের বন্ধু। হারাধন বন্ধু হয়েও বাপ হয়েছে। তাই সে হয়েছে বামুনবাবা।

এখানকার বস্তির বাইরে থেকে ভেতরটা বোঝা যায় না। সেখানে আছে অনেক-গুলো হারিকেনের আলো, একটা লম্বা চওড়া কাঁচা উঠোন, তার মাঝখানে তুলসী-মঞ্চ ও ছোট ফোকরের মধ্যে জ্বলছে সন্ধ্যাপ্রদীপ। বাইরের চেয়েও বেশী লোক, বেশী হল্লা হাসি গান। চারপাশ জুড়ে ঘর।

উঠোনটা ভেজা ছিল। তার উপরে একটা মাতাল পড়ে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে আর গান গাইছে।

প্রথম প্রথম এসব চেয়ে দেখেছে হারাধন। এখন দেখা দূরের কথা, মনেই থাকে না। সে দেখে খালি মেয়েগুলোকে, চেনে মেয়েগুলোকে, কথা বলে কেবল ওদেরই সঙ্গে এবং কোনো দিনও হেসে কথা বলে নি। যেটা হাসি বলে মনে হয়েছে সেটাকে দাঁত খিঁচোনা বলাই ভালো।

পুতুল ঘরের মধ্যে কাত হয়ে শুয়ে মুখের কাছে একটা বালিশ নিয়ে গান করছিল। হারাধনকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে বসল।

হারাধন মুখ খিঁচিয়েই আছে। বলল, 'গান হচ্ছে? বলি কোন্ সুখে।'

'ব্যামোর।' ম্লান হেসে বলল পুতুল। 'ব্যামোতে মানুষ গান গায় তা বুঝি জান না বাউনবাবা?'

'জানি বই কি। পাগলে ছেলে মলেও হাসে। ঢিল খেয়েও হাসে। এখন ওষুধ বের

কর দিন।'
হারাধন এখন একজন প্রকৃতই ডাক্তার। বলল, 'খেয়েছিস্ কখন?'
'সেই দুকুরবেলা।'
খ্যাঁক করে উঠল হারাধন, 'মিছে কথা বলছিস্ কেন? গাদা বমি করে মরবি! বিকেলে কিছু খাস্ নি?'
পুতুল অমনি আদুরে মেয়েটির মতো ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'সে তো কোন্ বেলায় দুটি মুড়ি আর চা খেয়েছি।'
'তবু কতক্ষণ আগে?'
'তা চার ঘন্টা হবে।'
ঠিক তো!
'তো কি, তোমাকে মিছে বলব?'
'পাগল! তা কখনো বলতে পারিস।' দাঁতগুলো বেরিয়ে পড়ল হারাধনের বিকৃত মুখটা বিস্ফারিত করে।
আবার চকিতে গম্ভীর হয়ে পুতুলের নাড়ি দেখল গভীর অভিনিবেশ সহকারে। এটুকুও সে জানে বোঝা গেল। তারপর পকেট থেকে একখানি ছোট পিজবোর্ডের বাক্স বার করে সিরিঞ্জ নিল, স্পিরিট তুলো বার করল, টকাস্ করে ভাঙল ইন্জেকসনের অ্যাম্পিউল।
পুতুল তাড়াতাড়ি হাঁক দিল, 'ও পুঁটি, একদুস্ আমাকে ধরবি আয় ভাই।'
পুঁটির জবাব এলো, 'হ্যাঁ, পেত্থম রাত্তির, আমার কি দরজা ছেড়ে যাওয়া চলে?'
পুতুলের গলায় আরও খানিক ভয় ও মিনতি ফুটে ওঠে, 'তোর পায়ে পড়ি পুঁটি।'
হারাধন সিরিঞ্জে ওষুধ পুরতে পুরতে বলে উঠলো, 'এখনও মরণের ভয়? বাঁচতে সাধ?'
'তা বাউনবাবা, মরতে পারলে কি আর গঙ্গার জল কিছু কম ছিল?'
'থাক।' বলে নিঃশেষিত অ্যাম্পিউলটি ফেলে দিয়ে চোখ তুলে সে পুতুলের দিকে তাকাল। এক মুহূর্তের জন্য তার মুখের আঁকাবাঁকা রেখাগুলো উঠলো সরল হয়ে। বলল, 'একটু দেখেশুনে মানুষ ঘরে তুলতে পারিস নে, অ্যাঁ?'
পুতুলের মুখটি পুতুলের মতোই হয়ে উঠল। 'তা কি হয় বাউনবাবা? খদ্দের কানা হোক, খোঁড়া হোক, সে-ই যে ভরসা।' পরমুহূর্তেই মুখটা বিকৃত করে বলল, 'তা রোগ ব্যামো কি মুখপোড়াদের ধরা যায়।'
পুঁটি এলো মুখ গোঁজ করে। উপায় তো নেই। ঘুঁটে পোড়ে, গোবর হাসে, এমন দিন সবারি আসে। পুঁটিকে একদিন ধরতে হবে হয়তো পুতুলকে এসে।
একটা পাকা ডাক্তারের মতো শিরা খুঁজে প্যাঁক করে হারাধন ছুঁচ ঢুকিয়ে দিল। 'কষ্ট হলে বলিস্।'
ইনজেকসনের পর, খানিকক্ষণ পড়ে থেকে পুতুল চার আনা পয়সা বাড়িয়ে দিল হারাধনের দিকে। 'ওষুধ এনে এই ছিল বাউনবাবা, পরে আবার দেব।'
হারাধনের ক্রুদ্ধ মুখটার দিকে চাওয়া যায় না। চিবিয়ে বলে, 'তোরা মরবি কবে,

করবে ?'
নিশ্চুপ পুতুল তেমনি পড়ে রইল। হারাধন তার হাত থেকে ছোঁ মেরে পয়সা চার আনা নিয়ে গেল বেরিয়ে।
বাইরে গজ্‌গজ্‌ করছে পুঁটি। কে জানে এই দশ মিনিটের মধ্যে হয়তো একটা খদ্দের মিলত তার।
একটা লোককে কয়েকটা মেয়ে মিলে পিটছে। লোকটা নাকি পয়সা ফাঁকি দেয়।
অবসর নেই কিছু দেখবার হারাধনের। সে চষছে সারা মহল্লাটা। পাকা বাঁশের মতো বাঁকা পা বকের মতো ফেলে ফেলে, ঘর থেকে ঘরে।
কিন্তু তারচেয়েও দ্রুতহুতোশে মন দৌড়চ্ছে মেয়েদের। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, দুরুদুরু বুকে শিকারীর মতো অপলক চোখে তারা পথের দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু কে যে শিকারী, তা বোঝবার যো নেই। যে দেখছে, না, যে দেখাচ্ছে ?
গান তেমনি চলছে, প্রেমবাজারে যাব লো…। আর দম-দেওয়া পুতুলের মতো হারাধন ফিস্‌ফিস্‌ করে চলেছে ভেংচে। প্রেম না পেম।…কেউ ওষুধ কিনে রাখে নি, কেউ না। অথচ রোজই বলে, রাখবে। তারপর আর পয়সা থাকে না। থাকলেও নেশা করে বসে থাকে, নয়তো কিছু খেয়ে বসে থাকে ভালো-মন্দ। কিন্তু বেশীর ভাগই পয়সা জমাতে পারে নি। একটা অজানা রাগে তার আঙুলের টিপুনিতে সিকিটাই না ভেঙে যায়।
'চন্ডী, চন্ডী কোথায় ? সে তো মাথার দিব্যি দিয়ে বলেছিল ওষুধ এনে রাখবে।'…
চন্ডীর দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই খুট করে দরজাটা খুলে গেল আর চামচিকের মতো ফুড়ুৎ করে একটা লোক গেল ছুটে বেরিয়ে।
চন্ডীর গায়ে কাপড় নেই। হারাধন বিকৃত মুখটা ফিরিয়ে বলল, 'কাপড় পর।'
মদ খায় নি, তবু যেন নেশাচ্ছন্ন চন্ডী তার কালো মোটা শিথিল শরীরটা ঢাকল ধীরে ধীরে, নিস্তেজ গলায় ডাকল, 'এস বাউনবাবা।'
ঢুকেই হারাধন তার দাঁত বের করে খিঁচিয়ে উঠল, 'তবে তোর ব্যামো সারবে কী করে ? খুব তো এন্‌তার…'
বাধা দিয়ে বলে উঠল চন্ডী, 'কোথায় বাবা, সবে তো দুজন।'
কথা বেরোয় না মুখ দিয়ে হারাধনের। মনে হলো এখুনি এক ঘুষিতে অর্বাচীনা চন্ডীর মুখটা ভেঙে ফেলবে। কিন্তু মুখ কই ?
চন্ডীর তো মুখ নেই। মাটির জ্যা তো একটা। বলল, 'ওষুধ এনেছিস ?'
'এনেছি।'
'বার কর।'
সেই এক কথা, এক ভাব, এক ব্যাপার।
ইন্‌জেকসনের শেষে একটা পুঁটলি বাড়িয়ে ধরল চন্ডী হারাধনের দিকে। 'এই-গুলো নেও বাউনবাবা, পয়সা নেই।'
'কি এগুলো ?'
'চাল একসের।'
চাল ? হঠাৎ যেন হারাধনের শূন্য পেটটা পাক দিয়ে উঠে মুখটা রসালো হয়ে

উঠল। ভাতের গন্ধ লাগল যেন তার নাকে। তবু বলল, 'চাল কলা আমার বাপ আনত মন্তর পড়ে, আমি কি করব?'

'খাবে।' নিরুপায় গলায় বলল চন্ডী, 'এর জন্যেই তো সব বাউনবাবা। শরীলে যে এত বিষ ধরি…'

কিন্তু কী যে মোহিনী গন্ধ চালের! হারাধন ততক্ষণে একমুঠো চাল কটরমটর করে চিবোতে আরম্ভ করেছে। তার চিবোনো মুখের খুশি দেখে মনে হলো সে সব ভুলে গেছে বুঝি। তারপর হঠাৎ চন্ডীর দিকে নজর পড়তেই অপ্রস্তুত হয়ে চালের দলাটা গিলে ফেলল কোঁৎ করে। মুখটা বিকৃত করে বলল, 'শালা চাল নিতে হবে? আচ্ছা, তাই সই।'

বলে পুঁটলিটা নিয়ে আবার ফিরে বলল, 'তোর চাল আছে তো?'

'চালিয়ে নেব কোনোরকমে।' চন্ডী এলিয়ে পড়ল বলতে বলতে।

মুখটাকে আরও কুঞ্চিত করে পুঁটলিটা মাটিতে রেখে বলল হারাধন, 'তবু বাঁচতে হবে।'

হেসে ফেলল চন্ডী, 'তোমার কি কথা মাইরি, বাউনবাবা। বাঁচতে না হলে তুমিই বুঝিন্ এ ছুঁড়িদের দেখতে?'

হয়েছে, থাক।' খ্যাঁক করে উঠে হারাধন বলল, 'ওর থেকে দুটো রেখে বাকিটা আমাকে দিয়ে দে।'

চন্ডী সংশয়ান্বিত চোখে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি রাগ করবে না তো বাবা?'

হারাধন তখন আপন মনে বিড়বিড় করছে, 'শালা পরাণ ভট্‌চায যে কি আপদের কাজে রেখে গেল আমাকে। এর থেকে আমার…'

অমনি তার মনে আবার প্রশ্ন ওঠে, কী? চেয়ে-চিন্তে, মিছে ধার করে আর মরীচিকার মতো ঘোড়ার পেছনে পেছনে ছুটে জীবনধারণ? না-ই বা হলো কিন্তু এ কোন্ বিদ্‌ঘুটে জীবনের সঙ্গে বাঁধা পড়েছে তার ভাগ্য? একজন প্রতিমুহূর্তে গন্ডূষ গন্ডূষ বিষ পান করছে, কী ক্ষমতা আছে হারাধনের সে বিষ সে শুষে নেবে?

চন্ডী এক কুনকে চাল রেখে আবার পুঁটলিটা তুলে দিল হারাধনের হাতে। হারাধন চলে যেতে যেতে বলল, 'দু-একটা রাত একটু কামাই দে, কামাই দে।'

চন্ডীর সেই মাটির ড্যালা মুখটাতে যেন আচমকা আগুন ধরে গেল। সত্যিই একটা মুখ ফুটে উঠল এবার এবং বিতৃষ্ণায় রাগে ঘৃণায় তা যেন জ্বরবিকৃত। 'এ জীবনে কামাই দেওয়া আর হবে না। এক রাত্রিও থামতে পারা যাবে না। এ শরীরের বিশ্রাম নেই। পারলে কি নিজের মুখের ভাত কেউ তুলে দেয়!…'

কোলাহল লেগেছে ঝগড়ার। একটা ছুতোর অপেক্ষা মাত্র। ঝগড়া তাদের, যাদের পসার নেই আর যাদের আছে তাদের মধ্যে।

সরলা বসে আছে রকের উপর। সেজেছে, রং মেখেছে, কাজল টেনেছে চোখে, কপালে বসিয়েছে টিপ। কিন্তু পথের ধারে যায় নি। কাপড় এলিয়ে খাটো জামাটা শরীরটাকে আরও কটুদৃশ্য করে তুলেছে। হারাধনের দিকে তাকিয়ে আছে ভিক্ষুকের মতো যন্ত্রণাকাতর মুখে।

হারাধন পাথরের মতো শক্ত মুখে তার পাশ দিয়ে চলে গেল। কিন্তু খানিকটা গিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে খেঁকিয়ে উঠল, 'তাকিয়ে আছিস কেন, কিসের জন্যে? আমি কি ভগবান যে তোর রোগ সারিয়ে দেব? ওষুধ না পেলে কিছু হবে না।'

সরলা কাছে এসে বললে, 'কি করব বাউনবাবা, রোজগারে কুলোয় না যে?'

রেগে কটূক্তি করে ওঠে হারাধন, 'শালা ভিক্ষুকের ডেরা নাকি এটা? তাদেরও তো রোজগার আছে, আর···। আমি কি করব? আমার কী আছে?'

এক, একই ব্যাপার ঘরে বাইরে। কোনো যেন ফারাক নেই ঘরের বৌটার সঙ্গে এদের। তার রোগ নেই, কিন্তু সেও যেন এমনি অবস্থায়, প্রাণভীত চোখে হারাধনের সামনে এসে দাঁড়ায়। চালের পুঁটলিটা শক্ত করে ধরে সে সরে গেল।

উপায় নেই। আগুনের হল্‌কা লেগে যেন সরলা ছুটে পথের উপর চলে যায়।

'বাবা। বাউনবাবা।···'

কচি গলার ডাক শুনে ধক করে উঠল হারাধনের বুক। যেন তার সেজ মেয়েটি এসে ইজের পরে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। রোগা লম্বা, সরলরেখার মতো অপুষ্ট কাঁচা মেয়েটা। ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর বাউনবাবার প্রকৃতি ওর জানা নেই, তাই হারাধনের হাত জাপটে ধরে মেয়েটা বলে উঠল, 'শরীলে আমার রোগ হয়েছে, সারিয়ে দেও, সারিয়ে দেও।'

হারাধনের মনে হলো কে যেন গান গাইছে কচি গলায়, ধনধান্যে পুষ্পেভরা—

'এই-এই ছোক্‌রি।' হাঁকছে সেই মোটা লোমশ চেহারা, গলায় সোনার চেন দেওয়া লোকটা। মেয়েটা শুনল না সে ডাক। লোকটা হেসে উঠল। 'আচ্ছা, আচ্ছা ডাক্তার, কাল এসে ওকে দাবাই দিয়ে যেও, আমি আনিয়ে রাখব। চলে আয় ছোকরি, চলে আয়।···'

মেয়েটা শুনল না।

'কিষণ!' মোটা লোকটা জোর গলায় চেঁচিয়ে উঠল।

সেই ডাক শুনে চকিতে মেয়েটা কাদার মতো দলা পাকিয়ে যেন গড়িয়ে গড়িয়ে চলে গেল। কিষণ এখানকার বেয়াদপ মেয়েদের যম। মোটা লোকটা কেশো গলায় হেসে উঠল, 'তুমি ডাক্তার, মেয়েগুলোর মাথা খাচ্ছ।···'

দড়াম করে একটা ঘরের দরজা খুলে রানী একটা সুবেশ ছেলের হাত ধরে বেরিয়ে এলো চেঁচাতে চেঁচাতে: 'আরে আমার কোথাকার পুঁটকে ভাতার এলো রে। দ্যাখো দিনি কাণ্ড। বলে আমার নেই সময়, ছোঁড়া কাজ মিটিয়ে পালাবি, তা না, বলে তুমি কেন বেবুশ্যে হয়েছ? এ কি যাত্রার ঢং রে বাবা। এখন আমি ওর সঙ্গে গল্প ফাঁদি আর কি। কেন হয়েছি সে তোর বাড়িতে জানে।' বলে অগোছাল রানী অশ্রাব্য কটূক্তি শুরু করল।

ছেলেটার দিকে এক মুহূর্ত দেখে হারাধন এগিয়ে গেল সেদিকে। নরম শান্ত নবীন যুবক। হারাধন তার চিবুক ধরে বলল, 'কাকে খুঁজছ বাবা? চন্দ্রমুখী, না, পিয়ারীবাইজী?'

ছেলেটা সন্ত্রস্ত বড় বড় চোখে হারাধনের দিকে তাকিয়ে রইল। তার হাত-পা ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে, ঠোঁট দুটো নড়েচড়ে উঠছে।

হারাধন তার খোঁচা খোঁচা দাঁতে বোধহয় হেসে বলল, 'এরা সব মেয়ে কুলি, ফুরনে খাটে। ওসব গল্পেই ভালো জমে, নয়তো জায়গা বাছতে হয়। এখানে সে সময় নেই। বাড়ি যাও, বাবা।'

ছেলেটার চোখে তখন প্রায় জল দেখা দিয়েছে। সে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল।

রানী খিলখিল করে হেসে উঠে বলল, 'ছোঁড়ার মরণ ধরেছে! চন্দ্রমুখীটা কে বাউনবাবা?'

'সে এক গল্পের বেবুশ্যে। শরৎ চাটুয্যের নাম শুনেছিস?'

'নরসিং চাটুয্যেকে তো চিনি, ও নাম তো জানি না।'

হারাধন বলল, 'তিনি বেবুশ্যেদের গল্প লিখতেন, খুব নামী লোক ছিলেন রে।' পরমুহূর্তেই মুখটা ঘোঁচ করে বলল, 'তা বলে তিনি তোদের মতো হাভেতেদের কথা লেখেন নি; যাদের কথা লিখতেন, তাদের একটা প্রাণ ছিল।'

'সে পেরাণ নিয়ে তোমরা থাক গে, জান্ থাকলে বাঁচি।' মুখ বেঁকিয়ে রানী সরে গেল।

'জান্ থাকলে বাঁচি। বিড়বিড় করতে করতে হারাধন এগোয়। ছোঁড়াটা বোকা, তাই এখানে এসেছে প্রেমের সন্ধানে। ব্যাটা মুখে দুটো তুলে দিয়ে প্রেম কর, জমবে। সবই জমবে। তা না, নভেলিয়ানা! চালের পুঁটলিটা নাকের কাছে ঘষতে ঘষতে পথে এলো হারাধন।

সারাক্ষণ ঘুরে তার বারো আনা আর ওই চালটুকু রোজগার হয়েছে। তাও আট আনা পয়সা ভবিষ্যতের জন্য একটা মেয়ে জমা রেখেছে।

'প্রেমবাজারে যাব লো সজনী…' সেই গান চলছে। হারাধন অন্ধকারে ঠাওর করে দেখলে, গান গাইছে মতিবালা। বয়স বেশী নয়, কিন্তু চামড়াগুলো ছাইপাঁশা হয়ে কুঁচকে ঝুলে পড়েছে, চুলগুলো হয়েছে পাঁশুটে, দাঁত নেই একটাও। চোখ আছে দুটো সাপের মতো। বলল, 'কে, বাউনবাবা? এই আঁধারে বসে গাইছি। দেখি যদি কেউ আসে।'

হারাধন মুখ ভেংচে বলল, 'প্রেমের শখ এখনো মেটে নি?'

মতি মাড়ি বের করে বলল, 'যা পেলেম না, তা মিটবে কি করে? আর পেটটা তো ভরাতে হবে। গান শুনে একবার উঁকি তো দেবে।'

'দিলই বা।'

'তখন ঘরে না যায়, দুটো পয়সা চেয়ে নেব।'

'তবু মরবে না।'… ছিটকে গলিটা থেকে বেরিয়ে এলো হারাধন। এক, দুই… লাইটপোস্ট গুণতে আরম্ভ করেছে সে। রাতটা এখন ফাঁকা। দোকানগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘাড় গুঁজে হেলে পড়ে ছায়া ফেলে চলেছে হারাধন। মাঝে মাঝে হঠাৎ থমকে পড়ছে। কেবল মনে হচ্ছে সামনে এসে কে যেন দাঁড়াচ্ছে। কে? কেউ না। রাত পুলিসের বুটের শব্দ আসছে। তবু যেন একটা কিসের দেওয়াল এসে পথরোধ করছে বারবার হারাধনের।…হঠাৎ মনে হলো রাস্তাটা একটা কুৎসিত ব্যাধির মতো দলা পাকিয়ে উঠে এসেছে তার সামনে। ধাক্কা দেওয়ার মতো এগিয়ে গেল সে। আঙুলে যেন সিরিঞ্জ ধরেছে। ফিস্‌ফিস্ করে উঠল, দেব শালা ছুঁচ

ফুঁড়ে ? দেওয়া যায় না ইন্‌জেকসন করে এক হাতে দুনিয়াটাকে সাপটে ধরে ?

…উনত্রিশ ত্রিশ…

গলিটাতে ঢুকে তার গতি শ্লথ হয়ে আসে। ঘাড়টা আরও খানিক ঝুঁকে পড়ে। বাঁকা পায়ের পদক্ষেপের তালে তালে যেন সে বলছে, ধরণী দ্বিধা হও। দ্বিধা হও।

গলিটাতে আলো নেই, কিন্তু শুক্লপক্ষের চাঁদ ছিল আকাশে। অষ্টমীর চাঁদ বোধ করি। এক বিচিত্র কুহেলিকাপূর্ণ আলো-আঁধারে ভরা সমস্ত গলিটা। কোথায় একটা গো-সর্পিণী উলু দেওয়ার মতো লুলু করে ডেকে উঠছে গো-সাপকে।

ডোবার ধারের সরু ধার দিয়ে ঝুপসিঝাড়ে-ছাওয়া হেলে-পড়া বাড়িটার সামনে এসে হারাধন দাঁড়াল। ভুতুড়ে বাড়ি, ছিটেফোঁটা ঝাপ্‌সা আলোয় মনে হয় নিশ্বাস আটকে হেলে পড়ে দাঁড়িয়ে আছে ভূতটা।

হারাধনের পায়ের শব্দে কিসে যেন ফোঁস করে উঠল; সে দেখল দেওয়ালের ফাটলে অর্ধেক বেরিয়ে আছে কালনাগ, চক্‌চক্‌ করছে রং। কিন্তু হারাধন যেন চেনা মানুষ। মাথা নামিয়ে তাড়াতাড়ি গর্তে ঢুকে গেল। বাস্তু সাপ এটা। একজোড়া আছে। ওরা চার শরিককে চেনে না, চেনে হারাধনকে। পোড়ো বাড়িতে ভূতের মতো নিঃসাড়ে ঢুকল হারাধন। ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠল। উঠোনটাতে আগাছার ঝাড়—তার ব্যাপ্তি উপরে ও নিচে সর্বত্র। উপরের সব ঘরগুলোই ভাঙা আধ-ভাঙা, একটা ঘর আস্ত। হারাধন সে ঘরে গিয়ে ঢুকল। দাঁতগুলো তার বেরিয়ে পড়েছে। বুক খোলা জামাটার ফাঁক দিয়ে ঝুলে পড়েছে পৈতেটা।

ঘরটাতে জানলা ও ভাঙা ফাঁক দিয়ে আলো ঢুকছে। সেই আলোয় দেখা গেল সারি সারি তার ন'টি ছেলেমেয়ে শুয়ে আছে। আটটি মেয়ে, একটি ছেলে। বড় মেয়ে দুটোর সারা গায়ে রং-এর জাদু লেগেছে। হারাধনের মুখের এলোমেলো কোঁচগুলো যেন কোথায় উধাও হয়ে গেল। সে উবু হয়ে সকলের ধার দিয়ে এক-বার হাত বুলিয়ে গেল। ছেলেটার কাছে এক মুহূর্ত থমকাল।

আলোয় যেন নীল দেখাচ্ছে ছেলেটার মুখটা। ছেলে মাত্র একটি। মুখের কষ বেয়ে নাল পড়ছে। অঘোরে ঘুমুচ্ছে। হঠাৎ তার একটা কথা মনে পড়ে গেল।… কিছুদিন আগে পাড়ার কে দু-কোয়া কাঁঠাল দিয়েছিল ছেলেটাকে। ছেলেটা ডোবার ধারে বসে তা খাচ্ছিল। হারাধন হঠাৎ কি মনে করে খেলাচ্ছলে কাককে দিয়ে দেবে বলে খ্যাপাতে খ্যাপাতে কপ্‌ করে কাঁঠালের কোয়াটা মুখে দিয়ে গিলে ফেলেছিল। আর ছেলেটার সে কী চিল চেঁচানি। হারাধন ভয় পেয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখেছিল তার বৌয়ের সেই একজোড়া অপলক চোখের অলস চাউনি। তাড়াতাড়ি ছেলেটাকে কোলে নিয়ে সে ছুটে গিয়েছিল গয়লা কেনোর দোকানে একটা বিস্কুট দিয়ে ঠাণ্ডা করতে।

কিন্তু বৌটা কোথায় ? একেবারে অন্য গলায়, নরম সুরে সে ডাকল, 'ন-বৌ। ন-বৌ কোথায় গেলিরে ?'

সে ডাকে যেন সারা ঘরটায় একটা মায়া ছড়িয়ে পড়ল। কিন্তু কোনো জবাব এলো না। হারাধন ঘর থেকে বেরিয়ে এদিক ওদিক করে পুবদিকের ছাদটার দিকে চলে

গেল।
সেখানে জামরুল গাছটার পাশে, আল্‌সের ধারে ন-বৌ নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মনে হয়, ন-বৌ অপরিসীম সুন্দরী। এই আলোয় গায়ের রং যেন ধপধপ করছে, রূপময়ী হয়ে উঠেছে ন-বৌ। মাথায় ঘোমটা নেই, ময়লা কাপড়ে শরীরটা ঢেকে রেখেছে।…
কিন্তু সামনে এলে দেখা যায়, সমস্ত শরীরটা একটা সরলরেখা। কোথাও তার নেই উঁচুনীচু বঙ্কিমরেখা। মুখটা কঙ্কালের মতো সাদা ও ছোট। সেই হাড়-কপালে একটা মস্ত লাল টিপ। চোখ দুটো যেন পোয়াতী গাভীর।
হারাধন চালের পুঁটলিটা রেখে বৌয়ের হাত ধরে ডাকল—'কী করছিস্‌ এখানে ন-বৌ, খুঁজে আর পাই না।'
ন-বৌ তাড়াতাড়ি ক্লান্ত হারাধনের দিকে ফিরে দু'হাত ধরে তাকে বসায়, জামাটা খুলে নেয়, বলে, 'কখন এসেছ?'
'এই তো কিছুক্ষণ।' হারাধন একটা নিশ্বাস ফেলে ন-বৌয়ের কাঁধে একটা হাত রেখে বলল, 'চাঁদ দেখছিস্‌?'
'চাঁদ কোথায়?' ন-বৌ অবাক হয়ে দেখল সত্যিই তো চাঁদ রয়েছে আকাশে।
হারাধন বলল, 'চোখেও পড়ে নি, না-রে? এ সব বুঝি আর চোখেই পড়বে না কোনোদিন। ন-বৌ, এ বাড়িটার মতোই আকাশটা কোন্‌দিন ভেঙে পড়বে।'
ন-বৌয়ের মুখটা যন্ত্রণাকাতর হয়ে উঠল। হারাধনের হাড় বের করা মুখটায় হাত বুলিয়ে বলল, 'তোমার যে শরীরটা'—
'বলিস নে।' বাধা দিয়ে বলে উঠল হারাধন। 'বলিস নে ন-বৌ। তুই গায়ে হাত দিয়ে বসেছিস্‌। আমি যে তোদের দিকে আর তাকাতে পারি নে।…এই তো রোজগার করেছি বারো আনা পয়সা তিন পো চাল। কী দিয়ে তোদের ছোঁব, বল।'
বুঝি রাত থেমে গেছে, চাঁদ ঢেকে গেছে, হাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।
ন-বৌ বলল, 'তা হলে তোমাকে দুটি রান্না করে দিই?'
'আজ আর নয়, কাল দিস্‌। চল্‌ ঘরে যাই।' বলে ন-বৌয়ের হাত ধরে কাছে টেনে নিল সে।
ন-বৌ উঠল কিন্তু তবু দাঁড়িয়ে রইল। হারাধন ডাকল, 'চল্‌ রাত যে পুইয়ে এলো?'
যেন দারুণ অপরাধিনীর মতো ন-বৌ হঠাৎ হারাধনের পায়ের কাছে পড়ে ফুঁপিয়ে উঠল, 'উঠানের ওই তেলাকুচোর ঝাড়টা তুমি কেটে দিও।'
হারাধন অবাক হয়ে বলল, 'কেন রে?'
'ওখান থেকে কি একটা ফল খেয়ে আমাদের ছেলেটা মরে গেছে।…'
হারাধনের মনে হলো সত্যি আকাশটা ভেঙে পড়েছে তার মাথায়, বাড়িটা টলছে, চাঁদটা ছিটকে পড়ছে আকাশ থেকে। ন-বৌ তখন বলছে, সন্ধ্যাবেলা কেবলি খেতে চাইছিল আর কাঁদছিল। ওদের জন্য ক-খানা রুটি করছিলাম। সেই ফাঁকে… খোকার খিদে মানল না।…দেখলাম, কি খেয়ে বোবা ছেলে শুয়ে আছে।…'

হারাধনের চোখের উপর ভেসে উঠল ছেলেটার নীল মুখ, নাল গড়াচ্ছে। যেন আকাশের বুক থেকে বলল, 'ও। তবে জন্মের মতো দেখে এসেছি তাকে?... তবু চল্ ন-বৌ, সে যে একলা রয়েছে।...আমার যে আরও জ্যান্ত আটটা মেয়ে রয়েছে।'

পরদিন ছেলেকে শ্মশানে পুঁতে এসে হারাধন পৈতেটা কোমরে গুঁজে একটা মস্ত ঠ্যাঙা দিয়ে ঝাড়টাকে পিটে পিটে দুমড়ে দিতে লাগল।

সেই ঝাড়ে ঘা লেগে ছরকুটে যেতে লাগল সবুজ লাল সব বিচিত্র ফল। পালাল কতগুলো ঢোঁড়া হেলে সাপ, পোকামাকড়। শিকড়ে ঘা লেগে সারা বাড়িটার দেয়ালের বিস্তৃত শিরা-উপশিরায় টান পড়ে যেন নড়ে উঠল বাড়িটা।

ন-বৌ উপরে দাঁড়িয়ে অপলক চোখে তাই দেখছে। মেজ-মেয়েটা কোলের বোন-টাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে দোলাচ্ছে আর সরু মিষ্টি গলায় গাইছে, ধনধান্যে পুষ্পে ভরা...।



জীবিকা

যা লিখছি, তাকে ঠিক গল্পই বলা যাবে কিনা আমি জানি নে। এবং অতিশয়োক্তি না করেও বলতে পারি, বাংলাদেশের একটি বিশিষ্ট কলেজে, সাহিত্যসভার আমন্ত্রণে, আমি বক্তৃতার কোনো কথা-ই খুঁজে পাই নি। এই গল্পটিই বলেছিলাম। এক বাঙালী শিল্পীর চরিত্র-চিত্রণও সেটা বলা যায়।

আজই বিশেষ করে কেন সেকথা মনে পড়ল, সেটাও আমার নিজের কাছে খুব বিচিত্র লাগছে। শুধু বিচিত্র বলছি কেন। বরং বলাই ভালো, এটা আমার স্পর্ধা কিনা, সে সংশয়ও আছে। আজ ষোলই সেপ্টেম্বর। গত পরশুদিন ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি, আমাদের সর্বজনশ্রদ্ধেয়, পণ্ডিত, দার্শনিক ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ যে-কলেজে গিয়েছিলেন, বছর ছ'য়েক আগে সে-কলেজেই আমি গিয়েছিলাম। আমার যাওয়াটা এত তুচ্ছ যে, এ রাজকীয় ঘটনার সঙ্গে তার কোনোই মিল নেই। শিয়ালদহ থেকে বহরমপুর স্টেশন পর্যন্ত, সমস্ত মানুষই ১৪ই সেপ্টেম্বর তা প্রত্যক্ষ করেছেন। করাই স্বাভাবিক। এবং কৃষ্ণনাথ কলেজে উপরাষ্ট্রপতি যা বলেছেন, তা আমাদের ভিতরের অবচেতন অনুভূতিরই কথা। গোটা ভারতের ভিতরের সত্যকে এমন করে উদ্ঘাটন করা, তেমন যোগ্যতা যে আমার কানাকড়িও নেই, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

তবু যে কৃষ্ণনাথ কলেজে তাঁর উপস্থিতির সংবাদ পড়ে আমার সে-কাহিনী মনে পড়ে গেল, সেটা আসলে, আমার তুচ্ছ উপস্থিতিকে আজ আমি অনেক গৌরবান্বিত বোধ করছি। আমি পাশের জেলার প্রতিবেশী-বন্ধু হিসেবেই গিয়েছিলাম। আমি সেই অগণিত সাধারণেরই একজন, অসাধারণের ছিটে-ফোঁটা স্পর্শ পেলেও নিজেকে যে যুক্ত করে গৌরব করতে চায়।

আর এই ভেবেও আফসোস হচ্ছে, সেই গল্প বলার ঝোঁকটা কখনো কাটাতে পারলাম না। আমি তো ধার করেও দুটি, দেশ কাল এবং সাহিত্যের ওপরে পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথা বলতে পারতাম। কিন্তু কথাই আছে, 'স্বভাব যায় না মলে।'

আজ আবার সেই তুচ্ছ গল্পটিরই পুনরাবৃত্তি করছি। আমার ঝুলিতে এই তুচ্ছতাটুকু ছিল। তাই তুলে, উপরাষ্ট্রপতির পায়ে দিই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি হিসেবে।

কী মাস সেটা, তাও মনে নেই। তবে ক্ষণে বর্ষা, ক্ষণে রোদ মুর্শিদাবাদের সবুজে সেদিন আলোছায়ার বিচিত্র খেলা। আর বাংলাদেশ, তার বিচিত্র রূপের কথা বলতে গেলেই গলার কাছে একটি আশ্চর্যজনক আনন্দদায়ক বেদনা যেন সব রুদ্ধ

করে দিতে চায়। রানীর মতো ধনরত্নের সত্যিই তো কোনো বৈশিষ্ট্য তার নেই। মা বলে ডাকতে গেলে কি এমনি হাসিকান্নায় সব ভরে ওঠে? আর আমরা, আমরা এই কয়েক কোটি ভাইয়েরা আমাদের মায়ের থেকে কি কম বিচিত্র?

কয়েকজন ছাত্র-বন্ধুর সঙ্গে প্রস্তাব হয়ে গেল, দুপুরেই বহরমপুর থেকে মুর্শিদাবাদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যাওয়া হবে। এবং সেটা ঘোড়ার গাড়িতে। যে কখনো অমন করে যায় নি, তাকে কেমন করে বোঝাব, সে যাওয়াটা কি? পাল্কী গাড়ি আমাদের ছুটল সেই পথ ধরে, যে-পথে বহু ঐতিহাসিক যাত্রার পদচিহ্ন এখনো খুঁজলে পাওয়া যাবে।

কিন্তু ইতিহাস থাক। মাইলের পর মাইল জুড়ে অমন পদ্মফুলের বিল আর কোথাও দেখি নি। কিন্তু পদ্ম থাক, বিল থাক। সেদিন হাজার দুয়ারির প্রাঙ্গণে তার দেখা পেলাম।

একদিকে গঙ্গা, আর একদিকে প্রান্তর জুড়ে বৃদ্ধ ইতিহাসের অবনত মাথা। ইংরেজদের তৈরী পোষা-নবাবের প্রাসাদের মধ্যে আছে জাদুঘর। দেখতে যাবার আগে, একটি জংধরা কামানের গায়ে হাত দিলাম। ভাবলাম, এ কামানটি হয়তো একদা বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছিল। ঠিক সেই সময়ে শুনতে পেলাম, 'ও কামানটা বেইমানের কামান বাবু। ওটা আমাদের নয়।'

সেই ভরাট প্রায় সুরেলা গলা শুনে চোখ তুলে তাকালাম। একটি মাঝারি লোক। হয়তো চাষী। পরনে একটি এক-রঙা লুঙ্গি। গায়ে বোতামখোলা ময়লা হাফ শার্ট। হাতে একটি বোধহয় হাঁড়ি, মুখে সরা ঢাকা, নতুন একখানি গামছা দিয়ে বাঁধা। বয়স বুঝি পঁয়ত্রিশের মতো। উস্কখুস্ক চুল। দুটি ভাসাভাসা সুন্দর চোখ। দৃষ্টিতে কোথাও তীক্ষ্নতা নেই, তীব্রতা নেই। একটা আশ্চর্য গভীরতা আছে।

জিজ্ঞেস করলাম, কী বললেন?

কাছে এলো লোকটি। বলল, বলছি কি বাবু, এ কামানটা সিরাজের কামান নয়। এটা কি বাবু জানেন? এটা হলো আপনার সিরাজ-মারা কামান, ইংরাজের দেওয়া তাঁবেদার নবাবের কামান। বুঝলেন কিনা বাবু? আপনি হয়তো উল্টা ভেবে বসে থাকবেন, তাই বললাম। বাবু, এটা বেইমানের কামান।

লোকটি আমার চোখের দিকে তাকাল। দুটি কথা বলল, আর মুহূর্তে আমার মনোহরণ করল। জিজ্ঞেস করলাম, আপনি জানেন?

একটি আশ্চর্য সুর তার গলায়। ইতিহাসের ব্যথিত হাসিটি দেখলাম তারই ঠোঁটে। বলল, জানব না বাবু? জন্মে ইস্তক তো এই দেখছি। এই যে মোকাম দেখছেন, এখন জাদুঘর, আর এই যে কামান দেখছেন, এ যে বাবু বেইমানির পুরস্কার।

অবাক লাগল লোকটির কথা শুনে। তার কথার উচ্চারণ ও সুর খাঁটি মুর্শিদাবাদী। অনেকটা বুঝি বাউলের গানের মতো। লিখে তাকে ব্যক্ত করা যায় না। আর তার গলার মধ্যে কেমন একটি করুণ হাসিভরা বিষণ্ণতা।

তারপরই সে জিজ্ঞেস করল, কোথা থেকে আসছেন আপনারা বাবু?

সবচেয়ে যেটা সোজা, সেটাই বললাম, কলকাতা।
সে বলল, ভালো করেছেন বাবু এসে। একটু দেখেন সব ঘুরে ফিরে। আসছেন তিন চারজন, সব ঘুরে ফিরে দেখে যান। একটা কথা বলব বাবু ?
এই অনুমতি চাঁওয়ার মধ্যে একটি সুন্দর গ্রামীণ আভিজাত্য ছিল। আর কী মিষ্টি তার বলার ধরন। নাম কি এর ? মনোহর ?
—বলুন।
বলছি কি যে, আপনার পকেটে দেখছি কলম রয়েছে। আমার পোস্টকার্ডে এক-খানি ঠিকানা লিখে দিতে পারবেন ইংরাজীতে ?
—নিশ্চয়।
পকেটে হাত দিয়ে সে পোস্টকার্ডখানি বার করে বললে, না, মানে, আবার বিরক্ত হবেন কিনা, তাই ভাবলাম। আপনার বন্ধু জাদুঘরে যাবার টিকিট কাটতে গেলেন তো। যদি দেরি হয়ে যায়। না হয় ফিরে এসেই লিখে দেবেন।
আমি হাত বাড়িয়ে বললাম, না। দিন লিখে দিচ্ছি।
পোস্টকার্ডখানি কামানের ওপর রেখে লিখতে গিয়েও কেন যেন পারলাম না। কামানটা বেইমানের। একথাটি বার বার মনে হতে লাগল। তাই সামনের দেওয়ালের দিকে অগ্রসর হতে গেলাম, লোকটির গা ঘেঁষে।
লোকটি যেন একটু চমকে উঠেই, হাঁড়িটা সরিয়ে নিল। আমি তাকালাম। সে হাসল। বলল, সাবধানের তো মার নাই বাবু, কার নসীবে কখন কি থাকে, তা কি বলা যায় ?
আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন বলুন তো ?
সে বলল, না ভয় কিছু নয়। এই হাঁড়িটার কথা বলছি। মুখ আমি সরা দিয়ে ঢেকে রেখেছি। গামছা দিয়ে বেঁধেছি। তাছাড়া আসল বস্তুটি আছেন আমার কাছে। কোনো ভয় নাই।
—কী আছে আপনার ওই হাঁড়িতে ?
—একখানা কালী গোখরো বাবু।
আমার গাটা যেন কেমন করে উঠল। আমি বললাম, কালী গোখরো ?
—হ্যাঁ বাবু। খবর ছিল কিনা কাল রাতে, ওই গঙ্গার ওপারে এক গাঁয়ে। বাইরের থেকে উনি একজনের ঘরে গিয়ে বসেছিলেন। সারারাত এয়াঁর সঙ্গে ঝুটো-পুটি লড়াই গেছে বাবু। তবে মা ধরা দিলেন ভোরবেলা। এই ধরে নিয়া আসছি। বিষ ঝাড়াই না হওয়া পর্যন্ত তো বিশ্বাস নাই। তাই সাবধান হলাম একটু।
ইতিমধ্যে জাদুঘরে যাবার তাড়া দিল বন্ধুরা। যদিও তারাও লোকটির সঙ্গে আলাপে ভিড়ে পড়েছিল।
লোকটা বলল, নিন, ঠিকানাটা লিখে দিন বাবু একটু কষ্ট করে। লিখুন, জনাব ইদ্রিস্ শেখ্।—গ্রাম।—পোস্ট অফিস—।—জেলা।
লিখতে লিখতেও আমার মনটা কালী গোখরোর দিকেই চলে গেছে। ঠিকানা লিখে দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি সাপ ধরেন বুঝি ?

সে বলল, সব সময় নয় বাবু। এক গুরুর সঙ্গ করেছিলাম, বিদ্যেখানি জানা আছে। তা বাবু। বিদ্যের কথায় না আছে, যত করিবে দান তত যাবে বেড়ে? মানুষের বিপদ-আপদের কথা শুনলে তো চুপ করে থাকা যায় না। থাকা যায় কি বাবু?

বললাম, না। কিন্তু আমি আপনার কালী গোখরো দেখব।

—দেখবেন বাবু?

—হ্যাঁ, দেখান না একটু।

—হাজারবার দেখাব বাবু আপনাকে।

বলেই যেন কেমন মুগ্ধ স্বপ্নাচ্ছন্ন চোখে তাকালো আমার দিকে। বলল, বাবু, একটা কথা বলব?

আমার যেমন মন ঠিক সেই ভেবেই পকেটে হাত দিলাম। পয়সা, নিশ্চয় পয়সা। বললাম, বলুন।

সে বলল, আপনাকে আমার বড় ভালো লেগেছে বাবু।

আমি মুঠো করে পয়সা তুললাম, যাতে সে দেখতে না পায়। কিন্তু সেও পকেট থেকে একটি সরু গাছের ডাল বার করল। বলল, বাবু, এটা আপনাকে দিলাম। আপনাকে আমার বড় ভালো লেগেছে।

—এটা কী?

—ইনিই সব বাবু। সংসারের মনসার ভয়টা বাবু ছোট মনে করবেন না। কিন্তু এটি সঙ্গে থাকলে, আপনার কোনো ভয় নাই। এটি রাখেন আপনি বাবু, আপনাকে দিলাম। মনসা আপনার কখনো কিছুটি করতে পারবে না। খালি একটা কথা বাবু, মনে করে রাখবেন, বুঝলেন?

—কী?

—সেটা হলো কি বাবু, সব জীবের একটা জীবধর্ম আছে তো? আছে না বাবু?

—আছে।

—মা মনসারও জীবধর্ম আছে। সেইটে মনে রাখবেন, ওয়াঁর জীবধর্মের বেলায় ও ওযুধটি আপনি কাজে লাগাবেন না। তা হলে জীবের দুঃখু হয়। হয় না বাবু?

—হ্যাঁ, হয়।

—তাই বলছিলাম কি যে, যেখানেই মনসা বিপদ ঘটাবেন, সব জায়গায় আপনি যেতে পারবেন। কিন্তু ধর্ম বজায় রেখে যাবেন বাবু। এ ওযুধ সঙ্গে নিয়ে যাবেন, রুগীকে ছোঁয়াবেন, বেটে খাওয়াতেও পারেন। বিশ্বাস অবিশ্বাস বাবু আপনার হাতে। আর একটা কথা বলি বাবু?

—বলুন।

—বিপদের কথা শুনলে যাবেন না। ডাকলে যাবেন। আপনার মা আছেন বাবু?

—আছেন।

—মায়ের হাতে একটু দুধ খেয়ে যাবেন।

যদিও মনসা নিয়ে আমার মনে কোনো কুসংস্কার নেই, সাপকে আমি সাপের

মতোই হিংস্র দেখি। তবু লোকটির কথার মধ্যে যেন একটি জাদু ছিল। অবিশ্বাস করেও, তাকে আমি বিদ্রূপ করতে পারলাম না। তার কথার মধ্যে যেন কী ছিল।

দুধ খাওয়ার কথায় আমি বললাম, কেন ?

সে বলল, বাবু মায়ের বাড়া কে আছেন সংসারে। তাঁর হাতের দুধ খেলে বাবু সব লড়াইয়ে জয় হয়। এটা জানবেন।

জাদুঘরের টানটা ভুলতে পারছিলাম না। কিন্তু চলেই বা যাই কেমন করে ? আমার মন তো মানে না। কারণ লোকটি দুচোখ মেলে যে তাকিয়ে আমার দিকে। বললাম, এই ওষুধের জন্য আপনাকে কি দিতে হবে ?

সে মস্ত বড় জিভ বার করে হাসল। বলল, আরে বাবা! কী বলেন বাবু! অমন পাপ কখনো করতে আছে ? ওটা আমাদের সাপুড়েধর্মে বারণ। ও বিষহরির দান। ওকি কিছু দিয়ে পাওয়া যায় বাবু ? আপনাকে আমি দিলাম। আপনাকে আমার বড় ভালো লেগেছে বাবু।

কেন ? মুর্শিদাবাদের এ ধ্বংসাবশেষ দেখতে আসা অনেক মানুষের মধ্যে, আমাকেই কেন ভালো লাগল ? কিন্তু সে-কথা জিজ্ঞেস করতে পারলাম না।

লোকটি নিজেই তাড়াতাড়ি বলল, যান বাবু, জাদুঘর দেখে আসেন। সিরাজের তলোয়ারখানা দেখবেন বাবু। আলীবর্দীর চার-নলা পিস্তল দেখতে চাইবেন কিন্তু।

তা তো দেখবই। কিন্তু লোকটি শুধু দান করেই চলে যাবে। বললাম, আপনি কালী গোখরো দেখালেন না তো ?

অমায়িক হেসে বলল, জাদুঘর দেখে আসেন বাবু, কালী-গোখরো আপনাকে না দেখিয়ে বাড়ি যাব না। আমি থাকব আপনার জন্য।

মনটা আমার খারাপ হয়ে গেল। হয়তো লোকটি এখনো কিছুই খায় নি। তার চোখের মধ্যে আমি যেন একটি লুকনো কান্না দেখতে পেলাম। কেন, কে জানে। আমাকে যেন সে কেমন একটি বেদনাদায়ক সম্মোহনে বেঁধে ফেললে।

বললাম, না না, আপনি কতক্ষণ অপেক্ষা করবেন। আপনি—

সে বলল, বাবু, বাড়ি আমার কাছেই। যখন খুশি যেতে পারব। আপনি ঘুরে আসেন। একটু এদিক-ওদিক যেতে পারি। এখানকার কাউকে জিজ্ঞেস করবেন দুলাল আলী কোথা গেল, বলে দেবে।

—দুলাল আলী ?

—হ্যাঁ বাবু। আমার নাম।

যেন মিলিত হিন্দু মুসলমানের নাম বলে আমার মনে হলো। বললাম, এমন নাম তো কখনো শুনি নি।

দুলাল আলী হাসল। বলল, আমার বড় ভায়ের নাম কালআলী। আমরা দু' ভাই। বাবার নাম কেষ্টআলী। তবে জাদুঘর থেকে বেরিয়ে যদি কাউকে আমার কথা জিজ্ঞেস করেন, সে যদি বলে, 'কোন্ দুলাল আলী যে গান গায় ?' তবে বলবেন, হ্যাঁ।

দুলালের ভাসা ভাসা চোখ দুটিতে লজ্জা চাপতে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, গান জানেন বুঝি আপনি?

দুলাল বলল, বলতে লজ্জা করে বাবু। কিছু মনে যেন করবেন না। আপনাকে আমার বড় ভালো লেগেছে। আপনার যদি সময় থাকে, তবে আপনাকে একখানি গান শোনাব বাবু। শুনবেন তো?

আমি বললাম, নিশ্চয়; আপনি বসুন তা'হলে, আমি ঘুরে আসছি।

—হ্যাঁ বাবু যান, ঘুরে দেখে আসেন। আর মোহনলালের তলোয়ারখানিও দেখে আসবেন বাবু। বললে দেখাবে, না বললে হবে না। মোহনলালের তলোয়ার না দেখলে, জীবন বেরথা বাবু।

দুলাল আলী সত্যি জাদু করল। তাকে পিছনে রেখে দিয়ে জাদুঘরের টান কমে গেল আমার। যদিও তার কথা অনুযায়ী সব জিনিসই দেখলাম। কিন্তু আলী-বর্দী, সিরাজ, মোহনলাল, মিরজাফর, ক্লাইভ আজ থাক। প্রায় দেড়ঘণ্টা পরে, প্রাসাদে ঘুরে যখন বাইরে এলাম, ভাবলাম, দুলাল আলী এতক্ষণ নিশ্চয় চলে গিয়েছে।

কিন্তু সে একটি বেঞ্চিতে শুয়েছিল। যেন আমার পায়ের শব্দ চিনে ফেলেছিল। উঠে বসে, সেই মনোহরণ হাসিটি হাসলে। বললে, দেখলেন বাবু?

—হ্যাঁ।

—এবার কোথায় যাবেন?

—আপনার গান শুনব, আপনার কালীগোখরো দেখব।

দুলাল আলী হেসে বলল, চলেন তা হলে ওই মাঠের মাঝখানটিতে গিয়ে বসি।

বন্ধুদের সঙ্গে দুলালকে নিয়ে গঙ্গার ধার ঘেঁষে মাঠে গিয়ে বসলাম।

দুলাল বলল, আগে গেয়ে নিই বাবু, কেমন? ইচ্ছে বাবু অনেক ছিল। রাত পোহালে পেটের চিন্তা, তাই ওস্তাদের ঘর করেও গানের লাইনে যেতে পারলাম না। যাই হোক, শোনেন।

ভৈরবী সুরে একটি প্রেমের গান গাইল সে।

আমি ছাড়িতে পারি না।
এ বড় বেদনা।
সখি তোমারো যাতনা
রাখিতে পার না
হৃদয় বড় অকুলানো হে।

গানের শেষে না জিজ্ঞেস করে পারলাম না, বিয়ে করেছেন?

দুলাল সলজ্জ হেসে বলল, বাবু অন্যায় করেছি, মন মানে নি, তাই দু'সন হলো ও আকামখানি করেছি।

আকাম কেন?

আকাম নয় বাবু? কাল রাতে তাকে কাঁদিয়ে বেরিয়েছি। এখনো তার চুলোয় কাঠ পড়ে নি।

বলতে বলতেই সে হাঁড়ির নতুন গামছা খুলে, সরা তুলে নিল। মুহূর্তে যেন

একটি কালো কুচকুচে আগুনের শিখা ফুঁসে উঠল। কালী গোখরোই বটে। আমরা সবাই প্রায় লাফ দিয়ে সরে গেলাম।
দুলাল চীৎকার করে বলল, আইরে মা মনসা, অমন করিস কেন লো ?
বলে সরা দিয়ে সাপের মাথাটি নামিয়ে দিল। সাপটি মাথা নামিয়ে নিল হাঁড়ির মধ্যে। তারপরে আমার দিকে ফিরে, প্রায় মধুর স্বরে ডাকল, আসেন বাবু, আপনি আসেন।
আমার সারা গায়ে যেন কালো কুচকুচে সাপটার স্পর্শ লাগছিল। আমি বললাম, থাক না, এখানেই তো বেশ আছি।
দুলালের দু'চোখে সম্মোহন। তার সেই ভাসা ভাসা চোখ দুটিতে জাদু ফুটিয়ে বলল, কোনো ভয় নাই আমার বাবুর। আমি আছি না ? আসেন।
গেলাম পায়ে পায়ে। সে তার পাশটি দেখিয়ে বলল, বসেন আমার কাছে। আমি তার গা ঘেঁষে বসলাম। দুলাল প্রায় আমার কানে কানে বলল, বাবু, আপনাকে আমার বড় ভালো লেগেছে। আমি আপনাকে আর একটি দ্রব্য দেব। আপনি নেবেন তো ?
—কী দ্রব্য ?
—নেবেন তো ?
—নেব।
তখন দুলাল তার পকেট থেকে ছোট একটি থলি বার করে, তার ভিতর থেকে যেন কী একটি জিনিস খুঁটে বার করল। বলল, হাত পাতেন বাবু।
হাত পাতলাম। সে আমার হাতে একটি কি জিনিস দিয়ে বললো, একবার দেখে মুঠ করেন।
দেখলাম। বুঝলাম না কিছুই। অতি ক্ষুদ্র একটি জিনিস। জিজ্ঞেস করলাম, কী এটা ? দুলাল বলল, দেখতে কেমন জিনিসটি দেখছেন বাবু ? শিবলিঙ্গের মতন নয় ?
দেখলাম, সত্যি তাই। প্রায় হুবহু একটি খুব ছোট, শিবলিঙ্গেরই মতো জিনিসটি। কিন্তু পাথর নয়, মাটি নয়। এটা কী ?
দুলাল বলল, বাবু, এটা শিবফল। এর নাম শিবফল। অর্জুনের ফুলের ভিতরে ইনি থাকেন। এ পাওয়া কঠিন। সব সাপুড়ের কাছে পাবেন না। মনসার অব্যর্থ ওষুধ, এর ওপরে আর কিছু নাই জানবেন। কিন্তু এর একটা নিয়ম আছে বাবু, সেটা দয়া করে, কষ্ট করে মানবেন। মানবেন তো বাবু ?
—কী সেটা ?
—মা মনসার একটু পুজো দেবেন বাবু। মনে যা-ই থাক, একবারটি ডেকে একটু পুজো দেবেন। বলবেন, তুমি আমায় দিয়েছ, আমি তোমাকে দিলাম। তোমার আমার এই রফা।
বলেই সে হাঁড়িতে একটা খোঁচা দিল। আবার সেই কালো আগুনের শিখা ফুঁসে লকলকিয়ে উঠল আমার বুক পার হয়ে।
আমি সরে যাচ্ছিলাম। দুলাল বলল, যাবেন না বাবু, একটুখানি পেত্যয় করেন।

এই নাগিনীর মাথায় আপনি শিবফলের হাত রাখেন।

আমার বুকের রক্ত তখন হিম। গলা শুকিয়ে তখন কাঠ। বললাম, আমি পারব না ভাই।

—পারবেন বাবু। আপনি আমার বাবু, আমি আছি না? আপনাকে যে জিনিস দিয়েছি, আপনার কোনো ভয় নাই। বিষ দাঁত ওর ভাঙা হয় নাই বাবু, ওর জিভে বিষ আছে। তবু বলি, আপনি হাতখানি রাখেন ওয়াঁর মাথায়। একবার দেখেন।

আমি দুলালের চোখের দিকে তাকালাম। সেই সম্মোহনের হাসি। আমি হাত এগিয়ে নিয়ে গেলাম সেই উদ্যত, সদ্যধরা কালী গোখরোর মাথায়। স্পর্শ করলাম। আর মনে হলো আমার শিরদাঁড়ায় যেন কিলবিলিয়ে কিছু নামছে।

দুলাল বলল, দেখেন বাবু।

দেখলাম সাপটি ফণা গুটিয়ে হাঁড়িতে নামছে। দুলাল আমার হাতটি ধরে হাঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়ে, চেপে ধরল একেবারে সাপটির মাথায়। প্রায় যেন চুপি চুপি বলল, কোনো ভয় নাই। কোনো ভয় নাই। আপনি বলেন, বলেন, 'আমার হাতে কি আছে, তুমি দেখ।' বলেন বাবু।

আমি বললাম।

দুলাল আবার বলল, বলেন, 'মা, আমি তোর পুজো দেব।'

তখন আমার হাতের তলায় কালী গোখরো কিলবিল করছে। আমি বললাম।

দুলাল বলল, বাবু, কোনো ভয় নাই। একটা নিয়ম হলো পুজোর কথাটি বলতে হয়। কত পুজো দেব, সেটাও মা'কে বলে দেন। যা আপনার মন চায়। এক পয়সা, দু পয়সা যা মন চায়।

কেন জানি না; তখন আমার মনটা কেন যেন নিঃশঙ্ক হয়ে গেছে অনেকখানি। বললাম, টাকা দেড়েক দেব।

দুলালের ভাসা ভাসা চোখ দুটি হাসিতে ভরে উঠল। বলল, জানি আমি, বাবুর আমার দিল অনেক বড়।

আমি হাত তুলে নিলাম। আমার বন্ধুরা উৎকণ্ঠিতভাবেই হাসছিল। আমি দুলালের চোখের দিকে তাকালাম। আমি দেখলাম আমার সামনে এক অসামান্য শিল্পী। এক আশ্চর্য কথার জাদুকর। কলেজ স্ট্রীটের প্রকাশকের ঘরে বসে ঐ কথাশিল্পী কোনোদিন তার বইয়ের সংস্করণের হিসেব করবে না। কিন্তু চিরদিন মনোহরণ করবে। এমন অধ্যবসায় আমরা কতটুকু দেখেছি। 'বেইমানের কামান' দিয়ে দুলাল শুরু করেছিল, এখন দেখলাম, দুলালের চোখের ওপরে এক অসহায় আর্ত ক্ষুধার্ত শিল্পীকে।

বললাম, পুজো আর কে দেবে? টাকাটা আপনি নিন, আপনি পুজো দেবেন। দুলালের দুটি ভাসা ভাসা চোখে অপার আলো। বলল, আপনি বললে তো আমি না করতে পারব না বাবু।

টাকা দেড়টি তার হাতে দিয়ে তাড়াতাড়ি বিদায় হলাম। আমি জানি বুদ্ধির দরবারে আমি একটু ইমোশনাল। দুলালের হাসিটি তখন প্রায় কান্নায় রূপান্তরিত হচ্ছে। এবার যে তার ঘরের চুলোয় আগুন জ্বলবে, সেই জন্যে।

আমার বন্ধুরা আমাকে অনুসরণ করল। একটু দূরেই লুঙ্গি পরে খালি গায়ে একটি লোক দাঁড়িয়েছিল। দেখলাম তার মুখে বাঁকা হাসি, চোখে বিদ্রূপ। সে বলল, দুলালের মনসার পুজো দিলেন বাবু ?

—হ্যাঁ।

—আর বললে বুঝি, সদ্য ধ'রে নিয়ে আসা বিষদাঁতওয়ালা কালী গোখরো ?

—হ্যাঁ।

—শালা, সেই বুড়ি সাপটা দেখিয়ে চিরদিন এক খেলাই দেখিয়ে গেল। জমি নেই, জিরেৎ নেই, এখন ওই হয়েছে পেশা!

আমরা লোকটার কাছ থেকে সরে গেলাম। জমি নেই, জিরেৎ নেই, তাই দুলাল এখন কথার জাদুকর। দুলালকে আমি শিল্পী বলেই জানি। আর এই ভূমিহীন কৃষক দুলালকে দিয়ে আমি আজ নতুন করে উপরাষ্ট্রপতির বাণীর সারমর্মটুকু বুঝলাম, আমাদের দেশের সংকট বাইরে নয়, ভিতরেই।

হ্যাঁ ভিতরেই, এমন কি আমাদের এই বাংলার ভিতরেও ; এই দুলালের মতো মানুষেরা যখন আছে।



আলোয় ফেরা

ঢং ঢং ঢং···।

তিনি অস্ফুটে ঠোঁট নেড়ে নেড়ে গুণতে লাগলেন, চার, পাঁচ দশ-এগারো-বারো। ঘরের দেওয়ালে ঘড়িতে ঘণ্টা বাজল যেন চুপিচুপি। একটা ফেনিলোচ্ছল উচ্ছ্বাস যেন সেই শব্দে চাপা পড়ে রয়েছে। একটি উদ্গত হাসি যেন এই অন্ধকারে থমকে রয়েছে। প্রাণের চির আবদ্ধ, চির অচেনা সেই হাসি থমকে রয়েছে ঘরের এই অন্ধকারে, নির্বাক দেওয়ালে, বাইরের সীমাহীন স্তব্ধতায়। একটি মুহূর্তের প্রতীক্ষায়। একটি মুহূর্তের, স্রোতমুক্ত তরঙ্গে রাশি রাশি আনন্দধারায় ফেটে পড়বার জন্যে। একটি বিস্মিত আনন্দস্ফুট ধ্বনি রুদ্ধ হয়ে আছে যেন সর্বত্র, বেজে উঠবে বলে।

আর এ সবই আবর্তিত হচ্ছে ওঁর বুকে। গোকুলচন্দ্রের বুকে, নিঃশব্দে আবর্তিত হচ্ছে। সেই আবর্তকে শান্ত করবার জন্যেই যেন বুকের ওপর দু'হাত চেপে রেখেছেন। কিন্তু পারছেন না। বরং একটা উত্তেজনা বোধ করছেন। তাই নিশ্বাস দ্রুত, অসহজ হয়ে উঠছে। ঘুম তো দূরের কথা, এই শীতার্ত পৌষ রাত্রিতে ওঁর সর্বাঙ্গে যেন উষ্ণ তরঙ্গ বইছে। ঘেমে উঠবেন বা। উদ্গত হাসি এবং আনন্দস্ফুট ধ্বনি ওঁর গলাতেই এসে থমকে রয়েছে। একলা ঘরে, চুপিচুপি উচ্চারণ করলেন, 'বারোটা। বারোটা বাজল। শুভেন আসবে ভোর ছটার সময় আমাকে নিতে। আমাকে নিয়ে যেতে সেইখানে···সেইখানে···যেখানে সেই একবার গেছলাম। তারপর তারপর···।'

বুকের ওপর থেকে দু'হাত তুলে নিয়ে মুখের ওপর চাপা দিলেন গোকুলচন্দ্র। যদিও নিশ্ছিদ্র অন্ধকার, তবু চোখে ঢাকা দিলেন হাত দিয়ে। কয়েক মুহূর্ত নিশ্বাস রুদ্ধ হয়ে রইল। আর রুদ্ধ নিশ্বাসের মধ্য দিয়ে ওঁর ঘ্রাণের মধ্যে সেই বাতাসে ভাসা ওষুধের গন্ধ স্পষ্ট হয়ে উঠল। যে গন্ধের মধ্যে একটা স্তব্ধ ভয়ের অনুভূতি ফুটে ওঠে, সেই ওষুধ গন্ধবিধুর হাসপাতালের প্রাঙ্গণ ওঁর চোখের ওপর ভেসে উঠল। কত বছর যেন। আট, আট আর পঞ্চাশ, আটান্ন। পঞ্চাশ বছর আগে হাসপাতালের ইঁট-বাঁধানো প্রাঙ্গণে সেদিন সকালে শুকনো পাতা ছড়িয়েছিল। আট বছরের গোকুল বিধবা মায়ের হাত ধরে ঢুকল সেখানে। চোখে অনবরত জল কাটছে। দৃষ্টি অস্পষ্ট ঝাপসা। তাই বারে বারে ভ্রূ কুঁচকে, চোখের ভিতরের প্রতিটি শিরা-উপশিরা অতিরিক্ত টান টান করে, বড় বড় চোখে গোকুল দেখছিল সব কিছু। ওষুধের গন্ধ নাকে ঢোকামাত্র মায়ের হাত আরও জোরে আঁকড়ে ধরেছিল। অস্পষ্ট ছায়া হলেও, মানুষগুলো অসুস্থ আর রুগ্ন বলে

চিনতে পারছিল। যন্ত্রণা-কাতর অস্পষ্ট একটা দূরাগত গোঙানি বুকের মধ্যে ভয় ধরিয়ে দিচ্ছিল। মাথার ওপরের প্রকাণ্ড গাছটা থেকে টুপ-টাপ পাতা পড়ছিল খসে। মনে আছে ওঁর কপাল ছুঁয়ে, গা বেয়ে একটা পাতা পড়েছিল। গোকুল সেটা ধরতে যাচ্ছিল। আর তখুনি আকাশের ওপর হাততালির মতো শব্দে চমকে তাকিয়ে দেখেছিল, এক ঝাঁক পায়রা গাছ থেকে হাসপাতালের ইমারতে গিয়ে বসল। যতোই ভিতরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল, ততোই স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছিল পায়রার বকবকম। আর অবাক হয়ে ভাবছিল, হাসপাতালে পায়রা থাকে। ওদের ভয় করে না?

পরমুহূর্তেই প্রকাণ্ড ইমারতের উঁচু খাঁজে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বলেছিল, মা ওখানে পায়রা দেখা যাচ্ছে, না?

মা তাকিয়ে দেখে বলেছিলেন, হ্যাঁ। দেখতে পাচ্ছিস?

—পাচ্ছি। ওরা নড়ছে, তাই। হাসপাতাল থেকে ওদের তাড়িয়ে দেয় না?

কিন্তু মায়ের তখন কী যেন মনে হচ্ছিল। তিনি আর এক হাত দিয়ে, গোকুলের কাঁধ ধরে গায়ের কাছে চেপে ধরেছিলেন।

হয়তো গোকুল যে পায়রাগুলোকে দেখতে পাচ্ছিল, তাতে আশা এবং ভয়ের আবেগে মায়ের গলাটা ধরে এসেছিল।

শুধু বলেছিলেন, না।

গোকুল আবার বলেছিল, মা, হাসপাতালের বাড়িটা লাল।

—হ্যাঁ।

—ওই যে ফুলটা ফুটে আছে, ওটা হলদে কলাফুল না?

—হ্যাঁ।

—আকাশটা ঠিক দিদির পুজোর কাপড়ের মতো নীল, ঠিক না?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ বাবা।

গোকুলের মনে হচ্ছিল, মায়ের গলাটা ক্রমেই সরু হচ্ছে, খাদে নেমে যাচ্ছে। গান গাইলে এক এক সময় যেমন হয়। গোকুল মায়ের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। মা তখন বলেছিলেন, চল, সিঁড়ি দিয়ে উঠে, ওই বাঁদিকের ঘরটায় যাব।

হাসপাতালের 'চক্ষু বিভাগের' ঘরের দরজাটার সামনে গোকুল একবার থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। পিছন ফিরে মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে বলেছিল, মা, বড্ড ভয় করছে।

মা মাথায় হাত রেখে বলেছিলেন, ভয় কী! আমি আছি না।

মায়ের হাতের তলা দিয়ে, হাসপাতালের পাতা-ঝরা রক্তাভ ইঁটের প্রাঙ্গণ গোকুল দেখতে পাচ্ছিল। ঝাপসা চোখে, গাছের ন্যাড়া ডালে পায়রাদের খুঁজছিল। আর কেন যেন ওঁর শিশু প্রাণটা এক বিচিত্র আচ্ছন্নতায় মূর্ছিত হয়ে পড়ছিল।

মা বলেছিলেন, চল, দেরি করিস না। ভয় কী। তোর চোখে কেবল তো ওষুধ দিয়ে দেবে।

গোকুল আস্তে আস্তে ঢুকেছিল সেই ঘরটায়। কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ বসেছিল সেখানে। কিন্তু সকলেই প্রায় বয়স্ক। গোকুলের বয়সী কেউ না। আর গোকুল

বেশ বুঝতে পারছিল, সকলেই চোখ দেখাতে এসেছে সেখানে। ডাক্তারবাবু বসেছিলেন চেয়ারে। আর আশ্চর্য! গোকুল অবাক হয়ে ভাবছিল, চোখের ডাক্তার, তাঁর চোখেও আবার চশমা কেন? কিন্তু ডাক্তারের মুখটা কেমন লাল মতো। কী ভীষণ বড় গোঁফ। গোকুল চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। তারপর অন্যমনস্ক হয়ে কখন বাইরের দিকে তাকিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, বাইরের রোদে একটা ছায়া ঘনিয়ে আসছে যেন। দিদির কাপড়ের মতো আকাশটা জলনেকড়া দিয়ে মোছা সেলেটের মতো হয়ে উঠছিল। পাতা-ঝরা ন্যাড়া গাছটা হিজিবিজি দেখাচ্ছিল। মনে মনে বলছিল, ওষুধ দিলে আবার সব ঠিক দেখতে পাব। লাহাদের বাগানের সেই ফুলগুলো, ময়ূরটা, লাল থাম আর পাড়ার শেষে, গঙ্গার ধারে ঘাসের ওপর সেই ছোট ছোট ফুলগুলো, দিদি নাকে নাকছাবি করে পরে, আমি যেগুলো এখন একদম দেখতে পাই না, সেই—

—গোকুলচন্দ্র দত্ত—।

চমকে উঠেছিল গোকুল। মাকে আবার চেপে ধরেছিল। মা গলা তুলে বলে উঠেছিলেন, এই যে!

—নিয়ে আসুন।

ডাক্তারবাবুর গলা। মা হাত ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন। ডাক্তারবাবু গোকুলের চোখের পাতা টেনে টেনে দেখে শব্দ করেছিলেন, হুম্! তারপর শুইয়ে দিয়ে টর্চ-লাইট জেবলে দেখেছিলেন। এবং আলোর চকিত ঝলক সরে যেতেই গোকুল আর কিছু দেখতে পাচ্ছিল না। শুধু শুনতে পাচ্ছিল ডাক্তারের গলা, হুম্। আপনার ছেলেকে আজ চোখে একটু ওষুধ দিয়ে দিচ্ছি। তাতে কয়েক ঘণ্টা চোখ মেলতে কষ্ট হবে। আলাদা ওষুধ দিয়ে দেব, আবার কাল সকালে চোখে দিয়ে দেবেন।

কথা শেষ হবার আগেই গোকুল চোখের উপর স্পর্শ অনুভব করেছিল। চোখের পাতা ফাঁক হয়েছিল, আর যেন তীক্ষ্ম ছুঁচের মতো বিন্দু বিন্দু ওষুধ পড়েছিল। তীব্র একটা যন্ত্রণায় গোকুল চীৎকার করে উঠেছিল, উঃ, জ্বলে যাচ্ছে, মা জ্বলে যাচ্ছে!

মা হাত দিয়ে স্পর্শ করেছিলেন। বুকের কাছে মুখটা তুলে নিয়েছিলেন। ফিসফিস করে বলেছিলেন, একটু কষ্ট হবে বাবা, তারপরে সব ভালো হয়ে যাবে।

কিন্তু কষ্ট অসহনীয় বোধ হচ্ছিল। এত অসহনীয় যে, মাথার শিরগুলো ছিঁড়ে পড়বে যেন। অজ্ঞান হয়ে যাবে বুঝি। তীব্র যন্ত্রণায় চোখ বুজে, অর্ধচৈতন্য অবস্থায়, প্রায় মায়ের কোলে চেপেই বাড়ি ফিরেছিল। গলির কাঁচা নর্দমা, আর তিতু ময়রার দোকানের গন্ধে টের পেয়েছিল, বাড়ির কাছে এসে পড়েছে। বাড়িতে এসে, ঘরের মাটির ওপর পড়ে চীৎকার করে আবার কেঁদেছিল গোকুল, মা, জ্বলে যাচ্ছে, জ্বলে যাচ্ছে!

মা আর দিদি, দু'জনেই বলেছিলেন, একটু একটু সয়ে থাক গোকুল, সেরে যাবে।

তারপরে এক সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল গোকুল। ব্যথা একটু একটু করে কমে গিয়েছিল। আর মনে আছে, স্বপ্ন দেখছিল। পাশে স্যাকরাদের বাড়ির ছাদে ঘুড়ি ওড়াচ্ছে। মাঝারি বাতাস। ঘুড়িটার কোনোদিকে একটু কান্নিক নেই।

সেই একেবারে নীল, রৌদ্রমাখা আকাশের গায়ে গিয়ে মিশেছে। বিশ্বকর্মা পুজো বুঝি আসন্ন। লাটাই ধরে, ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে গোকুল লাফিয়ে লাফিয়ে গাইছে, ঝিঙেফুল কাঁকুড় কাঁকুড়, ও গেঁড়ি বউ মোনসা ঠাকুর!...গাইতে গাইতে, হঠাৎ ঘুম ভেঙে দেখেছিল, রাত হয়ে গিয়েছে। ঘর অন্ধকার। চোখ দুটি তখনও টনটন করছে। আর মনে পড়ে গিয়েছিল, সকালবেলার কথা। মা আর দিদির গলা বাইরে শোনা যাচ্ছিল। আরও নানান শব্দ, এমন কি স্যাকরাদের বাড়ির ঠুকঠুক। গোকুল ডেকেছিল, মা।

মা তাড়াতাড়ি ঘরে এসেছিলেন। বলেছিলেন, ব্যথা কমেছে?

গোকুল বলেছিল, একটু একটু আছে। বাতি জ্বাল নি কেন?

—বাতি?

মা চমকে উঠে বলেছিলেন, বাতি কেন? এখন যে বেলা দুটো, গোকুল!

গোকুল চকিতে উঠে বসেছিল। দু'চোখ মেলে চারদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রায় চীৎকার করে উঠেছিল, বেলা দুটো? তবে এত অন্ধকার কেন?

মা চীৎকার করে গোকুলকে প্রায় ছোঁ মেরে বুকে তুলে নিয়েছিলেন, গোকুল! গোকুল, অন্ধকার কেন? এই দ্যাখ আমি আমি—।

—দেখতে পাচ্ছি না, মা, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

মা গোকুলের চোখের অন্ধকারে ঠোঁট ডুবিয়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠেছিলেন। আর দিদির কান্নার শব্দও গোকুল শুনতে পাচ্ছিল তখন।

দেওয়ালের ঘড়িতে ঢং করে একটি শব্দ বাজল। রাত্রি সাড়ে বারোটা না একটা, বুঝতে পারলেন না গোকুলচন্দ্র। চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে এনে আবার বুকের ওপর রাখলেন। নিশ্বাস আবার দ্রুত হয়ে উঠেছে। বুকের ভিতরে সেই আবর্তই পাক দিয়ে উঠছে। সেই সহর্ষ উত্তেজনার উচ্ছ্বাস অশান্ত করে তুলছে। পঞ্চাশ বছর আগের সেই ভয়ংকর স্মৃতি তাঁকে ব্যথায় ডুবিয়ে দিতে পারছে না। হতাশায় অবশ করে ফেলতে পারছে না। বরং পঞ্চাশ বছর আগের সেই শেষ আলোর ঝলক, মহান সংগীতশিল্পী গোকুলচন্দ্রের প্রাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যেন রুদ্ধ হাসির বেগ থমকে রয়েছে। খুশীর সুরে উপচে পড়বে বলে। চোখের দুয়ার ভেঙে প্লাবিত হবে বলে।

বুকের ওপর দু'হাত চেপে, ফিসফিস করে বললেন, আবার! আবার!

নিজেকেই সম্বোধন করে বললেন, গোকুল আবার, সেই পাতাঝরা সকাল ফিরে আসছে। আঃ! কী আশ্চর্য! সেই পায়রা-ওড়া সকাল, কলাফুলফোটা সকাল তোমার চোখের অন্ধকারে লুকিয়ে আছে। কাল সে বেরিয়ে আসবে। এই গাঢ় অন্ধকার থেকে ভেসে উঠবে। তাই শুভেন আসছে!

হ্যাঁ, তাই শুভেন আসছে। প্রতিধ্বনিত হলো ওঁর ভিতরে। আর স্পর্শ দিয়ে অনুভব-করা শুভেনের চেহারা ওঁর সামনে ভেসে উঠল। স্পর্শ দিয়ে অনুভব-করা সেই শক্ত, চওড়া বুক, পুষ্ট কাঁধ, নিটুট চিবুক, দৃঢ় সংবদ্ধ ঠোঁটের কোণে শ্রদ্ধালু

হাসি, সুইডেন থেকে ফেরা চক্ষু-বিশারদ ডাক্তার শুভেন। গোকুল অনুভব করেছেন, ওর ঋজু শরীরের একটি অনায়াস দৃঢ়তার ব্যঞ্জনা। গলায় পরম আত্ম-বিশ্বাস, যখন বললে, আমার স্থির বিশ্বাস আপনার দৃষ্টি এখনও আছে, বরাবরই ছিল। আপনার চোখ দেখে, এই-ই আমার সিদ্ধান্ত। আমি ঈশ্বর নই, তাহলে বলতাম নিশ্চিত ফিরিয়ে দিতে পারি আপনার দৃষ্টি। নিতান্ত মানুষের হাত, তাই দিয়ে আমার কাজ। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এখনও আপনার দৃষ্টিশক্তি রয়েছে, এখনও তা ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

শুনতে শুনতে স্তব্ধবাক দিশেহারা গোকুল মূঢ় বিস্ময়ে থতিয়ে গিয়েছিলেন। পঞ্চাশ বছর নয়, যেন সেইমাত্র চকিত অন্ধকার ওঁকে চিরতমসা আবৃত করে দিল। যেন হতচকিত সংশয়ে, দুঃসহ অন্ধকারে, অন্ধ চোখে হাতড়াতে লাগলেন, আর সভয়ে চুপিচুপি উচ্চারণ করলেন, দেখতে পাব ? আবার দেখতে পাব ?

শুভেনের গলার তেমনি দৃঢ় প্রত্যয়, দৈববাণীর মতো বেজে উঠেছিল, পাবেন। আমার সকল বিদ্যাবুদ্ধি তাই বলছে, আপনি দেখতে পাবেন।

পঞ্চাশ বছরের গাঢ় অন্ধকারের যন্ত্রণা সেই মাত্র যেন ওঁকে প্রথম অস্থির করে তুলেছিল। বলেছিলেন সব দেখতে পাব ?

—সবই, আর দশজনের—।

শুভেনের কথার ওপরেই, যেন আপন মনে কবিতার মতো আবৃত্তি করে বলে উঠেছিলেন সেই, সেই যে রোদ-চিকচিকে আকাশ, আর গাছ, আর পায়রা শালিক চড়ুই, আর সব মানুষ, আর…?

—সবই।

শুভেনের দৃঢ় স্বরের মধ্যেও আবেগের ছোঁয়া লেগেছিল, সবই। যখন আপনার চোখের বন্ধ দরজা আমি খুলে দিতে পারব—।

—তখন আমার তানপুরা সেতার হারমোনিয়াম তবলা—?

—নিশ্চয়ই!

—আর তখন, শুভেন, তখন গঙ্গার ধারের সেই ছোট ছোট রঙ-বেরঙের ঘাস-ফুলগুলো…?

কথা শেষ হবার আগেই একটি অশ্রুরুদ্ধ গলার ডাক শুনতে পেয়েছিলেন ? গোকুল।

চমকে উঠেছিলেন গোকুল। দিদির উপস্থিতি টের পান নি। টের পেয়ে সহসা স্বপ্নভাঙা স্খলিত স্বরে উচ্চারণ করেছিলেন, দিদি!

দিদির হাসি ছোঁয়ানো কান্নারুদ্ধ গলা শোনা গিয়েছিল, গোকুল আমাদের সেই গঙ্গার ধার আর নেই, শোভাবাজার, নিমতলা, বাগবাজার সব পীচের রাস্তা, বাঁধানো রক হয়ে গেছে। ঘাস গজাবার মাটি আর নেই।

—ও!

একটা চকিত ব্যথায় শান্ত হয়ে উঠেছিলেন গোকুল। তাঁর চোখের রুদ্ধ দুয়ার সর্বগত অন্ধকারের মধ্যে একটি ঘাসফুলের দ্বীপ ফুটে উঠেছিল। সবুজ ঘাসে রোদ-লাগা লাল সাদা নীল নীল ঘাসফুল। যেন লুকোচুরিতে ধরাপড়া মিটিমিটি

হাসি তাদের মুখে। এই বৃদ্ধা বিধবা দিদি তখন নাকছাবি করে পরতেন। সরু ডগাসুদ্ধ তুলে দিত গোকুল। কিন্তু এখন আর দিদি ফুলের নাকছাবি পরবেন না। এখন আর কলকাতার গঙ্গার ধারে ঘাস গজাবার মাটি নেই।

শুভেনের গাঢ় স্বরে শোনা গিয়েছিল, কিন্তু পৃথিবীতে এখনও অনেক ঘাস আছে, সেখানে অনেক ঘাসফুল ফোটে। আমরা আপনাকে সেখানে নিয়ে যাব। আপনি দেখতে পাবেন মামাবাবু।

মামাবাবু। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়ে গিয়েছিল, দিদির ছোট মেয়ে, তাঁর নিজের ছোট ভাগ্নী, তাঁর সব থেকে বেশী স্নেহের সুগতারই বন্ধু হিসেবে চক্ষুবিশারদ শুভেন তাঁদের পরিবারে এসেছে। মনে পড়েছিল ওদের ক্লাসে লেকচার দিতে এসেছিল শুভেন। সুগতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু-বিভাগেরই ছাত্রী। পরিচয় পেতেই শুভেন ছুটে এসেছিল গোকুলচন্দ্রকে দেখতে, পরিচিত হতে। সংগীতশিল্পী গোকুলচন্দ্রের সে আবাল্য ভক্ত। গোকুলচন্দ্র ওর স্বপ্নের শিল্পী। ও বলেছিল, সুইডেনের প্রবাসে অনেক একলা অন্ধকার রাত্রি আপনার রেকর্ড শুনে কেটেছে। আপনার সেই গান, "হে ভাই অন্ধকার, তোমার অন্ধকারের শিখায় আমি দেখেছি পূর্ণ জ্যোতি" আমি বারে বারে শুনি।

কিন্তু সেই সব নয়। আরও কিছু। তাঁর অনুভূতির আলোয় আরও দেখতে পেয়েছিলেন। তাঁর পরম স্নেহের সুগতার হৃদয়গতির মুখোমুখি এসে হাত পেতে দাঁড়িয়েছে শুভেন। তাই ওর গলাতেই যেন নতুন সুরে বেজে উঠল, 'পৃথিবীতে এখনও অনেক ঘাস আছে, এখনও অনেক ফুল ফোটে।' আছে, আছে। ফুটবেই তো। দিদির দিন গিয়েছে, কলকাতার ঘাটে আর মাটি নেই। কিন্তু রূপনারায়ণের ধারে এখনও মাটি আছে। সুগতার নাকছাবি পরার কাল এসেছে। ঘাসফুলেরা তাই এখনও ফোটে। কিন্তু—।

আবার সকল অন্ধকার কাঁপিয়ে বাতাস লেগেছিল গোকুলের প্রাণে। তেমনি ভয়ে ও আশায় চুপিচুপি গলাতেই বলেছিলেন, দেখতে পাব ? পাব ?

শুভেন বলেছিল, আপনি আমাকে অপারেশনের অনুমতি দিন।

দিদি বলে উঠেছিলেন, কিন্তু শুভেন, আবার কাটাকাটি করতে গিয়ে—।

কথার মাঝপথেই শুভেনের যুক্তিসিদ্ধ কথা শোনা গিয়েছিল, নতুন করে আর হারাবার কী আছে মা। আমি বলছি নিজের ওপর আমার পূর্ণ বিশ্বাস আছে। ওঁর চোখের ওপরেই আমার সকল শিক্ষা সার্থক হবে। তবু যদি আমি হেরে যাই, যদি যাই, পরিবর্তন কিছু হবে না।

শেষের কথাগুলো বলতে যেন শুভেনের কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু গোকুল আর সেসব ঠিকমতো ভাবতে পারছিলেন না। তাঁর সর্বব্যাপী অন্ধকারের পটে একটি রোদে-ভাসা সকাল থিরবিজুরি রেখায় ফুটেছিল। বহু যুগ-যুগান্তরের ফেলে-আশা বন্ধুর মতো সে যেন বিস্ময়ে নিঃশব্দে হাসছিল। তিনি শুধু বলেছিলেন আশ্চর্য। কী আশ্চর্য।

আবার ঘড়িতে ঘন্টা বেজে উঠল। কিন্তু স্মৃতি-সায়রের ডুব-সাঁতারে উজানবাহী

মীন গোকুল। সময়ের ঘণ্টা ওর কানে গেল না। সেদিনের মতোই এখনও উচ্চারণ করলেন, আশ্চর্য! কী আশ্চর্য! এই চির-অন্ধকারের কপাট শুধু মৃত পর্দায় ঢাকা। এক লহমায় সেই পর্দা খুলে যাবে। আলোক-স্নাত বিচিত্র পৃথিবী আবার ভেসে উঠবে। উঠবে, তাই তো শুভেন আসছে। আর কতক্ষণ! তাঁর বুকের দুরন্ত আবর্ত থেকেই যেন উঠে আসছে শুভেন। এই অন্ধকারের, অন্ধকারে স্তব্ধ দেওয়ালে দেওয়ালে, আসবাবপত্রে, এ বাড়ির সকল প্রাণে, সর্বত্র থমকানো রুদ্ধ হাসিকে প্রবল বেগে ছুটিয়ে নিয়ে আসছে।

নিজেরই গাওয়া টপ্পা সুরের গানের কথা তাঁর মনে পড়ল, 'কভু যদি দেখা নাহি দিতে, তবু সহিতো! ধরা দিয়ে, ধরা নাহি দিলে, বড় যাতনা॥'

যখন এই গান রেকর্ড করেছিলেন, তখন তাঁর অপার অন্ধকারের বুকে সেই শেষ সকালের আলোর ছবি ভেসে উঠেছিল। আট বছর বয়সের সেই শেষ আলোকে উদ্দেশ করেই যেন গেয়েছিলেন। কিন্তু সে শেষ আলো নয়। আজ আর তা পেয়ে হারানোর যন্ত্রণা নয়। আট বছরের সেই সকাল যেন তাঁর সঙ্গে দুয়োরবন্ধ খেলা খেলেছে! আজ তাঁর দুয়ার খোলা খেলা আসন্ন। আজ তবু সেই সকালই ঝিরবিজুরি রেখায় ফুটে আছে। যেখান থেকে এই সর্বগ্রাসী অন্ধকারের পরিক্রমা।

সর্বব্যাপী অন্ধকার, দুঃসহ। মনে আছে, সেই ভয়ংকর নিয়ত অন্ধকারের মধ্যে কী একটা আতংক যেন দেখতে পেত আট বছরের গোকুল। শিশুপ্রাণে যে অন্ধকারকে বড় ভয় ছিল, সেই অন্ধকার ওর চারপাশে একটা অশরীরী বিভীষিকার রাজত্ব রচনা করেছিল। সামান্য শব্দে উৎকর্ণ হতো। বাতাসের শব্দে চমকে উঠত। ভয় পেয়ে বারে বারে সামনে পিছনে হাত বাড়িয়ে অন্যে হাতড়াতো। অস্ফুটে জিজ্ঞেস করত, কে? কে?

তারপর মনে হতো, গাঢ় অন্ধকারের মতো সহসা স্তব্ধতাও সীমাহীন। তখন মাটিতে কোমর ঘষতে ঘষতে পেছিয়ে যেত যতদূর পারা যায়। তারপর দেওয়ালে ঠেকে যেতে হতো। আর চীৎকার করে ডাকত, মা! মা!

কাজ ফেলে মা আসতেন ছুটে।—কী হয়েছে গোকুল?

—কাছে এসো। আমার একলা ভালো লাগে না।

মা কাছে এলে, তাঁকে দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরতো গোকুল। মুখটি গুঁজে দিত বুকের মধ্যে। দিয়ে নিঃশব্দে পড়ে থাকতো। কথা বলতো না। মাও কথা বলতেন না। কেবল ওর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। কিন্তু মায়ের অনেক কাজ, গোকুল জানতো। মাকে শোলার ওপরে রাংতা কেটে বসিয়ে চাঁদমালা আর টোপর সাজাতে হয়। জরি আর পুঁতি সেলাই করতে হয় কাপড়ে। দোকানীরা এসে নিয়ে যায়। সময়মতো এসে মাল না পেলে টাকা দিতে চায় না। দোকানীরা টাকা না দিলে খাওয়া জুটবে না। মাটির দেওয়াল-দেওয়া টালির ঘর আর একটু উঠোন, মাথা গোঁজবার সেই ঠাঁইটুকু ছাড়া আর কিছুই ছিল না। মা দিদি দুজনকেই কাজ করতে হতো।

কিছুক্ষণ পর আবার মন শান্ত হতো। গোকুল বলতো, আচ্ছা, এবার তুমি যাও

মা। মা বলতেন, যাব। তোর যদি এখন ঘুম আসে, ঘুমো না।
—ঘুম যে আসে না। আচ্ছা মা, এখন বেলা কত?
—তিনটে বুঝি হবে।
—তা হলে স্যাকরাদের বাড়ির দেয়ালে, আমড়াগাছের ছায়া পড়েছে এখন, না?
—হ্যাঁ।
—ছায়াটা তেমনি ছাতা মাথায় দেওয়া লোকের মতন দেখায়?
—হ্যাঁ।
গোকুল ছায়াটা মনে মনে দেখতো। তারপরে হঠাৎ বলতো, মা, চোখ বুজলে তুমি কিছু দেখতে পাও?
মা হাসতেন কিনা কে জানে।—গলায় একটা শব্দ হতো। বলতেন, পাই। তোকে দেখতে পাই।
—আমিও তোমাকে দেখতে পাই। আমি সব দেখতে পাই। কিন্তু—।
একটা কথা মনে হলেই চুপ করে যেতো। মা বলতেন, কী রে?
গোকুল বলত, মা, আমি একলা থাকলে মনে হয়, কারা যেন আমার সামনে এসে দাঁড়ায়। আমি টের পাই, পা টিপে টিপে এসে দাঁড়ায়, একটু একটু শব্দ হয়। আঙুলের হাড় মটকালে যেমন শব্দ হয়, তেমনি। আর জান, হাই দিলে যেমন শব্দ হয়, তেমনি। ওরা কারা মা?
মা বলতেন, ওরা দেবতা।
—দেবতা কী মা? ভগবান তো?
—হ্যাঁ।
—তবে আমার ভয় করে কেন?
—ভয়ের কিছু নেই গোকুল। ওঁরা তোকে ছোঁবে না, কিছু করবে না। তোর জন্যে যে ওঁদের কষ্ট হয় তাই তোকে দেখতে আসে।
—কষ্ট হয়?
—হ্যাঁ।
সেই অশরীরী ভগবানের উপর হঠাৎ অভিমান হতো গোকুলের। বলত, তবে ওরা আমাকে অন্ধ করে দিলে কেন?
মায়ের কোনো জবাব পাওয়া যেত না।
—মা, ভগবান তো সব পারে, তবে আমাকে অন্ধ করে দিলে কেন?
মায়ের কোনো জবাব পাওয়া যেত না।
—মা, ভগবান তো সব পারে, তবে আমাকে অন্ধ করে দিলে কেন?
মায়ের কথা শোনা যেত না। স্পর্শের মধ্যে থেকেও মনে হতো, মা যেন কাছে নেই। গায়ে ঝাঁকুনি দিয়ে বলত গোকুল, বল না মা।
মায়ের নিচু ভাঙা ভাঙা গলা শোনা যেত, ওঁদের জিজ্ঞেস করিস। আমি তো জানি না বাবা।
গোকুল বুঝতে পারতো, মা কাঁদছে। তাই আর সে-কথা জিজ্ঞেস করতো না। এবং একলা একলা অনেকদিন অন্ধকারের সেই শব্দের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করেছে,

'আমাকে কেন অন্ধ করেছ ? কেন ?'
কোনো জবাব পেত না। কিন্তু একদিন যখন ফিসফিস করে ওইরকম জিজ্ঞেস করছিল তখন সহসা মিষ্টি গলার গান ভেসে এসেছিল,

আমি অন্ধকারেই থাকি,
তুমি আঁধার রাতেই এস।

বাইরে থেকে দিদি গাইছিলেন। তবু উৎকর্ণ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল গোকুল। মনে হয়েছিল, যেন, তারই কথার জবাব দিয়ে দিদি গেয়ে উঠেছিলেন। আর নিজেও গুনগুন করে গেয়েছিল,

অন্ধকারেই বসত করি,
তুমি গোপনে এসে বস।

এ কথার মানে কী তা তখন জানতো না। কিন্তু একটি অস্পষ্ট অর্থবহ সুরের দোলায় যেন তাকে ঘুমপাড়ানির মতো দোলা দিয়েছিল। কেন যেন ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গানটি গাইতে ভালো লাগছিল। আর গাইতে গাইতে মেঝের ওপর শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। তারপর যখনই সেই শব্দের উদ্দেশে জিজ্ঞেস করতে মুখ তুলেছে, তখন আর জিজ্ঞেস করতো না। গুনগুনিয়ে উঠতো, 'আমি অন্ধকারেই থাকি'।

বন্ধুরা কেউ আর আসত না। গোকুল তাদের সঙ্গে বাইরে যেতে পারত না। ছুটোছুটি করতে পারত না। প্রথম প্রথম মনে থাকত না, তার পৃথিবী অন্ধকারে আবৃত। বন্ধুরা এসে ডাকলে, সহসা ঘুম ভাঙা চমকে ছুটে যেত। আর মুখ থুবড়ে লুটিয়ে পড়ত মাটিতে, চৌকাটে। কপাল ঠুকে যেত দেওয়ালে। কেটে ছড়ে আঘাত পেয়ে চমক ভেঙেছে। মা কিংবা দিদি এসে জড়িয়ে ধরতেন। বন্ধুরা বিব্রত। আঘাতের ব্যথায় কান্না পেত না গোকুলের। দুঃসহ অন্ধকারের যন্ত্রণায় ফুঁপিয়ে উঠতো।

মা বলতেন বন্ধুদের, তোরা আর ওকে অমন করে ডাকিস না। ও কি আর বাইরে যেতে পারে ? কাছে এসে বসে গল্প করিস।

কিন্তু বসে গল্প করার বয়স সেটা ছিল না। বন্ধুরা তাই আস্তে আস্তে ভুলে গিয়েছিল। সব থেকে নিকটতম বন্ধু হয়ে উঠেছিলেন দিদি আর মা। আর দিদি শুধু গান গাইতেন। বলতেন। যখন চোখ ছিল, তখনও বলতেন। যখন ছিল না, তখনও। কিন্তু দিদির গানই চুপ করে শুনতে ভালবাসত গোকুল। বাসত নয়, আজও বাসে। আজকের সুবিখ্যাত এই অন্ধগায়ক গোকুল দত্ত ছাড়া আর কে জানে তাঁর দিদির গলায় কী আশ্চর্য সুরের জাদু লুকিয়ে আছে। আর দিদি বলতেন, 'আমার এ ছাই গলায় গান ভালো হচ্ছে না। গোকুল, তুই গা। তোর গলাটাই মিষ্টি।'

—'যাঃ।'

—'হ্যাঁ রে। দেখিস নি, তুই গান গাইলে লাহাদের বড়কর্তা কেমন হাঁ করে শোনে।'

হ্যাঁ, দেখতো গোকুল। তখন দেখতে পেত। সেই পাথর-বাঁধানো রকের ওপর ছড়ি

হাতে বসে থাকতেন লাটু লাহা। ডেকে বলতেন, 'এই, এই ব্যাটা, সে গানটা কর দিকিন, "মন তুমি কৃষি কাজ জান না।" গা, ছানার মুড়কি খাওয়াব।'

গাইবার আগেই অবিশ্যি জিভে জল এসে পড়ত। কিন্তু জিভের ঝোল টেনে টেনে গান শেষ করতো। তারপরেই নগদ রানীমার্কা এক পয়সা। এবং একছুটে তিতু ময়রার দোকানে।

শুধু লাটু লাহা নয়। তিতু ময়রা স্বয়ং ছিল একজন শ্রোতা। আর নিতাই স্যাকরা সন্ধেবেলা ঠাকুরকে বাতি দেখাবার সময় দেখতে পেলেই বলত, 'সেই দু কলি একবার গেয়ে দে তো গোকুল।'

গোকুল গাইতো, 'হরি নামের লুট পড়েছে, লুটে নে রে তোরা। লুট পড়েছে হরি প্রেমের লুটে নে রে তোরা।'

কিন্তু দিদির সঙ্গে ও-সব গান ছিল না। দিদি হঠাৎ পিছন ফিরে, চিবুকে আঙুল রেখে গেয়ে উঠতেন,

না না না, ও বাঁশী শুনব না
ও বাঁশীর বিষ প্রাণে সহে না।

দিদির কাছেই শেখা কলি গাইতো গোকুল,

শুন শুন সখী, রাখ এ মিনতি
এ বাঁশীরে দুষো না।
এ বাঁশীর প্রাণ সদা আনচান
রাধা বিনা নাম জানে না॥

দিদি— না না না, সহিতে পারি না
বাঁশী শুনে কুল রহে না রহে না।

গোকুল— কী হবে সখি কুল রেখে শুনি
শ্যামেরে ভজ মনে।
শ্যাম যদি রহে আঁখেরে রহিবে
পীরিতি ধরম সনে॥

দুজনের প্রায় পালা গান জমে উঠত বাড়ির উঠোনে, গঙ্গায় স্নান করতে যাবার পথে পথে, রাত্রে পাশাপাশি শুয়ে। যেন একটা গান গান খেলা। চোখের দৃষ্টি হারাবার পর, একটা ব্যথার চমকে কিছুকাল সে-সব বন্ধ ছিল। আবার শুরু হয়েছিল। গোকুল নিজেই কবে একদিন অন্যমনস্ক হয়ে শুরু করেছিল। দিদির স্তব্ধতা তাতে ভেঙেছিল। কিন্তু গানের কথোপকথনের চপলতা আর তেমন জমতো না। গোকুল দেখতে পেত না দিদির কোমরে হাত দিয়ে চিবুকে আঙুল রেখে সেই বিচিত্র ভঙ্গি। দিদিও নিরুৎসাহ হয়ে পড়তেন ভাইকে না দেখাতে পেরে।

গোকুল গানের মধ্যে জিজ্ঞেস করে উঠতো, দিদি, নাচছিস তো?

দিদির গলায় থিতিয়ে-যাওয়া সুরে শোনা যেত, হ্যাঁ।

দ্বিতীয়বার জিজ্ঞেস করলে সহসা জবাব পেত না। তখন বুঝতে পারতো দিদি কাঁদছে। গোকুলের নিজের গলায়ও উচ্ছ্বসিত কান্না থমকে থাকত। সেই স্নেহের

এবং বেদনার অনুভবের ভিতর দিয়ে তার নিকষ অন্ধকারে পৃথিবী যেন আর এক বিচিত্র রূপে প্রতিভাত হতো। সেই পৃথিবীর হাসিকান্নার চেহারা যেন আলাদা। কিন্তু গোকুল কাঁদত না। নীরব হয়ে যেত, আর সেই পৃথিবী তাঁর বিস্মিত মনের চারপাশে আবর্তিত হয়ে ফিরত। তখন বলতো, দিদি, আয় সে গানটা গাই।

কোন্‌টা ?

গোকুল ধরতো,

আমি শয়ানে থাকি বা স্বপনে থাকি,
দিবানিশি তোমা হেরে মোর আঁখি
তবু চিনিতে কেন পারি না।

দিদি গুনগুন করে সুর দিতে দিতে বলতেন, থামিস না, গেয়ে যা।

গোকুল গেয়ে যেত,

আঁখিজলে ভাসি কি গৃহকাজে থাকি
প্রাণে মনে মম তুমি মাখামাখি।
তোমা বুঝিতে কেন পারি না।

গেয়ে যেত। যেতে যেতে নিজেরই আর থামতে ইচ্ছে করত না। সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে আত্মহারা হয়ে যাবার সেই যেন এক পরম সান্ত্বনা হয়ে উঠেছিল। পরম আশ্রয়। আর তারই ভিতর দিয়ে একটি সচেতনতা আসছিল, তার কোনো কথা শুনলে মা আর দিদির কষ্ট হয়। কান্না পায়। তাই মুখে নীরব হয়ে উঠছিল, কিন্তু মুখর হয়ে উঠছিল ভিতরটা। তাই দুঃসহ অন্ধকারের কান্নাটা লুকোতে শিখেছিল।

মনে পড়ছে, লাহা-বাড়ির গানের আসরের কথা আবার তার মনে পড়েছিল তখন। পাথর-বাঁধানো মেঝে সেই বিরাট হলঘর। দেওয়ালে বড় বড় ছবি। মেঝেতে গদির ওপর সাদা ধবধবে চাদর আর তাকিয়া। বড় বড় ওস্তাদেরা আসেন রোজ সন্ধ্যায়, আসর বসান গানের। গোকুল বলেছিল, মা, আমি লাহাদের বাড়িতে গান শুনতে যাব।

মা যেন একটু সংকুচিত হয়ে বলেছিলেন, যাবি ? কিন্তু কার সংগে যাবি ?

—কেন, দিদির সংগে ?

—দিদি বড় হয়েছে, ওর সেখানে যাওয়া আর ভালো দেখায় না।

দিদি বড় হয়েছে। সেও এক আশ্চর্য অনুভূতি। অদেখার মধ্যেও গোকুল অনুভব করেছিল, দিদি অন্যরকম হয়ে যাচ্ছেন। সেটা বড় হওয়া কিনা জানতো না। মনে হতো দিদি যেন আরও সুন্দর হয়ে উঠছেন।

কিন্তু দিদির সংগে না গেলেও মা ব্যবস্থা করেছিলেন। সেই প্রথম হাতে লাঠি উঠেছিল গোকুলের। দিশা-দর্শন যষ্টি। মা কাউকে না কাউকে ধরে, অনুরোধ করে পাঠিয়ে দিতেন লাহাদের বারবাড়ির মহলে। আবার কাউকে পাঠিয়ে নিয়ে যেতেন। চোখ হারাবার পর প্রথম যেদিন গিয়েছিল, সেইদিন লাটু লাহার ছেলে হারু লাহা বেশ গোলাপী আমেজে ছিলেন। বলেছিলেন, এই যে গোকুলচাঁদ, চোখ খেয়েও গানের আসরে এসেছিস। ব্যাটা সুরদাস না হয়ে যায় না।

আসরের কেউ কেউ হেসেছিলেন। কিন্তু গোকুলের বিশ্বাস, হারু লাহাকে সবাই চিনতেন না। তিনি নিশ্চয়ই স্নেহ করেই বলেছিলেন। কারণ তিনি, তিনি যে গায়ক ছিলেন।

সেখানে যেন স্বপ্নের মধ্য দিয়ে সময় কেটে যেত গোকুলের। ভৈরবী-পূরবী-মল্লার, খেয়াল-ঠুংরি-গজল, টপ্পা-শ্যামা-কীর্তন সব দিয়ে মোড়া আর এক পৃথিবীর ভূগোল নানান সীমায় বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল তার অন্ধকারে। আর এক পৃথিবী। চোখের দেখা সমারোহে আগে তেমন করে ধরা পড়ে নি। অদেখার ভিতর দিয়ে তার নানান সীমান্ত চাক্ষুষ চেনা হয়ে উঠেছিল। যেন এক অচেনা জগতের নানা প্রান্তে ভ্রমণে বেরিয়ে পড়েছিল। আর যত যাচ্ছিল, ততই ভালবাসাবাসি, ততই চেনাচিনি, ততই আবিষ্কার। বাড়ি ফিরে গিয়ে দিদির কাছে শুয়ে সেই আবিষ্কারের আনন্দ উপচে পড়ত।

—খাম্বাজ ?

দিদি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতেন, খাম্বাজ কী রে ?

—খাম্বাজ জানিস নে ? সুর। একটা সুর। শুনবি ? এই এমনি—।

বলে, গুনগুনিয়ে খাম্বাজ রাগিণী শোনাতো।

কিন্তু সেই সময়েই হঠাৎ একদিন, মায়ের কথা শুনে একটা ভয়ংকর ভয়ে তীরবিদ্ধ যন্ত্রণায় আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকার আবার বীভৎস হয়ে উঠেছিল। মা ভেবেছিলেন, গোকুল ঘুমিয়ে পড়েছেন। তিনি দিদিকে ডাক দিয়েছিলেন, শুভি।

—বল।

—কালো চৌধুরী রাজী হয়েছে, এই মাঘেই সে কাজ সারতে চায়. জানিস তো ?

দিদির নিশ্চয় লজ্জা করছিল কথা বলতে। তাই শুধু শব্দ করেছিলেন, হুঁ।

কালো চৌধুরীর শ্যামবাজারে মুদী দোকান। তার সেজ ছেলে অম্বিকার সঙ্গে দিদির বিয়ের কথাবার্তা চলছিল। এই বাড়িতে এসে অম্বিকা থাকতে রাজী হয়েছিল। ঘরজামাই না, ত্রাণকর্তা হিসেবেই।

মায়ের গলা শোনা গিয়েছিল, কিন্তু শুভি, আমি আর বেশী দিন নেই। বেশ বুঝতে পারছি, আমার হয়ে এসেছে।

দিদির ভাঙা স্বর শোনা গিয়েছিল, মা।

মায়ের গলা হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে এসেছিল, শুভি, গোকুলের তুই ছাড়া আর কেউ—।

—মা তুমি বলবে, তবে বুঝব ?

অন্ধকার ঘরে আর দুজন জানতে পারেন নি তাদের চোখের জলের শরিকানায় আর একজন ভাসছে। সেই মুহূর্তে গোকুলের বড় ইচ্ছে হয়েছিল, মাকে স্পর্শ করে। পারে নি। কিন্তু সেইদিন থেকে জমাট অন্ধকারের গায়ে একটি তীক্ষ্ণধার ছুরি যেন তার বুক লক্ষ্য করে উদ্যত হয়ে উঠছিল। মাকে ছিনিয়ে নেবে বলে। সেইদিন থেকে তাই মায়ের কাছে কাছে বেশী থাকতে চেয়েছিল।

তবুও পারে নি। মাঘ মাসে দিদির বিয়ে হয়েছিল। চৈত্র মাসে মা মারা গিয়েছিলেন। গোকুলের মনে আছে, তাদের উঠানে স্যাকরাবাড়ির সেগুন গাছের

শুকনো পাতা খড়খড় করে উঠছিল। লাহাদের বাড়ির পায়রাগুলো ভর-দুপুরে ডাকছিল। গোকুল মায়ের পাশে বসেছিল ঘরে।

গোকুল মায়ের গায়ে হাত দিয়েছিল।

মা সহসা অস্পষ্ট আর্তনাদ করে উঠেছিলেন, আঃ। আঃ!

দিদি বলেছিলেন, কী হচ্ছে মা?

—গোকুলকে ডাক।

গোকুল মায়ের গায়ে হাত দিয়েছিল।—

—কী বলছ মা?

মা যেন ফিসফিস করে বলেছিলেন, গোকুল যাচ্ছি, আমি গেলুম।

দিদি হঠাৎ চীৎকার করে উঠেছিলেন। গোকুলকে জড়িয়ে ধরে মায়ের বুকে লুটিয়ে পড়েছিলেন।

গোকুলচন্দ্র মুখে হাত চাপা দিলেন আবার। তাঁর স্মৃতিচারণের ভিতর দিয়ে ঘড়িতে আবার ঘন্টা বেজে গেল। কিন্তু প্রহর গোনা তাঁর হলো না। গলায় থমকানো রুদ্ধ হাসির দুয়ারে কান্না করাঘাত করে উঠল। মনে মনে বললেন, কাল আমি আবার সেইখানে যাব, যেখানে তোমাকে শেষ দেখেছিলাম। সেই হাসপাতালেই, কাল আবার, আবার—। কিন্তু মা তোমাকে আর দেখব না।···

মনে আছে, উঠোনে মাকে বার করা হয়েছিল। দিদি গোকুলকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছিলেন। নিতাই স্যাকরা বলে উঠেছিল, দ্যাখ, শুভি, কাঁদিস কেন? দ্যাখ, আমার মা নেই, তোর দিদিমা নেই। মা-বাপ কি কারুর চিরকাল থাকে?

সেই মুহূর্তে গোকুলের ভিতরে কে যেন আপনি আপনি বলে উঠেছিল, মনে হয়, চিরদিন কেউ থাকে না।

থাকে না। অথচ কাল, অন্ধকারের দরজা ভেদ করে আট বছর বয়সের সেই আলো-ঝলকানো সকাল ফুটে উঠবে। তখন মাকে দেখতে পাওয়া যাবে না। তাই আগামীকাল শুধু রুদ্ধ হাসি নয়, আগামীকালের অবাক আলোয় অন্ধকারের কান্নাগুলো ভেসে উঠবে। আগামীকাল, আগামীকাল! আর কতক্ষণ। শেষরাত্রের আবেশ টের পাচ্ছেন গোকুলচন্দ্র। শেষরাত্রের একটি বিশেষ গন্ধ আছে যেন। রাত পোহালেই শুভেন এসে উপস্থিত হবে। নিয়ে যাবে তাঁকে—তারপর—।

তাই সেই দুঃসহ অন্ধকার, যুগে যুগের অন্ধকারে লেগেছে উজান বাতাসের তাড়া। পাতার পর পাতা চলেছে খুলে অন্ধকারের ইতিবৃত্ত।

মনে আছে, মা মারা যাবার পর মনে হয়েছিল আর একবার চোখ হারিয়েছে। আর একবার অন্ধকারের ভয়ংকর আতঙ্ক তার চারপাশে ভিড় করে এসেছিল। নড়তে-চড়তে ভয় করত। মনে হয়েছিল, গলায় শব্দ নেই, জিহ্বায় কথা নেই। চিরতরে বাকরোধ হয়ে গিয়েছে। কেবল মাঝে মাঝে একজনকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করত। জড়িয়ে ধরে মুখ গুঁজে দিতে ইচ্ছে করত। কিন্তু তার জন্যে দিদিকে ডাকতে দ্বিধা হতো। মা থাকতে দিদিকে মনে হতো একরকম। জামাইবাবুর সঙ্গে দিদিকে লাগত আর একরকম। দিদির কথা, দিদির ব্যবহার, সবকিছুর মধ্যেই কী একটা পরিবর্তন এসেছিল। ডাকতে গিয়ে থমকে যেত গোকুল।

কিন্তু দিদি আসতেন না ডাকতেই। রান্না করতে করতে উঠে আসতেন। জামাই-বাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে উঠে আসতেন। বারে বারে জিজ্ঞেস করতেন, কি হয়েছে গোকুল, অমন চুপ করে কী ভাবিস ?

গোকুল চমকে উঠতো। যেন অন্ধকারের মধ্যে লুকিয়ে পড়তো। বলতেন, কিছু না, এমনি।

দিদি কাছে বসতেন। গায়ে হাত দিতেন। গোকুলের মনে হতো, তাঁর বুকের ভিতর থেকে কিছু একটা উঠে আসতে চাইছে। তাই বুকের মধ্যে ব্যথা করে উঠতো। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে শক্ত হয়ে থাকতেন।

মাঝে মাঝে শুনতে পেতেন, দিদি জামাইবাবুকে বলছেন, আঃ! আস্তে বল, গোকুল শুনতে পাবে।

জামাইবাবু বলতেন, তোমার ভাইয়ের জ্বালায় দেখছি বোবা হয়ে থাকতে হবে।

দিদি ধমক দিতেন, চুপ কর না।

কৌতূহল এবং সঙ্কোচে কাঁটা হয়ে যেত গোকুল। ভাবতো, কী বলছে জামাই-বাবু ? কখনো কখনো শুনতো দিদি-জামাইবাবু ফিসফিস করে কথা বলছেন। চুপি চুপি হাসছেন। কিন্তু দিদির ধমকটা ঠিকই ছিল, আস্তে। গোকুল শুনতে পাবে।

গোকুল বুঝতে পারতো, ওঁদের আর একটা জগৎ তৈরি হচ্ছে। সেখানকার খবর গোকুল আর কখনও পাবে না। সেখানে ওর চির প্রবেশ নিষিদ্ধ। কিন্তু বুকের মধ্যে একটা ব্যথা টনটনিয়ে উঠত।

তারপর সেই কথাটাও তার অন্ধকারের গায়ে মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। শরীরের দাগের মতো। সে আছে, কিন্তু বাজে না। আবার একদিন গান করতে ইচ্ছে করেছিল। দিদিও যোগ দিতেন। তবে সময় পেতেন না। জামাইবাবু বাড়ি থাকলে কখনও গান গাইতেন না। গানের মাঝখানে জামাইবাবু এসে পড়লে দিদি থেমে যেতেন। ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়তেন। সংসারের কাজও যেন অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

আবার একদিন লাহাবাড়ির মজলিশ মহলে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অনেকদিন পরে গিয়েছিল। কিন্তু সে-দিনটি কখনও ভুলবে না। সামনে একটা বাগান পেরে হয়ে যেতে হতো। স্যাকরাবাড়ির একটি ছেলে গেট অবধি পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। বোধহয় জ্যৈষ্ঠের সন্ধ্যা ছিল। ফুলের গন্ধ পাচ্ছিল গোকুল। হালকা মিষ্টি গন্ধ, বেল, জুঁই আর গন্ধরাজের। লাঠির দিশায় গিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু মানুষের সাড়া শব্দ ছিল না। ভেবেছিল, কেউ নেই, আসর বসে নি।

তখনই হঠাৎ তানপুরার তারেই বোধহয় স্খলিত ঝংকার শোনা গিয়েছিল। খানিকক্ষণ চুপচাপ। আবার ঝংকার উঠেছিল। যেন কেউ আনমনে তারে টোকা দিচ্ছিল। পরমুহূর্তেই বেশ একটু চমকে-ওঠা ঝাঁঝালো গলা শোনা গিয়েছিল, কে ওখানে ? কে ?

গোকুল ভয়ে ভয়েই বলেছিল, আমি গোকুল।

বুঝতে পেরেছিল গলার স্বর হারু লাহার। তাঁর গলায় নেশার আমেজ ছিল।

বলেছিলেন, অ ! কানা গোক্‌লে ? আবার এসেছিস ?
কানা গোক্‌লে। ওই নামটাই আস্তে আস্তে লোকেরা রপ্ত করছিল। গোকুল বলেছিল, হ্যাঁ।
—হুম্‌। ওস্তাদেরা কেউ আসে নি। আসর আজকাল ভেঙে দিয়েছি।
—ও।
—হ্যাঁ, সব শালা আজকাল পেঁচো বড়ালের বাড়িতে গিয়ে জুটেছে।
হারু লাহার গলায় বেশ মত্ততা টের পাওয়া যাচ্ছিল। আবার বলেছিলেন, ওস্তাদ না ছাই, মেয়েমানুষের মুখ দেখলে ব্যাটারা সব ভুলে যায়, বুঝলি ?
—হুঁ।
—হ্যাঁ, মেয়েমানুষ নিয়ে দলাদলি, ওসব আমার ভালো লাগে না। আর মেয়ে-মানুষের জাতটা—কী বলব—।
বলতে পারেন নি হারু লাহা। একটা দীর্ঘশ্বাস শুনতে পেয়েছিল গোকুল। তার-পর তাকিয়ায় এলিয়ে পড়ার মৃদু শব্দ। গোকুল অস্বস্তিবোধ করছিল। কিন্তু হারু লাহার শেষদিকের গলার স্বরে মনটা কেমন বিমর্ষ হয়ে উঠেছিল। আস্তে আস্তে বলেছিল, তা হলে আমি যাচ্ছি।
—যাবি ?
হঠাৎ জিজ্ঞেস করেছিলেন হারু লাহা।—বাড়ি যাবি ? তোর চোখ নেই, আর দ্যাখ আমার চোখ থাকতেও আমি অন্ধ। বোস না, বোস, কী করবি বাড়ি গিয়ে ? তোর সঙ্গেই কথা বলি। আচ্ছা, তুই গান গাইতে পারিস তো !
দরদর করে ঘামছিল গোকুল। অস্ফুটে বলেছিল, সে কিছু নয়।
—যাই হোক ধর না একটা। আয়, এগিয়ে এসে বোস।
আমন্ত্রণ অমান্য করার সাহস ছিল না গোকুলের। আস্তে আস্তে এগিয়ে গদির সামনে গিয়ে, গদির নিচে গালিচায় বসেছিল। ভয় পাচ্ছিল। মনে মনে ভাবছিল, হে ভগবান, আমি কী গাইব।
হারু লাহা ততক্ষণে হারমোনিয়ামের রীডে আঙুল চালিয়েছিলেন। বলেছিলেন, ধর, ধরে ফ্যাল্‌।
গোকুল তবু সঙ্কুচিত দ্বিধায় বলেছিল, কী গাইব ?
—যা তোর ইচ্ছে।
—ওই, সেই, 'আব্‌ ম্যায় ক্যায় জাঁনু দিল ক্যায়া চাহে'টা গাইব ?
হারু লাহা যেন চমকে উঠে বলেছিলেন, এ তো নুরুল মিঞার গান, ঠুংরি। তুই জানলি কোত্থেকে ?
—এখানেই শুনেছিলাম।
—আচ্ছা ? সেই 'যব মেরে দিল তেরী হাথ্‌ পর' ? শিখে নিয়েছিস্‌ ?
—একটু একটু।
—গা গা গা দিকি নি।
গোকুল ভয়ে ভয়ে ধরেছিল। এবং এক সময়ে, ভয় পার হয়ে, গানের মধ্যে ডুবে গিয়েছিল। খেয়াল করে নি কখন থেকে হারমোনিয়ামের রীডে একটা টানা সুর

বেজে চলেছিল, আবার তবলায় তালও পড়ছিল। হারু লাহা একলাই সেই দ্বিবিধ কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। গান শেষ হতে হারু লাহা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে-ছিলেন। গোকুল ভয়ে লজ্জায় বসে বসে ঘামছিল। তারপর হঠাৎ স্পর্শ অনুভব করেছিল। হারু লাহা তার হাত ধরে টেনে গদিতে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, আয়, বসবি আয়।

গোকুলের আপত্তির কোনো অধিকারই ছিল না। পরমুহূর্তেই হারু লাহা প্রায় চীৎকার করে উঠেছিলেন, অ্যাঁ? আ রে ব্যাটা কানা গোকুলে, তুই যে সত্যি সত্যি সুরদাস হবি রে! প্রায় পাগল করে দিয়েছিস, অ্যাঁ? এখানে শুনে শুনে শিখেছিস?

—হ্যাঁ।

তাজ্জব। আর জন্মে যেন আমি কানা হই। নুরুলের ঠুংরি তুই এমনি করে গাইতে পারিস? বাঃ, ঠিক আছে! তুই রোজ আসবি, বুঝলি? আমাদের মালী গিয়ে তোকে রোজ নিয়ে আসবে।

সেই শুরু হয়েছিল। বন্ধুদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন হারু লাহা। তার পিছনে কারণ কোনো মেয়ে। যে মেয়ে, হারু লাহার ভাষায়, বিশ্বাসঘাতিনী। কিন্তু গোকুলকে নিয়ে দুজনের মজলিশও জমে উঠেছিল বেশ। মনে আছে, তবলা বাজানো শিখিয়েছিলেন তাঁকে হারু লাহা। তাল চিনতে, বুঝতে শিখিয়ে-ছিলেন। শব্দ করে করে স্বরলিপি বুঝিয়েছিলেন।

তবু সহজে হয় নি। সেই একদিন হারু লাহা গান ধরেছিলেন। গোকুল তবলা ধরেছিল। হঠাৎ এক সময়ে গান বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ঠাস করে একটা চড় পড়ে-ছিল গালে। গোকুল চমকাবার আগেই আর এক গালে আর একটা। তারপরেই হারু লাহার চাপা ক্রুদ্ধ স্বর, শুধু কানা নয়, ব্যাটা তালকানা তুমি! ছন্দ আর মাত্রা কি গিলিয়ে খাওয়াতে হবে? গোটা গানটাই মাটি!

বলেই মালী হরিকে ডেকে বলেছিলেন, ব্যাটাকে দিয়ে আয় বাড়িতে। আর নিয়ে আসিস না।

গোকুল চোখের জল বাড়ি ঢোকবার আগেই মুছেছিল। দিদিকে বলে নি। রাত্রে আবার লুকিয়ে কেঁদেছিল। যদিও বাইরের বারান্দায় বেড়া দিয়ে তখন তার থাকবার আলাদা জায়গা হয়েছিল। তবু শব্দ করার উপায় ছিল না। ঘর থেকে দিদির টের পাবার ভয় ছিল। কিন্তু মার খাবার জন্যে কাঁদে নি গোকুল। আর যেতে পাবে না, সেই দুঃখে কেঁদেছিল। কেন ভুল হয়, সেই ভেবে কেঁদেছিল।

কিন্তু পরদিনই আবার মালী হরি এসেছিল।—চল, ডেকেছেন।

আদেশ মাত্র গিয়েছিল। এবং তারপরেও মারের ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়েছিল কয়েকবার। কিন্তু এক অচ্ছেদ্য বন্ধনে দুজনে বাঁধা পড়েছিলেন। সে-বন্ধন তাঁদের বয়সের ফারাক দূর করেছিল। অন্ধত্বের বাধা সরিয়ে দিয়েছিল।

ইতিমধ্যে পাড়ায় এবং পাড়ার বাইরে, কলকাতার কোনো কোনো মহলে গোকুলের নাম ছড়িয়ে পড়ছিল। সব থেকে আশ্চর্য, নাম ছড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে যেটা সব থেকে বেড়ে উঠেছিল, সেটা টিটকারি, অপমান। কানা গোকুলেও নাকি গানের ওস্তাদ হয়ে উঠল।

তখনই আর একটা দিন, সে দিনটার কথাও ভোলা যায় না। গোকুল দাওয়ায় বসেছিল। জামাইবাবু হঠাৎ বাড়ি ঢুকে ঠক করে কী একটা বসিয়ে বলেছিলেন, তোমার জন্যেই নিয়ে এলাম হে গোকুল। মাল পুরনো, কিন্তু ওস্তাদ লোক দিয়ে দেখিয়ে এনেছি। একবার হাত দিয়ে দেখ।

গোকুল হাত দিয়ে দেখেছিল। হারমোনিয়াম। তার জন্যে হারমোনিয়াম, খুশির প্রাবল্যে কথা বলতে পারে নি গোকুল। যদিও বুঝতে পারছিল, নড়বড়ে ক্ষয়-পাওয়া রীড, এখানে-ওখানে কাঠের চটা উঠে গিয়েছে। তবু তার নিজের? বেশ খানিকক্ষণ পর, হারমোনিয়ামের গায়ে হাত রেখে বলেছিলেন, আমার জন্যে নিয়ে এলে?

অম্বিকা বলেছিলেন, হ্যাঁ। না এনে আর কী করি বল। লাহারা তো আর চাইলে একটা দেবে না। ওদিকে দেখছ তো, তোমার দিদি দুটো বিয়োলে আর দুটোই মেয়ে। এবার আমিও কানা হয়ে যাব। তাই দশজনে বললে, কিনে দিতে, যা হোক ঘুরে ঘুরে দশজনকে গান শুনিয়েও যদি কিছু রোজগারের ধান্দা হয়। বুঝলে না, নিজের পেটটা তো তোমার চলা চাই।

শুনতে শুনতে গোকুলের বুকে হঠাৎ নিশ্বাস আটকে গিয়েছিল। এই ইঙ্গিতটা পাড়ার দু-একজন আগেও দিয়েছিল। ভিক্ষে! হারমোনিয়াম গলায় নিয়ে ভিক্ষে করে বেড়াবার কথা বলেছিলেন জামাইবাবু।

কী বলবে, সহসা ভেবে পাচ্ছিল না গোকুল। কিন্তু তার আগেই দিদির তীব্র স্বর বেজে উঠেছিল, বটে! সেইজন্যেই বুঝি সাত সকালে বেরিয়ে গেছলে? শালার হারমোনিয়ামের দরদে! কিন্তু মনে রেখ, আমার হাত এখনও পচে নি, জরি পুঁতির কাজ এখনও করতে পারব। তবু গোকুল কোনোদিন ভিক্ষে করতে যাবে না।

জামাইবাবু হঠাৎ ক্ষেপে গিয়েছিলেন। চীৎকার করে উঠেছিলেন, বেশ, তবে আমি চললুম, কানা ভাইয়ের সঙ্গেই সংসার কর। দেখ, কত ধানে কত চাল।

বলে দুমদাম করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। গোকুল ডাক দিয়েছিল, দিদি!

দিদি তখনও ঝেঁঝে বলেছিলেন, তাই দেখব। তবু অমন পাপ হতে দেব না।

—কিন্তু দিদি—

গোকুল আবার ডেকেছিল। তখন দিদির রুদ্ধস্বর শোনা গিয়েছিল, তুই কিছু ভাবিস না গোকুল, তুই কিছু বলিস না।

—কিন্তু দিদি, এভাবে তো আর চলেও না। জামাইবাবু তো কিছু অন্যায় বলে নি। আমার তো একটা কিছু করতে হবে।

—করিস। আগে আমি মরি, তারপরে।

গোকুলচন্দ্র প্রায় অস্ফুটে ডেকে উঠলেন, দিদি! দিদি!

ডেকেই আবার মুখে হাতচাপা দিলেন। পাশের ঘরেই শুয়ে আছেন দিদি। আজ রাত্রে কি তাঁর চোখেই ঘুম আছে? তাঁরও প্রতিটি মুহূর্ত এমনি জেগেই কাটছে নিশ্চয়। এমনিতেই এ ঘরে সামান্য শব্দ হলে শুনতে পান। তাড়াতাড়ি

ছুটে আসেন। গোকুল যে বুড়ো হয়েছেন, সে কথাটাও ভুলে যান দিদি। ভাবেন, উনি বুঝি খাট থেকে পড়ে গেলেন। তাড়াতাড়ি মুখে হাত চাপা দিলেন। আর আস্তে আস্তে বাঁদিকে কাত হলেন। মনে মনে বললেন, ওই তো ঘরের ওই কোণেই তো সেই হারমোনিয়মটা আজও আছে। ওইখানেই, রেলিং-দেওয়া বড় তক্তপোশের ওপর গোকুলের সব সংগীতের যন্ত্র থরে থরে সাজানো রয়েছে। কালো মখমলের পর্দা দিয়ে ঢাকা দেওয়া আছে সব। তার মধ্যেই সেই হারমোনিয়মটাও আছে। পাশেই গোকুলের পিয়ানো রয়েছে। কিনেছিলেন তিনি। শিখেও ছিলেন। এখন ওটা ছোট ভাগ্নী সুগতারই পুরো দখলে প্রায়। তিনি জানেন পিয়ানোর ওপরে তাঁর একটি আবক্ষ প্লাস্টিক মূর্তি আছে। একজন সংগীতভক্ত ভাস্কর তৈরি করে দিয়েছেন। এই বাড়ির প্ল্যান যে এঞ্জিনীয়ার করেছিলেন, তিনি গোকুলচন্দ্রের থাকবার জন্যে এই ঘরটি বিশেষভাবে তৈরি করিয়েছিলেন। পাথরের টালি পাতা মস্ত বড় ঘর। প্রত্যেকটি টালিতে দিক-নির্ণয়ের জন্য বিশেষ খাঁজ কাটা আছে। বিভিন্ন দিকের টালিতে বিভিন্ন খাঁজ। গোকুল হাঁটতে গেলেই টের পান।

এই বাড়ি গাড়ি যশ, সবই চোখের আড়াল দিয়ে এসেছে। অনুভব করেন সবই। তবু জামাইবাবুর দেওয়া হারমোনিয়মটা যেন তাঁর অন্ধকারে চিরদিন একটি তর্জনী তুলে আছে। জীবনের একটা বিচিত্র রহস্যময় সংকেতের মতো। ওকে গলায় নিয়ে ঘোরেন নি কোনো দিন। ওকে বাজিয়েছেন হয়তো কম। কিন্তু ওর গায়ে হাত দিয়ে এখনও অন্যমনস্ক হয়ে যান। নমস্কার করেন। বলেন, না, তোমাকে ভুলতে পারি না। তোমার তাড়া খেয়েই তো একদিন হারু লাহার সংগে সকল দুয়ারে দুয়ারে ছুটেছিলাম।

হ্যাঁ, হারু লাহা অনেক জায়গায় নিয়ে যেতেন। যেখানে গান গাইলে পারিশ্রমিক পাওয়া যেত। হারু লাহার সংগে গিয়েই তো একদিন শ্রীজীব লাহিড়ীর চোখে পড়েছিলেন। ইন্দ্রাণী থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাতা, নাট্য-পরিচালক, অভিনেতা, তখনকার নবনাট্য আন্দোলনের নেতা শ্রীজীব লাহিড়ী সাদরে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁকে। চাকরি দিয়েছিলেন থিয়েটারে। সেই তো শুরু। তারপরে, রেকর্ড কোম্পানী, সবাক সিনেমা, রেডিও, সংগীতের সকল স্তরে তাঁকে সবাই হাত ধরে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁকে নিয়ে গর্ববোধ করছেন আজ দেশবাসী।

না, হলো না, এই হওয়া তো সব হলো না। সেই শুরু, তারপরে, তারপরেও যে সেই অন্ধকারের ইতিবৃত্তে আর একটা শুরু ছিল। ইন্দ্রাণী থিয়েটারের লীলা। লীলাবতী। ইন্দ্রাণীর প্রতি খোপে খোপে যাকে নিয়ে কূজন চলত। স্টেজ, ড্রেস, পেন্ট, অভিনয়, অফিস, সকল বিভাগের লোকেরাই যাকে নিয়ে গুঞ্জন করত। হাজার হাজার দর্শক যাকে দেখে উৎফুল্ল হতো, সেই লীলাবতীর আখ্যান বাদ যাবে কী করে?

কোনো দিন চোখে দেখেন নি গোকুল। কিন্তু গান শেখাতে হতো প্রায় রোজ। চোখে না দেখেও বুঝতে পারতেন, আগুন রয়েছে তাঁর সামনে। শিখার আঁচ লাগত অহরহ।

মনে আছে প্রথম দিন গান শিখতে এসেই লীলা বলে উঠেছিল, লাহিড়ীমশায়

শেষটায় আপনাকে ধরে নিয়ে এলেন ? আপনাকে টাকা দিতে হবে না বুঝি ?
গোকুল আস্তে আস্তে বলেছিলেন, সে কথা তো জিজ্ঞেস করি নি।
দুপুরে তখন কেউ ছিল না রিহার্সাল-ঘরে। লীলা সোফার ওপর শুয়ে পড়ে বলেছিল, আপনি তবলা বাজাতে পারেন ?
—পারি।
—আপনাকে প্রথম দেখে ভেবে ছিলাম শুধু বৈতালিকের গান গাইবার চাকরি হয়েছে আপনার।
গোকুল চুপ করে ছিলেন। লীলা হাই তুলে বলে উঠেছিল. ধ্যাৎ, আমার কিছু ভালো লাগছে না। আপনি হাবুল নন্দীকে চেনেন ?
হাবুল নন্দীই আগে গান শেখাতেন ইন্দ্রাণীতে। গোকুল জানতেন, হাবুলের ওপর নানান কারণে খুশী ছিলেন না শ্রীজীব লাহিড়ী। বলেছিলেন, নাম শুনেছি ওঁর।
লীলা বলেছিল, উনি খুব মজার গল্প বলতেন। বেশ রসের গল্প।
গোকুলের চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। অসহায়ভাবে বুঝতে পারছিলেন, তাঁকে লীলার পছন্দ হলো না। কিন্তু লীলার উপায়ও ছিল না। শ্রীজীব লাহিড়ীর ভয়, তা ছাড়া ইন্দ্রাণীতে তার প্রতিষ্ঠা।
পরমুহূর্তেই লীলা আবার বলে উঠেছিল, আচ্ছা, আমি কোথায় বসে আছি বলুন তো ?
অনেক দুঃখেও গোকুলের হাসি পেয়েছিল। লীলার বয়স বেশী নয় জানতেন। কিন্তু এত ছেলেমানুষ, বুঝতে পারেন নি। বলেছিলেন, বোধহয় আমার বাঁদিকে।
সেদিন আর বেশী বিরক্ত করে নি লীলা। নতুন গানের তালিম নিতে বসেছিল। এবং আস্তে আস্তে টের পেয়েছিলেন গোকুল, সঙ্গীতের প্রতি একটা সহজাত নিষ্ঠা আর গ্রহণ করবার ক্ষমতা আছে লীলার। তার নাচে সংগত করার সময়ও তা বুঝতে পারতেন। কিন্তু অন্য দিকে, দাবানলের মতো একটা বিধ্বংসী ভয়ঙ্করতা তার ছিল। যে ভয়ঙ্করতার মধ্যে নিজেরই অগোচরে গোকুল পায়ে পায়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কখন গিয়েছিলেন, টের পান নি।
লীলার একটা সহজ সাবলীলতা ছিল। একদিন বলেছিল, আচ্ছা, আপনি তো ছেলে বয়স থেকে অন্ধ। মেয়েমানুষ যে কী তা তো কোনোদিনই জানলেন না ?
গোকুল যেন খানিকটা অবাক হয়েই বলেছিলেন, কী জানব ?
—কী আবার। এই পুরুষেরা হা-ঘরের মতো মেয়েদের পেছনে ছোটে যে জন্যে ?
পুরুষেরা যে জন্যে মেয়েদের পিছনে ছোটে। যেন বুঝতে পারেন নি গোকুল অথচ তাঁর চোখের, প্রাণের অন্ধকার মধ্যে যেন একটা বিশাল সরীসৃপ চিরনিদ্রা থেকে সেই প্রথম সহসা পাক দিয়ে আকুঞ্চিত হয়ে উঠেছিল। সেই প্রথম, তবু নারী-পুরুষের সেই সম্পর্কটা যেন ঠিক বুঝতে পারেন নি। অথচ লীলার কথায় রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠেছিলেন। জবাব দিতে পারছিলেন না।
লীলা খিলখিল করে হেসে উঠেছিল। গোকুলের মনে হয়েছিল, জানালা দরজা দেওয়াল সব ভেঙে-চুরে পড়ছে। পরমুহূর্তেই দুরন্ত আগুনের লেলিহান শিখা

তার বুক স্পর্শ করেছিল। লীলা তাঁর বুকে হাত দিয়ে জামা টেনে বলেছিল, কী হলো বলতে পারলেন না ?
গোকুলের মনে হয়েছিল, লীলার স্পর্শিত বুকের অংশটা পুড়ে যাচ্ছে। আগুন তাঁর সারা গায়ে ছড়িয়ে পড়ছে। আর সেই আগুনে বাতাস দিচ্ছিল যেন লীলারই প্রসাধনের, চুলের তীব্র সুগন্ধ। যে উগ্র গন্ধ ওর চরিত্রের মতোই তীব্র। কিন্তু কিছু বলতে পারছিলেন না। কী বলতে হবে জানতেন না। কেবল তাঁর ঠোঁট নড়ছিল।
—কী ? জানেন না, তাই বলতে পারছেন না ?
বলে আবার খিলখিল করে হেসে, গোকুলেরই হাঁটুর ওপর লুটিয়ে পড়েছিল।
নিশ্বাসের প্রান্তে এসে রাগিণীর সুর ছেড়ে দেবার মতো গলায় বলেছিলেন গোকুল, আমি জানি না। মাকে দিদিকে জানি, অন্য মেয়েমানুষকে জানি না।
—কিন্তু জানতে ইচ্ছে করে তো ?
লীলার হাতের স্পর্শ তখন গোকুলের হাঁটুর ওপরে। এবং তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি মিথ্যে কথা বলছেন। কারণ, লীলার ভাষায়, মেয়েমানুষ কী, তিনি বুঝতে পারছিলেন। লীলার সংস্পর্শে আসার মুহূর্ত থেকেই বোধহয় জানতে পারছিলেন। কিন্তু বলেছিলেন, কী জানতে হবে জানি না।
—জানবেন কী করে ছাই, আপনি যে অন্ধ।
বলেই সহসা গোকুলের একটা হাত টেনে নিজের মুখে, সারা গায়ে বুলিয়ে দিয়েছিল হাসতে হাসতে। বলেছিল, বুঝেছেন ? বলুন তো এবার, আমি কী রকম দেখতে ?
গোকুলের দুঃসহ অন্ধকার যেন তীব্র যন্ত্রণাতেই কেঁপে উঠেছিল। আর সেই যন্ত্রণার মধ্যে একটা অভূতপূর্ব শিহরণ। প্রায় চুপিচুপি বলেছিলেন, তুমি সুন্দর।
—বুঝতে পারলেন ?
—অন্ধরাও বুঝতে পারে লীলা।
লীলা হঠাৎ প্রসঙ্গান্তরে চলে গিয়েছিল, আপনার কথাগুলো এরকম শোনায় কেন ?
—কী রকম ?
—যেন সব সময় কাঁদছেন।
—তা জানি না।
—আপনি যখন গান করেন, তখন তো আমার কান্নাই পেয়ে যায়।
—তাই বুঝি ?
—হ্যাঁ। আর আপনি যখন অন্ধমুনি সেজে ছেলের শোকে কেঁদে কেঁদে পার্ট বলেন, আমার তখন ভীষণ কান্না পেয়ে যায়। আমি তো আপনার মতো কেঁদে পার্ট বলতে পারি নে ?
গোকুল হেসেছিলেন। শ্রীজীব লাহিড়ী তাঁকে দিয়ে অন্ধমুনির ভূমিকা করাতেন।
লীলা আবার প্রসঙ্গান্তরে গিয়েছিল, আপনিও কিন্তু খুব সুন্দর।
—তাই নাকি ?
—হ্যাঁ, আপনার ঠিক উপযুক্ত পুরুষের মতো চেহারা। চোখ দুটো যদি থাকত—।

গোকুলের আবার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এসেছিল। লীলা বলেছিল, যদি থাকত আপনার চোখ দুটো তা হলে সাংঘাতিক হতো, সত্যি। কী বড় বড় ফাঁদ চোখের! মেয়েদের দিকে একবার তাকালেই তাদের হয়ে যেত।

—কী হতো?

—মরণ!

—তা হলে না থেকে ভালোই হয়েছে বল, হেসে হেসে ধীরে ধীরে বলেছিলেন গোকুল।

তারপর থেকে গোকুলকে নিরালায় একলা পেলে, আর সেটাই সব থেকে বেশী পাওয়া যেত, লীলা বারে বারেই জিজ্ঞেস করত, 'মেয়েমানুষ বুঝেছেন-টুঝেছেন একটু?' আর অবলীলাক্রমে গায়ের সামনে এসে দাঁড়াত। গোকুল হাসতেন। অন্ধকারের সেই যন্ত্রণাটা ছিল নতুন, অভিনব, অপরিচিত। সে কবে একদিন তাঁর অন্ধকারেই লুপ্ত হয়ে, মাখামাখি করে, সহনীয় হয়ে উঠবে, জানতেন না। হাসতেন, কিন্তু অদৃশ্য আগুনে দগ্ধ হতেন। বলতেন, 'না।'

একদিন সন্ধ্যায় প্রচণ্ড ঝড়ে হঠাৎ নাটক বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কুশীলবেরা থিয়েটারে সবাই পৌঁছুতে পারে নি। লীলার তাতে আনন্দই হয়েছিল। গোকুল স্টেজের শেষ প্রান্তের ঘরে, পিছনের উঠোনের দিকে জানালা খুলে দিয়ে ঝড়-জলের শব্দ শুনছিলেন চুপচাপ। এবং নিজের কাছে অস্বীকার করার উপায় ছিল না, তাঁর অন্ধকারের মাঝে লীলার অনুভূতি প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।

ঠিক সেই মুহূর্তেই লীলা পিছন থেকে স্পর্শ করে বলেছিল, কী, বোঝবার চেষ্টা করছেন নাকি?

—না। বৃষ্টির শব্দ শুনছি।

—এই তো ঠিক দিন।

—কিসের?

—বোঝবার।

গোকুল হঠাৎ বলেছিলেন, বুঝে কী লাভ লীলা?

—না বুঝলে তা জানবেন কী করে?

বলে সে হঠাৎ গোকুলের হাত টেনে ধরে বলেছিল, তো বেশ, বুঝবেন, চলুন আমার ঘরে।

অর্থাৎ ইন্দ্রাণীতে লীলার আলাদা ঘরে। গোকুল বলেছিলেন, না না, লাহিড়ীমশায় শুনলে কী ভাববেন!

—ও বাবা, সে জ্ঞান তো টনটনে দেখছি। তাতে কি! আপনাদের লাহিড়ীমশায় যে মাল খেয়ে রুক্মিণীঠাকরুনকে নিয়ে পড়ে থাকেন?

গোকুল প্রতিবাদ করে উঠেছিলেন, ছি! বাঙলাদেশের অতবড় লোক সম্পর্কে অমন করে বলতে নেই।

—হু-উ-রে বাবা! এদিক নেই ওদিক আছে। পদ্মলোচনের মতো কথা দেখছি। ডেকেছি, তাই না কত!

লীলার চলে যাওয়ার পায়ের শব্দ শুনেছিলেন গোকুল। তাঁর বুকের ভিতর ব্যথায়

ও অপমানে দপ্‌দপ্‌ করছিল। তবু তাঁর সকল অন্ধকার লুটোপুটি করছিল বাইরের ঝড়ের মতোই।

কিন্তু পরদিনই লীলা আবার সেই হাসি এবং সাবলীলতা নিয়ে এগিয়ে এসেছিল। আর আস্তে আস্তে ইন্দ্রাণীতে একটা আলোচনার গুঞ্জন উঠছিল। গুঞ্জনের মধ্যে হাসি আর বিদ্রূপই ছিল আসলে। লীলা আর কানা গোকুল! শুনেছ, কানা গোকুলেও ঘোল খাচ্ছে।

একদিন অন্ধকার উইংস-এর পাশ থেকে গোকুল স্পষ্ট শুনতে পেয়েছিলেন দুজনের কথা। লীলা আর হেরম্ব। হেরম্ব ইন্দ্রাণীর যুবক অভিনেতা। ওরা বোধহয় গোকুলকে দেখতে পায় নি।

হেরম্ব বলেছিল, কানা গোকুলকে নিয়ে নাকি খুব মেতেছ?

লীলা বলেছিল, তোমরা তো সবই মাতামাতি দেখ। তবে হ্যাঁ, ও তোমাদের মতো হেজে-যাওয়া পুরুষ নয়।

হেরম্ব—বটে? জানা গেল কী করে?

লীলা—গাছ হাজা না কাঁচা, দেখলেই বোঝা যায়।

তারপরেই তো একদিন সেই গোকুলের বুকের কাছে দাঁড়িয়ে লীলা আমন্ত্রণ জানিয়েছিল, আমার বাড়িতে আপনাকে একদিন যেতে হবে। আমার বন্ধুরা আপনার গান শুনতে চেয়েছে'

—তোমার বন্ধু?

—কেন আমার বন্ধু থাকতে নেই? কলকাতার অনেক বড় বড় লোক আমার বন্ধু, জানেন?

—তাই বুঝি? কিন্তু সে বড় বড় লোকেদের কি আমার গান শুনতে ভালো লাগবে?

লীলা মিঠে রসানের ঠাট্টা করে বলেছিল, ও বাবা, আপনার খুব গুমোর দেখছি। বলে, আপনার গান শোনবার জন্যে সব পাগল! বিশ্বাসই করতে চায় না যে, আপনাকে ডাকলে আমার বাড়িতে যাবেন।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ। সবাই তো বোঝে, আপনার জন্যেই আজকাল আমার এত নাম। আমার বন্ধুরা চায়, আপনি আমার বাড়িতে বসে গাইবেন, আমিও গাইব, নাচব আপনার গানের সঙ্গে। যাবেন তো?

গোকুল যেন দিশেহারা হয়ে পড়েছিলেন। কী বলবেন, বুঝতে পারছিলেন না। লীলা শরীরের কাছে আরও ঘন হয়ে এসেছিল। গোকুলের নিশ্বাস আবার বন্ধ হয়ে আসছিল। লীলা গায়ে নিশ্বাস ফেলে বলেছিল, আমাকে আপনি ভালবাসেন না?

বলতে বলতেই, লীলার ঠোঁট স্পর্শ করেছিল তাঁর চিবুকে। ফিসফিস করে বলেছিল, যাবে না?

গোকুলের মনে হয়েছিল, তাঁর অন্ধকারের মধ্যে ভীষণ একটা ওলটপালট হয়ে গেল। তিনি যেন দেখছিলেন, দুটো কালো পাখা ঝাপট খেয়ে কাঁপছে। কোনো রকমে

অস্ফুটে উচ্চারণ করেছিলেন, যাব, যাব

আর পরমুহূর্তেই, আবার, আবার লীলার ঠোঁট তাঁর নীচের ঠোঁট স্পর্শ করেছিল। শুনেছিলেন, তবে কাল, কাল তো থিয়েটার বন্ধ? কাল আমার গাড়ি যাবে বিকেলে তোমাকে আনতে, কেমন? যাচ্ছি।

লীলা চলে গিয়েছিল। গোকুল যেন থরথর করে কাঁপছিলেন। একটা তীব্র সুখ, একটি ভয়ঙ্কর উচ্চকিত যন্ত্রণার আঘাতে নুয়ে পড়ছিল। চোখে জল আসছিল তাঁর। মনে মনে বলছিলেন, অন্ধকার, হে অন্ধকার, কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

লীলার বাড়িতে, ওর বিলাসকক্ষেই সেদিন অন্ধকারের যাত্রা নির্দেশ করেছিল। গোকুল যাতায়াত আরম্ভ করেছিলেন। সঙ্গে থাকত স্যাকরাবাড়িরই একটি বেকার যুবক। জামাইবাবু নিজেই যেতে চাইতেন, গোকুলকে সব জায়গায় নিয়ে যাবার জন্যে। বলতেন, 'এখন তো তোমার কল্যেণেই আমার কল্যেণ হে। আমার উচিত তোমার সঙ্গে সঙ্গে থাকা।' কিন্তু গোকুল তা চাইতেন না। স্যাকরাবাড়ির ছেলেটিই সকল কিছুর সাক্ষী ছিল।

দেখতে দেখতে লীলার বাড়ি যাতায়াত নেশায় দাঁড়িয়েছিল। পূর্ণিমার কোটালের মতো, টইটুম্বুর মধুপূর্ণ মধুচক্র জমে উঠেছিল। ব্যবসায়ী, শিক্ষাবিদ, বড় চাকুরে, ব্যারিস্টার, সব রকমের আসর ছিল লীলার বাড়িতে। সেখানে সম্মান এবং খাতিরের উচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত গোকুলচন্দ্র। সবাই যেন তাঁকেই তোষামোদ করত, তাঁকেই খুশী করার চেষ্টা করত। আর তাঁর বুকের কাছ ঘেঁষে বসে থাকত লীলা। তিনি সুর ধরলেই সুর। তিনি সুর ধরলেই নাচের ঝংকার বেজে উঠত লীলার পায়ে।

সেই রাত্রি-বাসরের শত শত রজতমুদ্রা পারিশ্রমিক হিসেবে লীলা তাঁকেও দিতে চাইত। গোকুল শিউরে উঠে হাত ফিরিয়ে নিতেন। বলতেন, অমন কথা বলো না। আমি আসি তোমার কাছে। তুমি যে-দক্ষিণা দেবে, তাই আমার পাওনা। সে তো টাকা নয় লীলা।

লীলার স্পর্শ ঘন হয়ে উঠত। উৎসব শেষে কতদিন নিজের হাতে গোকুলকে খাইয়েও দিত।

তারপর, তারপরেই তো এসেছিল বীভৎস দিনগুলো। লীলার বাড়িতে যাতায়াত করছিলেন বটে। দুর্নিবার আকর্ষণ তাঁকে উন্মত্ত করেছিল ঠিকই। কিন্তু সেই পরিবেশ তাঁর ভিতর থেকে মেনে নিতে পারছিল না। যে-অন্ধকার লীলার বাড়ি যাত্রা নির্দেশ করেছিল, সেই অন্ধকার থেকেই একটি প্রতিবাদ পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে তাঁর গান উচ্ছ্বসিত গলায় ভর করছিল। মাঝে মাঝে নীরব হয়ে যেতেন। গান গাইতে পারতেন না। হাসতে পারতেন না।

লীলা জিজ্ঞেস করত, কি হলো?

গোকুল সঙ্কুচিত হয়ে বলতেন, তুমি বড্ড মদ খাচ্ছ লীলা। গান বেসুরো হয়ে যাচ্ছে তোমার।

বুঝতে পারতেন, ঘরের সবাই চুপ হয়ে গিয়েছে। বুঝতে পারতেন, পরমুহূর্তেই একটা চাপা হাসি ছড়িয়ে পড়ছে ঘরে। লীলা বলত, আচ্ছা আচ্ছা, আর খাব না,

তুমি ধর।
কিন্তু টের পেতেন, লীলা সঙ্গে সঙ্গেই আবার গেলাসে চুমুক দিচ্ছে। আর ওর ভক্তরা উল্লসিত হয়ে উঠছে। কেউ কেউ চাপা গলায় বলেই উঠত, দূর! এত শাসন ভালো লাগে না।
বুঝতে পারতেন, লীলা উঠে যেত তাদের কাছে। তাদের হয়তো মুখের সামনে গেলাস ধরে সান্ত্বনা দিত সে। তারপর একদিন চীৎকার করে গোকুলকে বলেছিল, ওসব গেরস্ত-পীরিত আমার ভালো লাগে না বাপু। দশ জনের সঙ্গে বসে, তোমার মুখ চেয়ে থাকলে আমার চলবে না।
কিন্তু গোকুল সহ্য করতে পারছিলেন না। বুঝতে পারছিলেন, সর্বনাশটা কোথায় হয়েছে। লীলাকে ছেড়ে থাকতে পারছিলেন না। অথচ লীলার সঙ্গে কোনো দিক দিয়ে খাপ খাওয়াতে পারছিলেন না। ওই পরিবেশে মিশতে পারছিলেন না লীলার সঙ্গে। ওকে সরিয়ে নিয়ে যাবার চিন্তা তো বাতুলতা ছিল। সুতরাং, যে সূত্র ধরে গিয়েছিলেন, সেই গানের উৎসাহ নিবে গিয়েছিল। একদিন আবিষ্কার করেছিলেন, ঘরে তিনি একলা। অন্য ঘর থেকে হাসিহল্লা ভেসে আসছিল।
কে যেন চীৎকার করে বলেছিল, কানাটাকে ভাগিয়ে দিলেই তো হয়! আমরা কেন আলাদা ঘরে বসব?
তবে সন্ধ্যা হলে, তাঁর অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা স্পর্শহীন শক্তি তাঁকে ঠেলে নিয়ে যেত সেখানে। থমকে গেলে, তাঁর পায়ে সে আঘাত করে ছুটিয়ে নিয়ে যেত। আর, তাঁর সামনেই লীলা অপরের আলিঙ্গনে রঙ্গিণী হয়ে উঠত। টের পেতেন তিনি। শুনতেন, লীলার আপত্তি শুনে পুরুষের মত্ত স্বর গুঙিয়ে উঠছে, আরে বাপু, আর যাই হোক, কানা তো। দেখতে তো পাচ্ছে না।
হয়তো স্খলিত চুম্বনের মধ্যে লীলার গলা শোনা যেত, কিন্তু টের তো পায়। বলতে বলতে দুজনেই হাসিতে ফেটে পড়ত।
গোকুল শিলীভূত স্তব্ধতায়, রুদ্ধশ্বাস হয়ে বসে থাকতেন।
একেবারে শেষের দিনটি ভয়ঙ্কর। হঠাৎ লীলা আর ওর মাতাল বন্ধুরা তাঁকে জোর করে মদ খাওয়াতে চেয়েছিল। লীলা বলেছিল, একটু অভ্যাস কর। নইলে তোমার দ্বারা কিছু হবে না।
কয়েকজন জোর করে গোকুলের মুখে বোতল ঢুকিয়ে দিয়েছিল। চিত করে শুইয়ে বুকের ওপর চেপে বসেছিল। গোকুল চিৎকার করতে পারেন নি। একটা তীব্র গর্জন আর কান্না তাঁর প্রাণের মধ্যে ফুলে উঠেছিল। জোর করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। কিন্তু ওরা হাসতে হাসতে সারা গায়ে মদ ঢেলে দিয়েছিল। কে একজন ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঠেলে দিয়েছিল উঠোনে। আর উল্লসিত হাততালি পড়েছিল।

চমকে উঠলেন গোকুলচন্দ্র। মনে হলো, বাড়ির নিচে কিসের শব্দ হলো। তাঁর ঘরের মধ্যে যেন অস্পষ্ট পায়ের শব্দ ভেসে বেড়াচ্ছে। তিনি চোখ বুজে আছেন। সর্বাঙ্গ শক্ত আড়ষ্ট। নিশ্বাস আটকে রয়েছে গলার কাছে। রাত পোহালো নাকি! নিম গাছটায় শালিক-চড়ুইদের জটলা শোনা যাচ্ছে যেন। কিন্তু, কিন্তু তাঁর

অন্ধকারের সেই আবর্ত যে তাঁকে এখনও পাক দিয়ে ফিরছে। সে যে আজ হিসাব-নিকাশ করতে এসেছে।

মনে আছে, লীলার বাড়ি থেকে ফিরে এসেছিলেন, সর্বাঙ্গ মদাসিক্ত আলুথালু বেশে। কিন্তু সেই শেষ দিন নয়। তারপরেই বম্বের চিত্রজগতের আমন্ত্রণ এসেছিল। চলে গিয়েছিলেন।

কেবল শ্রীজীব লাহিড়ী বলেছিলেন, চলেই যাবে ?

—হ্যাঁ।

লাহিড়ীমশায় বলেছিলেন, লোকে চার জোড়া চোখ থাকলেও যা করতে পারে না, তোমার একটা চোখও না থেকে, তুমি তাই করেছ। তোমাকে আমার কিছু বোঝাবার নেই। একদিন তুমি বুঝবে, এইটুকু ভরসা। যাও।

চলে গিয়েছিলেন বম্বে। কিন্তু স্থির হতে পারছিলেন না। যন্ত্রণা দ্বিগুণ হয়ে বেজেছিল। তখন লীলার বন্ধু-সহচরদের মতো হতে চেষ্টা করেছিলেন। মদ আর নির্বিচার ভোগ। তবু শান্তি ফিরে আসছিল না। বরং তাঁর সেই দুঃসহ অন্ধকার জগৎ কন্টকাকীর্ণ দেওয়ালে ঘিরে আরও ছোট হয়ে, চেপে ধরেছিল। দুরন্ত আগুন ছিল সেই ঘেরাওয়ে।

থাকতে পারেন নি, আবার ফিরে এসেছিলেন কলকাতায়। এসে শুনেছিলেন, ইন্দ্রাণীর দল নিয়ে লাহিড়ীমশায় দেশে দেশে নাটক করতে বেরিয়ে পড়েছেন। লীলাও সঙ্গে গিয়েছিল। শুনে একটা স্তব্ধতা বোধ করছিলেন গোকুল। আর সেই স্তব্ধতার মধ্যে তিনি উৎকর্ণ হয়ে উঠেছিলেন। মনে হতো, তাঁর অন্ধকারের মধ্যে কী এক সুর যেন ধ্বনিত হচ্ছে। সেই অস্পষ্ট সুর আর কথা শোনবার জন্যে তিনি দিনের পর দিন চুপ করে বসে থাকতেন।

কিছুকাল পরে খবর পেয়েছিলেন, ইন্দ্রাণীর দল ফিরে এসেছে। লীলাও ফিরে এসেছে। কিন্তু আসাম থেকে ভয়াবহ কালাজ্বর নিয়ে ফিরে এসেছে। শুনেছিলেন, কিন্তু গোকুল তাঁর উৎকর্ণ স্তব্ধ মগ্নতা থেকে চকিত হলেন না। হতে পারলেন না।

গোকুল ফিরে এসেছেন শুনে, শ্রীজীব লাহিড়ী তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এসেছিলেন। এসে তিনি বিশদ খবর দিয়েছিলেন, লীলার জীবনটা একেবারেই নষ্ট হয়ে গেল। কালাজ্বর যে কী ভীষণ! বেচারীকে একেবারে কালো কঙ্কাল করে ছেড়ে দিয়েছে। গায়ের চামড়া গেছে কুঁচকে। পেত্নীকেও অত খারাপ দেখায় না। হ্যাঁ, মুখটা পর্যন্ত বেঁকে গেছে।

গোকুল আর চুপ করে থাকতে পারেন নি। উৎকণ্ঠিত ব্যথায় বলে উঠেছিলেন, এখন কি উপায় লাহিড়ীমশায় ?

—উপায় আর কী। শুনেছি ডাক্তাররা বাঁচিয়ে রাখতে পারবে। কিন্তু সহজে আর আগের চেহারা ফিরিয়ে দিতে পারবে না।

বলে একটা নিশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, চিরকাল কিছুই থাকে না। তোমার কথা প্রায়ই বলত মেয়েটি। আর হ্যাঁ, লীলা তোমাকে বলতে বলেছিল পার তো তুমি তাকে একবারটি দেখতে যেও।

—আমি যাব ?
—কেন যাবে না? অসুবিধে থাকলে, আমার সঙ্গেই যেতে পার এখন। যাবে ?
—চলুন।
গিয়েছিলেন গোকুল। কিন্তু সে বাড়ি নয়। অন্য বাড়ি, কম ভাড়া ছোট ঘুপসি ঘর।
শ্রীজীব লাহিড়ী জিজ্ঞেস করেছিলেন, কেমন আছিস রে লীলা ?
বহুদূর থেকে যেন সানুনাসিক স্তিমিত গলা ভেসে এসেছিল, ভালো নয়।
—গোকুল এসেছে।
বলতে বলতেই শ্রীজীবের গলায় বিস্মিত উৎকণ্ঠা ফুটে উঠেছিল, ও কি লীলা, অমন ছটফটিয়ে উঠতে যাচ্ছিস কেন ?
লীলার রুগ্ন উত্তেজিত রুদ্ধ গলা শোনা গিয়েছিল, ওকে একটু ডেকে দিন লাহিড়ী-মশায়, একটু কাছে ডেকে দিন। গোকুল বিস্মিত হতে গিয়ে, সহসা ব্যথায় আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। কন্ঠস্বর লক্ষ্য করে অবলীলাক্রমে তিনি লীলার কাছে এগিয়ে গিয়েছিলেন। যেন তিনি চক্ষুষ্মান মানুষ। তৎক্ষণাৎ লীলার কংকালের মতো হাত তাঁর হাত আঁকড়ে ধরেছিল। অস্ফুট রুদ্ধ স্বরে ডেকে উঠেছিল, গোকুলবাবু এসেছ ?
গোকুল কথা বলতে গিয়ে দেখেছিলেন, গলায় তাঁর স্বর নেই। লীলার হাত ধরে, আস্তে আস্তে তিনি ওর পাশে বসেছিলেন। কিন্তু লীলা শান্ত হতে পারছিল না। সে গোকুলের হাত নিয়ে, তার নিজের মুখে গায়ে ছুঁইয়ে ছুঁইয়ে বলে উঠেছিল, দেখ গোকুলবাবু আমাকে দেখ, আমাকে দেখ।
গোকুল তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে লীলার মুখ চাপা দিয়ে ফিসফিস করে উচ্চারণ করেছিলেন, দেখেছি, তোমাকে দেখেছি। গোকুলের সর্বব্যাপী অন্ধকার লবণাক্ত জলে টলমল করে উঠেছিল।
লীলার অশ্রুরুদ্ধ গলা শোনা গিয়েছিল, দেখেছ, আমাকে দেখেছ ?
গোকুল তেমনি গলায় বলেছিলেন, সব দেখেছি লীলা, সব।

—মামা! মামা!
আস্তে আস্তে ডাক শুনে, চমকে উঠলেন গোকুলচন্দ্র।—কে কে ?
—আমি সুগতা। ওঠ সময় হয়ে গেছে। ওর গলায় খুশি চাপা থাকছে না।
চমকে উঠে গোকুল দুচোখে হাত দিলেন। তাঁর চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। এদিকে রাত্রি প্রভাত। সুগতা তাঁকে ডাকছে। সময় হয়ে গিয়েছে।
উঠে বসতে গিয়েও চোখের জল গোপন করতে পারলেন না। সুগতার অবাক গলা শোনা গেল, একি মামা, তোমার চোখে জল কেন ?
জল কেন ? গোকুল হেসে উঠলেন। সহসা যেন তাঁর সব আবার মনে পড়ল, আর আনন্দে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠলেন। বললেন, জল কেন ? জল আবার কেনরে ? খুশিতে, প্রাণের খুশিতে।
সুগতা হেসে উঠে বলল, সত্যি, মামা, আমার কিন্তু আজ কাঁদতেও ইচ্ছে করছে

জান ?

বলতে বলতেই ওর হাতের গরম জলে ভেজানো তোয়ালে গোকুলের মুখের ওপর এসে পড়ল। ঘষে ঘষে মুখ মুছিয়ে দিতে লাগল।

গোকুল বললেন, করবেই তো। আনন্দেই তো চোখে জল আসে মা।

সুগতা তাড়াতাড়ি গরম জলের গেলাস গোকুলের মুখে ধরে বলল, কিন্তু আর সময় নেই। তাড়াতাড়ি মুখ ধোও। মা এসে পড়ল বলে চা নিয়ে। ওদিকে শুভেনবাবু এসে পড়েছেন। নিচে বসে আছেন।

গোকুল জল কুলকুচা করে, সুগতার সামনে ধরা পাত্রে ফেললেন। বলে উঠলেন, শুভেন এসেছে ? ডাক, শুভেনকে ডাক।

শুভেনের গলার স্বর বেজে উঠল দরজার কাছে, আমি এসেছি।

গোকুল হাত বাড়িয়ে বলে উঠলেন, এসো, এসো বাবা, আমার কাছে এসো।

শুভেন খাটে এসে বসল। গোকুল তার কাঁধে হাত দিয়ে টেনে নিলেন।

দিদির গলা শোনা গেল, চা এনেছি গোকুল।

গোকুল যেন ছেলেমানুষের মতো উচ্ছ্বাসে বলে উঠলেন, রাখ গো দিদি, চা রাখ এখন। একটু বস আমার কাছে। সুগতা তুই কোথায় ?

—এই যে।

—আয়, কাছে আয়, বোস।

বলতে বলতে তাঁর গলার স্বর রুদ্ধ হয়ে এলো। কিন্তু হাসি লেগে ছিল মুখে।

শুভেন বলে উঠল, সময় নেই আর মামাবাবু।

গোকুল উচ্চারণ করলেন, সময় নেই, জানি বাবা, সত্যি সময় নেই।

বলে শুভেনকে আরও কাছে আকর্ষণ করে প্রায় চুপিচুপি গলায় বলে উঠলেন, শুভেন আর সময় নেই। রাগ করো না যেন, কিছু মনে করো না, এই সামান্য চোখের পর্দা সরিয়ে কিছু দেখবার আর দিন নেই।

বলতে বলতে অনুভব করলেন, ঘরের সবাই বিস্মিত থেকে যেন পাথর হয়ে গেল।

সুগতা অস্ফুটে আর্তনাদ করে উঠল, মামা!

—হ্যাঁ মা।

দিদি ডেকে উঠলেন, গোকুল!

—দিদি!

শুভেন ডেকে উঠল, মামাবাবু!

—বাবা!

শুভেনের গালে হাত দিয়ে বলে উঠলেন গোকুল, এই চোখের দরজা খুলে আমি আর কী দেখব বল। আমার যেটুকু, তা যে আমার সব দেখা হয়েছে। আমার অন্ধকারে যে সব দেখেছি।

গোকুলের চোখে জল এসে পড়ল। কিন্তু সংকুচিত হলেন না। মুছলেন না। ডাক দিয়ে বললেন, দিদি, তোমাকে আজ ছাড়ব না। কাছে এসো। আজ, দিদি আজ তুমি সেই গানটা গাও।—আমি অন্ধকারেই থাকি, তুমি আঁধার রাতেই এসো।

দিদির রুদ্ধ গলা শোনা গেল, গোকুল।
—গাও দিদি, লক্ষ্মীটি গাও।
বৃদ্ধা দিদি তাঁর ভাঙা ভাঙা সরু-গলায় গান ধরলে,

আমি অন্ধকারেই থাকি
তুমি আঁধার রাতেই এসো।—

গোকুল অনুভব করলেন, শুভেন তাঁকে শিশুর মতো জড়িয়ে ধরেছে। সে কানের কাছে মুখ এনে বলল, মামাবাবু, আপনি যে ঘাস ফুল দেখতে চেয়েছিলেন? গোকুল আবার চুপিচুপি গলায় বললেন, দেখছি, দেখতে পাচ্ছি শুভেন। সাদা-লাল-নীল ঘাসফুল, তাতে শিশির পড়েছে, রোদে চিকচিক করছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, পৃথিবীতে কত ঘাসফুল। আমি তাদের গন্ধ পাচ্ছি।
দিদির গলা আরও মুক্ত শোনাচ্ছিল,

অন্ধকারেই বসত করি,
তুমি গোপনে এসে বসো॥



শুভ্রা সন্ধ্যা সংবাদ

শুভ্রার কথা

আর কতদিন এভাবে চালাতে পারবো, বুঝতে পারছি না। এত বড় সংসারটা বাবার একলার ঘাড়ের ওপর। চটকলের কেরানী, সামান্য বেতন। আমরা ছ'টি ভাই বোন। আমিই সকলের থেকে বড়। আমার পরে এক বোন। তারপরে পর পর দুই ভাই। সকলের ছোট দুটিও বোন।

আমি কোনোরকমে বি. এ. পাস করেছি। অনার্স ছিল—ইংরেজিতে। রাখতে পারি নি। পাস কোর্সেই পাস করেছি। কোনো প্রফেসারের কাছে প্রাইভেট পড়ার সুযোগ পাই নি। কলেজের মাইনে দেওয়াই কঠিন ছিল। প্রাইভেট পড়ার কথা ভাবতেই পারতাম না। আমার সহপাঠী সহপাঠিনীদের নোট দেখে, একলা পড়ে যতটা সম্ভব নিজেকে তৈরি করেছিলাম। স্বীকার করতেই হবে, আমার এতটা গুণ ছিল না, বন্ধুদের নোট দেখে, একলা পড়ে অনার্স পাস করি। অথচ অনেকেরই আশা ছিল, আমি নিশ্চয়ই অনার্স রাখতে পারবো।

আশার আর এক নাম বোধহয় মরীচিকা। জীবনে আশা তো আমিও কম করি নি। অবিশ্যিই সে সব ছেলেবেলার জীবনে। তখনো পুরনো নারকেল কাঠির ঝাঁটার মতো সংসারটা ছড়িয়ে বড় হয়ে ওঠে নি। বাবা মায়ের শরীরে স্বাস্থ্যের দীপ্তি ছিল, হাসি ছিল দুজনের মুখে। মনে হয় তখন বাবা মায়ের চোখেও একটা সুখী ভবিষ্যতের স্বপ্ন ছিল। বাবা বলতেন, 'আমার ছেলেমেয়েদের আমি আলাদা করে দেখবো না। সবাইকে সমান ভাবে শিক্ষা দেবো।' দিয়েছিলেনও তাই। তবু, কিছুতেই নিজের ইচ্ছার সঙ্গে সবদিকে তাল বজায় রেখে গড়ে তুলতে পারেন নি।

বাবাকে সে-জন্য কখনোই দোষ দিতে পারি না। দোষ যদি দিতেই হয়, তবে দোষের বদলে অভিশাপই দেবো এই বর্তমান সমাজ আর রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে। ধিক্কার দেবো আমাদের সরকারি অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোকে। এই সব ব্যবস্থাই গরীবকে আরো গরীব করেছে, বড়লোকদের ভাণ্ডার আরো বেশি ভরে তুলেছে। আমাদের এ দেশটা স্বাধীন হবার আগে কেমন ছিল, জানি না। কারণ আমার জন্ম স্বাধীনতার পরে। জন্মের পরে, আস্তে আস্তে যতই জ্ঞান বাড়তে লাগল, ততই বুঝতে পারলাম, দেশের গোটা ব্যবস্থা আর পরিকল্পনার মধ্যে কোটি কোটি মানুষের অসহায় অপমান ছাড়া আর কিছু নেই।

আমার বাবা এই ব্যবস্থারই শিকার। চটকলে বিস্তর চুরির সুযোগ নাকি আছে।

তার প্রমাণও পেয়েছি। আমার বাবারই সহকর্মীদের কারো কারোকে যখন দেখি, বাড়ি ঘর-দোর করে বেশ ভালোই আছে। আমার বাবার চুরির যোগ্যতা ছিল না। উন্নতির একমাত্র সোপান ছিল বাৎসরিক ইন্‌ক্রিমেন্ট, তাও বছরে দশ টাকার বেশী না। অতএব, বাবা মায়ের স্বাস্থ্যের দীপ্তি আর মুখের হাসি নিভে যেতে খুব বেশি কাল সময় লাগে নি। বিশেষ করে জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসাবে, আমি সে-সব খুব ভালো করেই দেখেছি আর জেনেছি। এক হিসাবে বলতে গেলে, আমি আমার মায়ের থেকে কত বছরেরই বা ছোট। সতেরো আঠারোর বেশি না। ফলে আমি বাবা মায়ের একরকম বন্ধু আর সমব্যথী।

আমি জানি, আর্থিক অবস্থার সঙ্গে তাল রেখে, আমার বাবা মা, আমাদের ভাই-বোনের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন নি। এ বিষয়ে আমি কখনো তাঁদের সমালোচনা করতে পারবো না, সে-অধিকারও আমার নেই। তবে আমার কেন যেন মনে হয়েছে, এ বিষয়ে বাবা মায়ের কোথাও একটা অসহায়তা ছিল। এখন অবিশ্যি বাবা ভ্যাসেকটমি করেছেন। নইলে হয়তো আমাদের আরো কিছু ভাইবোনের জন্ম হতো।

আমার বাবা এ অবস্থাতেও, কায়ক্লেশে সংসার চালিয়ে, আমাদের সব ভাইবোনকেই লেখাপড়া শিখিয়ে যাচ্ছেন। এতে আমার মায়ের অবদান কোনো অংশেই কম নয়! খিদের সময়ে মাকেই তো সকলের পাতে খাবার বেড়ে দিতে হয়। এখনো আমাদের কারোকেই মা উপোস করিয়ে রাখেন নি। আমাদের সংসারে অশান্তি যা, তা কেবল আমার ভাই দুটিকে নিয়ে। বিশেষ করে বড়টিকে নিয়ে। ওর বয়স এখন উনিশ চলছে। ওর চালচলন ভাব ভাষা, মেলামেশার সঙ্গীসাথী, কোনো কিছুকেই ভালো বলা চলে না। ওর ভঙ্গিও বেশ দুর্বিনীত। ও এই বয়সে পার্ট ওয়ান দিয়েছে। হায়ার সেকেন্ডারিতে একবার ফেল করেছিল। সেই হিসেবে আমার পরের বোন পার্ট টু দিয়ে ফলাফলের অপেক্ষা করছে। কিন্তু ইউনিভারসিটি আর কলেজগুলো আমাদের জীবনে কত বড় অভিশাপ হয়ে উঠেছে, সে-কথা কারোরই অজানা নেই।

আমার এখন বাইশ চলছে। আমি সকালে সন্ধ্যায় দুটো টুইশানি করি। মাত্র দু সপ্তাহ হলো, টেলিফোন অপারেটরের কাজ শিখেছি। তিন মাসের কোর্স। টাইপরাইটিং শিখছি কয়েক মাস। স্পীড খারাপ তুলি নি। সেই সঙ্গে শর্টহ্যান্ডও শিখছি। কলকাতা থেকে বিশ মাইল দূরে, আমাদের উপকণ্ঠেও আজকাল নানারকম কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট হয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার উপকণ্ঠ থেকে কলকাতায় শেখাটাই আমি বেছে নিয়েছি। টেলিফোনের কোর্সটা তো কলকাতার বাইরে থেকে কোনো রকমেই সম্ভব না। টুইশানির টাকা থেকেই, কলকাতার মান্থলি টিকিট আর চায়ের ব্যবস্থা হয়ে যায়। আমার সাকল্যে পঁয়ত্রিশ টাকা উপার্জনের থেকে, মাঝে মধ্যে পাঁচ-দশ টাকা মাকেও দিয়ে থাকি। আমার খুব হাসি পায়, দুঃখও হয়, যখন বাবা আমার আর আমার ছোট বোন শিপ্রার বিয়ের কথা বলেন। বাবার কথাগুলো এইরকম: 'আমার মেয়ে দুটি তো দেখতে খারাপ না। রঙ ফরসা, চোখ মুখ ভালো, শাকপাতা খেয়েও, শত্তুরের মুখে

তাই দিয়ে ভগবান কিছু কিঞ্চিৎ রূপও দিয়েছেন। নিজের মেয়ে বলে বলছি না, পাড়ায় এরকম মেয়ে আর ক'টি আছে? তবু এত যে চেষ্টা-চরিত্তির করছি, কেউ ফিরেও তাকায় না। সবারই নজর মেয়ের বাপের ট্যাঁকের দিকে। এদিকে মুখে সব বড় বড় কথা।'

বাবার কথাগুলো সর্বাংশে মিথ্যা না। অবিশ্যি নিজের কথা বলছি না। তবে হ্যাঁ, শাকপাতা খেয়েও, একেবারে হাড় জিরজিরে নির্জীব হয়ে পড়ি নি। এটা বয়সেরই ধর্ম কী না জানি না, নিজেরই এক এক সময় মনে হয়, শরীরটা যেন বড় বেশী চোখে পড়ার মতো। আসলে এটা বাবা-মায়ের রক্ত-মাংসের থেকে পাওয়া, তাই কুড়িতেই বুড়িয়ে যাই নি। আমার ছোট বোন শিপ্রার স্বাস্থ্য তো রীতিমত উদ্ধত। কিন্তু চাকুরিজীবি অবিবাহিত ভদ্রলোকের ছেলেদের ব্যাপারটা সত্যি লজ্জাজনক। এইসব মধ্যবিত্ত তরুণেরা বড় বড় কথা বলে, অফিসে পাড়ায় বিপ্লব করে, কিন্তু পণের টাকা, কন্যার কোষ্ঠী মিলিয়ে ছাড়া বিয়ের কথা ভাবতে পারে না। সেইদিক থেকে আমাদের পাড়ার দিবাকর ছেলেটা অনেক ভালো।

না, দিবাকরের সঙ্গে আমার প্রেমের সম্পর্ক নেই, তবে দুর্বলতা বোধহয় উভয় পক্ষেরই আছে। দিবাকর লেখাপড়ায়ও ভালো। কিন্তু বেকারির অভিশাপ ওর গলায়ও ফাঁস পরিয়ে রেখেছে। ওর একটা চাকরি হয়ে গেলে, আমার জীবনে কী ঘটতে পারে, কে জানে। তবে এসব আমি মনে আসতে দিই না। আশা যে মরীচিকা, তা ভালোই জানি। পাড়ার বাকি ছেলেদের 'হিড়িক' কিছু শুনতেই হয়। ওসব নষ্টবুদ্ধি নিরুপায় ছেলেগুলোর বদনামী এখন সহ্য হয়ে গিয়েছে।

আমি সপ্তাহে পাঁচদিন, শনি রবি বাদে, খেয়ে-দেয়ে গড়ে এগারোটার গাড়িতে কলকাতা যাই। তার আগে সকালে একটি ক্লাস সিক্সের মেয়েকে পড়াই। সন্ধে সাড়ে ছ'টার মধ্যে ফিরে, একটি ক্লাস এইটের মেয়েকে পড়াই। ট্রেনে আমি মেয়েদের নির্দিষ্ট কামরাতে যাতায়াত করি। বসবার জায়গা না পেলে দাঁড়িয়ে যাই। প্রায়ই তা ঘটে। পুরুষদের কামরা সম্পর্কে আমার কোনো কুসংস্কার নেই বা ছুঁৎ-মার্গিতাও আদৌ নেই। তবে মেয়েদের কামরায় আমি অনেকখানি স্বস্তিবোধ করি। যদিও মেয়েদের কামরাটা কিছু স্বর্গ না, সেখানেও অনেক জটিলতা কুটিলতা নীচতা দেখা যায়। জায়গা নিয়ে ঝগড়াঝাঁটি তো সামান্য কথা। এর ওকে নানারকম ঠেস মারা কথা, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, আর মেয়েদের বিষয়েই নিন্দাচর্চার কোনো কিছু কমতি নেই। অনেক সময় এমন কথাও কানে আসে, মনে হয় কানে যেন অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছে। লজ্জায় মুখ তুলে তাকানো যায় না।

যাই হোক, এসব নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। সন্ধ্যা নামে একটি মেয়ে কিছু-দিন ধরেই বিশেষভাবে আমার দৃষ্টি-আকর্ষণ করছিল। নামটা আমি পরে জানতে পেরেছি। আমার ঠিক পরের স্টেশন থেকেই সে ওঠে। চালচলনে, সাজগোজে সে খুব স্মার্ট। মেয়ে হয়ে বলতে সংকোচ হয়, তার যেন রূপের থেকে প্রসাধনই বেশি। সেই সঙ্গে শাড়ি জামা স্যান্ডেল, ঝুটো পাথরের সাঁট মেলানো হার বালা কানের ফুল, আর রকমারি ব্যাগ, চোখের সান গ্লাস, সব মিলিয়ে মেয়েটি নজর কাড়ার মতোই।

মেয়েটিকে আমি কলকাতায় যাবার প্রথম দিন থেকেই দেখেছি। একই গাড়িতে সে যায়, আর মেয়েদের কামরাতেই। দেখেছি, সে কামরায় উঠলেই, কিছু মেয়ে নিজেদের মধ্যে চোখের ইশারা, ঠোঁট মুচকে হেসে নানারকম ভংগি করে। কিন্তু সন্ধ্যা নামে মেয়েটির যেন কোনো ভ্রূক্ষেপই নেই। সে কামরায় ঢোকে, আশেপাশে তাকিয়ে যদি জায়গা দেখতে পায়, বসে, তা নইলে দাঁড়িয়েই থাকে। ব্যাগ থেকে খুলে, রোজই কোনো না কোনো ইংরেজি পকেট বই পড়ে।

মেয়েটির সাজের উগ্রতা আছে বটে, তবে ওর স্মার্টনেস, বিশেষ করে অন্যদের দিকে ভ্রূক্ষেপমাত্র না করা, আমার খারাপ লাগে না। একদিন, আমি দরজা থেকে, সীটের কাছে সরে দাঁড়িয়েছিলাম। সন্ধ্যা আমার পাশেই দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ এক-জন মোটাসোটা মহিলা মাঝের একটা স্টেশনে নেমে যেতেই সন্ধ্যা ঝটিতি বসে পড়েছিল। তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে কী মনে হতে, একটু সরে গিয়ে হেসে বলেছিল, 'বসুন না। আমাদের দুজনের হয়ে যাবে।'

আমি আপত্তি করেছিলাম। কিন্তু সন্ধ্যা বারে বারে অনুরোধ করাতে, আমি বসেছিলাম। কথায় কথায় নাম ধাম জানা হয়ে গিয়েছিল। ওর নাম সন্ধ্যা তরফদার। আমার পরের স্টেশনের কাছে ওদের বাড়ি হলেও, পড়াশোনা করেছে কলকাতার কলেজে। বুঝেছিলাম, সেইজন্যই ওর সংগে আমার পরিচয় হয় নি। তা না হলে, পনর বিশ মাইলের মধ্যে অধিকাংশ ছেলেমেয়ে আমাদের কলেজেই পড়ে। সেই হিসাবে পরিচয় হওয়া উচিত ছিল।

কয়েক দিনের মধ্যেই সন্ধ্যার সংগে আমার মোটামুটি আলাপ হয়ে গিয়েছিল। জানতে পেরেছিলাম, ও একটা প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করে। মোটামুটি আলাপ-টাকে সন্ধ্যা নিজেই যেন একটু তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠতায় নিবিড় করে তুলতে চাইল। কথায় কথায় এমন আশ্বাসও দিল, ও ওদের অফিসে আমার একটা চাকরির চেষ্টা করবে। যার মাইনে শুরুতেই, চার পাঁচশোর কম না। এরকম একটা অফার তো আমার কাছে হাতে চাঁদ পাবার মতো। সত্যি কি এমন ভাগ্য আমার হবে?

সন্ধ্যার সংগে ট্রেনে মেলামেশার ফলে, লক্ষ্য করেছি, আমার দিকেও যেন কোনো কোনো মেয়ে একটু বাঁকা চোখে তাকায়। সন্ধ্যাকেও সে-কথা বলেছি। সন্ধ্যা বলে 'এরা সব নীচ। ওদের কোনো কিছুর দিকে মন দেবে না। তুমি একটু সাজলে গুজলে, বা দুটো মেয়ের সংগে কথা বললেই, ওরা তোমার সম্পর্কে খারাপ কিছু ভেবে নেবেই। আমি তো ওদের দিকে ফিরেও তাকাই না।'

সেটা মিথ্যা কথা নয়, নিজেই অনেকদিন দেখেছি। তবে সন্ধ্যাকে আমার কেমন যেন মনে হয়, সর্বদাই জ্বলছে, ফুঁসছে, দুর্বিনীত কথাবার্তা। ওর এই ব্যাপারে আমি একটু অস্বস্তিবোধ করি। আবার ভাবি, হয়তো ওর জীবনেও অনেক জ্বালাযন্ত্রণা আছে। ওর মুখে শুনেছি, আমার মতোই ওর অনেকগুলো ভাই-বোন। ওর ওপরে দুই দাদাও আছে। বাবা রিটায়ার করে বাড়িতে বসে আছেন। উপার্জন যা করার, সন্ধ্যা আর ওর এক দাদাই করে।

অবিশ্যি এসব ভেবেও আমি কী বা করতে পারি। সন্ধ্যার দৌলতে যদি আমার একটা চাকরি হয়ে যায়, তবে ওর কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

বাড়িটার কথা ভাবলে, থাকতে ইচ্ছা করে না। একবার বাড়ি থেকে বেরোলে, সেখানে আর ফিরতেও ইচ্ছা করে না। বাড়িটাকে বাড়ি বলে মনে হয় না, যেন একটা নরক। অথচ, যা-ই করি, যেখানেই যাই, বাড়িতে ফেরা ছাড়া জায়গাও নেই। কোনোরকমে যাও বা টিকে আছি, বাইরে থাকলে পশুরা আমাকে ছিঁড়েখুঁড়ে খাবে। তবু বাবা মা ভাইবোন, সংসার, এই সব পরিচয়ের একটা আবরণ আছে। এই আবরণটাই এখনো আমাকে বাইরের হিংস্র থাবা থেকে আড়াল করে ফেলেছে। অথচ বাড়ির চেহারাটাই বা কী? লোকের কাছে বলি, বাবা চাকরি থেকে রিটায়ার করে বাড়িতে বসে আছেন। আসলে বাবাকে আমি কোনোকালে কিছু করতেই দেখি নি। অন্তত লোকে যাকে 'কাজ' বলে, সেরকম কিছুই করতে দেখি নি। ভদ্রলোক জীবনে একটি কাজই কোনোরকমে করতে পেরেছেন। দেশ বিভাগের পরে কোনোরকমে কিছু জমি দখল করে, টালির চালের একটা কাঁচা বাড়ি করতে পেরেছেন। বাকি জীবনের সবটাই উঞ্ছবৃত্তি, আর প্রতি বছর একটি করে সন্তানের জন্ম দিয়ে গিয়েছেন। কলসী থেকে জল উপছে পড়ার মতো, আমাদের ভাইবোনগুলোর অবস্থা! কী করে যে আমরা বেঁচে থাকলাম, এটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। ছেলেবেলাতেই আমাদের না খেতে পেয়ে মরে যাবার কথা।

দেশ স্বাধীন হওয়ার বছরেই নাকি আমার জন্ম। আমাকে কয়েক মাসের কোলে নিয়ে, দুই দাদাসহ বাবা মা পূর্ববঙ্গ থেকে এখানে চলে এসেছিলেন। আমার একজন ঠাকুরমাও নাকি ছিলেন। তিনি এ দেশের জল হাওয়ায় বেশিদিন বাঁচেন নি। মরে বেঁচেছিলেন। সে-সব অবিশ্যি আমার কিছুই মনে নেই। সবই বাবা মায়ের কাছে শোনা কথা।

বাবা চাকরি না করুন, ছেলেবেলা থেকেই দেখে এসেছি, ভদ্রলোক রীতিমতো ডাকাবুকো। অনেকটা দস্যু রত্নাকরের মতোই, আশেপাশে ত্রাস সঞ্চার করে, যেখান থেকে যখন যা পেয়েছেন, তাই সংগ্রহ করে এনে সংসার চালিয়েছেন। কিন্তু বাল্মীকি হবার কোনো লক্ষণই তাঁর চরিত্রে নেই। রাজনীতির দলাদলি বরাবর করে এসেছেন, এখনো করেন। ওটা একটা মুখোশ ছাড়া, আমার আর কিছুই মনে হয় নি। বরাবরই শুনে আসছি, আমার বাবা নগেন তরফদার একজন ডাকাত বিশেষ।

একদিক থেকে ভাবলে, বাবাকে দোষ দিতে পারি না। বাবা তো আর নিজে দেশ বিভাগ করতে যান নি। অথচ রাতারাতি আমাদের ভিটেমাটি ছেড়ে আসতে হয়েছিল। শুনেছি, সেখানেও আমাদের সোনার মঠ ছিল না। তবু যা হোক খেয়ে পরে চলে যেত। এখানে এসে বাবার কিছুই করার ছিল না। ডাকাবুকো যাই যা হতেন, আমাদের বাঁচাতে পারতেন না, নিজেও বাঁচতেন না। মাকেও মরতে হতো।

কিন্তু তিনি নিজে যা-ই করুন, আমাদের জন্য কী করেছেন? কেবল উঞ্ছবৃত্তি করে খাইয়ে পরিয়ে বাঁচিয়ে রাখাই কি শেষ কথা? নিজের অবস্থা বুঝে, জন্মনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাটাও করতে পারতেন। আমাদের ভালোভাবে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করতে পারতেন।

আমার ভাই বোনের সংখ্যা আট। নেহাত মায়ের আর সন্তান উৎপাদনের ক্ষমতা নেই। তা না হলে বোধহয় এখনো গুচ্ছের ভাইবোন প্রতি বছরই জন্মাতো। বাবা যদি বা কোনোরকমে আমাদের উদরপূর্তি করে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন, লেখাপড়া শেখাবার কোনো চেষ্টাই ছিল না। বাবা যে-ভাবে দিন যাপন করতেন, সেই জীবনে সুস্থভাবে পরিবার গড়ে তোলার কথা চিন্তায় আসা সম্ভব না। নেহাত ভদ্রলোকের ছেলেমেয়ে বলে পরিচয় দিতে হবে, তাই রিফিউজি ফ্রি ইস্কুলে অল্পসল্প লেখাপড়া শিখেছিলাম।

বাবার এখন বয়স হয়েছে। তাঁর জায়গা দখল করেছে আমার দুই দাদা। সমাজ-বিরোধী বলতে যা বোঝায়, ওরা তাই হয়ে উঠেছে। অথচ ওরা দুজন, আমাদের বাকি ছ' ভাইবোনের থেকে লেখাপড়া কিছু বেশিই শিখেছিল। তার পরিণাম যে এই হবে, তা বোধহয় বাবাও ভাবেন নি। এখন তো বাবার সঙ্গেই দুই দাদার সব সময়ে খিটিমিটি ঝগড়াবিবাদ লেগেই আছে। বাবা আর দাদাদের কথাবার্তা এত খারাপ, নোংরা, বাবার ছেলে বলে মনে হয় না।

রাজনীতি আর সমাজবিরোধিতা এক কিনা, জানি না। আমার বাবাকেও দেখেছি, এখন দাদাদেরও দেখছি। দাদারা রাজনীতি করে, আবার ওয়াগন ভাঙে। দলাদলি মারামারি লেগেই আছে। আর তার ধাক্কা বাড়িতে এসেও পড়ে।

এ অবস্থায় বাড়ির আবহাওয়া যেমন হতে হয়, তাই হয়েছে। আমরা অন্যান্য ভাইবোনেরাও দাদাদেরই সঙ্গী। ছেলেবেলা থেকেই জেনেছি, জীবনে এসব করেই বাঁচতে হয়। আর মেয়ে হিসাবে সুস্থ রুচিশীল জীবনধারণ? বারো বছর বয়স না পেরোতেই, দাদার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে যে-খেলা খেলেছে, তারপরে আর সুস্থ জীবনের কথা চিন্তা করাই যায় না। মা যেন সে সব চোখে দেখেও দেখতেন না। কিন্তু বাবা রেগে যেতেন। রেগে গেলেও বাবার কিছু করার ছিল না। দাদার আর তাদের বন্ধুরা বাবাকে রীতিমতো চোখ রাঙিয়ে থামিয়ে দিত।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেখছিলাম, আমি একলা না, একদল মেয়েকে নিয়ে, দাদারা আর ওদের বন্ধুরা নরক গুলজার করে তুলেছিল! আমিও আস্তে আস্তে ও-সবেই ভালো অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এমন কি, একটু আধটু মদ সিগারেট খাওয়াটা খুবই সহজ বলে মনে হতো। কেবল আমার বয়সী না, আমার থেকে বয়সে বড় মেয়েরাও, আমাদের বেশ ভালো ভাবে হাতেখড়ি দিয়েছিল।

বাড়িতে তো পেট ভরে খাওয়া জুটতো না। জুটলেও, ভাতের পাতে বড় জোর উসুনি জলের মতো দুহাতা ডাল। খেতে হয় খাও, নয় তো পথ দ্যাখো। সেই তুলনায়, দাদার বন্ধুরা ভালো ভালো খাবার খাওয়াতো, ভালো শাড়ি জামা জুটতো। হাতে কিছু নগদও আসত। মা আবার তা থেকে ভাগ বসাতে আসত। না দিলেই, নোংরা গালাগালি।

এই রকম যখন অবস্থা, তখন ষোল বছর বয়সে, প্রায় আধবুড়ি বাণীদি নামে একজনের সঙ্গে প্রথম কলকাতায় যাই খালিকুঠি বেশ্যালয়ে। বড়লোক লম্পট, মাতাল, মদের এত ঢেলখেল, মেয়েদের ভিড়, আগে আর কখনো দেখি নি। প্রথম দিনেই রোজগার করেছিলাম একশো টাকা, মাত্র দুটো লোকের কাছ থেকে। বাণীদি

আর দালালের পাওনা আলাদা ছিল।
এই ভাবেই শুরু। তারপরে এই ছাব্বিশ বছর বয়সের মধ্যে অনেক দেখলাম। অভিজ্ঞতাও কিছু কম হয় নি। তবে উত্তর কলকাতার নামকরা পাড়ায় যাই না। রাস্তায় রাস্তায়ও ঘুরে বেড়াই না। আমার ব্যবসাটা একটু স্বতন্ত্র। যে-কারণে বুক ফুলিয়ে বলতে পারি, আমি চাকরি করি। তা একরকমের চাকরিই তো। বেলা বারোটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত চাকরির মেয়াদ। মাসে হাজার বারোশো টাকা অনায়াসেই রোজগার হয়। এখন দাদারাও আমার টাকায় ভাগ বসাতে চায়। বাবা মায়ের তো কথাই নেই। আমার দেখাদেখি, আমার ছোট বোন দুটোও এদিকেই পা বাড়িয়েছে। নিয়মই তাই। একবার চৌকাঠের বাইরে পা দিলে, এ পথ থেকে আর সহজে ফেরা যায় না।
এখন আমিও মাঝে মধ্যে দু চারটে মেয়েকে আমার পথে টেনে আনি। এতেও লাভ কিছু কম নেই। সম্প্রতি শুভ্রা নামে যে-মেয়েটির সঙ্গে ট্রেনে আমার পরিচয় হয়েছে, ভাবছি ওকেও টোপ দেবো। মেয়েটার কথাবার্তা শুনেই বুঝেছি, গরীব, বাড়িতে অভাব। মেয়েটা অবিশ্যি ভালো। নানাভাবে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। কিন্তু একবার আমার জীবনের স্বাদ পেলে, টাকা আর আরাম পেলে, এসব ভুলে যাবে। তবে মেয়েটার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়, একটু সাবধানে এগোতে হবে। মেয়েটার চেহারাটি বেশ মিষ্টি, চোখে পড়বার মতো। একবার হাত করতে পারলে, কাজ ভালোই দেবে।

শুভ্রার কথা

সন্ধ্যার সঙ্গে ইদানিং আমার বেশ ভাব হয়ে গিয়েছে। ও প্রায়ই বিকালে ওর অফিস ছুটির পরে আমার কাছে কমারসিয়াল ইনস্টিটিউটে চলে আসে। আমাকে টেনে নিয়ে যায় রেস্টুরেন্টে, খাওয়ায়। আমার ভারি লজ্জা করে। এক তরফা ও খাইয়ে যায়, আমি একদিনও খাওয়াতে পারি না। অথচ বাধা দিলেও সন্ধ্যা শুনতে চায় না। বলে, 'তোমার যখন চাকরি হবে, তখন তুমি খাইও, কিছু বলব না।'
কথাটা অবিশ্যি মিথ্যা না। সন্ধ্যাকে খাওয়াবার মতো আর্থিক যোগ্যতা আমার নেই। মেয়েটা সত্যি ভারি প্রাণখোলা। আমাকে ভালবেসেই ফেলেছে। মাঝে মাঝে ও কেমন যেন এলোমেলো কথাবার্তা বলে। বাড়ির বিষয়ে, সমাজ পরিবারের বিষয়ে ওর কোনো টান নেই। ভাইবোনদের কথা কখনো ওর মুখে শুনি না। একদিন তো ফস করে বলেই বসল, 'ভদ্রলোকের মেয়েদের থেকে যারা শরীর ভাঙিয়ে খায়, তারা অনেক ভালো।'
কথাটা আমার একটুও ভালো লাগে নি। আমি প্রতিবাদ করেছিলাম, 'না ভাই, তোমার এ কথাটা আমি কখনো মানব না।'
সন্ধ্যা হেসে বলেছিল, 'সত্যি সত্যি কী আর বলছি। জ্বালায় জ্বলে বলছি। তা ছাড়া শরীর ভাঙিয়ে বলতে তুমি কী বুঝেছ? খারাপ কিছু? মোটেই আমি তা

বলি নি। চাকরি করাটাও তো শরীর ভাঙিয়ে রোজগার করাই, না কি ?'
সে কথা হয়তো ঠিক। তবু 'শরীর ভাঙিয়ে' কথাটা যেন মেয়ে হয়ে কানে কেমন লাগে। শরৎচন্দ্রের 'নারীর মূল্যে' যেন পড়েছিলাম, শ্রমজীবী পুরুষ ও দেহোপজীবিনীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কথাটা আমি মেনে নিতে পারি নি।
সন্ধ্যা কয়েকদিন ধরেই ওর এক বউদির বাড়ি আমাকে নিয়ে যেতে চাইছে। বালিগঞ্জের দিকে কোথায় নাকি সেই বেলা বউদি থাকেন। মানুষ নাকি খুব ভালো। আমার যাবার ইচ্ছা থাকলেও সময় করে উঠতে পারি না। কারণ সন্ধ্যার সঙ্গে সন্ধ্যার সময়ে বউদির বাড়ি গেলে, ফিরতে দেরি হয়ে যাবে। আমার টুইশানি আছে। বিকেল পাঁচটা বাজলেই আমি কলকাতা থেকে পালাই পালাই করি।
সন্ধ্যা তবু জেদ করে। শেষ পর্যন্ত একদিন বেলা তিনটের সময় যাওয়া ঠিক হলো। সন্ধ্যা ওর অফিস থেকে এসে আমাকে নিয়ে গেল। সেদিনটা আমার শর্টহ্যান্ডের ক্লাসটা করা হলো না। গিয়ে দেখলাম, দক্ষিণ কলকাতার বেশ অভিজাত পাড়া, তিনতলায় বেলা বউদি থাকেন। আগেই শুনেছিলাম, বেলা বউদির স্বামী ব্যবসায়ী। গড়িয়াহাটে নাকি কাপড়ের দোকান আছে। তবে তিনি বাড়িতেই বেশিক্ষণ থাকেন। বিশ্বস্ত কর্মচারিরাই ব্যবসা দেখাশোনা করে।
সন্ধ্যার সঙ্গে বউদির দোতলার ফ্ল্যাটে গেলাম। বাইরের বসবার ঘরটি বেশ সুন্দর। শোফা সেট, বইয়ের আলমারি, আরো নানা কিছু দিয়ে সাজানো, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কিন্তু ঘরে ঢুকেই, বেলা বউদির সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে, কেমন একটা গন্ধ পেলাম। বেলা বউদি আমাকে জড়িয়ে ধরতেই গন্ধটা যেন বেশি করে নাকে লাগল। তাঁর চোখ দুটোও যেন লাল ছিল। অথচ তাঁর ঘাড় ছাঁটা চুল, লাল পাড় শাড়ি, চেহারাটি বেশ সুন্দর। একটু বেশি মোটা। তা হলেও হাসি খুশি। কিন্তু গন্ধটা কি মদের ?
সন্ধ্যা আমাকে বউদির কাছে বসিয়ে দিয়েই ভিতরে কোথায় চলে গেল। তারপরেই এলেন এক ভদ্রলোক। তাঁর চোখও রীতিমতো লাল আর ঢুলু ঢুলু। এসেই আমাকে দেখে বলে উঠলেন, 'বাঃ, এ যে দেখছি খাসা। ওকে কোথা থেকে যোগাড় করলে বেলা ?'
বেলা বউদি চোখ কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'কী যা তা বলছ ? এ আমাদের সন্ধ্যার বন্ধু, বেড়াতে এসেছে।' বলে বউদি পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার স্বামী।'
কিন্তু ভদ্রলোককে আমার একটুও ভালো লাগল না। তাঁকে দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, তিনি মদ খেয়ে চুরচুর হয়ে আছেন। এ আবার কী রকম পরিবার। পরিবারের ছেলেমেয়েরাই বা কোথায়। লজ্জাই বা কোথায় গেল ?
বউদি বললেন, 'বস শুভ্রা। কী খাবে বল। চা না কফি ?'
বললাম, 'আমার কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। সন্ধ্যা কোথায় গেল ?'
বউদি বললেন, 'তুমি বস, আমি ডেকে দিচ্ছি। হয়তো কোনো মেয়ের সঙ্গে গল্প করছে। তিন তলাটাও আমাদের। সেখানেও যেতে পারে।'
বউদির স্বামীটি ইতিমধ্যে শোফায় এলিয়ে পড়ে আমার দিকে তাকিয়ে দেখছিলেন।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'বউদি, আপনি যাবেন না।'
বউদি হেসে উঠলেন, 'আরে কোনো ভয় নেই। তোমার দাদা অতি ভালো মানুষ। শরীরটা তো ভালো নেই, তাই ওরকম করছেন।'
শরীর খারাপ হলেও কি কেউ ওরকম ভাষায় একটা নতুন মেয়ের সামনে তার প্রশংসা করে? খাসা, যোগাড় করা, এসব কথার মানে কি?···আমার এসব ভাবনার মধ্যেই সন্ধ্যা এসে ঘরে ঢুকলো। আমাকে বলল, 'চলো, তেতলায় যাই।'
আমি ভাবলাম, সেখানে বউদির ছেলেমেয়েরা আছে। সন্ধ্যার সঙ্গে তিনতলায় গেলাম। তিন তলার একটি ঘরে একজন যুবক বসেছিল। তার চোখ লাল, আর সেই গন্ধ। সন্ধ্যা আমাকে আলাপ করিয়ে দিল, 'বউদির ছোট দেওর।'
কিন্তু যুবকটির সামনে টেবিলে মদের বোতল ও গেলাস দেখেই আমি থমকে দাঁড়ালাম। যুবকটি হেসে ডেকে বলল, 'আসুন, বসুন। চলবে?' বোতল দেখালো।
সন্ধ্যা বলল, 'বীয়র তো, শুভ্রা একটু খাবে।'
আমি মাথা ঝেঁকে ঝেঁজে বললাম, 'না না, এসব মদ-টদ আমি খাই না। আমি এখুনি চলে যাবো।'
সন্ধ্যা হেসে বলল, 'বীয়র আবার মদ নাকি? ও তো জল!'
যুবকটি বলল, 'আরে এখানে একবার ঢুকলে কি সহজে বেরনো যায়?'
কথা শুনে, আতঙ্কে আমার বুকটা কেঁপে উঠলো। মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, আমি এক নারকীয় ফাঁদে পা দিয়েছি। এই সময়েই সে ঘরে আরো তিন চারটি মেয়ে এলো। সঙ্গে দুজন পুরুষ। তারা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে, হাসা-হাসি করছিল। আমি সন্ধ্যার দিকে অসহায় ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে বললাম, 'সন্ধ্যা, তুমি আমাকে এ কোথায় নিয়ে এসেছো? আমি তো তোমাকে কখনো এরকম ভাবতে পারি নি।'
সন্ধ্যা বলল, 'ভয় পেয়ো না। তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কেউ তোমাকে জোর করে কিছু করবে না।'
আমি বললাম, 'সেসব আমি জানি না। তুমি এখুনি আমাকে এ বাড়ির বাইরে নিয়ে চলো।'
সন্ধ্যা বলল, 'আহা, এত তাড়া কিসের? আমরা দোতলায় যাই।'
আমি সন্ধ্যার সঙ্গে দোতলায় যেতে যেতে বুঝতে পারলাম, এই হচ্ছে সন্ধ্যার প্রাইভেট ফার্মের চাকরি। কিন্তু সে-কথা আমি ওকে মুখ ফুটে বললাম না। দোতলার বসবার ঘরে এসে দেখলাম, নতুন দুজন লোক ও একটি মেয়ে বসে আছে। বউদি তাদের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছেন। সন্ধ্যার মুখে, আমি তখনই চলে যেতে চাই শুনে বউদি বিশেষ অবাক হলেন না। আলমারি থেকে ব্যাগ বের করে পঞ্চাশটি টাকা নিয়ে আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে শুভ্রা, আবার তোমার ইচ্ছে হলে এসো। আমার এই সামান্য উপহার নিয়ে যাও।'
উপহার! তাও আবার টাকা? আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'না না, আমাকে টাকা

দেবেন না।'

বউদি বললেন, 'কেন, তোমার টাকার দরকার নেই? শুনেছি তোমাদের অবস্থা ভালো নয়।'

আমি বললাম, 'না-ই বা হলো। তা বলে আপনার টাকা আমি নিতে যাবো কেন?'

আমার কথা শুনে বউদি রাগ করলেন না, হেসে বললেন, 'ঠিক আছে। তবে তোমার যদি কোনোদিন দরকার পড়ে, আমার কাছে এসো। ভয় নেই, আমি তোমার কোনো ক্ষতি করবো না।'

আমি কোনো কথা না বলে, সন্ধ্যার সঙ্গে বেরিয়ে গেলাম। সিঁড়িতেই সন্ধ্যাকে বললাম, 'তোমাকে আর আসতে হবে না। আমি একলাই যেতে পারবো।'

কী ভাবে কথাটা বললাম জানি না। সন্ধ্যা আর এক পাও আমার সঙ্গে আসতে পারল না। আমার তখন দুচোখ ফেটে জল আসছে। সব ঝাপসা, রাস্তা, গাড়ি, আলো, সবই যেন কাঁপছে। কীভাবে যে স্টেশনে এসে বাড়ি ফিরলাম, নিজেই জানি না। আর এই প্রথম, আমি সন্ধ্যার টুইশানিতে যেতে পারলাম না।

কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস, পরের দিন সকালবেলায় বাবার হঠাৎ শরীর খারাপ করল। তাড়াতাড়ি ডাক্তার ডাকা হলো। ডাক্তার দেখেই, হাসপাতালে নিয়ে যেতে বললেন। বাবার বুকে তখন অসহ্য যন্ত্রণা। মিউনিসিপ্যালিটিতে ছুটলাম, যদি অ্যাম্বুলেন্স পাওয়া যায়। পাওয়া গেল না। ভোরবেলাতেই একজন রুগী নিয়ে কলকাতায় চলে গিয়েছে। অগত্যা বাবাকে নিয়ে সেই সাড়ে এগারোটার গাড়িতেই আমরা চার ভাইবোন হসপিটালে নিয়ে চললুম।

পরের স্টেশন থেকে সন্ধ্যা উঠল। আমি অন্য কামরা থেকে দেখলাম, কিন্তু কোনো কথা বললাম না। বাবাকে নিয়ে শিয়ালদায় নেমে, একটা ট্যাক্সি ডেকে মেডিকেল কলেজ হসপিটালে গেলাম। বাবাকে এমারজেন্সিতে ভর্তি করিয়ে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ দেখি সন্ধ্যা এসে সেখানে হাজির।

আমি মুখ শক্ত করে অন্যদিকে ফিরে তাকালাম। সন্ধ্যা আমার কাছে এসে বলল, 'শুভ্রা, জানি, এখন তুমি আমাকে ঘেন্না করছো।'

বললাম, 'তা করছি।'

সন্ধ্যা নিচু গলায় ঢোক গিলে বলল, 'করতেই পার। কিন্তু তোমার বাবার অসুখের কথাটা শুনে না এসে পারলাম না।'

আমি বললাম, 'কোনো দরকার ছিল না। আমার বাবার অসুখ, আমরাই দেখব। তোমার কিছুই করবার নেই। তুমি যেতে পার।'

সন্ধ্যা কালো মুখ করে চলে যেতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, বলল, 'আচ্ছা শুভ্রা, বলতে পার, অত অভাবে দুঃখে, তুমি কী করে এমন শক্ত থাকলে, আর আমি নর্দমার জলে ভেসে গেলাম?'

আমি অবাক চোখে সন্ধ্যার দিকে তাকালাম। দেখলাম, ওর কাজল পরা চোখের কোণে জল। আমি রেগে বলতে যাচ্ছিলাম, পারলাম না। বললাম, 'সন্ধ্যা, এ কথার জবাব আমার সত্যি জানা নেই। আমার কাছে জীবনের চেহারাটা অন্য রকম। সুখ আমিও চাই, কিন্তু তার জন্য নিজের সব বিসর্জন দিতে পারব

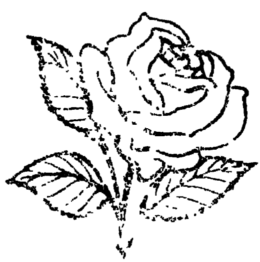
না।'

সন্ধ্যা কোনোরকমে বলল, 'বুঝেছি। চলি ভাই শুভ্রা।'

সন্ধ্যা ভেজা চোখে, মুখ নামিয়ে চলে গেল। খাবার জল। উদ্বেগ সত্ত্বেও সন্ধ্যার জন্য আমার মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল।

সন্ধ্যার কথা

জীবনে এরকম হোঁচট আর কখনো খাই নি। আজ বউদির বাড়ি যেতে ইচ্ছা করছে না। বাড়ি ফিরে যাব, না কি গঙ্গার ধারে যাব, বুঝতে পারছি না। কেবলই একটা কথা মনে হচ্ছে। শুভ্রা এত শক্তি কোথা থেকে পেল? অথচ আমাদের মধ্যে সমাজ সংসারের তফাৎ কতটুকু? জানি না, ঈশ্বর বলে সত্যি কেউ আছেন কী না। থাকলে জিজ্ঞেস করতাম, আমাকে কি শুভ্রার মতো শক্তি দিতে পার না?



রং

ঠিক যে মুহূর্তে সংবাদটি এলো, 'উনি' এসেছেন, সেই মুহূর্তেই গোটা কারখানায় একটা ম্যাজিক ঘটে গেল। সেক্শনে কেরানীদের নিঃশব্দ কিন্তু দ্রুত ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেল। যেন একটা ভয়ংকর আতঙ্কজনক কোনো ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে এবং ব্যাপারটা যেন অত্যন্ত গোপনীয় কিছু। তাই সকলের চোখে মুখেই একটি চাপা উৎকণ্ঠা। কেউ গলা খুলে কথা পর্যন্ত বলছে না। সবাই ফিস্‌ফিস করছে, কানে কানে কথা বলছে।

একমাত্র রাজার মৃত্যু আসন্ন হলেই, রাজপ্রাসাদে এমনি একটি আতঙ্ক এবং ফিস-ফিসানি চারদিকে চলতে পারে। কেন না, সেখানে মৃত্যুই শুধু নয়, সিংহাসন দখলের ষড়যন্ত্রটাও চলতে থাকে শোকবিহ্বলতার মধ্যে।

কিন্তু এখানে রাজার মৃত্যু নয়, রাজপ্রাসাদও নয় এটা।

এটা কারখানা। তাও কোনো এঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাক্টরী নয়, চটকল।

সেখানেই এরকম একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটছে।

সেক্শনে সেক্শনে অফিসে অফিসে, মজুর, কেরানী, ওভারসিয়ার, লেবার অফিসার, সকলের কাছে সংবাদ চলে গিয়েছে, 'উনি' এসেছেন।

যদিও গতকালের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, শ্রমিকেরা সকলেই ফর্সা জামা কাপড় পরে আসতে পারে নি, কেরানীরা সকলেই টিপটপ হতে পারে নি, ওভারশিয়াররা এবং অফিসাররা পর্যন্ত 'চয়েস' অনুযায়ী টাইয়ের রং ফলাতে পারে নি, তবু সকলেই স্মার্ট, দক্ষকর্মী হিসেবে নিজেদের প্রমাণ করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে।

শ্রমিকদের অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে এনে কোনো লাভ নেই। লোকগুলি চিরদিনই 'ক্যালাস্'। আর ঠোঁট উল্টে উল্টে 'ওঁর' সম্পর্কে দু'চারটে বাজে কথা বলবেই। যদিও মেশিন থেকে তারা কেউই নড়ছে না। ম্যানেজার, অফিসার, ওভারসিয়ারের কথানুযায়ী খুব মনোযোগ দিয়েই কাজ করে চলেছে। তারাও জানে, 'উনি' এসেছেন। আর 'উনি' খোদ মালিক, খোদ কলকাতার খোদ আলুগুদাম অর্থাৎ হেড অফিস থেকে আসছেন। আর কাজ মানেই যে-হেতু ইজ্জতের ব্যাপার, সেই জন্য কোনো সময়েই সেটা হারাতে রাজী নয়। অবশ্য, একথা সত্যি, সাধারণ দিনে কাজকর্মে কিছু শৈথিল্য তাদের থাকে। কেন না, তাদের ওপর ওভারসিয়ার দারোগার মতো নজর রাখে। যেন তারা চোর, কাজ চুরি করবে। এ অবিশ্বাস ও সন্দেহের জন্যে, একটা নীরব প্রতিবাদই, তার যতটুকু না করলে নয়, ততটুকুই করে। তার বেশী নয়।

আজ তারা প্রত্যেকেই বীরের মনোভাব নিয়েই কাজ করছে। কারণ এখনো আলু-

গুদামের প্রতি তাদের একটি ক্ষীণ বিশ্বাস আছে। তাছাড়া এটাও বলা হয়েছে, 'উনি' যদি কারুর কাজ দেখে খুশি হন, অর্থাৎ 'ওঁর' নজরে পড়ে যেতে পারে, তার আখের আর দেখতে হবে না।

মনে তাদের একটা আশা আছে। যদিও এ রকম আশা তারা অতীতে অনেক করেছে। তবু আশার আর এক নাম নাকি মরীচিকা।

তাই আশা এবং নিরাশা, কাজে মনোযোগ এবং 'ওঁর' প্রতি বিদ্রূপ এই উভয় রকমের মনোভাব রয়েছে তার মধ্যে।

অফিসের 'বাবুদেরও' তাই। একসঙ্গে সব টাইপ মেশিনগুলি কোনো সময়েই এমন কোরাস খট্‌খট্‌ সংগীত করে না। সবাই এত ব্যস্ত যে, বুড়ো টাইপিস্ট হরিহরবাবু কাগজ না সাজিয়েই টাইপ করছিলেন এবং যখন সেটা আবিষ্কৃত হলো, তখন 'উনি' হরিহরবাবুর কাছেই দাঁড়িয়ে। হে ভগবান, হে ভগবান।

কিন্তু 'উনি' কিংবা 'ওঁরা' তাকান নি। কেবল, এই দারুণ ভুলের জন্য হরিহর-বাবুর হার্টের রোগটা অনেকখানি বেড়ে গেল।

'উনি' একলা আসেন নি, একজন সহকারী হোমরাচোমরা প্রতিনিধিও এসেছেন। কেননা, ব্যাপারটা আসলে চটকলগুলির ওপর সরকারের সাম্প্রতিক কালের অনু-সন্ধান। কোম্পানীর মুনাফা, নতুন মেশিন, র‍্যাশনালাইজেশনের প্রশ্ন নিয়ে নানারকমের কথাবার্তা চলছে। সেই উপলক্ষেই খোদ কর্তা এবং সরকারি প্রতি-নিধিরা নানান জায়গায় চটকল সফর করছেন।

ব্যাপারটা খুবই ক্লান্তিকর, আর তাই, ভগবান বুদ্ধকে অশেষ ধন্যবাদ, চটকলের ম্যানেজারেরা পরিদর্শনের পর ক্লাব-হলে রিফ্রেশমেন্টের ব্যবস্থা ভালোই করেন। সকলেই গলদ্‌ঘর্মপ্রায়। কিন্তু খবরদার। এক চুলও যেন এদিক ওদিক না হয়। ওভারসিয়াররা যেন নতুন মেশিনের তৎপরতা বোঝাতে যথেষ্ট সচেতন থাকেন, কেননা র‍্যাশনালাইজেশনের ওটাই আসল ভিত্তি। আর 'সেল মাস্টার' অর্থাৎ বাণিজ্যের ব্যাপারে যার দায়িত্ব, তিনি যেন টুপিওয়ালা সরকারী প্রতিনিধিটিকে সব বিষয়ে বুঝিয়ে, বলে বলে তাঁর সমর্থন আদায় করতে পারেন। আর পারবেনই, কারণ সরকারী প্রতিনিধি নিজেও একজন ভালো সওদাগর।

ঝাড়ুদার ঝাড়ুদারণীরা জেনারেল ল্যাটরিনের আড়ালে দাঁড়িয়ে এইসব বড়কা আদমিদের দেখছিল আর নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিল তাদের ঝাড়ু দেওয়া কোন্‌ কোন্‌ জায়গা সবচেয়ে বেশী পরিষ্কার হয়েছে এবং সাহেবরা কার ঝাড়ু দেওয়া জায়গাটাকে দেখে খুশি হচ্ছেন মনে মনে।

ঠিক সেই সময়েই, বনোয়ারির হাতটা কেটে গেল।

এ ভয়টা ছিল গত তিন মাস থেকেই। মেশিনটা খারাপ—যে কোন মুহূর্তে মণ খানেক ওজনের দাঁতালো চাকাটা তার ডানার ওপরে পড়তে পারত। মেশিনটা নতুন, ভাগবাগ সে ঠিক জানত না। ওভারসিয়ার'এঞ্জিনিয়ারবাবু ঠিক ওয়াকিবহাল নয়, তাই মেশিন যারা বসিয়ে গিয়েছে, সেই আমেরিকান এঞ্জিনিয়ারটি না হলে মেশিনটা কিছুতেই ঠিক করা যাচ্ছিল না।

অবশ্য কোম্পানী বনোয়ারির বিপদটা বুঝতে পারছিল। কিন্তু তারা লাচার।

বনোয়ারি কাজটা ছেড়ে দিতে পারে—নিজেই সে জবাব দিয়ে আখেরি ছুটি নিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু বনোয়ারি যে তা'হলে খেতে পাবে না? বেকার হয়ে যাবে যে?

সেটাও একটা কথা। তা'হলে কোম্পানী কি করবে? বসিয়ে মাইনে সে দিতে পারবে না। আর একজন জোয়ান মজুর বসে বসে মাইনে খায় কখনো?

বনোয়ারিই বলুক না।

তা তো বটেই।

তবে? সুতরাং বিপদের ঝুঁকিটা নিয়ে সে চালিয়ে যাক। ব্যবস্থা শীঘ্রই হবে।

তাই চালিয়ে যাচ্ছিল বনোয়ারি। আর আজকে সবচেয়ে বেশী মনোযোগ দিতে গিয়ে, সামলাতে পারলে না সে। টিথ্-রোলটা যখন ওপরে উঠেছে, সে মেশিনের মধ্যে হাত দিয়ে, ব্রাশ দিয়ে, তেলের গাদ আর পাটের ফেঁসো পরিষ্কার করছিল। সেই সময়েই, মণ খানেক ওজনের দাঁতালো চক্রটা তার ডানার ওপর নেমে এলো চোখের পলকে।

বনোয়ারি দেখল, তার ডান হাতটা মেশিন রোলিং-এর নিচে পড়ে, একবার মুঠি পাকাল, তারপর খুলে গেল।

সে চীৎকার করতে গেল। গলার স্বর ফুটল না। মাটিতে পড়ে গিয়ে সে গোঙাতে লাগল।

সর্দার টের পেয়ে ছুটে এলো। খবর গেল ওভারসিয়ার, ম্যানেজার, লেবার অফিসারের কাছে। অমনি সকলের প্যান্টের বোতামগুলি ছিঁড়ে পড়বার যোগাড় হলো যেন।

সর্বনাশ! 'ওরা' যে এখুনি ওখানেই যাচ্ছেন?

ম্যানেজার বলল, ওভারসিয়ারের কানে কানে—শীগ্‌গির যাও। সরিয়ে ফেল।

ডাক্তারকে বললেন, জলদি যাও দেখ কি ব্যাপার।

ওভারসিয়ার, চীফ্ ডাক্তার ছুটলেন। এসে দেখলেন, গোটা সেক্‌শানের লোক ভিড় জমিয়ে ফেলেছে।

হটাও, হটাও। জলদি হটো। মেশিনে যাও সব। 'উনি' এসে পড়লেন বলে। দোহাই তোমাদের, যাও।

তাড়া দিলেন ওভারসিয়ার, সর্দার।

সরে গেল সবাই। একটা ভয়ংকর জরুরী ব্যাপার। মিটে যাক্, তারপরে তারা বনোয়ারিকে দেখবে, যদিও কাজে আর কারুর ভালো মন বসছে না। একটা আতঙ্ক আর ক্ষোভে ওদের সকলের দু'চোখে ভয় আর ঘৃণা জমে রইল।

কিন্তু কোথায় সরানো যায় বনোয়ারিকে? ওভারসিয়ার আর ডাক্তারের মাথা খারাপ হয়ে যাবার যোগাড়। ওভারসিয়ার দেখলেন, ডাক্তারের মুখটা একেবারে সাদা।

কেন? বনোয়ারি মারা গিয়েছে নাকি?

কিন্তু যাই হোক, তাড়াতাড়ি সরাতে হবে। 'ওরা' এসে পড়ছেন। এসে পড়লেন বলে।

ওভারসিয়ারের চোখের সামনে ভাসতে লাগল, কোম্পানীর দৌলতে তার আসন্ন

বিলেত যাত্রা, আর ভাবী শ্বশুরের কাছ থেকে 'পণ' হিসেবে সেভ্রলেট লেটেস্ট মডেলের গাড়িখানা। সব, সব ধূলিসাৎ হয়ে যাবে।

তিনি চাপা গলায় প্রায় কেঁদে উঠলেন, সর্দার, শীগ্‌গির।

সহসা চোখে পড়ল, দশ ফুট সমান উঁচু প্যাকিং বাক্স সেক্‌শানের এক কোণে জড়ো করা আছে। ওইখানেই, ওর আড়ালে সরিয়ে দিতে হবে।

কয়েকজন ধরাধরি করে তুলল বনোয়ারিকে। রেখে এলো প্যাকিং বাক্সের আড়ালে। একটা চটও ঢাকা দেওয়া হলো। যদি 'ওরা' এদিকে আসেন, তবে নিশ্চয় চটের ঢাকা খুলবেন না।

কিন্তু, কি সর্বনাশ! সর্দার, বনোয়ারির হাতটা পড়ে আছে রেলিং-এর পাশে। ছোট্‌ ছোট্‌।

সর্দার হাতটা নিয়ে এলো। ঢুকিয়ে দিল চটের তলায়।

ওঁরা এলেন। ঘুরলেন, দেখলেন।

এটা কি মেশিন? আই সি। সরকারী প্রতিনিধির উক্তি।

এই মেশিনটার গ্রোয়িং ক্যাপাসিটি কি রকম? নমুনা মাল দেখাও তো একটু। বাঃ, বেশ হয়েছে। বড়কর্তার মন্তব্য।

ওঁরা দেখলেন, একটিও মানুষ নেই সেক্‌শানে। সকলেই এমনভাবে মেশিনের সঙ্গে লিপ্ত হয়ে গিয়েছে যে, মানুষ আর মেশিন তফাত করা যাচ্ছে না। বাঃ নাইস।

ভগবান বুদ্ধের কি অপরূপ লীলা। নব-ভারত সত্যি উন্নতি করেছে। এরাও মেশিনে এ রকম সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করতে পারে।

—আচ্ছা, এগুলো কি? এই লাল মতো?

ম্যানেজারের বুক কেঁপে উঠল, ওভারসিয়ারের মুখ সাদা হয়ে গেল, ডাক্তার ভয়ে ও উত্তেজনায় কেবলি খ্যাঁকারি দিতে লাগলেন।

বড়কর্তা আবার জিজ্ঞেস করলেন, মেঝেতে এই লাল মতো তরল পদার্থটা কি?

ইস্‌। ছি ছি, কী হবে? লাল তরল পদার্থটা বনোয়ারির রক্ত। সেটা মুছে নিতে কারুর মনে হয় নি।

আর রক্ত অনেকখানি। গাঢ়, টকটকে লাল। ঠিক প্রকৃতির খামখেয়ালি ভূ-খণ্ডের মতো, অর্থাৎ ম্যাপের মতো একটা দলা। কিছুটা গড়িয়ে গিয়ে, আবার থেমে গেছে।

ভারতবর্ষের মতো? না, বোধহয় অস্ট্রেলিয়ার ম্যাপের মতো। উঁহু, ঠিক তাও নয়, বেশ চওড়া, লম্বা নয় খুব। ইংল্যাণ্ডের মতই বোধহয়। চীনের মতো নয় তো?

ম্যানেজার হেসে, জুতো দিয়ে একটু ঠেকিয়ে দেখে বলল, ওহো, এটা, মানে—

—এটা রং।

—রং?

—হ্যাঁ, রং। মানে, এদের জানেন তো, এরা একটু রং ভালবাসে। বোধহয় নিজেদের মধ্যে একটু ফষ্টিনষ্টি করার জন্য কারুর গায়ে ছুঁড়ে দেবে বলে, মানে, আর কিছুই নয়. বুঝলেন না। এ দেশের লোকেরা একটু রসিক। কাজের মধ্যেও

নিজেদের মধ্যেই একটু ইয়ার্কি ফাজলামি করতে ভালবাসে। অবশ্য আপনি যদি কিছু মনে না করেন স্যার—এই আর কি।
—ও, রং এটা ?—সরকারী প্রতিনিধি বললেন।
—হ্যাঁ, রং।
—নিশ্চয় কোনো ভালো কারখানার ম্যানুফ্যাকচারিং, নয় ?—বড়কর্তার উক্তি।
—হ্যাঁ। ভালো কারখানার।
—দিশী কারখানার কি ?—সরকারী প্রতিনিধির প্রশ্ন।
—বোধহয়।
—হুঁ। রংটা খুবই ভালো। খুব গাঢ়—বড়কর্তা বললেন।
—আর রংটা পাকা নিশ্চয়ই, আর খুবই উজ্জ্বল।—সরকারী প্রতিনিধির বক্তব্য।
বড়কর্তা মেশিনটার দিকে তাকালেন। এটা বন্ধ কেন ?
—মেশিনটা একটু বিগড়ে আছে। চালালে অ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। একটা শারীরিক ক্ষতি হতে পারে, তাই আমরা এটা বন্ধ রেখেছি।
—খুব ভালো করেছেন। যদিও আপনাদের উৎপাদনের ক্ষতি হচ্ছে, তবু এরকম ক্ষতি স্বীকার করেও কাউকে বিপদে না ফেলাটা, সত্যি আপনাদের চরিত্রের এটা, কি বলব, মানে, একটা আধুনিক শিল্পোন্নতির মহানুভবতা।
বললেন সরকারী প্রতিনিধি।
বড়কর্তা বললেন, আমার তাই বিশ্বাস।
বলে তিনি দাঁতালো মেশিনটার গায়ে হাত দিয়ে কাবাব করার কাঁচা মাংসের মতো একটুকরো মাংস আঙুল দিয়ে তুলে আনলেন।
—এটা কি ?
—এটা ? এটা মানে, আপনার মানে, পশুর চর্বি দিয়ে এটা মাজা হয়েছিল, যদিও সেটা খুব ভুল হয়েছে। মানে, আমরা এই পদ্ধতিতে মেশিন চালাই না যদিও। ওটা তারই, একটা ফ্রাগমেণ্ট হবে। মানে—চর্বির।
—হুঁ। বড়কর্তা বললেন।
—সংসারে কিছুই ফেলা যায় না।—বললেন সরকারী প্রতিনিধি।
তারপরে ওঁরা আরো অনেক জায়গায় ঘুরলেন। ওভারসিয়ার, ম্যানেজার সবাই ঘুরতে লাগলেন ওদের সঙ্গে।
মেমসাহেব এবং অন্যান্যেরা ক্লাবরুমে রিসেপশনের ব্যবস্থা রেডি করে রেখেছিলেন। ওঁরা খুবই ক্লান্ত হয়ে ঘুরে এলেন।
মিসেসরা রং মাখা ঠোঁটে খুব হাসলেন। দেশী-বিদেশী, সব মিসেসরাই। বুকের সবটা তারা খুলে রাখতে পারে নি, তাই বুকের কেন্দ্রবিন্দু পর্যন্ত পাতলা জামায় তারা ঢেকেছেন। না ঢাকলেও অনেক কিছু ফাঁস হয়ে যেতে পারে, তাই যতটা সম্ভব নিপুণতার সঙ্গে ঢাকা ও দেখানোটা বজায় রেখেই পুরুষচিত্ত ক্ষতবিক্ষত করা পোশাক তারা পরেছেন। তাঁরা মশগুল করছেন ক্লাবঘর। তাঁরা নিজেরাই মাননীয় অতিথিদের পরিবেশন করছেন।
তাঁরাই প্রোগ্রাম করেছেন, আর সেই অনুযায়ী কনসার্ট শুরু হলো। বিদেশী নাচের

প্রোগ্রামটাই আগে রাখা হয়েছে।

বনোয়ারির চটের ঢাকনাটা অবশ্য আর খোলার দরকার হলো না। ও তখন মারাই গিয়েছে। ওর হাতটা ওর পেটের ওপর বসিয়ে, একটা প্যাকেট করে ফেলা হলো। এর ব্যবস্থা কি হবে?

সমবেত প্রশ্নটা পাঠানো হলো ক্লাব হলে।

জবাব এলো, পরে জবাব দেওয়া হবে।

এক ঘণ্টা আগে ছুটি দেওয়া হলো আজ। চটকলের ইতিহাসে এরকম ঘটনাও ঘটে। কারণ, 'ওঁরা' আজ এসেছিলেন, এটা শ্রমিকদেরই সুকৃতির ফল।

শ্রমিকরা মৃতদেহটা নিয়ে বসে রইল। 'ওঁরা' থাকা পর্যন্ত তাদের অপেক্ষা করতে বলে পাঠিয়েছেন ক্রুদ্ধ ম্যানেজার।

দেশীয় নাচের ঘূর্ণিতে, নটীর ঘাগরা ফোলানো আর দেহের নানান আঁকেবাকে অদ্ভুত সব ইন্দ্রিয়-কলাকৌশল দেখে, সরকারী প্রতিনিধি বললেন কর্তাকে, দেখুন, বৌদ্ধ শ্রমণ অবশ্য সুন্দরী যুবতী নারীকে অবলোকন মাত্র তার ভিতরের কঙ্কাল-টাকেই দেখতে পেতেন। আমিও এই নটীর একটা কি যেন দেখতে পাচ্ছি, বুদ্ধের কৃপায় সেটা একটা আশ্চর্য জিনিস বলতে হবে।

—কঙ্কাল কি?—বড়কর্তা জিজ্ঞেস করলেন।

—না।—সরকারী প্রতিনিধি।

বড়কর্তা সোহাগ করে বললেন, জানি তবে সেটা মাংস নিশ্চয়?

সরকারী প্রতিনিধি বললেন, আশ্চর্য! কি করে বুঝলেন?

—যন্ত্রটা দেখে।

—কোন্ যন্ত্র?

—যে যন্ত্র মাংস কাটে। মানে, (কানে কানে) আপনার বাসনা!

সরকারী প্রতিনিধির ভীষণ হাসি পেল। চোখ তার আগেই লাল হয়েছিল। বড়-কর্তার পেটে খোঁচা মেরে বললেন, দুষ্টু।

ওঁরা সকলেই ভগবান বুদ্ধের শিষ্য৷ কঙ্কালটার নানান অংগভঙ্গি দেখে, নির্বাণ লাভের জন্য হাত নিশপিশ করতে লাগলেন।



পঞ্চায়েত

শনিবার সন্ধ্যাবেলা পঞ্চায়েত বসল মাতাদীনের উঠোনে। ঘোর সন্ধ্যায়। উঠোনের একপাশে সজনে গাছের নরম গায়ে 'তেলচেটে'র মশাল পুঁতে দিল একজন। তার অদূরে বাতাবীলেবুর তলায় পিসিড়ান অর্থাৎ সভাতির খাটিয়া পাতা হয়েছে। সেখানে দাঁড়িয়ে একজন গলায় ঝোলান ঢোলকটা পিটিয়ে দিল দুম্ দুম্ দুম্ দুম্।

জায়গাটা চটকল শহরের পুবের রেললাইন ঘেঁষা খানিকটা গ্রাম্য নিস্তব্ধতায় আচ্ছন্ন। লোকগুলো সব চটকলের মজুর হলেও পশ্চিম প্রদেশের ছোটজাতের মানুষগুলোর রীতিই একরকম। এরা সকলেই চামার, কাহার, কৈরী, কামকার, অছিরো জাত; পেছনে ফেলে আসা গ্রামকে তারা ভুলতে পারে না। তাই সাংঘাতিক দুর্ঘটনা কিছু না ঘটলে মহল্লা এলাকার অন্যায়ের প্রতিকারটা তারা নিজেরাই বিচার করে পঞ্চায়েত বসিয়ে। এ বিচার অমান্য করলে কোর্ট কাছারির ফ্যাসাদ না হোক, অমান্যকারীকে কেউ টিকতে দেবে না এখানে। জীবন তার দুর্বিষহ করে তুলবে।

ঢোল বেজে উঠল অর্থাৎ সময় হলো সভা বসবার। দু'চারটি টিমটিমে লম্ফও জ্বলে উঠল এদিকে ওদিকে। দক্ষিণের তেপান্তরের জোনাকি পোকার মতো পিটপিটে আলো জ্বলছে ডোমবস্তির কুঁড়েগুলোতে। সেখানকার ছাড়া শুয়োরগুলো ছানার পাল নিয়ে খাদ্যান্বেষণে বেরিয়েছে। তেপান্তর পেরিয়ে যখনই শুয়োরগুলো এদিককার বাড়ির নর্দমাখানার দিকে এগোচ্ছে তখনই এখানকার কুকুরগুলো ঘেউ-ঘেউ করে যাচ্ছে তেড়ে। শুয়োরগুলো ঘোঁৎঘোঁৎ করে পালিয়ে যাচ্ছে। পুবে রেল-লাইনটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে যে পাহাড়ের মতো পেপারমিলের সাদা নীল রাবিশের বিরাট স্তূপটা, সেখানে তখনো সন্ধ্যাকালীন সভা বসবার নিশানা পেয়ে কেউ তাড়াতাড়ি কাজ গুছোবার চেষ্টা করতে লাগল।

বুড়ি ভুজোওয়ালী দোকান বন্ধ করে বাদাম আর ভুট্টার খইভাজার ধামা নিয়ে এসে পঞ্চায়েতের আসরে বসল। আজকের শনিবারের সন্ধ্যার বিকিকিনি তার এখানেই হবে। কিন্তু সে এসে যখন দেখল তার আগেই কোত্থেকে একটা ঘুগনিওয়ালা এসে জমিয়ে বসে আছে তখনই তার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। নামহীন উদ্দেশে সে গালাগাল দিতে শুরু করল। খাবার বেচা না ছাই, আসলে বস্তি ঘরের মেয়েমানুষ দেখবার মতলবেই এখানে আসা হয়েছে, তা কি জানি না।

ঘুগনিওয়ালা মিষ্টি হেসে ছড়া কেটে চলল ঘুগনির রসালো ফিরিস্তি দিয়ে—যে খাবে ঘুগনিদানা, সে পাবে, সে পাবে সোনাদানা, হায় এমনি ঘুগনি এনেছি,

বহুড়ি লেড়কি মরদ পাবে, বহুড়া মরদ জরু পাবে, হায়—খেয়ে দেখ এমন মসলা দিয়েছি।

কিন্তু সে ছড়ার দিকে কারু কান নেই তখন। সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়েছে খাটিয়ার একপাশে ওই সজনের গায়ে পোঁতা মশালটার শিখার মতোই শুকালুর বিধবা বহুড়ি কুনতির উপর। আগুনের শিখাই বটে। মশালের আলোয় তার সারা দেহ আগুনের মতো জ্বলছে। শান্ত চোখের মণি দুটো শূন্যে স্থির নিবদ্ধ। দোলায়িত শিখার আলোকে কপালের টিপটা জ্বলছে দপ্‌দপ্ করে, ঠোঁট দুটো টেপা, বিদ্রুপের ভঙ্গীতে বাঁকা। উদ্ধত যৌবনের গরিমায় বলিষ্ঠ বুক মশালের আলো-আঁধারিতে যেন এক বিচিত্র উদ্দামতার রূপ নিয়েছে। কোলের ছেলেটা তার বারবারই বুকের কাপড়টা খুলে ফেলে স্তন মুখে পুরে দেওয়ার চেষ্টা করছে। না, অবুঝ স্তন্যপায়ী ছেলেটা মানুষকানা। মায়ের বুক ঢাকার গোপন লজ্জা তো সে জানে না। কুনতির ছ'বছরের আর চার বছরের মেয়েটাও দু'পাশ থেকে ঘিরে বসেছে মাকে। যেন পাহারা দিচ্ছে। বড় মেয়েটা অবাক হয়ে মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। ছোট মেয়েটা সভায় ভিড় করা মেয়ে পুরুষদের মুখগুলো গভীর সন্দেহে নিরীক্ষণ করছে তার ড্যাবা ড্যাবা চোখে। যেন এদের কাউকে বিশ্বাস নেই তার। প্রয়োজন হলে এরা বোধহয় তার মায়ের ফাঁসির হুকুমও দিতে পারে। কোলের ছেলেটা বুকের কাপড় টেনে টেনে হতাশ হয়ে হাঁ করে মশালটার দিকে তাকিয়ে রইল রাজ্যের বিস্ময় নিয়ে।

শুকালুর এ বিধবা বহুড়ি কুনতির বিচারের জন্যই পঞ্চায়েতের আয়োজন।

বস্তির মেয়েরা যে যার কাজ গুছিয়ে তাড়াতাড়ি নিজেদের একটা জায়গা করে বসেছে। যারা কাজ এখনও মেটাতে পারে নি তারা কেউ স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া লাগিয়েছে, পেটাচ্ছে বাচ্চাদের। এ সভার উপরে যেন তাদের অনেক কিছু নির্ভর করছে। কিন্তু সব পঞ্চায়েতেই মেয়েরা এরকম ভিড় করে না। যে কুনতির নিশ্বাসে তারা বিষ ঝরতে দেখে, তার বিচারসভা যদি ফস্‌কে যায় তবে বুঝি জিন্দিগীর মধ্যে একটা বিরাট ফাঁকই থেকে যাবে।

রতনতাঁতীর রোগা বউটা কিছুতেই বুকের নিশ্বাসটা আটকে রাখতে পারল না কুনতির দিকে তাকিয়ে। ইস্! কে বলবে ওই বাচ্চা তিনটের মা ওই মাগী। যেন সেদিনে গাওনা মিটিয়ে জোয়ান লেড়কি শ্বশুরঘর করতে এসেছে।

মেয়েদের সকলের চোখই প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করছে। তাদের সমবেত চাউনি থেকে ভাবটা ফুটে উঠছে এমন যেন তাদের এক দুর্জয় শত্রুকে এইমাত্র ধরাশায়ী করে তখনো ঘৃণায়, রাগে ক্লান্তিতে ফুঁসছে তারা।

মেয়েদের দলটার সামনেই যে বউটি নাকের পাটা ফুলিয়ে ঠোঁট টিপে স্থির শক্ত দৃষ্টিতে কুনতির দিকে তাকিয়ে বসে আছে সে হলো ধনিয়া। এ বস্তির মালিক মাতাদীনের দ্বিতীয় পক্ষের খান্ডার বউ। বলতে গেলে সে-ই এ পঞ্চায়েতটা ঘটাল। কুনতিকে সে কোনোদিনই সহ্য করতে পারে না। তাদের দুজনের মধ্যে ঝগড়াবিবাদ প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার ছিল, খানিকটা সতীনের ঝগড়ার মতো। শেষ পর্যন্ত কালকে কুনতির সঙ্গে তার হাতাহাতি মারামারি হয়ে গেছে। কম করে

নিজ এলাকার মেয়েপুরুষ নিয়ে দু' তিনশো লোক সে মারামারি দেখেছে। তাকে মারামারি না বলে দুই বেড়ালীর কামড়াকামড়ি খামচাখামচি বললেই ভালো হয়। কুনতির ঠোঁটের আর ভ্রূর উপরে যে ক্ষতের দাগ রয়েছে তা ওই ধনিয়ার কঙ্কণের ঝাপটাতেই হয়েছে। মহল্লার ঝি বহুড়িরা ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে দজ্জাল ধনিয়ার পিটুনি খাইয়েছে কাল কুনতিকে। কেউ ছাড়ানো তো দূরের কথা, বরং সবাই হাততালি দিচ্ছিল আর মরদদের মধ্যে যারা ছাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছিল তাদের দু'হাতে টেনে ধরে রেখেছিল। মাতাদীন পর্যন্ত মুদীখানা ছেড়ে ছুটে এসেছিল। ধনিয়া তখন কুনতির চুলের মুঠি ধরে মাটিতে লুটোপুটি করছিল, আর কি শরম কি বাত। মাতাদীন এসে দেখল ধনিয়া লড়তে গিয়ে পা দুটো ঠেস মারার জায়গা না পেয়ে এমনভাবে শূন্যে পা ছুঁড়ছে যে পুরুষরা তো দূরের কথা ঝি বহুড়িরা লজ্জায় মুখ ফেরাবার চেষ্টা করছে। সে লজ্জায়, ভয়ে "হার রাম" বলতে বলতে যেমনি ধনিয়ার গায়ে হাত দিয়েছে অমনি ধনিয়া তাকেই পা ঘুরিয়ে মেরেছে এক লাথি। আর শাসিয়ে দিয়েছে, "বাড়িবালা হয়ে তুই বুড়ো রেণ্ডি পুষবি বস্তিতে! তোর বাড়িবালার মুখে মারি ঝাড়ু।"

মাতাদীনের আর চোদ্দ পুরুষেরও সাহস ছিল না ধনিয়ার গায়ে হাত দেয়। সে তার ঝুলে পড়া গোঁফের ফাঁকে "হায় রাম" করতে করতে বসে পড়েছিল। যেন তাইতেই দেবী তুষ্ট হয়ে রোখ ছাড়বে।

এরকম কতক্ষণ চলত বলা যায় না যদি এ সময়টাতে হীরালাল না এসে পড়ত। সে এ বাড়ির বাসিন্দা ঠিক নয়, তবে এ মহল্লা এলাকায় তাকে সবাই খুব ভালো-ভাবে চেনে। নানান্ জনে তার নানান নাম দিয়েছে। কেউ বলে ফেরেববাজ, কেউ বলে গুণ্ডা, কেউ বা খুব লিখাপড়া জানা "জোয়ান", কেউ কেউ চোখ বড় বড় করে ফিসফিসিয়ে বলে, 'ও ছিয়াশি মানায়'। অর্থাৎ বিপ্লবী মানুষ। সে যে কি তা অবশ্য নিশ্চয় করে বলা কঠিন। তবে সে হলো চটকলের একজন স্পিনার, একলা বে-ঝামেলার মানুষ। সাদী বেহা'র ধার ঘেঁষে নি সে।

ব্যাপারটা এসে দেখেই তার সমস্ত মুখটা রাগে ঘৃণায় বেদনায় জ্বলে উঠল। পরমুহূর্তেই কঠিন বিদ্রূপে হেসে সে চিৎকার করে উঠল, 'আরে বাহ্‌বা, কেয়া মজাদার খেলা। বেশ বেশ। কুনতির ছেলেমেয়েরাও ধূলায় পড়ে ডাক ছেড়ে কান্না জুড়েছে। সেদিকে দেখে বলল, 'আরো জোরে চিল্লা, এদের কানের পর্দা একটু মোটা কি না।' ধনিয়া তখন কঙ্কণের ঝাপটা মারছে কুনতির ঠোঁটের পাশে। সেদিকে দেখে বলে উঠল, 'আরো জোরে, আরো জোরে চালাও বাড়িবালি ভউজি। ঠোঁট যদিও বা ফাটে, থুৎনিটা ভাঙবে না ওতে।'

হীরালালের উলটো গাওয়ার ফল ফলতে দেরি হয় নি। ধনিয়ার হাত আপনা থেকে শিথিলই শুধু হয়ে এলো না—জোঁকের মুখে নুন দেওয়ার মতো এতক্ষণ যে লজ্জার মাথা একেবারেই খেয়ে বসেছিল তা যেন চকিতে তাকে অবশ করে দিল। সে তাড়াতাড়ি পা আর ঘোমটা ঢাকবার জন্য নিজের কাপড় নিয়ে টানাটানি শুরু করল।

কুনতি এ মারামারিতে প্রতিরোধের চেষ্টাই করেছে। সে-ও প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায়

নিজেকে ঢাকবার চেষ্টা করছে। ছেলেমেয়েগুলি মা-কে মুক্ত পেয়ে তখন ধরেছে ছেঁকে।

কিন্তু হীরালালের বাক্যবাণ তখনও শেষ হয় নি। সমবেত মেয়েপুরুষদের দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'একি, রাজা মহারাণীর দল তোমরা থেমে গেলে কেন? ভউজিদের নিয়ে আর একবার মার হাততালি, মাদারিখেল্ শুরু হয়ে যাক্।'

বিদ্রূপটা স্পষ্ট না বুঝলেও সকলেই কেমন বিব্রত কাষ্ঠহাসিতে দাঁতগুলো বের করে রাখলো শুধু। হীরালাল মঞ্চের অভিনেতার মতো দু'পা এগিয়ে এসে আবার বলল, 'সারাদিন বাদে সাহেব সর্দারের ঠোক্কর খেয়ে কারখানা থেকে ফিরে এসেছ, এখন একটু খেলা না জমলে দিলখুস হবে কেন? কি বল বৈজু ভাই? মুরগীর লড়াই নয়, ষাঁড়ের লড়াই নয়, একেবারে অওরতে অওরতে। আরে বাপ্রে।'

চলল সে হাসতে হাসতে কিন্তু তার চোখ দুটো যেন ধক্ধক্ করে জ্বলছে। জমাটি ভিড়টা তখন তাড়াতাড়ি ভেঙে যেতে বসেছে।

সময় বুঝে মাতাদীন উঠে দাঁড়াল। হ্যাঁ, এতক্ষণে তাকে বাড়িওয়ালা বলে চেনা যাচ্ছে। গোঁফটা দু'হাতে তুলে, সকলের দিকে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে সে ঘোষণা করল, 'কাল এর বিচার হবে, পঞ্চায়েত বসবে। সকলে হাজির থাকবে। এসব আর চলবে না আমার বাড়িতে।'

'জরুর!' হীরালাল পা ঠুকে বলল, 'এতদিন চলল কি করে সেটাই তাজ্জবের ব্যাপার।' বলে সে এমনভাবে মুখটাকে বিকৃত করে তুলল যে, তাই দেখে মাতাদীন চলে যেতে যেতে অস্ফুট গলায় বলে উঠল, 'লুচ্চা কাঁহিকা।'

ভিড়টা কেটে গেল প্রায়। কুনতি গায়ের ধুলো ঝেড়ে ওইখানে বসেই কোলের ছেলেটাকে স্তন পান করাচ্ছে। কিন্তু ছেলেটা বার বার স্তন থেকে মুখ তুলে মায়ের ঠোঁটের রক্তাক্ত ক্ষতটা নিরীক্ষণ করছে আর শিশু মনের কৌতূহলেই বোধ-হয় তার ছোট আঙুলের ডগায় ক্ষত থেকে রক্তের ফোঁটা নিয়ে নিজের ঠোঁটের পাশে ঘষে দিচ্ছে। মেয়ে দুটো গালে চোখের জলের শুক্নো দাগ নিয়ে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে মায়ের দিকে।

রাগে না ক্লান্তিতে বোঝা যায় না, কুনতির বুকটা তখনও ফুলে উঠছে। কাপড় ঢেকে ছেলেটাকে স্তন খাওয়াতে চাইলেও তার সুগঠিত বুক আনমনা অবহেলায় খানিক উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে। কেঁপে কেঁপে উঠছে তার ঠোঁটের পাশের নিয়ত রহস্যময় বঙ্কিম রেখাটি। তবু চোখে তার এক ফোঁটা জল নেই। এত ধুলো মাখামাখিতেও জ্বলজ্বল করছে পেতলের টিপটা তৃতীয় নয়নের মতো তার ভুরুর মাঝখানে।

একমুহূর্ত স্তব্ধ থেকে হঠাৎ হীরালাল নিচু গলায় বলল, 'চোটটা বড় জোর লেগেছে। বলিস্ তো ডগদরবাবুর কাছ থেকে থোড়া দাওয়াই নিয়ে আসি?' বলতে বলতে বিদ্রূপভাষী হীরালালের মুখটা একেবারে অন্যরকম হয়ে উঠল।

কিন্তু কোনো জবাব দিল না কুনতি। শুধু মেয়ে দুটো অবাক হয়ে হীরালাল-চাচার দিকে তাকিয়ে রইল সংশয় নিয়ে। জন্মের পর থেকে ওরা দেখেছে, যারা মায়ের সংগে কথা বলে তারা সকলেই মতলববাজ।

পরমুহূর্তেই হীরালাল গম্ভীর হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'বেশ তুই-ই বল্ না কেন, তোর মতো কোনো বিধবা বহুড়ি কেবলি যদি পেটে বাচ্চা ধরে কার না গোসা হয় ? মহল্লার মেহেরারুরা তোকে কোন্ দিন পিটিয়েই মেরে ফেলবে।'

কুনতি এবার ফুঁসে উঠল, 'আপনা পেটে ধরি, কার বাবার কি ?'

'বাঃ বেশ বলেছিস্। কার বাচ্চা ধরিস ?' হীরালাল হাসতে চেষ্টা করে।

কুনতি ছেলে নিয়ে উঠে বলল, 'যারই ধরি তোমার তো নয়।'

'আফসোস!' এবার হেসে ফেলল হীরালাল।

হঠাৎ আগুনের মতো জ্বলে উঠে কুনতি বলল, 'আফসোস নয়, তোমার মতলব আমি খুব জানি। ভুলিয়ে ভালিয়ে ফোকাটিয়া কাম চাও তুমি। সে ওই বুড়ো ভাতারি ধনিয়ার কাছেই হবে।' বলতে বলতে রুদ্ধ কান্নায় থম্থমিয়ে উঠল তার মুখ।

হীরালাল দরাজ গলায় হেসে উঠল এবার।

কুনতি আপন মনে বলে উঠল, 'পঞ্চায়েত হবে, বিচার হবে আমার। খানা বিনা যখন মরছিলাম কটা পঞ্চায়েত বসেছিল তখন ? বেহায়া দুনিয়ার ফুটানির মুখে মার ঝাড়ু।'

যেন ঝাড়ু দিতে দিতেই ঘরে চলে সে। কেবল হীরালালের উদ্গত হাসিটা বুকেতেই আটকা পড়ে গেল। আপন মনে বিকৃত মুখে বিড়বিড় করতে লাগল সে, 'বেহায়া দুনিয়ার ফুটানি…'

দূর থেকে এ দৃশ্য দেখে যার বুকে জ্বালা ধরে গেল, সে হলো ধনিয়া। নিজের জ্বালায় সামনে উনুনের উপর কড়াতে যে ভাজি পুড়ে ছাই হয়ে গেল তা সে খেয়াল করল না। কেবলি মনে হতে লাগল, হীরালালের মতো মানুষ ওই রেণ্ডিটার সঙ্গে কি কথা বলছে এতক্ষণ ?

এতক্ষণে হঠাৎ কুনতি পঞ্চায়েতের আসরে চোখ তুলে ধরলো। সত্যিই সেই দিল-খোলা হাঁকডাক করা মানুষ হীরালালটা কোথায় ? কুনতির বিচারে কি সে গরহাজির থাকবে ?

সে মুখ তুলতেই নতুন বিয়া করা বিট্লে হাসকুটে ছোঁড়া পুনিয়া দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'এই যে বড় ভউজি আমি এখানে। কি বলবে বল ?' যেন কুনতি তাকেই খুঁজছে।

কুনতি অপ্রতিভ ভাবেই মুখটা ফিরিয়ে নিল তার দিক থেকে। পুনিয়া অমনি দু'হাত তুলে হতাশার ভঙ্গি করে বলল, 'হায় রাম! আমাকে নয় ?' একটা হাসির রোল পড়ে গেল চারদিকে।

রাগে বিস্ময়ে অবাক মানল ঝি বহুড়িরা, পুনিয়ার ঠাট্টায় কুনতির ঠোঁটে হাসির ঝিলিক দেখে। পুনিয়ার নতুন বউ পাকা পাকা মেয়েটা রুপোর নতুন নথ্টা নাড়িয়ে বলল, 'ওমা, মাগী কি বে-শরম!' বলে সে চোখ পাকিয়ে তাকাল পুনিয়ার দিকে। পুনিয়া একচোখ বুজে তার জবাব দিল।

মিসিমাখা মাড়ি বের করে বলল বুড়ি ছেদি, 'রেণ্ডির আবার শরম। জোয়ানী উমরে আমাদেরও গোলমাল হয়েছিল। পঞ্চায়েত হয়েছিল, সাজা দিয়েছিল। তা

আমরা কি ওই হারামজাদীর মতো বসেছিলাম ? বুক অবধি ঘোমটা ছিল—হাঁ।'
না জানি কি কথাই বলল এমন বুড়ির ভাবখানা।
রতনের রোগা বউটা বলে উঠল, 'মহল্লার মরদদের রক্ত খাওয়া চেহারা যে। খুলে দেখাবে না ?'
এমন সময় পুরুষদের মধ্য থেকে একজন দুহাত কানে লাগিয়ে গলা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে গেয়ে উঠল,

এ যমুনাকে যানে বহলি, কাঁহি তোরি গোর লাগি
উদাস তুহার নয়ন হম্‌সে মিলাকে যা।

চারদিক থেকে একটা উল্লাসধ্বনি উঠল, হায় হায় হায়।···
আর একজন সরু গলায় সুর করে রাধার উক্তি করে উঠল,

চোট্টা কানাইয়া কাল্য বিল্লি বন্‌কে আওত···

হাসি আর খেউড়ের ঝড়ে সমস্ত পঞ্চায়েতের সভাটা উন্মত্ত হয়ে উঠল।
কিন্তু যাকে উদ্দেশ করে এত গান হল্লা, সেই কুনতি নির্বিকার। মেঘের কোণে বিদ্যুৎ চমকানির মতো শুধু তার ঠোঁটের কোণের বঙ্কিম রেখাটি ও কপালের উজ্জ্বল টিপটি ঝিলিক দিয়ে উঠছে। কিন্তু তা যেন ঘুমন্ত অজানায় আচম্বিতে। ভিড়ের মাঝে চোখজোড়া তার খুঁজছে হীরালালকে।
মাতাদীন চিৎকার করে উঠল, 'চুপ, চুপ সব বেতমিজ কোথাকার। পঞ্চায়েতের কারবার এখুনি শুরু হবে। ঠাকুরজী আসছে।'
ঠাকুরজী অর্থাৎ হড়কু ঠাকুরজী আসছে। নিজেদের গাঁ ঘরে পঞ্চায়েত হলে সরপঞ্চ অথবা রউয়া হুজুর মালিকেরাই সভার প্রধান হয়। না হলে নিজের জাতের মুখিয়ারা সভাপতিত্ব করে। এখানে এই বিদেশে চটকল শহরে সে সুযোগ নেই, তার উপায়ও নেই। কালোবাজারে যারা ধনে মানে বড় বা কারখানার হেডসর্দার, তেজারতী মহাজনী কারবারী, তাদেরই এরা 'পিসিডান' অর্থাৎ সভাপতি করে কাজ চালায়।
ঠাকুরজী একজন মস্ত ধার্মিক তো বটেই, সুদী কারবারী বলেও বিখ্যাত। এখানকার ফকির কুলি-কামিনকে অভাবে ধারকর্জ দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে। সুদটা একটু বেশী। কিন্তু সে তো সে নেয় পরমেশ্বর রামজীর সেবার জন্য। আর ডোম বস্তির দক্ষিণে অন্ধ গলিতে যে সুদীর্ঘ বেশ্যাবস্তিটা গড়ে উঠেছে তার কর্তাও সে। বলে, ঘরের ময়লা সাফ করে ফেলবার জন্য একটা আঁস্তাকুড় তো চাই। সে তোমার দেওতার রাজত্ব স্বর্গেও খানিক আঁস্তাকুড় আছে। দুনিয়ার নিয়ম এটা।
ইতিমধ্যে মাতাদীনের উঠোনটা একেবারে ভরে গেছে। ভিন্ মহল্লার যারা শুনেছে ঘটনাটা, তারাও এসেছে। কেননা কুনতি কম বেশী সব মহল্লাতেই পরিচিতা। পঞ্চপান্ডবের মা শাশ্বত কুনতি সূর্যদেবতার অনুরাগে পুড়ে লুকিয়ে সেই অগ্নিগর্ভে নিজের যৌবন সমর্পণ করেছিল। লাভ করেছিল অবৈধ সন্তান। সবাই বলে এটা নাকি কলিযুগ। হীরালাল বলে নোকরশাহীর যুগ। এ যুগের কুনতি নিজেই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের মতো মহল্লায় জোয়ান মরদদের দিল পুড়িয়ে বেড়ায়। মহল্লাগুলো মাতাল হয়ে ওঠে, সেই আগুনে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য। তাই তার বিচারে এত

ভিড়। কেউ রীতিমতো শুঁড়ি-তাড়িখানার আড্ডা ছেড়ে এসেছে চলে। তবে এই জমাটি সভায় পানীয়ের ভাঁড়টি নিয়ে এসেছে কেউ কেউ। তা ছাড়া গতকাল গেছে শুক্রবার, হপ্তার দিন, শনিবারের রাত্রে আকণ্ঠ পিপাসা না মেটালে সমস্ত সপ্তাহ-টাই যে ব্যর্থ।
লম্ফ আরও দু' একটি এসেছে। ঘুগনিওয়ালার হাঁড়ি প্রায় শেষ। ভুজাওয়ালী একটানা বক্‌বক্‌ করে গালাগাল দিয়েই চলেছে। কেননা এখনও তার কাছে ঘেঁষে নি কেউ। আর এই ঘুগনি খানেওয়ালারাই না ঘরে চাল আটা গিলে শেষ করে ধারে তার ভুট্টা আর ছাতু খেয়ে পড়ে থাকে। বেইমানের দল।
একপাশে আর একটি পঞ্চায়েত বসেছে। তবে সেটা হলো ছোট ছোট বাল-বাচ্চাদের। অনুকরণেরও কায়দা আছে। বড়দের সভায় এখনও সভাপতি আসে নি যখন, তখন তাদের সভায়ও ইটপাতা আসনটি খালি রয়েছে। সবচেয়ে দেখতে ভালো ভিখারির মেয়েকে তারা বানিয়েছে কুনতি, আবার তার থেকেও বড় দুটো মেয়েকে বানানো হয়েছে তার মেয়ে। মাতাদীনের আগের পক্ষের ধুমসো পাঁচ বছরের ছেলেটাকে সাজানো কুনতির ছোট্ট কোলটিতে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে তার ছেলে বলে। বেচারীর জান যায় আর কি? কিন্তু অমান্য করবার উপায় নেই।…বড়দের মতো এরাও গান আর খিস্তি জুড়েছে। কেবল বৈজুর ছেলেটা সাজানো কুনতির কানের কাছে সবাইকে লুকিয়ে বার বার বলে যাচ্ছে, এ খেলাটা মিটে গেলে তোর সঙ্গে আমার সাদী হবে, অ্যাঁ?
কিন্তু সাজানো কুনতি নির্বাক। কারণ আসল কুনতিও নির্বাক যে!
হঠাৎ ভিড়ের মাঝখান থেকে হীরালাল চেঁচিয়ে উঠল, 'মার হাততালি, খেল্‌ এখনি শুরু হবে। ওস্তাদ আসছে।'
একদল সত্যি সত্যি হাততালি মেরে উঠল। ওস্তাদ অর্থাৎ হড়কু ঠাকুরজী আসছে। মাতাদীন গোঁফের পাশ দিয়ে হিসিয়ে উঠল, 'লুচ্চা কাঁহিকা।'
হীরালাল চকিতে একবার কুনতিকে দেখে নিল। কুনতিও তার দিকেই তাকিয়ে-ছিল। সে অবাক্‌ মানল লোকটার এতক্ষণ ভিড়ের মাঝে চুপ করে বসে থাকা দেখে! কেন? এত দিল্লেগী, এত ফালতু বাত যে করে, কুনতির বিচারে বুঝি তার কোনো আগ্রহ নেই! তার আদমি শান্তশিষ্ট শুকালু ছিল জোয়ান হীরার মস্ত ভক্ত। প্রথম যেদিন সুদূর গ্রাম ছেড়ে ঘর ছেড়ে শুকালু এই চটকল শহরে এলো সেদিন থেকেই যেন সে ভেঙে পড়েছিল। সেই ভেঙে পড়ার দিনে হীরা ছিল তার একমাত্র অন্তরঙ্গ। নানা দেশ-বিদেশের গল্প করত আর মাঝে মাঝে আগুনের মতো জ্বলে উঠত নিজেদের জীবনের কথা বলতে গিয়ে, 'আরে গোলামের জান্‌ আছে, আমাদের চটকলিয়াদের শালা তাও নেই। আমরা মেশিন, দোসরা আদমির মর্জি আমাদের চালায়।' কখনো কখনো শুকালুর শান্তিপনাকে সে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ করত, 'হাঁ, আশমানের দেওতার দিকে তাকিয়ে থাক, সে একদিন আবার তোমাকে নিরালা গাঁয়ের ভিটায় তুলে দিয়ে আসবে।' কিন্তু পরমুহূর্তেই শুকালুর হাতটা চেপে ধরে বলত, 'দোস্ত, তুমি এরকম থেকো না, মরে যাবে। এ যে চটকলের বাজার! কিছু না পার, দমভর দারু পিও, মাতলামি কর, জরুকে পাকড়ে পেটাও, নইলে

যত শোচ্‌বুঝ করবে, তত দেখবে, চটকল তোমাকে গিলতে আসছে। আর নইলে …নইলে ফিকির কর এ দুনিয়া পাল্‌টে ফেলবার।' কিন্তু গিলেই ফেলল চটকল শুকালুকে। দু' সাল গেল না, ভঁইষের লেজ মোচড়ানো লাঙল ধরা হাতে যেদিন এসে মেশিনে হাত দিল সেদিন থেকেই মৃত্যু তার হৃৎপিণ্ডে জেঁকে বসল। ওহো, কি মড়ক যে এসেছিল দেশে! মানুষ মরল, ভঁইষ মরল, জমিন্‌শক্ত হাঁ করে পড়ে রইল বাপ-হারা বেটীর মতো। মহাজনের রাক্ষুসে হাত দরজায় দরজায় থাবা বাড়াল। …শস্যহীন ঝরাপাতায় ছাওয়া উঠানের উপর দিয়ে কুনতিকে নিয়ে চলে এলো সে! মোষ বাঁধার শূন্য খোঁটাটা নীরব ব্যথায় স্তব্ধ হয়ে যেন তাদের বিদায় দিয়েছিল। কিন্তু মানুষটা বাঁচলো না।…

নিশ্বাসে দুলে উঠল কুনতির বুক। সামনে থেকেই কে যেন জিভ দিয়ে তু তু শব্দ করে উঠল সান্ত্বনা দিয়ে। রতন তাঁতীর বউ হাত বাড়িয়ে বলে উঠল, 'এখন কত পানি পড়বে চোখের। রাক্ষসের মতো পেট বাগানোর সময় মনে ছিল না?' খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল ধনিয়া। বুড়ি ছেদি মাড়ি বের করে বলল, 'চোখের পানিতে না সভাটাই ডুবে যায়।'

ও! কুনতির চোখে বুঝি জল এসেছে! তাই সান্ত্বনার তু তু শব্দ, বহুড়িদের এত কথা! তাড়াতাড়ি আঁচল দিয়ে জল মুছল সে। ঘুমন্ত কোলের ছেলেটাকে মাটিতে শুইয়ে দিল।

বৈজুদের দলটা ততক্ষণে তাড়ির নেশায় চুর চুর। মত্ত বৈজু চেঁচিয়ে উঠল, 'বোলাও শালা লেবার বাবুকে, হাজির কর হাজিরা বাবুকে, বলুক সামনে এসে আমার কাছ থেকে দুশো টাকা ঘুষ খেয়েছে কিনা।'

মাতাদীন খিঁচিয়ে উঠল 'নিকাল দেও গিদ্ধর মাতালটাকে।'

তাড়িমত্ত আর একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'হাঁ নিকাল দেও মাতালটাকে।'

হাসি আর সোরগোল পড়ে গেল একটা।

কিন্তু হীরালাল 'বৈজু'র নাম ধরে একটা হাঁক দিতেই মাতালের দলটা সামলে উঠল খানিকটা। তারপর আর সবাইকে হাতজোড় করে বিনয়ে হেসে বলল সে, 'মেহেরবানি করে একটু শুনুন হুজর হুজরাইনরা, দিল কি বাত্‌ একটু বাদেই করবেন।'

কুনতি তাকিয়েছিল হীরালালের দিকে। হ্যাঁ, এমনি দিলজ্বালানো দিল্লাগি করা স্বভাব লোকটার। হপ্তা আর ছুটির দিনে যখন ছোকরা মরদেরা সাফা জামা গায় দিয়ে মাথায় তেল চুর চুর করে বেরোয়, তখন হীরা তাকে সেলাম করে যেমন কারখানার সাহেব সর্দারকে করে আর বেশ্যাগলির পথটা দেখিয়ে বলে, 'হুজুর, গরমী বিমারের দাওয়াইয়ের দামটা ফেরবার সময় হড়কু ঠাকুরজীর কাছ থেকে উধার নিয়ে এসো।' মেয়েরাও সেজেগুজে এদিক ওদিক দেখে চট করে বস্তি থেকে বেরিয়ে পড়ে। কেউ যায় জংলা ঘুমে। কারখানার বাঁধাধরার মধ্যে থেকেও জীবনের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম যেন নেই এখানে। প্রতি মুহূর্তের নিরাশায় উচ্ছৃংখল মহল্লাগুলোর কোনো কোনো জোয়ানী সব ভুলে অভিসারে বেরিয়ে পড়ে। হীরা তাদের বলে 'শুনো হো, একটা গল্লার গল্লায়ও মুহব্বতের দাঁড় পরিও,

নইলে তোমার আ'নেবালা বাচ্চা দুধ বেগর পটল তুলবে।'

তার কথায় কেউ হাসে, কেউ রাগে। কিন্তু সকলেরই মনটা শুধু দমে যায় না, কেমন যেন বিব্রত, অস্বস্তিতে বুক ভরে ওঠে। কিন্তু হ্যাঁ, বড় তাজ্জবে অবাক্ হয় কুনতি। লোকটা নিজে কোনো আওরতের কাছে ধরা দেয় না। না, কুনতির কাছেও না, যার দিকে মহল্লার সব মরদেরা হাপিত্যেশ করে তাকিয়ে থাকে। অথচ কুনতি একসময়ে ভাবত…

আবার শুকালুর কথা মনে পড়ে গেল তার। লোকটা মরে গেল। কিন্তু এখানকার ভাষায় সে বিধবা হলো না, হলো বেওয়ারিশ আওরৎ। চটকলের পাট-ঘরে তার একটা সল্‌তানি বদলি নোকরি মিলল। সল্‌তানি অর্থে পার্মানেন্ট। বদলি মানে অন্য মেয়ে মজুর যখন ছুটিতে যায়, রোগে পড়ে, তখন সে পুরো মাইনে পায়। না হলে কোম্পানী থেকে প্রত্যেক সপ্তাহে দুটাকা মাইনে দেবে।…জোয়ান উমরের আওরৎ, সন্তানহীনা, চলতে ফিরতে বলিষ্ঠ শরীরে তার যৌবন যেন উছলে পড়ত। শোকাচ্ছন্ন হীরা দূর থেকে তাকিয়ে থাকত। কি যেন সে বলতে চায়, কি যেন বোঝাতে চায় তার চোখের চাউনি। কিন্তু দ্বিধা সংকোচে এগুত না। কুনতি ভাবত, কি বলবে বল না জোয়ান, অমন করে চেয়ে কেন থাক। হীরার ভাব দেখে সেই মুলুকের গাঁয়ের লু বয়ে যেন বুক পুড়ে যেত তার। এ সময়েই একজন তাকে বিয়ের নাম করে ঘরে নিয়ে তুলল। কিন্তু মতলব ছিল লোকটার। একদিন গভীর রাতে পাটকলের সর্দারকে ঘরে এনে ওর আলিঙ্গনে তুলে দিল কুনতিকে। বাইরের থেকে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলল, সল্‌তানি বদলি নোকরিটা পেলি, তার নজরানা দিতে লাগবে না?…

সেই হলো তার নতুন জীবনের শুরু। ধীরে ধীরে শোকের ছায়াটা কেটে গিয়ে স্বাভাবিক বিদ্রূপে হাসি ফুটে উঠল। বলত, 'জিতা রহো চটকল বাজার।' কুনতিকে আর সে ভউজি বলত না। নাম ধরে মাঝে মাঝে বলত, 'তোর মতলব ভালো নয়। নইলে এত মরদ থাকতে কারুর সঙ্গে তো তোর মহব্বত হয় না।'

মহব্বতের কথা শুনলে কুনতির ঠোঁটের বঙ্কিম রেখাটি আরও বেঁকে ওঠে কঠিন বিদ্রূপে। মহব্বত! ··পরপর কয়েক ঘর ঘুরেছে সে শুধু বিয়ের আশায়। কিন্তু বিয়ে কেউই করে নি। উপরন্তু পেটে এসেছে বাচ্চা, ঘর করার নামে মিলেছে শুধু মাতালের মার। তারপর নিজের ভার নিজেই নিয়েছে সে।

না, তবু কুনতি হীরালালের ধাতটা ঠিক বুঝতে পারে না। রোজই একবার খবর জিজ্ঞেস করে সে আর বলে, 'এ পথ ছেড়ে দাও।'

কোন্ পথ ধরবে কুনতি? অনাহার আর মৃত্যু? জিজ্ঞেস করলে খানিকক্ষণ ধম্ ধরে থেকে বলে, 'নাঃ তোমার ভালো মতলব নেই।' কিন্তু তার মতলবও কুনতি আবার বুঝতে পারে না। তবে কি ··

হ্যাঁ, সেই ভেবে কোনো কোনো দিন বিলোল কটাক্ষে মোহিনী ভঙ্গিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সে হীরাকে। ভ্রূর মাঝে টিপ কাঁপিয়ে হেসেছে। কিন্তু হীরা বিকৃত মুখে দূরে সরে গেছে। রাগলে তাই কুনতি বলে, 'ফোকাটিয়া কাম চাও তুমি।' সভার মধ্যে হঠাৎ মাতাল মহাদেও চেঁচিয়ে উঠল বুক চাপড়ে, 'কসম খেয়ে বল্‌ছি

ওর আদমি শুকালু আমার কাছ থেকে বারো আনা উধার নিয়েছিল।'

মাতাল বৈজু তাকে দু' হাতে ধরে বলল, 'ওরে শালা, আদমি মরে গেলে উধার শেষ হয়ে যায়।'

মহাদেও তবুও চেঁচাতে লাগল, 'আমি বল্‌ছি উধার নিয়েছে।'

হীরালাল উঠে গিয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'তবে কি হবে হুজুর? কুনতিকে আপনার চাই?' মহাদেওয়ের ঘোলাটে চোখ ঘোলাটে হয়ে উঠল আরও। সে চুপ করে গেল।

মাতাদীন চেঁচিয়ে উঠল, 'নিকাল দেও মাতালগুলোকে।'

বৈজুও মাতাল গলায় হেঁকে উঠল, 'হাঁ নিকাল দেও শালাদের।'

ঘুগনিওয়ালা তার শেষ কথাটিও মাতালদের কাছে বিক্রি করে এবার পঞ্চায়েতের বয়ান শুনবার জন্য এগিয়ে এসে বসল। ভুজাওয়ালী আপনমনে শুধু বকে চলেছে, কাল থেকে কাউকে আর আমি উধার দেব না। ইমান থাকে তো ধার খানেওয়ালারা এখনি পয়সা মিটিয়ে যাও।

ধার খানেওয়ালারা বোধহয় ইমানদার কেউই নয়। কারণ, কেউই তার কথার জবাব দিল না।

কেবল হীরা বলল ঠোঁট কুঁচকে, 'নানী, সব বেটা বেইমান।'

মাতাদীন হাঁকল, 'চুপ চুপ।'

সভাপতি হড়কু ঠাকুরজী বলল, 'সবই রামজীর খুশীতে চলছে। এই যে আওরৎ-টিকে তোমরা এত গালি বকছ, ওর এই দুর্ভাগ্য তো রামজীর কৃপা।'

বুড়ো নাথুনি ঘাড় দুলিয়ে বলল, 'ঠিক, ঠিক।'

কিন্তু তার থেকেও কয়েক কাঠি বুড়ো মতিলাল বলে উঠল নাথুনিকে, 'তোমার মাথা। ওই ছেদিকে যখন তুমি…'

তার কথা শেষ হওয়ার আগেই মেয়েদের মধ্যে একটা শোরগোল পড়ে গেল। কারণ রামু হামাগুড়ি দিয়ে পেছন হটতে হটতে একেবারে হরিশের বহুড়ি শ্যামদেইর গায়ের উপর গিয়ে পড়েছে। কি ব্যাপার? কেউ লক্ষ্য করে নি, পঞ্চায়েত সভায় কখন রামুর পাওনাদার কাবুলীটা এসে দাঁড়িয়েছে। গতকাল হপ্তা পেয়ে সে কোনোরকমে কাবুলীর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়েছিল। আজ আর কেউ না দেখুক, রামুর নজরটা ওদিকে কড়াই ছিল। কিন্তু লুকোতে গিয়ে যে মাঠের মাঝে হাঁড়ি ভেঙে যাবে তা সে ভাবে নি।

ব্যাপার বুঝে কাবুলীটা একবার লজ্জিত সন্ত্রস্ত রামুর দিকে অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করে বিড়বিড় করতে করতে চলে গেল। 'কাল সবেরে শালা তুম্‌কো পাকড়া-য়েগা।'

কিন্তু রেহাই দিল না শ্যামদেই। সে গলা চড়িয়ে গালাগাল দিতে শুরু করল। ফলে রামুর বউ পাতিয়াও কোমর বেঁধে এলো।

বুড়ি ছেদি মাড়ি বিকশিত করে বলল, 'হায় রাম। আমি ভাবি বুঝি আন্ধারে মহব্বতের কারবারই চল্‌ছে। তবে বলি শোন্‌ ওই বুড়ো-নাথুনির কথা। এক-বার…'

প্যাতিয়া তখন শ্যামদেইকে ছেড়ে রামুকে ধরেছে। কুনতিকে দেখিয়ে বলল, 'আরে, যা রে কামিনা আদমি রেন্ডি তোর বসে আছে।'
তারপর সে কাঁদতে শুরু করল, 'ওই মাগী জরুর আমাদের হপ্তার টাকায় ভাগ বসায়, জরুর।'
বুড়িদের কয়েকজনও ওই কথা বলে চেঁচিয়ে উঠল।
মাতাদীন হামলে উঠল, 'চুপ, চুপ কর সব।'
মাতাল বৈজুও হেঁকে উঠল, 'চুপ, চুপ কর সব।'
হড়কু ঠাকুরজী আবার শুরু করল কুনতিকে দেখিয়ে, 'বেচারীর তগদীর। তবে ওর মতো আওরতের এ বস্তিতে থাকা চলে না কি বল ?'
মেয়েরা বলে উঠল, 'জরুর।'
কিন্তু ধনিয়ার চোখ জোড়া জ্বলে উঠল, ফুলে ফুলে উঠল বুক আর নাকের পাটা। তার জ্বলানো রোষের রোশনাই ঝিলিক দিয়ে উঠল নাকের নাকছাবিতে। সে বলে উঠল, 'ওই মাগীকে কবুল খেতে হবে, ওর বাচ্চাগুলোর বাপ কে।'
মেয়েরা কলরব করে উঠল ধনিয়ার কথার প্রতিধ্বনি করে।
প্রশ্নটা শুনে থমকে গেল সভাটা। এমন কি হড়কু ঠাকুরজীও। মাতাদীনের গোঁফ জোড়া যেন বসে গেল।
ইতিমধ্যে লম্ফ দু' একটা নিভে গেছে। মশালের আলোয় ঝিলিক দিয়ে উঠল কুনতির কপালের টিপ। উদ্ধত বুক টান করে বসল সে, বুঝি দুলে উঠল নাগিনীর মতো। কেঁপে কেঁপে উঠল ঠোঁটের রহস্যরেখা। অঙ্গারের মতো প্রজ্বলিত চোখ তুলে তাকাল সে সমবেত পুরুষদের দিকে।
তার মেয়ে দুটো অবাক আকুল অপলক চোখে মায়ের দিকে তাকিয়ে রইল। তাদের আবার বাপ, তাদের আবার বাপ আছে নাকি ?
পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ অন্ধকার ঘেঁষে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ সন্ত্রস্ত ভীত জানোয়ারের মতো মাথা নিচু করে রইল বসে। স্তব্ধ, নিঃসাড় সভা।
ঝি বুড়িদের অপলক চোখগুলো প্রতিহিংসায় জ্বলজ্বল করছে।
হীরালাল চিৎকার করে উঠল, 'বাতলে দাও, দেখি কে বাপের ব্যাটা আছো, বাতলাও মরদেরা।'
সারা মুখে কুনতির নির্মল হাসি। চোখ দুটো যেন ছুরির ফলার মতো চকচক করছে। পুরুষদের মুখের উপর দিয়ে চোখ তার যেন অনুসন্ধানী তীক্ষ্ন আলোর মতো এগিয়ে চলল। কে ? কে তার এ বাচ্চাদের বাপ ? এই পুরুষদের মধ্যে কোন্ জন ? কে, কে ?
খুঁজতে খুঁজতে কুনতির চোখ পড়ল হীরার উপর। অবাক মানল সে হীরার মুখ দেখে, খুশীও হলো। এত আগ্রহ হীরার এ জবাব শোনবার জন্য ?
কিন্তু হায়, কুনতি কেমন করে বলবে এর মধ্যে কারা বা কে তার সন্তানের বাপ। একলা কার মুখে চুনকালি মাখাবে সে, কার ঘর ভাঙবে ?
প্রতিহিংসায় প্রজ্বলিত বুড়িদের দিকে তাকাল সে। দেখল অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে পালানো মানুষগুলোকে। বেলাশেষের শান্ত ঝিলের মতো ছায়া নেমে এলো

কুনতির চোখে। তার সন্তানের আছে শুধু মা, বাপ নেই। মা বাপ দুই-ই ওদের কুনতি। আকুল আগ্রহভরা নিজের মেয়ে দুটোর চোখের দিকে তাকিয়ে যেন আচমকা বুক থেকে একটা তুফান উঠে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসতে চাইল তার। নিজের সন্তানদের উদ্দেশ্যেই যেন সে মাথা নেড়ে বলল, আমি জানি না।

মেয়েরা আক্রোশে ফেটে পড়ল। বুড়ি ছেদি বলল, 'আমি কসম খেয়ে বলতে পারি, ও মাগী পঞ্চায়েতের রায় কিছুতেই মানবে না। নইলে সাফ জানিয়ে দিলে ও কবুলে খাবে না?'

মাতাদীন আর ঠাকুরজী কি বলতে চাইল। গোলমালে ডুবে গেল তাদের কণ্ঠস্বর। পুরুষদের মধ্যে থেকে একটা হাঁপ ছাড়ার নিশ্বাসের সঙ্গে নানারকম গুনগুনানি শুরু হয়ে গেল।

হঠাৎ পুনিয়া গালে হাত দিয়ে চিৎকার করে গেয়ে উঠল:

এনানী বঢ়ায়ি হম্ কেয়সে কহু তুঝে

হম্ আইহনকে ঘরওয়ালীকো দিল চৌপাট্ কৌন্ সে॥

পাতিয়া চেঁচিয়ে উঠল, 'হে ভগবান, হারামজাদীর জান চৌপাট কর।'

বুড়ো মতিলালের গম্ভীর গলা শোনা গেল, 'আজকালকার মরদরা সব ডরপুক, বে-দিল নীচ্।'

ছোট বালবাচ্চাদের পঞ্চায়েত এতক্ষণ সুন্দর অনুকরণে বেশ ভালোই চলছিল। কিন্তু সাজানো কুনতির কান্নায় ওদের মধ্যে একটা শোরগোল পড়ে গেল। মাতা-দীনের ধুমসো ছেলেটা ওর ছোট্ট কোলে ঘুমিয়ে পড়েছে। অনেকক্ষণ আগেই সে উঠব উঠব করছিল। কিন্তু আর সহ্য করতে না পেরে বেচারী কাপড়েই পেচ্ছাব করে দিয়েছে। করে ফেলে তারপর কাঁদতে আরম্ভ করেছে।

বৈজুর ছেলেটা মাথামুণ্ডু কিছু না বুঝে ওই অবস্থাতেই সাজানো কুনতির কাপড় ধরে চেঁচিয়ে উঠল, 'আমি কিন্তু ওকে সাদী করব, হ্যাঁ।'

ভুজাওয়ালীর কাছে তখন কেউ কেউ ভিড় করতে আরম্ভ করেছে। আর ভুজাওয়ালী সবাইকেই বলছে, 'কেন ঘুগ্নি খাওগে যাও।' কিন্তু কাউকেই ফিরিয়ে দিচ্ছে না। বুড়ি ছেদি 'তবে বলি শোন' বলে কেবলি চেষ্টা করছে তার যৌবনের গল্প জমাবার। মাতালদের দলটার মধ্যে একজন কুনতির নাম ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করেছে। তাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে আর এক মাতালও তার কোলে মুখ গুঁজে কেঁদে উঠল। অন্য একটা দল পঞ্চায়েতের কোনো কথাতেই না থেকে কারখানার সাহেব সর্দারদের আলোচনায় জমে উঠেছে। মেয়েদের নানান্ দফে নানান্ আলোচনা। ঘর, কারখানা, পয়সা, ব্যায়রাম, পুরুষ, ভালবাসা—কোনো কথাই বাদ নেই।

হীরালাল একবার এখানে বসছে, একবার ওখানে বসছে, কথা শুনছে সকলের। প্রায় সব ক'টা লম্ফই নিভে এসেছে। দু'একটা মাত্র জ্বলছে আর মশালটাও খানিক কমজোর হয়ে গেছে। সেই ক্রমাগত অন্ধকার যেন চেপে বসছে ধনিয়ার সারা মুখে।

ডোম বস্তির ধাড়ি শুয়োরের ঘোঁৎঘোঁৎ শব্দ শোনা যাচ্ছে। বোধহয় শেয়ালের

আক্রমণের সম্ভাবনায় ছানাপোনাদের প্রতি সাবধানী সংকেত। কুকুরগুলো ঘোরা-ফেরা করছে পঞ্চায়েতের আশেপাশেই।
বহু দূর থেকে কার গলার স্বর শোনা যাচ্ছে—হো-উই।
ঠাকুরজী বলল, 'তোমরা সব শুনেছ। কিন্তু আমার বড় দুঃখ হয় কুনতি বেটির জন্য।'
হীরালাল মাতালদের দেখিয়ে ঠাকুরজীকে বলল, 'হুজর, ওই দুঃখেই এরাও কেঁদে মরছে।'
এ নাস্তিকটার বাক্যবাণ সহ্য হয় না ঠাকুরজীর। মাতাদীন খালি বলল, 'লুচ্চা কাঁহিকা।'
কুনতির মুখে দেখা দিয়েছে আবার সেই বিচিত্র হাসি। পঞ্চায়েতের আসল বয়ানে তার কান আছে কি না বোঝা যায় না। সে যেন রামলীলার মজা দেখতে এসেছে।
ঠাকুরজী বলল আবার, 'রামজীর কী লীলা। নইলে বল, কুনতি বেটিরই কেন এ দুর্দশা হবে, আদমি মরে যাবে? তোমার আমার কোনো হাত নেই এতে। যা হবার তা হবেই। আমরা খালি অশান্তিটা দূর করে দেব। এ বস্তি ছেড়ে ওকে চলে যেতে হবে।' বলে তাকাল কুনতির দিকে যেন তার মমতা, করুণা এ স্বৈরিণী মেয়েটার জন্য।
হীরালাল চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় যাবে হুজুর।'
কে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'জাহান্নমে।'
আর একজন বলে উঠল, 'বোধহয় ডোম বস্তির দক্ষিণে ঠাকুরজীর জেনানা পট্টিতে।'—একটা হাসির রোল পড়ে গেল। অর্থাৎ ঠাকুরজীর বেশ্যাপট্টিতে। গম্ভীর হয়ে উঠল ঠাকুরজীর মুখ। বলল, 'কাল ধনিয়া বেটির সংগে মারপিট করেছে ও, আর বিধবা হয়ে তিনটে বাচ্চা পয়দা করেছে, ও জাত থেকে আলাক্ হয়ে গেছে।'
ঠাকুরজী ব্রাহ্মণ মানুষ। এরা তার দেশের সব চামার কাহারের জাত। দেশের গাঁয়ের পঞ্চায়েতে সে বহুবার সভাপতিত্ব করেছে। এখানেও করেছে। কিন্তু এখানে এ কালোবাংলারে সেই মানুষগুলোর চরিত্রই শুধ বদলায় না। এখানে সমাজ-ব্যবস্থা না থেকেও এক বিচিত্র বস্তিসমাজ আছে। সামাজিক বিচারের যে শাস্তি তার কোনো মূল্যই প্রায় নেই এখানে। এখানকার শাস্তি জরিমানা করেই বেশী হয়। মনে করে, বিদেশে কোনোরকমে নিয়ম রক্ষা করা। কিন্তু এতদিন পরে সকলের ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কুনতির এই যে পরিণতি, এর রায় দেওয়ার পূর্বে ঠাকুর-জীকে একটু ভেবে নিতে হয়। এ ছোট জাতের লোকগুলোকে শান্ত করতে হবে আবার নিজের মতলবও হাসিল করতে হবে।
সে বলল, 'কুনতি অন্যায় করেছে, আবার মারপিটও করেছে। সেইজন্য ওকে পঞ্চাশ টাকা জরিমানা দিতে হবে আর একঘরে হতে হবে। কালকেই ওকে এখানকার ঘর ছেড়ে দিতে হবে। এর বেশী বেচারী আর কি পারবে বল?'
সারা মুখে হাসির ঢেউ খেলল কুনতির। সে সকলের দিকে তাকাল।
হীরালাল জিজ্ঞেস করলো, 'টাকা কোথা থেকে দেবে?'

'না পারলে আমিই এখন উধার দেব। কি বলিসরে বেটি ?' স্নেহ ঝরে পড়ল ঠাকুরজীর চোখ থেকে।

ঝি বহুড়িদের দমটা যেন নিভে গেছে। কেবল ছেদি আর কয়েকজন বলে উঠল, 'ঠিক হয়েছে।'

হীরা জিজ্ঞেস করল আবার, 'উধার শুধবে কি করে হুজুর ?'

কে একজন বলে উঠল, 'সে ঠাকুরজী আদায় করে নেবে।'

ঠাকুরজী বলল, 'আর ওকে থাকার জায়গা আমিই না হয় দিয়ে দেব একটা।'

মাতাদীন শুধু শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে বলে উঠল, বাহ্‌বা'। বলে বাহাদুরের মতো তাকাল ধনিয়ার দিকে। কিন্তু ধনিয়ার মুখ অন্ধকার।

হীরালাল হঠাৎ তীব্র গলায় চিৎকার করে উঠল, 'শুনুন ভাইয়ারা', সকলেই তার দিকে তাকাল। উত্তেজনায় থমথমে মুখ হীরালালের। চোখ দুটো জ্বলে উঠল। হাতজোড় করে সবাইকে বলল, 'আর এবার থেকে আপনারা দয়া করে সকলেই ঠাকুরজীর দেওয়া জায়গাতে তসরিফ রাখবেন।' বলে সে হো হো করে হেসে উঠল। বোধহয় হাসির দমকেই ফুলে উঠল কুনতির শরীরটা। হীরার হাসির শব্দেই মাটিতে শোয়া তার ঘুমন্ত ছেলে চমকে কেঁপে উঠল।

কেবল মাতাল বৈজু হাত ঝট্‌কা দিয়ে জড়ানো গলায় বলল, 'হাঁ, ঠাকুরজী, তোমাকে আমরা দিয়ে দিলাম আমাদের কুনতিকে।'

কুনতি ঘুমন্ত ছেলেটাকে কোলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এ পঞ্চায়েতকে সে না মানতে-ও পারত। এখানকার কোনো সংস্রব না রেখে সে পারত চলে যেতে। কিন্তু কোথায় ? এখানকার এ মেয়ে মরদেরা তবু তাকে চেনে। শুকালুর বিধবা বহুড়ি, খুবসুরৎ বেওয়ারিশ আওরৎ সে। বস্তি থেকে তাকে চলে যেতে হবে ঠাকুরজীর ডোম বস্তির দক্ষিণে। বেশ্যা বস্তিতে। দেহ খাটানো রুজির জায়গা আর রূপ পরিবর্তন শুধু। তবু বুক তার হাহাকার করে উঠল। মাতাল বৈজুদেরই কুনতি ছিল যে সে। হ্যাঁ, এখানকার মেয়ে মরদ সবাইকেই ভালবাসে সে। জীবনের পচা জায়গাটিতে থেকেও দুনিয়াকে সে সবচেয়ে বেশী জেনে নিয়েছে।

তবু সে হাসল সবার দিকে তাকিয়ে মেয়েদের দিকে তাকিয়ে। এ শুধু চিত্তবিভ্রম ঘটানো হাসি নয়, বন্ধুদের কাছ থেকে বাসা বদলের বিদায়ের হাসি। সে হাসির ধারে ধারে অশ্রুর বাষ্প জমে আছে।

তারপর অপরিসীম ঘৃণায় জ্বলন্ত হেসে ঠাকুরজীকে বলল, 'তোমার লাইনে তবে একটা ঘর বন্দোবস্ত করে রেখ।'

বলবার দরকার ছিল না সে কথা। মশালটা কয়েকবার দপ্‌দপ্‌ করে নিভে গেল। রাত হয়েছে বেশ। আকাশে ক্ষীণ চাঁদ রয়েছে। কুনতি ছেলে মেয়ে নিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

ঝি বহুড়িদের দলটা স্তব্ধ, হতাশ। বুকের মধ্যে যেন দমটা ভারী হয়ে গেল। পঞ্চায়েত ভেঙে গেল। শিশু পঞ্চায়েতের সভাপতি তখন আসনের ইটের উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মা এসে তাকে তুলে নিয়ে গেল। ভুজাওয়ালী ঘোষণা করল, কালকে যেন সবাই তার দেনা মিটিয়ে দেয়।

বৃদ্ধ মতিলালের গম্ভীর গলা শোনা গেল, দুনিয়াতে মরদ নেই।
ঘরে ঢোকবার আগেই হীরা কুনতির দিকে এগিয়ে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'তাহলে—'
কুনতির তিনটি চোখ ঝিলিক দিয়ে উঠল। তার কপালের টিপটাও তার চোখ। ঘাড় বাঁকিয়ে বঙ্কিম হেসে বলল, 'তাহলে ঠাকুরজীর লাইনে।' বলে খিল্‌খিল্‌ করে কাচের শার্সি ভেঙে পড়ার মতো হেসে উঠল সে। হাসির দমকে দুলে উঠল সারা শরীর।
'চুপ রহ।' প্রায় ধমকে উঠল হীরালাল। কোঁচকানো ভুরুর তলায় চোখ দুটো তার ঢেকে গেছে প্রায়। মুখের শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। মনের প্রতিচ্ছবির মতো সেগুলো কেঁপে কেঁপে উঠছে।
অবাক কুনতির কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। হীরালালকে অন্য মানুষ মনে হলো তার। কি বলবে সে!
পঞ্চায়েতের শূন্য আসরে তাড়ির ভাঁড় আর ঘুগ্‌নির পাতাগুলো চাটছে বাড়ির কুকুরগুলো।
কুনতির কোল থেকে ছেলেটাকে হঠাৎ নিজের কোলে নিয়ে বলল হীরা, 'ঢের হয়েছে, এবার বেরুবি চল।'
কোথায়?
ঘরে!
ঘরে?
নয় তো কি ঠাকুরজীর লাইনে?
হঠাৎ যেন ফিক্‌ ব্যথায় কথা আটকে গেল কুনতির গলায়। বলল, 'তোমার ঘরে?'
হীরা বিড়বিড় করতে করতে তখন পা বাড়িয়েছে, 'না-বুঝ্‌ বেত্তমিজ আওরৎ, তবে কার ঘরে।'
ঝাপসা চোখে হোঁচট খেতে খেতে মেয়েদুটোকে নিয়ে কুনতি পথে নামল, এগুলো হীরালালের পেছনে পেছনে। ভাঙা গলায় বার বার বলতে লাগলো, 'বহুরূপী আদ্‌মি. কিছুতেই ওর ধাত বুঝি না আমি, কভি না।' পুবে পাহাড়ের মতো পেপার্‌মিলের সাদা নীল রাবিশের স্তূপটার অন্ধকার কোল থেকে হীরার গলা আবার শোনা গেল, 'তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে আয়।'
দূর থেকে এ দৃশ্য দাঁতে দাঁত চেপে স্তব্ধ হয়ে দেখছিল ধনিয়া চালার ছায়া বারান্দার কোল ঘেঁষা অন্ধকারে। পেছন থেকে মাতাদীন তার পিঠে হাত দিয়ে সোহাগ করে ডাকল, 'ঘরে চলে এস মেরি মন!'
আচমকা যেন ক্লেদাক্ত সরীসৃপের স্পর্শে ঘৃণায় চম্‌কে কঙ্কণ দিয়ে এক ঝাপটা কষিয়ে দিল ধনিয়া মাতাদীনের মুখে। ক্রুদ্ধ সাপিনীর মতো হিসিয়ে উঠল, 'হট যা বুঢ়া মরদ!' তারপর ঘরে ঢুকে মেঝেয় মুখ ঢেকে শুয়ে পড়ল। কেবল মাতা-দীনের মোটা গলার সুর করে কান্নার চাপা শব্দ থেকে অন্ধকারকে হাসিয়ে তুলতে লাগল।

পয়স্বিনী

'আচ্ছা, এত বড় ঢাউস ব্যাগটা নিয়ে রোজ রোজ বেরোও কেন ?'

'তাতে তোমার অসুবিধেটা কী ?'

'আমার বিচ্ছিরি লাগে।'

'লাগুক গে। এ ছাড়া আমার আর ব্যাগ নেই।'

ব্যাগটা বাঁ হাত থেকে ডান হাতে নিল কণা। মনীশ ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো। কণার ভুরু দুটো বেঁকে খোঁচা হয়ে উঠেছে। সন্দেহের চোখে তাকালো মনীশের দিকে। আলতো করে রঙ বোলানো ঠোঁট দুটো টেপা। সেই রঙেরই একটা বড় টিপ ওর কপালে আঁকা। ভুরু বেঁকে যেতে কপালের চামড়ায় টান লেগে টিপটাও যেন বাঁকাচোরা হয়ে উঠলো।

ওরা দুজনেই হাঁটছে সার্কুলার রোড ধরে। এখন শেষ বিকেল। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এলো। তবু, বড় বড় বাড়ি, বা দু-একটা এদিক ওদিক চিমনির বা গাছের মগডালে একটু রোদ লেগে আছে। পশ্চিম দিকের আকাশটা এত লাল হয়ে উঠেছে, রোদটুকু মুছে গেল বলে। ঘণ্টা দুয়েক আগে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। টুকরো টুকরো মেঘ ছড়ানো। শরৎকালের আকাশে, বেলা শেষে, রঙের খেলা ফোটে বেশী।

রাস্তায় সন্ধ্যাবেলার ভিড়। ট্রাম বাস মানুষ ঠাসাঠাসি। অন্যান্য যানের তো কথাই নেই। সবই ছুটন্ত, গর্জিত। একমাত্র যারা হেঁটে চলে তাদেরই যা একটু প্রশান্তি। ব্যস্ততা, তাড়াহুড়ো নেই। কাজ শেষ হয়েছে, এবার একটু ধীরে সুস্থে হেঁটে চললে ক্ষতি নেই।

মনীশ আর কণা সেই রকম চলেছে। দুজনেরই কাজ শেষ হয়ে গেছে। একজন এসেছে হাসপাতাল থেকে। আর একজন সরকারী অফিস থেকে। একজন নার্স, আর একজন কেরানী। চাকরির পরে, দুজনেই দুজনের সংগে, একটা নির্দিষ্ট সময়ে ও জায়গায় দেখা করেছে। যোগাযোগটা, কাজের জায়গা থেকে বেরোবার আগেই, বিনা পয়সায় টেলিফোনে হয়ে যায়।

কণাকে এখন দেখে অবিশ্যি নার্স বলে চেনা যায় না। কালো পাড় শাড়ি, সাদা জামা, মাথায় সাদা কাপড়ের সেবিকা বন্ধনী, সে সব কিছুই নেই। অ্যাপ্রন তো নেই বটেই। এখন ওকে আর দশটা সাজগোজ করা মেয়ের মতোই দেখাচ্ছে। লালফুল ছাপা শাড়ি, খুবই অল্প দামী, শাড়ির জমি দেখলেই বোঝা যায়, আর সেই কাপড়েরই কাঁধ-হাতা জামা, হাসপাতাল থেকেই বদলে নিয়ে বেরিয়েছে। মুখে একটু পাউডার, ঠোঁটে একটু রঙ, কপালে একটা টিপ, চোখে একটু কাজল দিয়ে নিয়েছে। একটু গোল ভাবের মুখ, বোঁচা বোঁচা নাক, শ্যামলা রঙ, সব মিলিয়ে

বৈশিষ্ট্যের কিছু নেই। একটা মেয়ে যেমন হয়।
মনীশও তা-ই। সরকারী কেরানীর ছাপ কিছু গায়ে নেই। প্যান্ট, শার্ট, ভাঙা-চোরা মুখ, তেল ছাড়া চুল আঁচড়ানো। ঘরের মধ্যে, অধিকাংশ ছেলেদের মতোই চিকন একজোড়া গোঁফ। পাক ধরতে আরম্ভ করলেই আর সকলের মতো হয়তো মুড়োবে। মাঝারি লম্বা, হাতা গুটানো, চুলে একটু ভাঁজ, হাতে একটা ঘড়ি, সব মিলিয়ে কণার মতোই বৈশিষ্ট্যহীন। হয়তো চোখজোড়া একটু বেশী তীক্ষ্ণ, ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসির ছাপ, লক্ষ্য করলে চোখে পড়তে পারে।
কণার ভাবভঙ্গি দেখে মনীশ হেসে উঠল। জিজ্ঞেস করলো, 'কী হলো?'
কণা মুখ ফিরিয়ে, সামনের দিকে চেয়ে বলল, 'কী আবার আমার ভীষণ বিরক্ত লাগে। রোজ রোজ তোমার এক কথা, ঢাউস ব্যাগটা কেন নিয়ে আসি। কে বলেছে, এটা ঢাউস ব্যাগ?'
মনীশ একটু অবাক হলো কণাকে এতটা চটতে দেখে। তবে, গায়ে মাখলো না। বলল, 'এটা ঢাউস নয়?'
'মোটেই না। এর চেয়ে বড় বড় ব্যাগ নিয়ে আজকাল মেয়েরা ঘুরে বেড়ায়।'
'সব দিন, সব সময়ে না। হয়তো বিশেষ কোনো প্রয়োজনে বড় ব্যাগ নিয়ে বেরোয়। তুমি এটাই রোজ রোজ নিয়ে বেরোও। জামাকাপড় তো হাসপাতালেই থাকে। ব্যাগে করে তো বইতে হয় না যে—।'
মনীশ কথাটা শেষ করতে পারলো না। কণা একেবারে তিক্ত ঝাঁজে বলে উঠলো, 'আমার ব্যাগটার জন্যে যদি তোমার এতই আপত্তি, তাহলে তুমি আর আমার সঙ্গে না হয় মিশো না। কিন্তু এরকম, ঢাউস বল আর যাই বল, ব্যাগ নিয়েই আমি বেরুব। হলো তো?'
গলার স্বরের মতোই চোখেও ঝাঁজ আর বিরক্তি ফুটিয়ে ও মনীশের দিকে তাকাল। মনীশের তীক্ষ্ণ চোখ দুটো তখন গোল হয়ে উঠেছে। অবাক হয়ে বলে উঠল, 'বাব্বা! এত চটে গেলে?'
'চটব না? তুমি এত কথা রোজ রোজ বল কেন?'
মনীশ হাত জোড় করে বলল, 'ঘাট হয়েছে বাবা, আর বলব না।'
কণা কোনো কথা বলে না। মনীশও চুপ করে থাকে। ওকে একটু বিমর্ষ আর চিন্তিত দেখাচ্ছে।
কণাকে দেখাচ্ছে বিচলিত, বিরক্ত, আর খানিকটা অন্যমনস্ক। কখন ওরা ধর্মতলার দিকে বাঁক নেয়, নিজেদেরই খেয়াল থাকে না।
প্রথম কণা বলল, 'জামাকাপড়ই থাকে না শুধু। তা ছাড়া আরো কত টুকিটাকি জিনিস থাকে, তা জান? তারপরে, কত সময়ে, হঠাৎ কত কী দরকার হয়ে পড়তে পারে। একটা বড় ব্যাগ সঙ্গে থাকলে ক্ষতি কী?'
মনীশ অভিমান করে না, গম্ভীরও হয় না। বরং একটু হেসেই ব্যাগটার দিকে চেয়ে বলল, 'তা বলছি না। তোমার ব্যাগে কী থাকে, দেখতেও চাই না। তবে কয়েক মাস আগেও তো ছোট ব্যাগই নিতে।'
'নিতাম, নিতাম। এখন বড় ব্যাগ নিই।'

'এটা অবিশ্যি এখন ফ্যাসানও হয়েছে। তবে, এত বড় ব্যাগটা তোমাকে মানায় না, মানে তোমার চেহারার তুলনায়।'

কণা এবার কোনো কথা বলে না। কিন্তু একটা আহত, ক্রুদ্ধ কটাক্ষ হানে। মনীশের এ আক্রমণটা ওর অন্য জায়গায় বেজেছে। মনীশও সেটা বুঝতে পারলো। পেরেই, খপ করে কণার হাত চেপে ধরে বলে উঠলো, 'এই কণা, প্লীজ রাগ করো না।'

কণা ঝটকা দিয়ে হাত সরিয়ে নিল, বলল, 'আহ্! রাস্তার মাঝখানে অসভ্যতা করো না।'

মনীশ রাস্তায় হাত ধরার মতো অসভ্যতা আর করে না। কিন্তু আঘাতটা করতে পেরেছে জেনে এখন ও আপোসের চেষ্টাই করে। কণার খুব কাছ ঘেঁষে চলতে চলতে বারে বারেই ডাকতে লাগলো, 'কণা, কণা, এই কণা।'

কণা অনেকক্ষণ জবাব না দিয়ে থাকতে চেষ্টা করলো। তারপরে বার বার ডাক শুনে আস্তে আস্তে ওর মুখের ভাব নরম হলো। বলল, 'কী?'

'রাগ করো না। আমি তো তোমাকে চটাবার জন্যেই বলেছি।'

কণা একবার সন্দিগ্ধ চোখে মনীশের দিকে তাকালো। রাগ আর বিরক্তির বদলে ওর চোখে অভিমান আর ভর্ৎসনা ফুটলো। কিছু বলল না।

মনীশ স্বর আর একটু নিচু আর আবেগান্বিত করে বলল, 'ভাবী স্ত্রীকে এটুকুও পারি না?'

'কী?' কণা ভুরু কুঁচকে ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো। তারপরে একটু মিঠে কড়া ঝাঁজের ঝঙ্কার দিয়ে বলল, 'ফাজিল। 'বলে একটু হাসলো, আর ঠোঁট ফুলিয়ে বলল, 'খালি আমার পেছনে লাগা।'

মনীশ হাসলো। মেঘ যে কাটলো, তা বোঝা গেল।

কয়েক কদম চলে, কণাই আবার বলল, 'ভাবী স্ত্রী তো খুব বলা হচ্ছে। শেষে, চিরদিন ভাবীই থেকে যেতে হবে না তো?'

'কেন?'

'বর্তমান হবার কোনো লক্ষণ তো দেখছি না।'

মনীশ প্রায় দাঁড়িয়েই পড়ছিল। অবাক এবং উত্তেজিত হযে বলল, 'এখন তুমি আমার ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ? আমি তো তোমাকে বলেই দিয়েছি, যেদিন বলবে, আমি সেদিনই রাজী। তোমারই তো যত সব ঝামেলা।'

কণা মণীশকে দোষারোপ করলেও ঠিক যেন অভিযোগের তীব্রতা ততটা নেই ওর মুখে। বলল, 'তুমি যে কী সব বল, বিয়ে করলে বাড়িতে থাকতে পারবে না, ঘর-দোর নেই। বিয়ে করলে নাকি তোমাকে আলাদা থাকতে হবে। তোমার দাদারা বলেছে, এই মাইনেতে বিয়ে করা চলে না। তা ছাড়া, একটা ধাইকে বিয়ে করবে, তোমার মায়ের সেটাও—।'

'থামো থামো।' কথার মাঝপথেই মনীশ বাধা দিল। বলল, 'আমার কথা রাশি-খানেক বলে তো গেলে। নিজেরটা বলছ না কেন। তোমার বাপ-মার কাছে তো আমি একটা ঠগ, জোচ্চোর। তোমাকে বিয়ে করতে চাওয়া মানে, তোমার মাইনের টাকায় ভাগ বসানো, তোমাদের ফ্যামিলিকে ঠকানো—।'

কণাও বাধা দিল মনীশের কথায়। 'বাড়ির লোকের কথা বলে লাভ কী।'
'তুমিও তো তাই বলছ। আমাদের বাড়িতে তো আমি জানিয়েই দিয়েছি, আলাদা থাকব। আমার মতো আয়ের লোকেরা কি বিয়ে করে না? তুমি আজই চল, এখুনিই চল, ম্যারেজ রেজিস্ট্রীর নোটিস দিয়ে আসি।'
কণা ঘাড় বাঁকিয়ে, চোখে একটু নিবিড় চাহনি হেনে হাসলো। হাসির মধ্যে কোথায় একটু তোষামোদের ভাব আছে যেন। বলল, 'এখন কি রেজিস্ট্রী অফিস খোলা আছে?'
মনীশ খানিকটা জেদের ভঙ্গিতে বলল, 'কালই চল।'
কণা চুপ করে রইলো। মনীশ তাকালো ওর মুখের দিকে। ওরা ওয়েলিংটন স্কোয়ার পেরিয়ে গিয়েছে। মনীশ ওর মুখের দিকে চেয়ে রয়েছে, জানে কণা। ও মনীশের দিকে চেয়ে হাসলো। হাসিটা বিব্রত। কণার চোখেও যেন একটা অসহায় ভাব। একটু বা করুণ। মনীশ মুখটা ফিরিয়ে নিল। শক্ত মুখে সামনের দিকে চেয়ে রইল। কোনো কথা বলল না।
কণা ওর মুখটা নামিয়ে নিল। ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে মনীশের পাশে পাশে চলতে লাগলো। দুজনেই চুপচাপ, কেউ কোনো কথা বলছে না।
উপচানো মানুষ নিয়ে ট্রাম আর বাসগুলো দু-মুখেই চলেছে। মিটার ফ্ল্যাগ ওঠানো একটা ট্যাকসিও চোখে পড়ে না। নানা রঙের প্রাইভেট গাড়িগুলোই যা একটু ঢিলে-ঢালা মন্থর ফাঁকা কিংবা অ-ব্যস্ত নিরুদ্বেগ মুখ নরনারীর দেখা মেলে।
সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হয়ে এলো। রোদ একটুও নেই। দোকানে দোকানে বাতি জ্বলে উঠতে আরম্ভ করেছে। তবু ধর্মতলা স্ট্রীটের দু-একটা গাছে কাকের ডাক শোনা যায় এখনো। মুখ তুলে সোজা তাকালে, দূরে এসপ্লানেড বরাবর, লাটবাড়ির গাছগুলির মাথায় রক্তিম আকাশ চোখে পড়ে।
পশ্চিমের আকাশ, এখনো যেন সূর্যের আঁচ লেগে আছে তার গায়ে।
মনীশের গলায় শোনা গেল, 'জানি সবই, বুঝিও সবই।'
কণা একবার মুখ তুলে মনীশের দিকে দেখলো। মনীশের দৃষ্টি সামনের দিকেই। কণাও মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বললো, 'না জানবার, না বোঝবার তো কিছুই নেই।'
'তবে আমাদের বাড়ির কথা তুলে লাভ কী। বাড়ি আমার কাছ থেকে কিছু আশা করে না, আমিও করি না। দাদারাও চায় না আমি আর তাদের সঙ্গে থাকি। তাদের যা আয়, তুলনায় আমার কিছুই না। তাদের মোটা টাকার সুখের ভাগ আমাকে দেবেই বা কেন। আমার নিজেরই লজ্জা করে, যখন দেখি আমার খাওয়া পরার সঙ্গে তাদের সবই আলাদা। এক বাড়িতে থেকেও, আমি তো আলাদাই। আমি যে কোনোদিনই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে রাজী আছি। কিন্তু—।'
মনীশ থামলো। মনে মনে উত্তেজিত বলেই এতগুলো কথা সে এক টানে বলে গেল। ওর চোয়াল ভাঙা কৃশ মুখটা যেন আরো ভাঙাচোরা দেখাল। চোখের দৃষ্টিতে ক্ষোভ, তেমনি শক্ত, দৃষ্টি সামনের দিকেই।
কণা তাকালো মনীশের দিকে। ওর ডাগর চোখের দৃষ্টি করুণ, যেন স্নেহে

নিবিড়। ও মনীশের গায়ের কাছ ঘেঁষে চলতে লাগলো। পাশ থেকে দুটি উপ-বাসী-চোখ যুবক ওদের দিকে চেয়ে নিজেদের মধ্যে হাসলো। একজন বলল, 'বেস্ আছে মাইরি।' আর একজন আওয়াজ দিল, 'মালটি বাগিয়েছে মন্দ না।'
মনীশের কানে কথাগুলো ঠিক ঢোকে না। কণার কানে ঢোকে। কিন্তু ছেলেদের এই বকম ইতর কথাবার্তা শুনে শুনে এখন আর কিছুই মনে হয় না। যেখানেই যাবে, এসব শুনতে পাবে। ওইটুকুতেই ওদের তৃপ্তি। আসলে না পাওয়ার ক্ষোভ আর ঘৃণা এসব। অতএব কান দিলে চলে না। বিব্রত সংকুচিত হবার তো কোনো প্রশ্নই নেই।
মনীশ আবার বলল, 'তবে এবার আমি আলাদা হয়ে যাবই। কোনো মেসটেস-এ গিয়ে উঠব। আর তুমি তো কোনোদিনই বাড়ি ছাড়তে পারবে না। কারণ তুমি রোজগেরে মেয়ে, তোমার টাকা না হলে সংসার চলবে না, তাই তোমার বিয়ে করাও চলবে না। মিটে গেল সব, যে যার রাস্তা দেখ।'
মনীশের শেষ কথায় কণার চোখে ঝিলিক হেনে যায়। হাসি চাপে ঠোঁট টিপে। বলল, 'একেবারে রাস্তা দেখিয়ে দিলে?'
'আমি দেখিয়ে দেব কেন। যার যার রাস্তা সে-ই তো দেখছে।'
কণা ভুরু তুলে, চোখের তারা ঘুরিয়ে বলে, 'সত্যিই তো। আমিও তো নিজের রাস্তা নিজেই দেখছি। সেই জন্যেই তো বাড়িতে নোটিশ করে দিয়েছি, আগামী মাসে শ্রীমান মনীশ চৌধুরীর সঙ্গে শ্রীমতী কণা হালদার সংসার পাতিতে যাইতেছে।'
মনীশ এবার কণার চোখের দিকে তাকালো। কণা হেসে উঠলো। মনীশ বলল, 'না না, আমার ভালো লাগে না এসব। আমার কষ্ট হয় না, না?'
মনীশকে ক্ষুব্ধ অবুঝ ছেলেমানুষের মতো মনে হয়। কণার চোখে স্নেহ আরো নিবিড় হয়ে উঠলো। কয়েক মুহূর্ত মনীশের দিকে চেয়ে থেকে, নিচু গভীর স্বরে বলল, 'জানি না বুঝি? কেউ দেখবার নেই, একটু ভালো করে খাওয়া নেই। তোমার এই চেহারা দেখে আমারই ভালো লাগে বুঝি?'
মনীশ কণার দিকে তাকালো, ওর চোখ মুখ নরম আর শান্ত হয়ে এলো।
কণা আবার বললো, 'এক পো করে দুধ নিতে বলেছিলাম তোমাকে, নিচ্ছ তো?'
'না।'
'কেন?'
'আলাদা করে ওভাবে দুধ কিনে খেতে আমার লজ্জা করে।'
'তোমার দাদারা যখন খান?'
'ওদের কথা আমাকে বলো না। তিন বছর বাবা মারা গেছেন। বাবা যতদিন ছিলেন, তাঁর রোজগারের পয়সায় দুধ খেয়েছি। তারপরে আর আমি দুধের স্বাদ জানি না।'
কণা চুপ করে থাকে। হঠাৎই যেন ওর মুখটা বড় বেশী ব্যথায় আর কষ্টে ছায়া-ভার হয়ে ওঠে। মাথা নিচু করে চলতে থাকে।
মনীশ তাকিয়ে দেখলো। কণার মুখ দেখে ওরও চোখে যেন স্নেহ উথলে উঠলো। বলল, 'তুমি যখন সংসার করবে, তখন তোমার কাছে দুধ খাব।'

কণা চোখ তুলে তাকালো। হাসতে চাইলো, কিন্তু হাসিটা যেন ফুটলো না। মুখের ছায়াভার কাটলো না। কিছু একটা যেন বলতে চাইল। বলতে পারল না। কেবল বলল, 'তাই হবে।'

মনীশের চোখে একটু চিন্তার ছায়া দেখা দিল। বলল, 'কী হলো বল তো?'

কণা মাথা নেড়ে বলল, 'কিছু না তো।'

'নিশ্চয়ই কিছু। দুধের কথা উঠতে তোমার দেড় বছরের ছোট ভাইটার কথা মনে পড়ে গেল, না?'

কণার ব্যথিত মুখেই একটু অবাক হওয়ার ভাব দেখা গেল। মনীশ বলল, 'তোমার ছোট ভাইটা একটু দুধ পায় না, মাস কয়েক আগে বলছিলে না তুমি? তাই বলছি।'

কণা চুপ করেই থাকে, মনীশ বলতে থাকে, 'সত্যি তোমাকেই বা কী দোষ দেব। সংসারে বড় মেয়ে হয়ে জন্মেছ। ছোট ছোট ভাই বোন, তাদেরই বা কী উপায়।'

কণা বলল, 'সে কথা ঠিক। তা বলে তোমাকে এভাবে ছেড়ে রেখেই বা আমি কতদিন থাকব। নিজের সংসার করে যতটা পারি করব।'

মনীশ বোধহয় ভুলেই গেল, এটা রাস্তা। ও একেবারে হাত দিয়ে, কণার পিঠের কাছে চেপে ধরে, কানের কাছে মুখ এনে বলল, 'তোমাকে এখন আমার আদর করতে ইচ্ছে করছে, সত্যি।'

কণা শরীরটা বাঁকিয়ে ভুরু কুঁচকে চেয়ে, নিচু গলায় বললো, 'হাত সরাও, এ কী? অসভ্য!'

মনীশ হাত সরালো। এস্‌প্ল্যানেডের ভিড়। বাঁ দিকে মোড় ফিরতে গিয়ে গায়ে গায়ে ঠেসাঠেসি। পথচারী পুরুষদের, মেয়েদের গা ঘেঁষে চলবার মজাটা দেখে কণা। মনে মনে হাসে।

মনীশের গায়ে কণার ব্যাগটা বারে বারেই ধাক্কা খাচ্ছে। বলে উঠলো 'ওহ্, তোমার এই ঢাউস্ ব্যাগটা—।'

'আবার?' ধমক দিয়ে উঠলো কণা।

মনীশ হাত বাড়িয়ে বললো, 'দাও তো, ওটা আমি নিই।'

কণা যেন অতিরিক্ত ত্রস্ত চমকে ব্যাগসুদ্ধ হাত সরিয়ে নিয়ে বলে উঠলো, 'না, ব্যাগ নেবে না তুমি।'

মনীশের চোখে আবার সেই হাসি মাখানো তীক্ষ্ণতা ফিরে এসেছে। বলল, 'তুমি এমন কর, যেন ব্যাগটা মারণশিলা। ছুঁলেই জাত চলে যাবে।'

কণা বললো, 'যাবেই তো। মেয়েদের ব্যাগ তুমি নেবে কেন?'

'ও যা ঢাউস ব্যাগ, ছেলেদের হাতে থাকাই ভালো।'

'ফের?'

কণা বিরক্তি মেশানো কোপ কটাক্ষে চায়। মনীশ বললো, 'আচ্ছা আচ্ছা, চল।'

ওরা এসে ঢুকলো একটা রেস্তোরাঁয়। মোটামুটি সস্তা রেস্তোরাঁ। মেয়েদের নিয়ে বসবার জন্যে ময়লা ময়লা পর্দা ঢাকা কেবিনও আছে। এখানে ওরা কিছুটা পরিচিতও। বেয়ারারা চেনে। কারণ, এখানে ওরা দুজনে প্রায় নিয়মিত আসে।

টোস্ট, ভেজিটেবল চপ আর চা, প্রায় রোজ এখানে এসে খাওয়াটা ওদের বড় রকমের একটা বিলাসিতা।

ওরা দুজনে একটা পর্দা ঢাকা কেবিনে গিয়ে পাশাপাশি বসলো। বেয়ারাকে খাবারের কথা বলে দিল। কণা ওর ব্যাগটা টেবিলের ওপর রাখতে যেতেই মনীশ হাত বাড়িয়ে বলল, 'দাও তো, এটা ওপাশের চেয়ারে রেখে দিই।'

কণা ব্যাগটা ছোঁ মেরে সরিয়ে নিয়ে বললা, 'না থাক। আমার পাশের চেয়ারে থাক।'

বলে, তার পাশের খালি চেয়ারে ব্যাগটা রাখলো। আঁচলটা ঠিক করে গোছাবার আগেই মনীশ ঝুঁকে পড়ে কণার গালে একটু ঠোঁট ছুঁইয়ে দিল।

কণা চোখ পাকিয়ে চেয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো, 'অসভ্য কোথাকার। বেয়ারা আসবে না এখুনি ?'

'তার আগেই একটু ছুঁইয়ে রাখলাম।'

কণা সোহাগে আর কপট রাগে বললো, 'ফাজিল।'

মনীশ বললো, 'খাবারটা দিয়ে গেলে, তারপরে ভালো করে, কেমন ?'

কণা যেন সপাটে ছুঁড়ে দিল, 'না। রাক্ষস কোথাকার। একটু সভ্য হয়ে থাকা যায় না, না ?'

'চুমো খেলে, আদর করলে বুঝি অসভ্য হয় ?'

'হ্যাঁ হয়।'

'তবু তো একটু ভালো করে আদর করতে পারি না।'

'দরকার নেই।'

কথার মধ্যেই বেয়ারা এলো। খাবার দিয়ে গেল। চা পরে আসবে। বেয়ারা চলে যেতেই পর্দাটা হাত দিয়ে চেপে ধরলো মনীশ। পাছে কেউ খুলে ফেলে। তারপরে, আর এক হাতে কণার গলা জড়িয়ে ধরে চুমু খেল।

অশান্তির মধ্যেও, কণার আবেগ দেখা দিল চোখে মুখে। ঘন নিশ্বাসে দ্রুত প্রতিদান না দিয়েও পারল না। কিন্তু মনীশের বুকে আলতো করে একটা চাঁটি মেরে, ভুরু কুঁচকে চেয়ে, আঁচল দিয়ে আস্তে আস্তে ঠোঁটে চাপলো। তারপরেই বলল, 'এই, তুমি খাও, আমি আসছি।'

'বাথরুমে, না ?'

'হুম্‌। সব কথা জানতে চাও কেন ?'

মনীশকে ডিঙিয়ে সে বেরিয়ে গেল। মেয়েদের আলাদা বাথরুমটা চেনে সে। এমন একলা হতেই কণার মনে আবার ছায়া ঘনিয়ে এলো। হাসপাতালে, আজকের ঘটনাটা আবার মনে পড়ে গেল। মনীশকে বলতে পারে নি। মনীশ হয়তো ওকে খুবই ছোট ভাবতো। সত্যি, কণার মনটা নিশ্চয়ই ছোট, হিংসুটে আর নিষ্ঠুর।

হাসপাতালের প্রসূতিদের ওয়ার্ডের নার্স সে। তিন চারদিন হলো একটি গরীব বউয়ের প্রসব হয়েছে। বউটির স্বামী বোধহয় সামান্য বেতনের কোনো দোকান কর্মচারী। আরো তিনটে ছেলে মেয়ে আছে। রোজ বিকেলে তারা তাদের মাকে দেখতে আসে।

পরশু থেকেই কণা লক্ষ্য করছে, বউটিকে যে দুধ খেতে দেওয়া হয়, এক সের দুধ প্রায় সবটাই সে নিজে না খেয়ে রেখে দেয়। বিকেলে ছেলে মেয়েরা যখন মাকে আর নতুন ভাইকে দেখতে আসে, তখন বউটি লুকিয়ে দুধটা ওদের খাইয়ে দেয়। আজও যখন লুকিয়ে খাওয়াচ্ছিল, কণা ছুটে গিয়ে চিৎকার করে বলেছিল, এসব কী করছেন আপনি। কেন লুকিয়ে এদের খাওয়াচ্ছেন! আমি রিপোর্ট করে দেব, আপনাকে আর দুধ দেওয়া হবে না।

যে ছেলেটি তখন লুকিয়ে দুধ খাচ্ছিল, সে এত চমকে উঠেছিল যে গেলাস থেকে তার দুধ চলকে পড়ে গিয়েছিল। মুখে দুধের দাগ লেগেছিল। ভয়ে দুচোখ অপলক। বউটি লজ্জায় ভয়ে থমকে গিয়েছিল। সারা ওয়ার্ডের প্রসূতিরা কৃপা আর বিদ্রূপ ভরে বউটির দিকে তাকিয়েছিল।

বউটির চোখে জল এসে পড়েছিল। বলেছিল, 'মাপ করবেন দিদিমণি। ওরা খেতে পায় না তো, তাই।'

কণা ঝামটা দিয়ে উঠেছিল, 'তা হাসপাতালের দুধ কেন। বাড়িতে কিনে খাওয়াবেন।'

বলেই সে চলে এসেছিল। ঘটনাটা সে ভুলতে পারছে না। এখনো কেমন খচ্‌খচ্‌ করছে। নিজেকে ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে। অথচ কর্তব্য হিসাবে ঠিকই করেছে। তবু কী একটা কষ্ট আর ধিক্কার যেন মনের মধ্যে তীক্ষ্ণ হয়ে বিঁধে আছে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাবলো, কাল বউটির সঙ্গে ভালো করে কথা বলবে। ছেলেগুলোকে সে নিজেই স্টোরের কাছে সরিয়ে নিয়ে, একটু দুধ খাইয়ে দেবে।

কেবিনে যখন ফিরে এলো, মনীশ তখন টোস্ট খেতে আরম্ভ করেছে। কণা বলল, 'এখনো তোমার খাওয়া হয় নি ?'

'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম।'

'বাব্বা! কবে থেকে মশাই ? কোনোদিন তো তর সয় না দেখি, খাবার পাওয়া মাত্রই খেতে আরম্ভ কর।'

মনীশ যেন সে তুলনায় আজ একেবারে নতুন মানুষ। পেট হাতিয়ে বলল, 'পেটটা আজ আমার তেমন ভালো নেই। দুটো চপই তুমি খেয়ে নিও।'

'পেটে আবার কী হলো ?'

'কী জানি।'

মনীশ সত্যি সত্যি চেয়ারে এলিয়ে পড়লো। কণা অবাক হয়ে বলল, 'কই, একবারও সে কথা বল নি, পেটটা ভালো নেই।'

মনীশ একটু হেসে বলল, 'এখন খেতে গিয়ে সেরকম মনে হচ্ছে।'

কণা খেতে আরম্ভ করলো। মনীশ হঠাৎ গুনগুনিয়ে উঠলো। কণা ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলো, 'কী ব্যাপার ? গান আসছে কোত্থেকে ?'

মনীশ হেসে উঠলো জোরে। বলল, 'কী জানি। আমার ভীষণ হাসিও পাচ্ছে, গানও গাইতে ইচ্ছে করছে।'

কণা মুখে খাবার নিয়ে, সন্দিগ্ধ অনুসন্ধিৎসু চোখে মনীশের দিকে তাকালো।

মনীশ আবার ওর মুখের কাছে ঝুঁকে এলো। কণা চোখ পাকিয়ে, মুখ সরিয়ে নিল।

খাওয়ার শেষে একই বাসে চেপে দুজনে কালিঘাট স্টপেজে নামলো। সেখান থেকেই বিদায়। দুজনে এবার আলাদা রাস্তা দিয়ে পাড়ায় ঢুকবে।

মনীশ বললে, 'কাল তাহলে ওখানেই ?'

কণা বলল, 'টেলিফোনে ঠিক করে নেওয়া যাবে।'

কণা একটু তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগলো। মনীশের কাছ থেকে আলাদা হয়েই, একটু যেন বেশী মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো। গলি পার হয়ে পুরনো একতলা প্রায়ান্ধকার বাড়িতে এসে ঢুকলো। জলে ভেজা উঠোন পেরিয়ে, এবড়ো খেবড়ো বারান্দা পেরিয়ে নিজেদের ঘরে ঢুকলো। এপাশে ওপাশে তিনটে ভাড়াটে আছে। কণাদের ভাগে দেড়খানা। একটাতে মা বাবা ছোট ভাই থাকে। আর একটাতে অন্যান্য ভাইবোনদের নিয়ে কণা থাকে।

বারো বছরের বোনটা পিছনের বারান্দায়, ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে বসে আছে। কাছে বসে মা রান্না করছে। বারান্দাটাই রান্নার জায়গা। বাবা এখনো বাড়ি ফেরে নি। বাকী ছোট ভাই দুটি পাশের ঘরে চেঁচিয়ে পড়ছে।

ভাই কোলে বোনটি বলল, 'দিদি এসেছে মা।'

কণা ব্যাগসুদ্ধ বারান্দার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমার একটু দেরি হয়ে গেল। ভাই কি খুব কেঁদেছে ?'

মা রান্নার দিকে চোখ রেখেই বললো, 'হ্যাঁ, এই তো কেঁদে কেঁদে এখন ঘুমিয়ে পড়লো।'

বোনটি বলল, 'খিদেতে খুব কাঁদছিল। এনেছ দিদি ?'

কণা বলল, 'হ্যাঁ, এনেছি।'

মা বলল, 'এখন আর ওকে তুলিস না। জেগে উঠে খাবে।'

কণা সরে এলো। ঘরে আসবাবপত্র কিছুই নেই, কয়েকটা পুরনো ট্রাঙ্ক স্যুটকেস ছাড়া। তার ওপরে বিছানার ডাই, রাত্রে পাতা হবে। সেখানে দাঁড়িয়ে ও ব্যাগটা খুললো। ভিতরে হাত দিয়ে ওর ভুরু দুটো কুঁচকে উঠলো। তাড়াতাড়ি হাতড়ে একটা দুধের বোতল বের করলো। কিন্তু বোতলটা শূন্য।

কণার মুখটা পাংশু হয়ে গেল। অবাকও হলো সে। ভাই কোলে বোনটি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'দুধ আনোনি দিদি ?'

সে কথার কোনো জবাব না দিয়ে ব্যাগটা চোখের সামনে তুলে ভিতরে উঁকি দিল। ভেবেছিল, বোতলের মুখ খুলে দুধ পড়ে গিয়েছে নাকি। কিন্তু সেখানটা একেবারেই শূন্য। শুধু একটা ভাঁজ করা কাগজ পড়ে আছে। সেটা তাড়াতাড়ি টেনে, ভাঁজ খুললো। দেখলো, মনীশের হাতের লেখা, 'কণা, তোমার ঢাউস ব্যাগটায় দেখছি এক বোতল দুধ রয়েছে। দুধটা খেয়ে ফেললাম। বাবা মারা যাবার পর এই প্রথম দুধ খেলাম। খুব রাগ হচ্ছে তো ? কিন্তু সত্যি, দুধটা এখনো গরম রয়েছে। কোনোদিন বল নি কেন, এতে দুধ থাকে, তাই এত বড় ব্যাগটা নিয়ে চল। তারই শাস্তি। কাল যে শাস্তি দেবে, মাথা পেতে নেব।—মনীশ।'

কণার চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠলো। মুখটা শক্ত হয়ে উঠলো। নাকের পাটা দুটো ফুলে উঠলো। ওর চোখের সামনে মনীশের ভাঙাচোরা মুখটা ভেসে উঠলো। পরমুহূর্তেই চোখ দুটো শান্ত হয়ে গেল, দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে এলো, ঠোঁট দুটো কেঁপে গেল। মনীশের ভাঙাচোরা কৃশ মুখের সংগে সেই কথাগুলোও মনে পড়ে গেল, তিন বছর ধরে দুধের স্বাদ ও জানে না। ওর চোখের সামনে আরো ভেসে উঠলো, সেই বউটির মুখ, তার ছেলেমেয়েদের মুখ।

তাড়াতাড়ি ব্যাগটা দিয়ে কান্নার উদ্যত শব্দকে ঠোঁট চেপে ধরলো কণা। মনীশকে তো কোনোদিন বলতে পারি নি। হাসপাতালের দুধ ও নিজেও নিজের ভাইয়ের জন্য চুরি করে আনে। তার জন্যে এই ঢাউস ব্যাগটা দরকার।

দুধ তো সকলেরই দরকার। মনীশের, ভাইয়ের, সেই সব ছেলেমেয়েদের। কার দুধ ও কাড়তে যায়। কার মুখেই বা দিতে যায়। এত নীচতা, তবু তো কারুর মুখেই একটু তুলে দিতে পারে না। তিন বছর বাদে, তবু তো মনীশ আজ একটু স্বাদ পেয়েছে। কত তো ইচ্ছে করে কণার, পারে না, তা-ই। মনীশেরও যে কত দরকার তা কি কণা জানে না! ও শুধু, সেই ভাঙাচোরা মুখটার উদ্দেশে একবার বলে, 'পাজী কোথাকার।'

তারপর তাড়াতাড়ি শূন্য বোতলটা নিয়ে, বাইরের দিকে পা বাড়িয়ে বললো, 'আসছি।'

ভাইয়ের জন্যে একটু দুধ তো যোগাড় করতেই হবে।

শিকল কাটার ছল

ও যেন ঠিক আমারই মতো। ছটফট করে মরে বাইরে বেরুবার জন্য। একবার বাইরে আসতে পারলে সেটা চিরদিনের তরে। ও মিশিয়ে যাবে বনে। আমাদের বাড়ির এই চারপাশের আম জাম নারকেলের সবুজে মিশে যাবে ওর সবুজ গা। হারিয়ে যাবে ঘন ঝোপে ঝাড়ে। কোনো ফাঁক দিয়ে জেগে থাকবে লাল ঠোঁট দুটি। যেখান থেকে ওর ডাক শোনা যাবে, টি-ই। টি-ই। টু টু টু। শিস্ দেবে। পুরনো অভ্যাস মতো হয়তো ডেকেই বসবে, কোকো!

অর্থাৎ খুকু। ওইটি আমার ডাকনাম। তা খুকু তো ও বলতে পারে না। ওর মুখে ডাকটা ওই রকমই শোনায়। দেখাদেখি বিভাসদাও আমাকে ওই নামে ডাকে। সকলের সামনে নয় আড়ালে। আমাকে রাগাবার জন্যে ডাকে। বিভাসদা আবার সুর স্বর সবই নকল করে। টিয়েটার ডাক এমনিতেই কেমন যেন ন্যাকা ন্যাকা শোনায়। ওরকম করে বিভাসদা ডাকলে আমার সত্যি রাগ হয়ে যায়। কী জানি, সত্যি কি না কে জানে। বেশীক্ষণ তো রাগ করেও থাকতে পারি নে বিভাসদার ওপর। রাগ হয়, হাসিও পায়।

সেজন্যে আমি টিয়েটাকে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করি, এই মুখপোড়া, তুইও কি আমাকে রাগাবার জন্য যখন তখন অমনি করে ডাকিস?

ওর নাম ভক্ত। কথা শুনে ভক্ত ওর লাল রেখার মধ্য থেকে কালো মণি দুটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে, আমার মুখের দিকে দেখে নেয়। বার কয়েক ঘাড় কাৎ করে এদিকে-ওদিকে। এগিয়ে আসে দুপা।

আমি আবার ভ্রূ কুঁচকে সরোষে জিজ্ঞেস করি, কিরে ভক্তা, তুইও কি আমার পিছনে লাগতে চাস্? বল্, তা হলে এখুনি তোকে কাটি দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে খুব মারব, দেখবি।

কিন্তু খাঁচার মধ্যে ওর সাহস খুব। অমনি লাল ঠোঁট দুটি ফাঁক করে, জিভ্ দেখিয়ে ডেকে উঠবে, কো-কো!

আ মরণ! লোহার পাতের খাঁচার গায়েই আমি থাপ্পড় কষিয়ে দিই। ভক্ত অমনি মাথাটা নিচু করে, সরে যায় এক কোণে। সভয়ে তাকায়। পিঠের কাছ থেকে পাখাটা সরিয়ে এনে এমনভাবে মেলে দেয়, যেন মার আটকাবে।

আমি বলি, আবার ডাকা হচ্ছে? ন্যাকা পাখি কোথাকার। ফের অমন পেছু লাগবি তো, শিক পুড়িয়ে ঠোঁটে ঘষে দেব।

বলে যেমনি ফিরতে যাই, অমনি আবার কো কো!

দেখছ? কিন্তু নিজের মন নিয়েও বলিহারি যাই। আর আমার রাগ হয় না।

হাসি পায়। ভক্তকে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। তবু যেন জ্বালাতন হয়েই ফিরি। বলি, কী কী কী! কেন এত ডাকাডাকি, শুনি? তুই কি আমাকে ধরে রাখতে পারবি?

গলা নামিয়ে, চুপিচুপি বলি, বাবা মা কাকাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখিস না? ওদের কথাগুলো শুনিস না?

ভক্ত যেন এক মুহূর্ত আমার দিকে তাকিয়ে কি ভাবে। তারপরে যেন আরো গাঢ় স্বরে ডাকে, কো কো।

ঠিক যেন বিভাসদার আদর করে দুষ্টুমি করে ডাকার মতো শোনায়। ও বোঝে না, আমার কী হয়। পাখিটা কি বোঝে, আমার বুকের রক্ত কেমন করে ছলকে ওঠে অমন ডাক শুনে? ও কি জানে, আমার শরীর কেমন অবশ হয়ে আসে। তবু তলে তলে রক্তের স্রোতে কত টান।

কেমন করে জানবে? ও তো আমাকে ওই নামেই ডেকে আসছে প্রথম থেকে। তখন আমার কিছু মনে হতো না। ওর আদরের ভাবটা নকল করতে শিখলে বিভাসদা। এখন দুয়ের ডাক মিলে আমার কানে, আমার মরমে এক হয়ে গিয়েছে। এখন যে ভক্তর ওপর রেগে উঠি, আসলে কি ওর মুখে ওই ডাক শোনবার জন্যেই? কিন্তু রাগ যত করি, ভালাবাসর টান তত বাড়ে। কী যে সব বিপরীত রীতি, বুঝিনে ছাই।

আর, এখন শুধু ডাক নয়। ওর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দেখি নিজেকে। ও যেন দিন রাত্রি ওর তীক্ষ্ম ঠোঁট দিয়ে লোহার খাঁচাটাকে খোঁচায়, মনে হয়, সে যেন আমারই ঠোঁট দিয়ে খোঁচানো। আমার খাঁচাটা দেখা যায় না। ওর খাঁচাটা দেখা যায়। ভক্ত অবসর পেলেই ঠোঁট দিয়ে লোহার পাত ঠোকরায়। কাটতে চায়, ভাঙতে চায়।

আমার চারপাশেও কঠিন লোহার খাঁচা ঘিরে রয়েছে। বাবা, মা, কাকা, দাদা, ভাই, বোন, সমাজ সংসার, আমাদের বাড়ি, আমাদের মন, সব মিলিয়ে সেই অদেখা খাঁচাটি বড় কঠিন নিশ্ছিদ্র, নিটুট, নিষ্ঠুর। ওই খাঁচার ঘেরাওয়ে আমাদের এই মফস্বল শহরের কলেজে আমাকে আই. এ. পাস করানো হয়েছে। শিক্ষার অধিকারে আমি কলেজে পড়ি নি। সংসারের মাঝে দাঁড়াবার জন্যে শিক্ষার শক্তি নয়। 'শিক্ষিতা পাত্রী' হিসেবে আমাদের পারিবারিক মর্যাদার জন্য আমাকে পড়ানো হয়েছে। আমি যাদের বউ হবো, তারা বলবে, 'লেখাপড়া জানা বউ।' আমাকে পড়ানো হয়েছে, নইলে মেয়ে মুর্খ হয়ে থাকবে। কিন্তু তা বলে মেয়েকে জ্ঞান লাভের অধিকার দেওয়া হবে, তা যেন আদপেই না মনে করি। আমাকে পড়ানো হয়েছে, নইলে দুষ্টু সরস্বতী ঘাড়ে চাপে যদি? দিনকাল, আর আশে পাশে ছেলেপিলেরা তো ভালো নয়। অলক্ষ্মীর হাতছানি যদি দেখা যায় সদর দরজায়, তাই ঘরের কাজে আমাকে ব্যস্ত রাখা হয়েছে।

আঠারো বছরে আই. এ. পাস করেছি। এখন বাইশ বছর। এই চার বছরে আমার খাঁচা আরো ছোট হয়েছে। ধীরে ধীরে একটু একটু করে খাঁচাটি ছোট হতে হতে, এখন আমার টুঁটি টিপে ধরছে। এখন আমার সম্বন্ধ আসে। প্রতি রবিবারে,

স্কুল মাস্টার, কেরানী, ব্যবসায়ী, ওভারশিয়ার, নানারকম পাত্রেরা আনাগোনা করছে। আসে, খাবার খায়, আমাকে গিয়ে সেজে বসতে হয়। তারপর সেই একই কথা। নাম কী? বাবার নাম কী? কদ্দুর পড়াশোনা হয়েছে? হাতের লেখাটা দেখি। গান বাজনা জানা আছে? যেন ওরা এক সঙ্গেই ইন্দ্রের বউ শচী, আর সভাতলের উর্বশীকে চায়। ভগবান! ওদের কি মরণ হয় না?

হবে কী করে? ওরা কি ইচ্ছে করে আসে? বাবা কাকারা ওদের ডেকে নিয়ে আসে, তাই আসে। ওরা কি করে জানবে বিভাসদার খবর? বাড়ির লোকেরাই জানে না। জানে না কি আর? জানে একটু-আধটু, সন্দেহও করে। তবে ঘাঁটাতে চায় না। কি দরকার? ভালোয়-ভালোয় বিয়েটা হয়ে গেলে মিটে যাবে সব। ওরকম একটু-আধটু হয়। বাড়ির লোকের এই ধারণা। গলার কাঁটা, বেশী ঘাঁটিয়ে, খুঁচিয়ে লাভ কি? দুটি শুকনো ভাত আলতো করে গিলে ফেললেই যদি রেহাই পাওয়া যায়, তবে তাই হোক্।

তবে তা হবে না। খাঁচা আমি ভাঙব। শিকল আমি কাটব। এই আমার পণ। নইলে বিভাসদার সঙ্গে কেন বা এমন হবে? সেই চার বছর আগে আমার পাসের খবর বেরুল। বাড়িতে খাবার আয়োজন হয়েছিল। দাদা তার বন্ধু বিভাসকে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে এসেছিল সেদিন। সেই থেকে যাওয়া-আসাটা আজও অটুট আছে। বিভাসদা তখন বি. এ. পাস বেকার। বেকার এখনো। খালি টুইশানি আর টুইশানি। চাকরি খুঁজে পায় না। এমন রাগ হয় এক এক সময় বিভাসদার ওপর। ভারী গেঁতো মনে হয় আমার। বাড়িতে বিশেষ চাপ নেই কিনা। কাজের মধ্যে টুইশানি আর ঘুরে-ফিরে এ বাড়িতে এসে আমার মুখ দেখা। ওই করলেই বুঝি চলবে!

একটু যদি উদ্যোগ থাকত লোকটার। সব ব্যাপারেই এক রকম। আমার ব্যাপারেও। আমাকে প্রথম দিন দেখেই ভালো লেগেছিল বিভাসদার। কিন্তু ওই পর্যন্তই। কাছে পেলে হাতে হাত দেওয়া দূরের কথা। হাসতে গেলেই ঠোঁট কেঁপে যেত। তার আবার উদ্যোগ। ভালো আমারও লেগেছিল বিভাসদাকে। কবে থেকে, কে জানে? বুঝতে তো সময় লাগে কিছুদিন। ভালো-লাগা-চোখে তো অনেকেই তাকায়। তাকিয়ে চলে যায়। সে সব তো আর কোনো মেয়ে মনের মধ্যে ধরে রাখতে পারে না। ভালো-লাগা-চোখে দেখতে দেখতে, কবে একদিন মন গাঁথা হয়ে যায়, চোখে ফোটে প্রত্যাশা। সেই বুঝি ভালবাসা। ছেলেদের চোখে ওই প্রত্যাশা দেখলেই, মেয়েদের বুঝি টনক নড়ে। ছেলেটিকে মনে নিয়ে, নিরালায় ভাবতে বসতে হয়। ও আমার কাছে কি চায়?

শুধু মন নয়, রক্তও জানে, কি চায়। কিন্তু দিতে চাই কি? ভেবে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কয়েকদিন দেখেছিলাম বিভাসদাকে। কিছুটি দেখতে ভুলি নি। চোখ মুখ নাক, হাসি চাউনি, কথা বলার ভঙ্গি, হাঁটার ঢঙ, খাবার রকম। সব দেখেছি। বুদ্ধি আছে, কিন্তু ভালো মানুষ। নিরীহ কিন্তু হাসকুটে। ভাবভঙ্গি শান্ত, কিন্তু দাপাদাপি অপছন্দ করে না। তবে বড্ডো ফরসা। নাকটি খুব চোখা। ও-দুটি আমার তেমন পছন্দ নয়। না হোক, কি করব। লোকটা যে সরল, ভালো

মানুষ। বিশেষ কোনো প্যাঁচ-পয়জার নেই। নানান অছিলায় বিভাসদার পাশে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখেছি, বেমানান হবে না। আমি বিভাসদার মাথার চেয়ে একটু খাটো। একটু কালো। কালো আমার চুলের গোছাও কম নয়। বিভাসদা বলে, ভালো করে সুযোগ যেদিন পাব, সেদিন তোমার চুলের গোছা মুখে ছড়িয়ে রাখব। তোমার নিটোল হাতে চুড়ি পরাবার বড় সাধ হয় আমার। তুমি মাথায় বাঁধবে সাপের ফণার মতো খোঁপা। গাঢ় রং-এর সিলকের শাড়ি পরে বেরুবে তুমি আমার সংগে। তখন তোমার দেহের দুয়ারে মাথা নত করে, আমিও রাস্তার আর দশজন লোকের মতোই তাকিয়ে থাকব।

প্রথমটা মুখচোরা, মুখ খুললে বিভাসদা একেবারে কবি। আয়নার চেয়ে বিভাসদার দেখাটাই আমার ভালো। ওই জানাটাই আমার নিজের সম্পর্কে সবচেয়ে ভালো জানা।

তবে, বিভাসদা যা করবে, তা আমি জানি। আমাকে যেদিন বিয়ে করে ঘরে নিয়ে তুলবে, সেদিনও হয়ত দেখব, তার উদ্যোগের অভাব। সে-অভাব আমি প্রথমেই টের পেয়েছিলাম। চোখে চোখে, এলোমেলো কথার ফাঁকে সব বোঝাবুঝি হয়ে গিয়েছিল ছ'মাসের মধ্যেই। তবু আমার সংগে একলা ঘরে বসে থাকলেও, মনের কথা একটিও বলতে পারত না। আমি তো পারতামই না। মেয়েরা পারে বুঝি ? বিভাসদা কি একটুও বোঝে না ? বড্ডো ভয় বিভাসদার। আমার চোখের দিকে তাকিয়েও একটু ভরসা পেত না : কেবলি ভাবত, পাশের ঘরে বুঝি কেউ আড়ি পেতে আছে। কেউ টের পাবে, ভালো ছেলের দুর্নাম হবে। অথচ একটু কান পাতলেই বুঝতে পারত, আশেপাশে কেউ নেই। আমার বুক তো ফাটতই। বিভাসদারও বুক ফাটত, কিন্তু মুখ খুলত না। বুঝতেই পারতাম, আমার হাতটি একটু ধরতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কিছুতেই পারত না। বাড়ির লোকের ভয়, আর হাসি পায়, দুঃখও হয়, আমাকেও নাকি ভয় করত।

শেষে, সত্যি, ভাবতে এত লজ্জা করে, শেষে উদ্যোগটা আমাকেই নিতে হয়েছিল। দুই ঘরের মাঝখান দিয়ে, সদর দরজার গলিটা অন্ধকার। একদিন বিভাসদা বেরুবার ঠিক আগেই, অন্ধকার গলিতে চলে গিয়েছিলাম। বিভাসদা এলেই ভাবটা দেখাব, যেন আমি সদর দরজাটা খুলতে এসেছি কোনো কারণে।

বিভাসদা এসেছিল। আমাকে ওখানে দেখে একেবারে থ' হয়ে গিয়েছিল। ভেবেছিলাম, বিভাসদা আমার হাত চেপে ধরবে। কিন্তু শুধু দম বন্ধ গলায় ডাক দিয়েছিল, চিনু।

আমি বলেছিলাম, কে ? বিভাসদা ? বাড়ি যাচ্ছেন ?

বুঝতে পারছিলাম, বিভাসদা ঢোঁক গিলছে। হয়তো কাঁপছিল ভিতরে ভিতরে। তবু স্থাণুর মতোই আমিই কাছে এসে বলেছিলাম, কি হলো বিভাসদা ? দরজা খুলে দেব ?

যেন মরিয়া হয়ে বিভাসদা সহসা হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল আমার দিকে। আমিও বিভাসদার হাতটি ধরেছিলাম। আমার শরীর অবশ হয়ে আসছিল। ভীষণ আনন্দ হচ্ছিল। তবু কেমন একটু কান্নাও যেন ঠেলে আসছিল বুকের কাছে।

ভেবেছিলাম বিভাসদার ঠোঁট নেমে আসবে। আমি তো নির্ভয় দিয়েছি। কিন্তু আমার হাতটি তুলে নিয়েছিল বিভাসদা ঠোঁটের ওপর। তারপর কোনোরকমে বলেছিল, কাল আসব।

বলেই ঝড়ের বেগে চলে গিয়েছিল।

সেই থেকে শুরু। চার বছর হতে চললো। বিভাসদা এখন প্রায়ই আমাদের বাড়িতে আসে। দাদা না থাকলেও আসে। মা বাবা, সকলের সঙ্গেই বিভাসদার ভাব হয়ে গিয়েছে। আমার ভাইবোনেরা বিভাসদার অনুরক্ত। বিভাসদার সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ মেলামেশাটা হয়তো মা বাবা পছন্দ করেন না। কিন্তু সেটা গায়ে না-মাখার খানিকটা ভান করে থাকে।

অন্ধকার গলিটাতে তারপরে অনেকবার গিয়েছি। এই চার বছরের মধ্যে বার কয়েক বিভাসদাদের বাড়ি যাবার সুযোগ পেয়েছি। অবশ্যই দাদার সঙ্গে। দু-একবার এদিক-ওদিক একলা যাবার নাম করেও বিভাসদার সঙ্গে বেড়াতে গিয়েছি। খুব চুরি করে। মফস্বল শহর, ছোট জায়গা, সবাই আমাদের চেনে। জানে বিভাসদা ডাক্তার অনাদি মিত্রের ছেলে। আমি কৈলাস ভট্টাচার্যের মেয়ে। আমাদের কোনো পারিবারিক সম্পর্ক নেই। আমি বন্ধুর বোন, বিভাসদা দাদার বন্ধু। আমাদের একসঙ্গে দেখলেই নানান কথা উঠবে।

একেবারেই কি ওঠে নি? পাড়ার লোকে বলতে সাহস করে না কিন্তু একটু-আধটু আন্দোলন কি হয় না? বিভাসদার সঙ্গে যখন কথা বলি তখন আমার ছোট বোন মীনু আমাদের কি একটুও বুঝতে পারে না? মায়ের রুষ্ট নীরবতার কারণ কি একটুও বুঝি নে? দাদা যে এখন আর তার বন্ধুকে তেমন পছন্দ করে না, তা কি জানি নে?

বিভাসদাও এসব জানে। জানে তবু না এসে থাকতে পারে না। আমি জানি, তবু আমার মন মানে না।

তাই প্রতি সপ্তাহে খালি সম্বন্ধ আর সম্বন্ধ। মেয়ে দেখা আর মেয়ে দেখা। যত তাড়াতাড়ি পারা যায়, বিদায় করতে হবে। তাছাড়া বয়স হয়ে যাচ্ছে মেয়ের। বাড়ির লোক, আত্মীয়স্বজন, যেন পাগল হয়ে উঠেছে, হন্যে হয়ে ফিরছে একটি ছেলের জন্য।

আমি প্রতীক্ষা করে আছি সেই দিনটির জন্য। যেদিন আমি আর বিভাসদা সবাইকে জানিয়ে দেব। বিভাসদার একটা চাকরির অপেক্ষা। কী যে রাগ হয় বিভাসদার ওপর। বি. এ. পাস করেও চাকরি পায় না। আসলে, ভীষণ গেঁতো। ভেবেছে এমনি করেই দিন যাবে। এদিকে যে সময় ঘনিয়ে আসছে, সে খেয়াল নেই। যেন এমনি ক'রে রোজ একবার করে 'কো-কো' বলে ডেকে আমার মুখ দেখলেই চলবে।

তবু কী যে ভয় করে এক এক সময়। কেমন করে বলব? বাড়িতে এখন কেউ গায়ে মাখছে না। কিন্তু আমাকে তো মাখতে হবে। বিভাসদাকে মুখ ফুটে দাবি করতে হবে। যা ছেলে! পারবে তো?

ভাবলেই আমার গায়ের রক্ত জল হয়ে যায়। যেদিন জানাজানি হবে সেদিন কী

হবে ? বাবা কাকা দাদারা কী বলবে ? মারবে আমাকে ? ঘরে দরজা বন্ধ করে রাখবে ? কেন বিভাসকে ভালবেসে কি পাপ করেছি ? শুধু জাতে মেলে না। সেই কি সব ?
তাই পাখিটার দিকে তাকিয়ে আমার নিজের কথাই শুধু মনে হয়। আমি আর এ খাঁচার বাঁধন সইতে পারি নে। ভক্ত যেমন করে—অবসর পেলেই দেখি, লোহার পাত কাটার ব্যর্থ চেষ্টা করে, আমিও আসলে দিনরাত্রি খাঁচা ভাঙবার কথাই ভাবি। ভক্ত কোনোদিন ওর ওই ঠোঁটে খাঁচার লোহা কাটতে পারবে না। ওর ঠোঁট ভাঙবে, রক্ত পড়বে, তবু না। আমি পারব। আমি তো পাখি নই।
ভক্তটার জন্য তাই আমার কষ্ট হয়। প্রথম যখন এসেছিল পাঁচ বছর আগে, তখন ভালো করে পাখা গজায় নি। হলুদের জল দিয়ে চান করাতে হতো। তারপর আস্তে আস্তে ঘন সবুজ পাখা গজাল। ঠোঁট দুটি আরো বড় হলো, আগে লাল হলো। শিস দিতে শিখল, কথা বলতে শিখল, ডাক দিতে শিখল।
আমাকেই ডাকে বারে বারে। আমি বরাবর ওকে চান করিয়েছি, খেতে দিয়েছি। আমিই তো কথা শিখিয়েছি, আমার নাম ধরে ডাকতে শিখিয়েছি।
দুপুরটা যখন খাঁ খাঁ করে, সবাই যখন ঘুমায়, আমাদের বাগানের গাছগুলি বাতাসে মাথা দুলিয়ে পাতার ঝাপটায় ঝাপটায় গান করে, গালে হাত দিয়ে আমি টিয়ে পাখিটার দিকে তাকিয়ে থাকি। ও মেয়ে কি পুরুষ আমি জানি নে। নামটা যদিও পুরুষের। কিন্তু ওর তো বাবা মা ছিল আমারই মতো। ও যদি বাইরে যেতে পারত, এতদিন ভক্তও প্রেম করত নিশ্চয়। বাচ্চা হতো। বাবা কিংবা মা হতো।
এক এক সময় ওর ডাক শুনে মনে হয়, যেন আকাশের দিকে তাকিয়ে কাঁদছে। বুনো টিয়েরা আসে বাগানে। তাদের ডাক শুনে ভক্ত কিন্তু চেঁচায় না। কান পেতে শোনে। ঘাড় কাৎ করে, চোখ বড় বড় করে দ্যাখে। তারপর বুনোরা চলে গেলে ভক্ত চীৎকার করতে থাকে। খাঁচাটাকে দুলিয়ে কামড়ে একশা করে।
ইচ্ছে হয়, ওকে ছেড়ে দিই। কিন্তু আমি কী নিয়ে থাকব এ বাড়িতে ? আমি বাবা মা ভাইবোন কাকা দাদা, সবাইকে ভালবাসি। কিন্তু বিভাসদার কাছে কী কেউ। বিভাসদা না হলে যেন টুটা ফুটা ভাঙা টুকরা মনে হয়। সবটা নয় যেন। তাই ভক্তটা এখন আমার সংগী। আমিই রাগি, আমিই সোহাগ করি। ওর ডাকা নাম-টাই যে বিভাসদা শিখেছে। আমি যে ওরই মতো। তাই বিভাসদাও ভক্তকে খুব ভালবাসে। আবার একটু হিংসেও করে। আমি যে আসলে মুখপোড়া পাখি-টাকে সত্যি ভীষণ ভালবাসি। মনে হয়, ও যেন ছদ্মবেশী বিভাসদা। পাখি রূপ ধরে বসে আছে আমার সামনে। সব মিলিয়ে ভক্ত আমার আত্মার মতো।
ভোরবেলা ওর 'কো-কো' 'কো-কো' চেঁচানিতে যখন আমার ঘুম ভাঙে তখন ভীষণ রাগ হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে একটা আনন্দ হয়। কারণ বিভাসদা সকলের সামনে চিনু বলে বটে, আড়ালে যে আমাকে ও নামেই ডাকে। উঠেই মুখ খিঁচুনি দিই, কেন, তোমার পেটের ছেলে পড়ে যাচ্ছে ? আর খিদে সইতে পারছ না ?

আমি খাবার না দিলে আবার বাবুর মুখে রোচে না। মরণ! ইচ্ছে করে ওর টুক-টুকে ঠোঁট দুটো ধরে নেড়ে দিই কষে। ইচ্ছে হয়, বলি ন্যাকা বুঝিসনে কিছু তাই অমনি করে ডাকিস, না?

ক'দিন ধরে মনটা ভালো নেই। কেমন যেন মনটা বারে বারে ছ্যাং ছ্যাং করে উঠছে। চমকে চমকে উঠছি। কোথায় কী একটা অশুভ ঘটনা যেন ঘটেছে অন্তরালে।

বিভাসদা এক সপ্তাহ আসে নি। কেন, জানিনে। দাদাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম লজ্জার মাথা খেয়ে। দাদা শুকনো করে জবাব দিয়েছে, খবর জানি নে।

আর গত দু'সপ্তাহ আগে এক পাত্রী-দেখা দল এসেছিল দেখতে। তাদের ভাব-ভক্তি তখনই আমার ভালো লাগে নি। মেয়ে পছন্দ আর পাওনা থোওনা বিষয়ে তারা বেশ যেন খুশী মনেই হয়েছিল। বাবা কাকাকেও দেখেছিলাম, বেশ খুশী। ছেলেটি বুঝি কোনো অফিসে চাকরি করে কেরানীর। শীগগিরই নাকি বড়বাবু হবে তার ডিপার্টমেন্টের।

আজ ভোরে 'কো-কো' 'কো-কো' ডাক শুনে প্রায় কান্না পেয়ে গেল। টিয়েটাকে আজ বকলাম না, ধমকালাম না। খাবার দিয়ে শুধু চুপিচুপি বললাম, আমার কি হবে রে? আমার কী হবে? কাল থেকে যে শুনছি, আজ আমার আশীর্বাদ হবে। বাবা ছেলেকে আগেই আশীর্বাদ করে এসেছে। আমাকে কি এবার তুই গলায় দড়ি দিয়ে মরতে দেখবি?

ভক্ত অস্ফুটে একবার ডাকল, কো-কো।

তারপরে আবার খাবারে মন দিল। কিন্তু বারে বারে তাকাতে লাগল আমার দিকে।

আমি বললাম, শুধু ডাকিস, ডেকে আনতে পারিস নে? আমি কেমন করে মুখ ফুটে বলব, আমার আশীর্বাদ হবে না। আগে বিভাসদাকে আসতে দাও।

ভক্ত শুধু বলল, কো-কো।

আমার চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। পিছনে মায়ের গলা শুনতে পেলাম, খুকু তাড়াতাড়ি চান করে নে মা আজ। বেলা ন'টার মধ্যেই আশীর্বাদ হয়ে যাবে। ক'জন খাওয়া-দাওয়া করবে, আমাকে সাহায্য করবি।

আমার চীৎকার করে বলতে ইচ্ছে করল, কিসের আশীর্বাদ? আমাকে কি কচি খুকি পেয়েছ নাকি?

কিন্তু বলতে পারলাম না। পালিয়ে গেলাম তাড়াতাড়ি।

সাতটার সময় স্নান করে বেরুতেই মীনু বলল, দিদি। বিভাসদা এসেছে। বিভাসদার নাকি একটা ভালো চাকরি হয়েছে।

আমার বুকের মধ্যে কাঁপতে লাগল থরথর করে। তাড়াতাড়ি কাপড় পরে, বিভাসদার কাছে গেলাম।

ইতিমধ্যে মীনুর কাছে বিভাসদাও খবর পেয়েছে, আজ আমার অশীর্বাদ। তাই

দুজনেই যখন চোখাচোখি করলাম, থমকে গেলাম দুজনেই।
বিভাসদা শুধু বলল, আমি চাকরি পেয়েছি কোকো। কাছে এলো আমার। আজকে বিভাসদার দেখছি অনেক সাহস। আমার হাত ধরল। ভয় করতে লাগল আমার। আজ যে বাবা দাদা কাকা, সবাই বাড়িতে। যদি দেখে ফেলে?
বিভাসদা বলল, কি হবে কোকো? ন'টার মধ্যে তোমার নাকি আশীর্বাদ! তোমার বাবাকে বলব আমি?
আমি শিউরে উঠলাম যেন। হাত ছাড়িয়ে সভয়ে বললাম, না, না, বাবাকে বলো না। ভীষণ কাণ্ড হবে।
—তবে তোমার দাদাকে বলব?
—না না। সেও একই ব্যাপারে হবে।
—তবে? তবে কী করব কোকো? তুমি নিজে বলবে?
আমার ভীষণ কান্না পেল। দু'হাতে মুখ ঢেকে বললাম, আমার বড্ডো ভয় করছে বিভাসদা। কেমন করে বলব?
বিভাসদা বিমূঢ় বিস্ময়ে আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল। তারপর অস্থিরভাবে বলে উঠল, তাহলে আমি কি করব এখন কোকো?
আমি একেবারে ভেঙে পড়ে বললাম, কিছু বুঝতে পারছি নে বিভাসদা। কিছু বুঝতে পারছি নে।
এমন সময় দাদা এসে ঘরে ঢুকল। আমাদের ওই অবস্থায় দেখে একটু গম্ভীর হলো। তারপর আমাকে বলল, খুকু তুই ভিতরে যা, মা ডাকছে। বোস বিভাস, চা খাবি।
আমি তাড়াতাড়ি বাড়ির ভিতরে চলে গেলাম। গিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কিন্তু কোথায় গেল আমার সমস্ত শক্তি। অসহায় কান্না ছাড়া আমার আর কিছু অবশিষ্ট রইল না। কিন্তু আমি যেন ভয়ে ও আতঙ্কে বিভাসদার কথা আর কাউকে জিজ্ঞেস করতেও পারলাম না। উঠে গিয়ে দেখে আসতেও পারলাম না।
মা আমার কান্নার কোনো কৈফিয়ত চাইলেন না। আদর করেই বললেন, বিয়ে একদিন সকলেরই হয় মা। কাঁদিস নে। মেয়েরা কি বাপের ঘরে চিরকালই থাকে? আয়, ছেলের বাবা এসে পড়েছেন। একটু ভালো জামাকাপড় পর। আর বেশী সময় বাকী নেই আশীর্বাদের।
ভক্তটা ডেকে মরছে, কোকো! কো-কো! কোটা গেলে?
জানি নে কোথায় গিয়েছি। কিন্তু যেখানে ছিলাম, সেখানে নেই।
আমার আশীর্বাদ হয়ে গেল। আমার ভাবী শ্বশুরমশাই, আমার গলায় একটি বেশ ভারী, মডার্ন ডিজাইনের হার পরিয়ে দিলেন। আমি নমস্কার করে বেরিয়ে এলাম।
এসেই সোনার হারটা খুলে ফেলতে গেলাম। মা যেন তা বুঝতে পেরেছিলেন, তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বললেন, ছি খুকু, ওটা এখন খুলিস নে। আদর করে দিয়েছেন।
হ্যাঁ, আদর করে সোনার শিকল গলায় পরিয়ে দিয়েছে লোকটা। কিন্তু কিছু বলবার অধিকার আমার নেই। বিভাসদাকে আমি ফিরিয়ে দিয়েছি। কে বিশ্বাস করবে, আমার বুক ফেটেছে, মুখ ফোটে নি। আমি ভীরু, আমার সাহস নেই।

আমি কাকে দোষ দেব? আমার মন, আমার রক্ত, আমারই মিথ্যে, আমারই অপমান।

আমার নজর পড়ল রান্নাঘরের বারান্দায়, খাঁচার ভিতরে ভক্তকে। দেখলাম, ও আপনমনে লোহার পাত কামড়ে মরছে।

মুহূর্তে একবার আমি চারদিক দেখে নিলাম ত্রস্ত চোখে। আমার বুকের ভিতর কান্না উথলে উঠল। তবু আনন্দ হলো। আমি স্থির করলাম, ভক্তকে খাঁচা খুলে দেব। ও পালিয়ে যাক্। চলে যাক্। আমার চিরদিনের খাঁচার দুঃখ—ওর মুক্তির এই মুহূর্ত স্মৃতিতে ধরে রাখব।

বারেক চারদিকে চোখ বুলিয়ে, আমি ভক্তের সঙ্গে কথা বলার ছল্ করে খাঁচাটার কাছে গেলাম। মা রান্নাঘরে। বাবা দাদা কাকারা বাইরের ঘরে কথা বলছে। মীনুরা ঘরের মধ্যে দাপাদাপি করছে।

মাকেই আমার সবচেয়ে ভয়। মা কেবলি রান্নাঘরে থেকে একবার বাইরে আসছেন ও যাচ্ছেন।

পাখিটা ডাকল, কো-কো।

আমি ফিস্‌ফিস্ করে বললাম, খাঁচা খুলে দিই, চলে যা।

বলে আমি লোহার সরু শিকের কুলুপটা দিলাম খুলে। মা বাইরে এলেন। এসে আমার দিকে ফিরে বললেন, খুকু, একবারটি আয় কাপড় ছেড়ে। একলা পারব না!

কোনো রকমে বললাম, যাই!

কিন্তু সরতে পারছিলাম না। খাঁচার দরজাটা খুলে গিয়েছে। আমি সরে গেলেই মা দেখতে পাবে খোলা দরজা। দেখলাম পাখিটা অবাক হয়ে চেয়ে রয়েছে খোলা দরজাটার দিকে।

মা রান্না ঘরে যেতেই আমি ছুটে পালালাম। আমার গা কাঁপছে। প্রায় কাঁপতে কাঁপতে শাড়ি বদলালাম। কিন্তু বাইরে যেতে পারছি না। এতক্ষণে হয়তো পাখিটা উড়ে পালিয়েছে। পালাক। পালাক।

বেশ খানিকক্ষণ দেরি করে আমি পা টিপে টিপে ঘরের বাইরে এলাম। এসে থম্‌কে দাঁড়ালাম। অবাক হয়ে দেখলাম, পাখিটা দরজার বাইরে এসেছে। বাইরে এসে খাঁচার বাইরে, লোহার পাতের উপর ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

যেন মুক্তিটাকে চিনতে পারে নি। আমি তাড়াতাড়ি চারদিকে দেখে, ছুটে গেলাম তাড়া দিতে। কিন্তু পাখিটা তাড়া খেয়ে, ঠিক তেমনি করে পিঠের পাখা মেলে দিয়ে ভীরু চোখে তাকাল। কিন্তু উড়ল না।

আমি আবার তাড়া দিলাম। ও ভয়ে নিচের দিকে গড়িয়ে পড়ে, খাঁচার লোহা কামড়ে ঝুলতে থাকল।

আমার যেন চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করল। লোকের সাড়া পেয়ে আমি সরে এলাম। পাখিটা তাড়াতাড়ি আবার ঢুকে গেল খাঁচার মধ্যে। ঢুকে ডাকল, কো-কো।

আঁচল মুখে চেপে পালিয়ে গেলাম সেখান থেকে। ও পালাতে পারবে না। খাঁচার

পাখি, ও যে আমার সত্যি এমন আত্মা স্বরূপ, এতখানি জানতাম না। আমরা এক, অভিন্ন।

সেই কবিতাটির মতো, মুক্তিরণে মাতব বলে এ যে 'শিকল পরার ছল' নয়; তা জানতাম না। আসলে মুক্তি নেই। তাই এ জীবনে শুধু শিকল কাটারই ছল।



পার

কাজ নেই তাই বসে ছিল দুটিতে। সেই সময়ে পুবের উঁচু থেকে জানোয়ারগুলি নেমে এলো হুড়মুড় করে। ধুলো উড়িয়ে, বনজঙ্গল মাড়িয়ে, একরাশ কালো মেঘের মতো নেমে এলো জানোয়ারের পাল ঘোঁৎঘোঁৎ করে।

বসে ছিল দুটিতে। বেঁটে ঝাড়ালো এক বটের তলায় একজন গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে ছিল। শুয়ে ছিল আর একজন। একজন পুরুষ, আর একজন মেয়ে।

আসশেওড়া আর কালকাসুন্দের অবাধ বিস্তার চারিদিকে। মাঝে মাঝে বট অশ্বত্থ-পিটুলি-সজনে, সব আগানি-গজানো গাছ দাঁড়িয়েছে মাথা তুলে। যেন নিচের কচি-কাঁচা ঝোপ-ঝাড়গুলিকে খবরদারি করছে উঁচু মাথায়।

বন-ঝোপ নিয়ে, হামা দিয়ে দিয়ে জমি উঁচুতে উঠেছে পুবে। একটু উত্তরে, উঁচুতে দেখা যায় একটি কারখানাবাড়ি। বাদবাকি হারিয়ে গেছে গাছের আড়ালে। আর পশ্চিমে মাটি নেমেছে গড়িয়ে গড়িয়ে। নামতে নামতে তলিয়ে গেছে গঙ্গার জলে।

আষাঢ়ের গঙ্গা। অম্বুবাচীর পর রক্ত ঢল নেমেছে তার বুকে। মেয়ে গঙ্গা মা হয়েছে। ভারী হয়েছে, বাড় লেগেছে, টান বেড়েছে, দুলছে, নাচছে, আছড়ে আছড়ে পড়ছে। ফুলছে, ফাঁপছে, যেন আর ধরে রাখতে পারছে না নিজেকে। বোঝা যাচ্ছে আরো বাড়বে। স্রোত সর্পিল হচ্ছে। বেঁকেছে হঠাৎ। তারপর লাটিমটির মতো বোঁ করে পাক খেয়ে যাচ্ছে। স্রোতের গায়ে ওগুলি ছোট ছোট ঘূর্ণি। মানুষের ভয় নেই, মরণ নেই ওতে পশুর। শুকনো পাতা পড়ে, কুটো পড়ে। অমনি গিলে নেয় টপাস্ করে! বড় ঘূর্ণি হলে মানুষ গিলত। এই ঘূর্ণি-ঘূর্ণি খেলা। যেন তীব্র স্রোত ছুটে এসে একবার দাঁড়াচ্ছে। আবার ছুটছে তর্‌তর্ করে।

দুটিতে দেখছিল। মেঘ জমেছে মেঘের পরে। বড় বড় মেঘের চাংড়া নেমে এসেছে স্রোতের ঠোঁটে, ব্যাকুল ঢেউয়ের বুকে। নেমে এসেছে গাছের মাথায়। হাত বাড়িয়ে ছুঁতে আসছে আসশেওড়া কালকাসুন্দের লকলকে ডগা। বাতাসের ঘায়ে মেঘ দোমড়াচ্ছে, দলা পাকাচ্ছে। আবার ছড়িয়ে ছড়িয়ে আসছে নেমে।

কাজ নেই, তাই দুটিতে বসে ছিল। বেকার বসে বসে দেখছিল। সেই সময়ে জানোয়ারগুলি আসতে চমকে উঠল।

এদিকে গঙ্গার ধারাটা ফাঁকা ফাঁকা। লোকজনের যাতায়াত তেমন নেই। বাইরে থেকে মনে হয়, উত্তরের কারখানাটা ঝিমুচ্ছে এই মেঘলা দুপুরে। গঙ্গা এখানে বেশ চওড়া। ওপারে ধু-ধু করছে ইঁট পোড়াবার কারখানা। আষাঢ় এসেছে, ইঁট

পোড়াবার মরশুম শেষ। ওখানেও ফাঁকা। জেলেনৌকারও তেমন ভিড় হয় নি এখনো। তার মাঝে এ দুজন বসেছিল। এই আষাঢ় ঢলকানো গৈরিক গঙ্গা, এই জনশূন্য বনঝোপ, ওই মেঘভরা আকাশ, তার তলায় ওই দুটি। সহসা মনে হয়, পৃথিবীর সেই প্রাগৈতিহাসিক যুগের মেয়ে আর পুরুষ বসে আছে ঝোপ-জঙ্গলের অসহায় আশ্রয়ে।

কালো কুচকুচে পুরুষ। গামছাটি পাতা শিয়রে। আঁটসাঁট করে কাপড় পরা। গোঁফজোড়া বড় হয়েছে। কিন্তু এখনো নরম রোঁয়াটে ভাব যায় নি। মুখটি এর মধ্যেই চোয়াড়ে, খোঁচা খোঁচা হয়ে উঠেছে। শুয়ে পড়েছে। পা চালিয়ে দিয়েছে মেয়েটির উরুতের ওপর দিয়ে।

মেয়েও কালো। চুলে পড়েছে জট। কপালে কয়েকদিন আগের গোলা মেটে সিঁদুরের টিপের আভাস মাত্র। ছোট একটি কাপড় কোমরে জড়িয়ে বাকিটুকু টেনে দিয়েছে বুকে। তাতে মন মেনেছে, শরীর মানে নি। নতুন বয়সের বাড়। বন-কালকাসুন্দের মতো পুষ্ট বেআব্রু হয়ে পড়েছে। হাহা করছে কান আর নাকের ফুটোগুলি। উকুন মারছিল মাঝে মাঝে। মাঝে মাঝে পুরুষটির গায়ে বুক চেপে এলিয়ে পড়ছিল।

সেই সকাল থেকে দুটিতে এমনি গায়ে গায়ে বসে ছিল। কাজ নেই, খাওয়াও নেই, তাই এইখানে বসে ছিল।

এলিয়ে এলিয়ে পড়ছে হাত পা। কালি পড়েছে চোখের কোলে। মুখে চেপে বসেছে ক্ষুধা-ক্লিন্নতা।

পরশু রাতে শেষবার খেয়েছে। কাজ করেছে আগের সপ্তাহ পর্যন্ত। তারপর 'মিসিপালটীর' দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কাজ নেই।

গাঁয়ের মানুষ ননকু। এখানে এখন ঝাড়ুদারদের সর্দার। দু'মাস আগে তাকে কাজ দেবে বলে নিয়ে এসেছিল। বাবুসাহেব নাগিন প্রসাদের শুয়োর আর ভেড়া চরিয়ে পেটভাতায় ছিল দুটিতে গাঁয়ে। ননকু গোঁফ মুচড়ে, বুক ফুলিয়ে বলেছিল, সঙ্গে চল্। মাস গেলে দুটিতে রোজগার করবি ষাট টাকা।

আরে বাপ্‌রে বাপ। ষাট টাকা। সবে তখন বিয়ে হয়েছে ছমাস। একলা মানুষ নয়, যে মনের রাশ নেই, শরীরের উপর বিশ্বাস নেই। ওদের গাঁয়ের মানুষ কথায় বলে, নট জাতের মাগী-মদ্দা এক হলে, হেন কর্ম নেই যে করতে পারে না। তা ঠিক। তখন ওদের মনে নেমেছে ঢল। ওরা নটের ঘরের দুই জোয়ান মাগী-মদ্দা। ওরা একত্র হলেই যে-কোনো অভিযানে নামতে পারে। নাগিন প্রসাদকে কিছু না বলে চলে এসেছিল দুটিতে ননকুর সঙ্গে।

কিন্তু কোথায় ষাট টাকা। দুজনে মিলে বত্রিশ টাকা রোজগার করেছে মাসে। দেড় মাস পর বাড়তি হয়ে গেছে দুটিতে। কাজ নেই। কেবল থাকতে পাওয়া যাবে ধাঙড় বস্তিতে।

কিন্তু কাজ নেই তো খাওয়া নেই। ননকুকে বলল, কেন কাজ নেই?

ননকু বলল, ওট হয়ে গেল তাই। ওটের আগে কাজ দেখাতে হয়, তাই বাড়তি নেওয়া হয়। মিটে গেল, বসিয়ে দিল।

ওরা বলল, তবে কি হবে ?

কি হবে! ননকু বোধহয় প্রথমে ভেবেছিল চেঁচিয়ে ধমকে উঠবে। কিন্তু সে চেঁচিয়ে ভেউভেউ করে কেঁদে উঠেছিল, হায় রাম রাম রাম। আমি পাপ করেছি। আমি শুয়োরের বাচ্চা, গাধার বাচ্চা, আমি পাপী।

সবাই এসে সান্ত্বনা দিতে লাগল ননকুর কান্নায়, রোহ, রোহ, তু তু তু. বহো সর্দার, ন রো। তুমি ভালো মানুষ। ওদের একটা কিছু হয়ে যাবে।

একা দুটিতে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে চুপ করে গেছল? ননকু কাঁদো-কাঁদো গলায় বলেছিল, হবে?

হ্যাঁ হ্যাঁ, হবে।

সাতদিন কোনোরকমে খাইয়েছিল কেউ কেউ দুটিকে। পরশু রাতে শেষবার খাওয়া পাওয়া গেছে। আর নয়।

গতকাল সারাদিন কেটেছে এখানে। আজো এসে দুটিতে এলিয়ে পড়েছিল। শহরের মধ্যে থাকা যায় না। পুবের উঁচু পাড়ের খানিকটা গেলেই ধাঙড় বস্তি। সেখানেও থাকা যায় না! ক্ষুধার্ত, জিভ-বেরিয়ে পড়া কুকুরের মতো হাঁপাতে হয় সেখানে। খিদে পায় কাউকে খেতে দেখলে। এখানে এই নির্জনে এসে তবু পড়ে থাকা যায়।

যায়, কিন্তু যাচ্ছিল না আর। দুজনের হৃৎপিণ্ড দুটি পেটে নেমে এসে দম নিচ্ছিল। আর গায়ে গা রেখে দুটিতে জাইয়ে রাখছিল রক্তপ্রবাহ। গায়ে গা ঠেকিয়ে যেন রক্তে রক্তে সাহস সঞ্চয় করছিল। গা শুঁকে, চটকে, চেটে, বিকট ভয়কে মুখে থাবড়ি দিয়ে রাখছিল সরিয়ে। যে-ভয়টা গা বেয়ে বেয়ে উঠে ওদের একেবারে শেষ করে দিতে চাইছিল। যেন ওদের ভয় ধরিয়ে দেওয়ার জন্যেই আকাশ কালো হয়ে নেমে আসছিল! জল আরো লাল হয়ে উঠছিল, পাক দিয়ে দিয়ে খলখলিয়ে উঠছিল। দক্ষিণের বাতাস একটু পুবে বাঁক নিয়ে খ্যাপা হ্যাঁচকা দিচ্ছিল। ভেজা মাটি ফুঁড়ে ফুঁড়ে উঠছিল দলা দলা কেঁচো। ওদের চারপাশ ঘিরে, বটতলায় পিঁপড়েরা আসছিল তেড়ে।

এসেছিল একটা জোয়ারের শুরুতে। একটা পুরো জোয়ারের উজান গেছে। তারপরে নেমেছে দীর্ঘ সময় ধরে একটা ভাঁটার ঢল। আবার লেগেছে জোয়ার।

এমন সময়ে এলো সেই জানোয়ারগুলি পূবের উঁচু থেকে। মেঘের বুকে আর এক পোঁচ গাঢ় কালিমার মতো নেমে এলো কালো কুতকুতে চোখো, ছুঁচলোমুখো, মাদী-মদ্দা পশুর দল।

ওরাও মাদী-মদ্দা দুটিতে উঠে বসল গায়ে গায়ে।

শুয়োরের দল একবার থমকে দাঁড়াল জঙ্গলে একজোড়া মানুষ দেখে। তারপর আবার ঘোঁৎঘোঁৎ করে ছড়িয়ে পড়ল আশেপাশে।

পেছনে দেখা গেল দুটি লোক। একজন বেশ নাদুসনুদুস, সোনার মাকড়ি কানে। দুটি সামনের দাঁত পুরো সোনার। শুয়োরগুলি কিনেছে এ অঞ্চলের যাবৎ ধাঙড়-তল্লাট ঘুরে ঘুরে। নিয়ে যাবে ওপারে। সঙ্গে আর একটি লোক। সামনের বস্তির ময়লা টানা গাড়ির গাড়োয়ান।

এই দুটিকে দেখে সোনার মাকড়িকে বলল, মহাশয়জী, এ দুটোকে দিয়ে আপনার কাজ হতে পারে ?

সোনার মাকড়ি এগিয়ে এলো। দেখল দুটিকে একবার। মেয়েটি টানতে লাগল বুকের কাপড়। পুরুষটি সংশয়ে দেখতে লাগল দুজনকে।

গাড়োয়ান বলল সোনার মাকড়িকে, সে এদের চেনে। বেকার বসে আছে। রাজী হয়ে যেতে পারে।

সোনার মাকড়ি কাছে এসে দুটিকে দেখল আরো খানিকক্ষণ। আর শুয়োরের দল, বনপালা উপড়ে, কচি শিকড়ের শাঁসের সন্ধানে তছনছ করতে লাগল ঢালু জমি।

সোনার মাকড়ি দেখতে দেখতে একবার হুঁ দিল আপন মনে। আর ওরা দুটিতে এখান থেকে সরে যাবে কিনা ভাবছে।

তারপর বলল সোনার মাকড়ি, কাজ করবি ?

কাজ ! কাজ মানে খাওয়া ! ওদের এলানো শরীর একটু শক্ত হলো, পুরুষটি বলল, কি কাজ ?

সোনার মাকড়ি বলল, শুয়োরগুলি নিয়ে যেতে হবে দরিয়ার ওপারে।

আরে বাপ্। ভরা দরিয়া, আরো বাড়ছে। ফুলছে, নাচছে আর ঠেলে ঠেলে উঠছে উজানে! ওরা মেয়ে-মরদ চোখাচোখি করল দুজনে। দুজনেরই ক্ষুধিত চোখে আশা ফুটল।

পুরুষটি বলল, একটা খবরদারি লাও চাই যে ?

অর্থাৎ একটি খালি নৌকা চাই শুয়োরগুলির পাশে পাশে। ওটিই নিয়ম। কিন্তু সোনারমাকড়ি সেদিকে ঢু-ঢু। নৌকার পয়সা খরচ করতে পারবে না।

ওরা দুটিতে দমে গেল খানিকটা। ফিরে তাকাল দরিয়ার জলে। তারপর শুয়োর-গুলির দিকে। কালো কিম্ভূত দলা দলা ছড়ানো। মাদীই বেশি। চোখগুলি ট্যারা। চাউনি বোঝা যায় না। কিন্তু লক্ষ্য আছে ঠিক মানুষের দিকে।

ওরা পরস্পর চোখাচোখি করল আবার। আর সেই মুহূর্তেই মনে মনে রাজী হয়ে গেল দুজনে। সেই মুহূর্তে ওদের নটরক্ত উঠল তোলপাড় করে। আঁকুপাঁকু করে উঠল অভুক্ত পেটের মধ্যে। পড়ে থাকাটা মনে হলো মরে থাকার মতো। দুটিতে কাপড়ে কষুনি দিল।

তবু মেয়েটি মেয়েমানুষ। বলল, কিন্তু বিনা লাও, পারব তো ?

পুরুষটি বলল, সামলাতে হবে।

সোনার মাকড়ি বলল, উই যে ওপারে উত্তরে দেখা যায় শিউমন্দির, তুলতে হবে ওখানে। উনত্রিশ জানোয়ারের জন্য উনত্রিশ আনা দুজনের মজুরি। আর উপরি পাওয়া যাবে কিছু কেড়ুয়া তেল, দরিয়ার থেকে উঠে গায়ে মাথার জন্যে। একটি খোয়া গেলে ছমাস হাজত।

বলে তার হাতের লম্বা লাঠি বাড়িয়ে দিল পুরুষটির দিকে। মেয়েটি পাতা ছাড়িয়ে ভেঙে নিল কালকাসুন্দের ছপটি।

সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ান, দুজনেই চোখাচোখি করল হতবাক হয়ে। রাজী

হয়ে গেল দুটোতেই ? শেষে জানোয়ারগুলি মেরে দুটোতে মরবে না তো। কিন্তু ওদের দুজনকে শুয়োরগুলিকে ঘিরে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে সে তরর্ হয়ে গেল। ওরা দুজনে দাঁড়িয়ে গেল দুদিকে। মেয়েটি তার সরু মিষ্টি গলায় টান দিল এক-টানা, উ-র্ র্-র্-র্-র্-আ…

আর পুরুষটি ডাক দিল দোআঁশলা গলায়, আ…হুঃ। আ…হুঃ। যেন মেয়েটির টানা সুরে পুরুষ দিল তাল। শব্দগুলি বেরুচ্ছিল ওদের ক্ষুধিত পেটের ভেতর থেকে। কেমন ক্লান্ত আর গম্ভীর সেই সুর। হঠাৎ যেন এক বিচিত্র গানের মায়া ছড়িয়ে দিল এই ঢালু বনভূমিতে। ঘোলা লাল জলের তরঙ্গে তরঙ্গে লাগল সেই সুর। বাতাসে বাতাসে সে সুর লাগল গিয়ে মেঘে মেঘে।

জানোয়ারগুলি ঘোঁৎঘোঁৎ করে উঠল সোহাগী সংশয়ের সুরে। মাথা তুলল একে একে ঝুপসি ঝাড়ের ফাঁক দিয়ে। ছুঁচলো মুখ তুলে যেন গন্ধ শুঁকে দেখল ডাকের ভাব। চকচক্ করে উঠল কুঁত্কুঁতে গোল চোখগুলি। ঘেঁষাঘেঁষি করে এলো সবাই গায়ে গায়ে। গায়ে গায়ে সবাই ঠিক জড়ো হতে লাগল ওদের মাঝ-খানে।

উ-র্-র্-র্-র্-আ-উ-র্-র্-র্—আ…

আ…হুঃ। আ…হুঃ।

সোনার মাকড়ির সোনার দাঁত উঠল চক্‌চকিয়ে। গাড়োয়ানটা ঠিক জানোয়ার-গুলির মতো গোল গোল চোখে তারিফ করতে লাগল মনে মনে, হ্যাঁ, ঠিক যেন শুয়োরের আদত বাপ-মা দুটি।

আর ওদের উপোসে মরণের ভয়টা যেন হারিয়ে গেল ওই সুরের মধ্যে। অভর পেটের ক্ষুধার যন্ত্রণাটা এক নতুন সংযমী ক্ষুধার রসে উঠল ভরে। খেতে পাওয়া যাবে, সেই আশায় শক্ত হলো হৃৎপিন্ড। কাজ পাওয়া গেছে, কাজ করতে হবে আগে। কঠিন কাজ।

কাজ কঠিন, কিন্তু পশুগুলি চেনা। সেই থেকে পড়ে থেকেছে ওদের সঙ্গে। পেলেছে ওদের চিরদিন গাঁয়ে। ওদের চেনে, জানে তাগ্ বাগ। চেনে না শুধু দরিয়াটাকে। লাল দরিয়া চলেছে খরবেগে তর্‌তর্ করে। জোয়ার লেগেছে, ঢেউ নেই। কিন্তু টান খুব। দরিয়াও গহিন। ছড়িয়ে ছড়িয়ে বাড়ছে। কালো মেঘ নামছে পুঞ্জ পুঞ্জ।

জানোয়ারগুলি জড়ো হচ্ছে গায়ে গায়ে। দূর থেকে মনে হয়, একজায়গায় থুক-থুকিয়ে উঠেছে কালো ডেঁয়ো পিঁপড়ের দল। আর শোনা যাচ্ছে সোহাগী শুয়োর-গলার চাপা ডাক।

ওরা যতো জড়ো হয়, ওরা দুটিতে তত ঘনিয়ে এলো কাছাকাছি। মেয়েটি আড়-চোখে ফিরে তাকাল একবার সোনার মাকড়ি আর গাড়োয়ানের দিকে। তারপরে গঙ্গার দিকে। চাপা গলায় বলল, লাও নেই, কিছু নেই। বহুৎ বড় দরিয়া।…

মেয়েটা মেয়েমানুষ। এটুকু ওর ভয়ে পেছন-টানা নয়। সাহস আর ক্ষমতার মাপ বুঝে হাত দিতে চায় কাজে।

পুরুষটা পুরুষমানুষ। গোঁফ মুচড়ে তীক্ষ্ম চোখে মাপে দরিয়া। তারপর বলে

খালি, হাঁ, বহুৎ বড় !

কথাটার মানে হলো, বড় কিন্তু পার হতে হবে।

মেয়েটি আবার বলল, উনতিশ আনা কত ? পুরা রুপয়ার বেশি না কম ?

বউটা ছোট, তবে মেয়েমানুষ। হিসাব না খতালে মন সাফ হয় না।

মরদটা পুরুষ। সব মেনে গেলে বেহিসাবী হয়ে পড়ে। বলে, তিন আনা কম পুরা দু রুপয়া।

আচ্ছা। নতুন ক্ষুধায় একটা অদ্ভুত মিষ্টি স্বাদ লাগছে যেন। কাজেরও তাড়া লাগছে মনে মনে, আর শরীরে। জোয়ারে জোয়ারে যেতে হবে। ওপারের উত্তরের দূর শিবমন্দিরের কাছে যেতে হবে।

মেয়েটা আবার বলল, দরিয়ায় এখন জল বেশি। এরা এখন পার করছে কেন ?

পুরুষটি বলল, ওরা কারবারী ' জানোয়ারের তখলিফ পরোয়া করে না।

ওরা ডাকছে সুরে সুর মিলিয়ে আর কথা বলছে। কথা বলতে বলতে গুনছে। দুটো মদ্দা, বাকি সব মাদী। হ্যাঁ, কিন্তু একটা গাভিন যে। গাভিন শুয়োরী। পেটে ওদের সোনা ফলে। কোনোটা পাঁচটা দেয়, কোনোটা ছটা। তেমন ফলবতী হলে সাতটাও। দরিয়া পার পাবে তো !

পাবে। নয়া গাভিন। এখনো হালকা আছে।

ডাকের সুরটা কিছু রকমফেরে। তাড়া দেওয়ার সুর। তাড়া দিতে গিয়ে থমকে গেল পুরুষটি। ব্যস্ত হয়ে ফিরল সোনার মাকড়ির দিকে। উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, হুজুর এদের খানাপিনা ভরপেট আছে তো ?

সোনার মাকড়ি বলল, হাঁ হাঁ।

হাঁ বাবা ! এতবড় দরিয়া, যুঝবে কি করে নইলে পশুগুলি। ওদের দুটির পেটে না থাক খানা। খানার জন্যই ওরা যুঝতে যাচ্ছে। জানোয়ারগুলি কেন যুঝবে, তা ওরা জানে না।

পরমুহূর্তেই পুরুষটি লাঠি তুলে ওর শূন্য নাভিস্থল থেকে একটা তীক্ষ্ন বিলম্বিত হাঁক দিল, হাঁ-ই—ই—হা…

মেয়েটা টান দিল, উ-র্-র্-র্—আ,—উ-র্-র্-র্-আ…

জানোয়ারগুলি হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠল এই রূঢ় অথচ নতুন ইঙ্গিতের সুরে। গোল গোল ট্যারা পাকানো চোখে সংশয় দেখা দিল। হাঁক শুনে সব সামনের দিকে একবার ঠেলে আসতে গেল। কিন্তু দোলায়মান লাঠি আর ছপটি দেখে, থমকে ঠেলাঠেলি করতে লাগল। ভাবখানা এ সবের মানে কি ? গায়ে গায়ে ঘষার একটা খস্‌খস্‌ শব্দ উঠল। গায়ের শুকনো কাদা উড়তে লাগল ধুলোর মতো।

তারপর লাঠি-ছপটির নিশানা আর হাঁকের ইশারায়, এক জায়গাতে ঘেঁষাঘেঁষি করে ফিরল নদীর দিকে। পরমুহূর্তেই কোনো খবরদারি না দিয়ে পুরুষটির হাতের লাঠি আলতোভাবে গিয়ে পড়ল জানোয়ারের ভিড়ে। আচমকা ভয় পেয়ে, মাটিতে অদ্ভুত শব্দ করে দলটা নামতে লাগল ঢালুতে। দুজনের লাঠি-ছপটি হাতের ঘেরাওয়ে উনত্রিশটি জানোয়ার। বড় জাতের জানোয়ার।

ততক্ষণে আষাঢ়ের জোয়ারের গঙ্গা এগিয়ে এসেছে কল্‌কল্‌ করে। বাড়ছে। আরো

বাড়বে।
কালো-কালো খোঁচা-খোঁচা লোমওয়ালা পিঠের ঢেউ থমকে থমকে পড়ছে। শুয়োর জল চায়। টানের দরিয়ায় পড়তে চায় না সহজে। চোখে তাদের টানা ঘোলা স্রোতের শঙ্কা। গলায় অদ্ভুত সন্দিগ্ধ বিক্ষুব্ধ শব্দ। যেন জিজ্ঞেস করছে, কি হবে? কোথায় যেতে হবে?
পুরুষটি রূঢ় হাঁকের ফাঁকে ফাঁকে তোয়াজের সুর দিচ্ছে, আহু আহু আহু, উতারো, উতারো। তোদের দরিয়া পার করি তারপর। হোই…হা হা
উ-র্-র্-র্—আ উ-র্-র্-র্-আ…
মেয়েটি কেবল দেখছে, দরিয়া বাড়ছে। যত কাছে আসছে, ততই যেন বেড়ে যাচ্ছে। ততই ফুলছে, স্রোতের টান বেঁকে বেঁকে হিল্‌হিল্ করে যাচ্ছে। দেখছে আর ফিরছে পুরুষের দিকে। পুরুষটিও দেখছে আর শক্ত হচ্ছে মুখটা। এসে গেছে, এসে গেছে জলের কিনারায়। ল্যাজ গুটিয়ে এগুচ্ছে জানোয়ারেরা। এ ওকে গুঁতিয়ে ঠেলে এগিয়ে দিয়ে পেছিয়ে আসছে নিজে। এমনি করে অনিচ্ছায় এগুচ্ছে।
হঠাৎ একটি জানোয়ার তীব্র চিৎকার করে ছুটে বেরিয়ে গেল। সেই গাভিন শুয়োরীটি। আকাশ ফাটিয়ে চেঁচিয়ে ছুটেছে। যেন তীব্র প্রতিবাদ করে বলছে, যাব না, কখ্‌খনো যাব না।
যাবে না। ভয় পেয়েছে। হারামজাদীর পেটে বাচ্চা আছে কিনা!
কিন্তু মেয়েটি হুতাশে পেছন তাড়া করতে গিয়ে, জলের ধারের কাদায় হুমড়ি খেয়ে আবার উঠে ছুটতে যাবে পুরুষটি হাঁক দিল, ছুট্ মত্।
কাদা মেখে প্রায় খালি গায়ে দাঁড়িয়ে গেল মেয়েটা। শক্ত নিটোল বুকে কাদা লেপে গেছে। কাদা লেগেছে চুলে। অনেকখানি যেন মিশে গেল শুয়োরের দলের সংগে। পুরুষটি বলল, ডাক, ডাক দে, এগুলিকে নিয়ে আগে বাড়তে হবে।
জলে নামাল না শুয়োরের দলকে। ডাঙার উপর দিয়ে চলল নরম সুর ছাড়তে ছাড়তে। উররর-আ, উররর-আ, আ-হুই! আ-হুই।
শুয়োরীটা অনেক দূরে গেছে চলে। থেমেছে, কিন্তু বিকট গলায় তারস্বরে চেঁচাচ্ছে, কিন্তু ফাঁকে ফাঁকে আবার মুখ নামিয়ে কি সব খাচ্ছে খুঁটে-খুঁটে।
এরা দুটিতে জলের ধার দিয়ে দলটাকে নিয়ে চলেছে এগিয়ে। শুয়োরীটা দেখছে, খাচ্ছে আর চেঁচাচ্ছে। তারপরে হঠাৎ তেমনি চেঁচাতে চেঁচাতেই পিল্‌পিল্ করে ছুটে এলো দলের মধ্যে। কিন্তু চেঁচাতে লাগল তেমনি। ঘাড় গোঁজ করে আড়চোখে তাকিয়ে চেঁচাতে লাগল, জেনে-শুনে মারতে নিয়ে যাচ্ছিস আমাকে! শয়তান মানুষ!
মেয়েমানুষ আর পুরুষমানুষ দুটি চোখাচোখি করল একবার। সময় হয়েছে। এইবার, এইবার। পায়ের পাতায় জল ঠেকছে। ঠেকছে আবার সরে যাচ্ছে। আবার ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে অনেকখানি।
শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি। আর পুরুষটি যেন তার সব কথাই বুঝতে পারছে, এমনিভাবে বলছে, হুঁ হুঁ! কোনো ডর নাই। হুঁ হুঁ। আ-হুই! বলতে বলতে

সে আবার গঙ্গার দিকে তাকাল। গঙ্গা। গঙ্গামায়ী। যেন খিলখিল করে হাসছে, কল্‌কল্‌ করে কি সব বলছে। আর যেন ঠিক চেয়ে আছে ওদের দিকে। কি যে বলছে, ঠিক বুঝতে পারছে না ওরা দুটিতে। খালি মনে হচ্ছে, যেন জিজ্ঞেস করছে ভগবতী দরিয়া, আসছিস ? আসবি ? তোরা ভুখা রয়েছিস আর আমি কত বড় হয়েছি। এই বলছে আর হাসছে। হাসছে আর মাতাল রহস্যময়ী চোখে দুলে দুলে চলছে। লাল হয়ে গেছে খুশিতে।

পুরুষ আর মেয়ে ওদের দুজনের চোখেই অপার অনুসন্ধিৎসা। দুজনেই যেন দরিয়ার তলা পর্যন্ত দেখে নিতে চাইছে। কি রহস্য আছে সেখানে। কি ভয় আছে, কত ফাঁদ পাতা আছে মরণের।

এইবার বোঝা যাচ্ছে, ওরা দুটি যেন শিশুর মতো সরল। শিশুর মতো নির্ভীক ও সাহসী। মেয়েটা আঁচল আঁটছে কোমরে। গা-টা একেবারেই খোলা। ঝড়, জল ও বজ্রপাতেও দুর্জয় গিরিশৃঙ্গের মতো নির্ভীক বলিষ্ঠ বুক।

পুরুষটি গোঁফ পাকাচ্ছে। রোঁয়াটে গোঁফ আর এবড়ো-খেবড়ো পাথরের চাংড়া শরীর।

ওরা দুজনেই যেন মনে মনে বলছে ভগবতী দরিয়াকে, হাঁ, আমরা ভুখা। সেইজন্যে আমাদের পার হতে দাও। সোনার মাকড়িটা কারবারী। ও আষাঢ় মাসে জানোয়ার পার করাচ্ছে বিনা নৌকায়। উনত্রিশটা জানোয়ার, আরে বাপ। দুটো মানুষ। হাই বাপ্‌। জানোয়ারগুলোর কোনো দোষ নেই। হেই মায়ী। দুদিন ধরে দেখছ, আমাদেরও কোনো দোষ নেই।

ওরা বলছে আর দরিয়া যেন যোগেড়ী নাচওয়ালীর মতো কল্‌কল্‌ ঝুম্‌ঝুম্‌ করে এগিয়ে আসছে দুর্জয় কটাক্ষ করে। জল বাড়ছে, ওরা কেবলি সরে সরে উঠে আসছে। তৈরি হচ্ছে।

জানোয়ারগুলি সংশয়োদ্দীপ্ত চোখে তাকাচ্ছে মানুষদুটোর দিকে। কান পাতছে বাতাসে আর জলে। বাতাস আর জলের কথা বুঝতে চাইছে যেন ওরা। ঘোঁৎঘোঁৎ করছে সবাই। শুয়োরীটা চেঁচাচ্ছে তেমনি কোনো কিছু গ্রাহ্য না করে।

এইবার। এইবার। পুরুষটি জানোয়ার পটানো শব্দের ফাঁকে ফাঁকে বলল মেয়েটিকে, থোড়া উপরে ওঠ।

হাঁ, ঠিক আছে। একটু এগিয়ে যা, হাঁ, ঠিক খাড়া হয়ে যা।

দাঁড়িয়ে পড়ল মেয়েটি। জানোয়ারগুলিকে মুখ ফেবাতে হলো জলের দিকে। এইবার তাড়া দিতে হবে। একবার জলে পড়লেই স্রোতের টান। তখন আর কিছু ভাববার অবসর থাকবে না।

শেষবারদুজনে তাকাল জলের দিকে, ওপারে মাটির সীমানায়। জানোয়ারগুলির জিজ্ঞাসু গোঙানি বাড়ছে।

একমুহূর্ত পরেই ওদের দুজনের গলাতেই শোনা গেল একটি তীব্র চিৎকার আর সঙ্গে সঙ্গে লাঠি ছপটি মুহুর্মুহু এসে পড়তে লাগল জানোয়ারগুলির গায়ে। পরমুহূর্তেই দেখা গেল জানোয়ারগুলিকে দরিয়া খানিকটা টেনে নিয়ে গেছে। ওরা দুটিতেও ঝাঁপ দিল জলে।

কিন্তু ওদের দুটিকে পেছনে রেখে, জানোয়ারগুলি দ্রুত উত্তর দিকে চলল ভেসে। এখন থেকেই এরকম উত্তর দিকে গেলে, এ জন্মে আর পার হওয়া যাবে না। শুয়োরগুলিকে ওপারের দিকে মুখ করাতে হবে। নৌকা থাকলে এ অসুবিধে হতো না।

পুরুষটি চিৎকার করে উঠল, ডাঙায় ওঠ্, জলদি।

তখনো বুকজল। দুজনে লাফিয়ে ডাঙায় উঠল।

জানোয়ারগুলিও ডাঙায় ওঠবার তালে আছে। জলে একটা অদ্ভুত খলবল শব্দ তুলছে শুয়োরেরা আর চাপা গলায়, ছুঁচলো মুখে মুখ ঠেকিয়ে কিসব বলাবলি করছে। গাভিন শুয়োরীর গলাটাও চেপে গেছে অনেকখানি।

ওরা দুজনে উঠেই ডাঙার উপর দিয়ে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির সামনে। উনত্রিশটা জানোয়ার যেন একটি বিকটাকার জানোয়ারের মতো ভাসছে। পুরুষটি ঝাঁপ দিয়ে পড়ল ঠিক সামনের মুখে। মেয়েটি পড়ল মাঝামাঝি।

পুরুষটি জলে পড়েই লাঠি তুলে দলটার মুখ ফিরিয়ে দিল পশ্চিমে গংগার ওপারের দিকে। মেয়েটি পেছন থেকে ছপটি মারল ছপছপ করে। শুধু দক্ষিণ দিকটা ফাঁকা রইল। জোয়ারের ধাক্কা আসছে ওদিক থেকে। শুয়োরগুলি ওদিকে ফিরতে পারবে না কোনোমতে। আর খোলা আছে পশ্চিম দিক। ওদিকেই তাড়াতে হবে।

পুরুষটি লাঠি তুলে চিৎকার করতে লাগল, হা—ই। হা—ই। পেছন থেকে মেয়েটি হুমহুম শব্দ করছে আর বলছে, খবরদার, এদিকে মুখ করবি নে।

শুয়োরগুলি তখনো ঠেলাঠেলি করছে পরস্পরের মধ্যে আর ঘোঁৎঘোঁৎ করছে। এখনো বোধহয় পেছন ফেরার আশা করছে। এর পরে ঠেলাঠেলি করে নিজেরাই এগিয়ে যেতে চাইবে। এখন ভয়ে ও শংকায় ঠেলে বেরুচ্ছে চোখগুলি। সামনে ওই বিশাল জলরাশি আর তার তীব্র টান। কোথায় নিয়ে যাচ্ছে অ্যাঁ ? মরতে হবে ? কি চায় এরা !

ওপারে নিয়ে যেতে চায়।

পুরুষটি কিছুতেই তিষ্ঠুতে পারছে না শুয়োরগুলির উত্তর মুখে। ভয়ংকর টান। টানটাও একরোখা নয়। থেকে থেকে বেঁকে যাচ্ছে।

মেয়েটি তো কিছুতেই জানোয়ারগুলির পেছনে থাকতে পারছে না। তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে আরো উত্তরে, পুরুষটির দিকে।

পুরুষটি চিৎকার করে বলল, ঠেলে থাক্। জোরে ঠেলে থাক্। খবরদার ইধারে আসিস্ নে।

ঠেলে থাকছে মেয়েটা। কিন্তু তীব্র স্রোতে হাত-পা-গুলিকে যেন ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। ধাক্কা মারছে এসে বুকে।

এখন আর মানুষ দেখা যায় না। সব শুয়োর হয়ে গেছে। সাতাশের জায়গায় আটাশটা মাদী, আর দুটো জায়গায় তিনটে মদ্দা হয়েছে।

ডাঙা সরে গেছে বেশ খানিকটা। দক্ষিণে বাতাস ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে জলে। যেখানে পড়ছে, সেখানে এক অদ্ভুত উল্লাসের কাঁপুনি লেগে যাচ্ছে। জোয়ার না হলে, এই

বাতাসে ধাক্কা লেগে গঙ্গা উত্তাল হয়ে উঠত। ঢেউ উঠত বড় বড়। তাহলে জানোয়ারগুলি মরত নির্ঘাত।

পুবের হ্যাঁচকা থেকে থেকে ঢেউয়ের আভাস দিচ্ছে, সেইটাই ভয়ের! মেঘগুলি দলা পাকিয়ে কোথাও কোথাও নেমে আসছে হুহু করে। কোথাও উঠে যাচ্ছে। উঠতে উঠতে ফাঁক হয়ে যাচ্ছে। ফাঁক হয়ে যাচ্ছে দুপাশে। সেই ফাঁকের মাঝে দেখা দিচ্ছে অদ্ভুত আলোর রেখা। যেন কি এক রহস্য প্রকাশ হয়ে পড়বে এখুনি। কিন্তু পরমুহূর্তেই ঢেকে যাচ্ছে গভীর কালিমায়। ভাবভঙ্গি ভালো নয়। মেঘ তাতে আরো জমাট হচ্ছে। গাঢ় অন্ধকার আসছে ঘনিয়ে।

ওরা দুটিতে দেখছে আকাশের দিকে আর প্রচণ্ডভাবে হাত-পা ছুঁড়ছে জলের মধ্যে। মাঝে মাঝে উঠছে লাঠি আর ছপটি। জলের ধাক্কায় কাবু হচ্ছে একটু একটু করে। কিন্তু এখনো সেটুকু ভাববার, অনুভব করার অবসর পাচ্ছে না। মুখে শব্দ করছে হা—হা—! মেয়েটি নীরব হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে তীব্র চিৎকার করে উঠছে এক-একটা জানোয়ার। আর ওরা দুজনে চমকে জলের দিকে তাকাচ্ছে। কি হয়েছে! কে তোকে কি করেছে। ঠ্যাং কামড়ে ধরেছে কি কেউ জলের তলায়।

ভাবতেই, জলের তলায় ভয়াবহ আতঙ্কটাকে ওরা ওদের দেহের প্রচণ্ড আলোড়নে চূর্ণবিচূর্ণ করে দিতে চাইছে। কিছু নয়। কিছু নেই। কোনো ভয় নেই।

হঠাৎ মেয়েটি চিৎকার করে উঠল। পুরুষটা শুশুকের মতো লাফিয়ে উঠল জলে। কি হলো?

তিনটে শুয়োরী বেমালুম পিছন ফিরে পোঁপোঁ করে পালাচ্ছে উত্তর-পুবে। যাবে না, কিছুতেই আর যাবে না। স্রোত বাড়ছে, জল ফুলছে। মারবার ফন্দি খালি।

পুরুষটি একমুহূর্তে আড়ষ্ট রইল। তারপর লাঠি নামিয়ে তিন শুয়োরীর পেছন ধাওয়া করল। কাছাকাছি গিয়ে, মুখোমুখি হলো। লাঠি তুলে জলে মারল ছপাস্ করে। ছুঁচলো মুখ আবার ফিরল। সেই গাভিনটা। আর দুটো উঠতি বয়সের। সময় হয়েছে গাভিন হওয়ার। এখনো মানুষ চিনতে শেখে নি, বিশ্বাস আসে নি মনে।

পুরুষটার রাগ হলো, আবার মায়াও হলো। খালি বলল, জানোয়ার। একদম জানোয়ার। হাই—হাই!

হলদে দাঁত বের করে চেঁচাতে চেঁচাতে দলের দিকে ছুটল তিনটিতে। লাঠিটা উঠে রইল আকাশে।

ইতিমধ্যে বাকি জানোয়ারগুলিকে নিয়ে মেয়েটা চলে গেছে অনেকখানি।

পুরুষটা তাড়া দিল। জলে ডুবে ডুবে তারও চোখগুলি দেখাচ্ছে শুয়োরের মতো। বলছে, আমি আছি না, হ্যাঁ? হারামজাদী!

নিদারুণ সব খিস্তি করতে লাগল রাগে ও সোহাগে।

কাছাকাছি এসে মেয়েটির সঙ্গে চোখাচোখি হলো। দুজনের চোখই শুয়োরের মতো দেখাচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখে কেমন একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি।

দুজনেই বুঝল, স্রোত বাড়ছে! ভয়ংকর বাড়ছে। দরিয়া আকুল। আরো বাড়ছে।

ফুলছে। এক-একটা জায়গায় জল যেন নিচের থেকে ফুলে ফুলে উঠছে। উঠছে আর ছুটছে তীব্র বেগে। আবার দাঁড়িয়ে পড়ছে এক-এক জায়গায়। ওখানে রাগ আছে বুঝতে হবে। কপট রাগ। ঢালাও স্রোতের কৃত্রিম ঘূর্ণি।
শুয়োরগুলি চাক বেঁধেছে। মুখের পাশ দিয়ে ফ্যাঁস্‌ফ্যাঁস্‌ করছে জলের মধ্যে। গোঁগোঁ করে কিসব বলাবলি করছে। জলের গভীরতা, তার ভয়ংকরী রূপটা যেন ওরাও চিনতে পেরেছে, তাই একজোট হয়ে, নিজেরাই নিজেদের দায়িত্বে চলেছে। মিছিল করে নিয়েছে, লড়াই জলের সঙ্গে। তবু দেখছে লাঠি আর ছপটি। তবু ওরই মধ্যে যত ময়লা ভেসে যাচ্ছে মুখের সামনে দিয়ে, সব মুখে পুরে নিচ্ছে। আর ওরা দেখছে, দরিয়াটা ক্রমে সরে যাচ্ছে। গহিন দরিয়া। এখনো মাঝামাঝিও আসা যায় নি। জলের ধাক্কায় ধাক্কায় ওদের হাতে, পায়ে, মাথায় শিরাগুলি টানটান হয়ে উঠেছে। জল ঠাণ্ডা কিন্তু ওদের পা থেকে গরম বেরুচ্ছে। ঘাম ঝরছে। মেশামিশি হয়ে যাচ্ছে ঘামে জলে।
জল হাসছে কল্‌কল্‌ করে, বেঁকে বেঁকে যাচ্ছে সোজা স্রোত। বেঁকে ফুলে উঠে এক-একটা করে চুবানি দিচ্ছে ওদের আর বলছে, এসেছিস ? আয়, আরো আয়। বলছে আর সমুদ্র উজাড় করে খল্‌খল্‌ করে আসছে।
হ্যাঁ, যেতে হবে। হেই মায়ী! মায়ী দরিয়া, যেতে হবে। অনেক লাঠি আর ঘা পড়ছে তোর গায়ে। জানোয়ারগুলিকে ভয় দেখাবার জন্যে। তোর কত সহ্য মায়ী। আমাদের কোনো দোষ নেই, কোনো স্পর্ধা নেই। দরিয়ার উপর চিরকাল মানুষকে পার হতে হয়।
মেয়েটার মুখের দিকে তাকানো যাচ্ছে না। জোয়ারের দরিয়া কেবলই বাড়ছে আর ওর চোখে বাড়ছে একটা অশুভ ইঙ্গিত। ঠেলছে, কিন্তু পারছে না। দূরে সরে যাচ্ছে কেবলই। হাতের আর উত্তোলিত নেই। নেমে গেছে।
পুরুষটা কিছু জিজ্ঞেস করতে চাইছে, কিন্তু ভয়ে পারছে না। যদি বলে, নাই সক্‌তি। আর পারছি নে। বিদায় দাও। বাবুসাহাব নাগিন প্রসাদ ওদের বিয়েতে দুটো শুয়োর মেরেছিল, এক মণ চাল দিয়েছিল। আর দিয়েছিল চার জালা তাড়ি।
আকাশ আরো নামছে। নামছে। হঠাৎ পশ্চিম দিক থেকে একটা বিদ্যুৎঝলক ওদের মাথার উপর এসে হারিয়ে গেল। পরমুহূর্তেই কড়কড় ব্যাগ করে শব্দ হলো। অমনি জানোয়ারগুলি মিছিল ভেঙে ফেলল। এলোমেলো হয়ে গেল।
আঁ আঁ শব্দে চেঁচিয়ে উঠল কয়েকটা।
মেয়েটাও লাফ দিল মস্তবড় কাতলা মাছের মতো। ছপটি উঠেছে আবার হাতে। পুরুষটা লাঠি তুলে হাঁক দিল, খবরদার! কিছু ডর নেই, চল্‌। যত জল্‌দি পারিস চল্‌।
যা দু-একটা জেলেনৌকা ছিল আশেপাশে, তারা সব পার ঘেঁষছে।
যত পশ্চিম, ততই স্রোত। পশ্চিমে বাঁকা। জল ওখানে তলে তলে লুপলুপ করে মাটি খাচ্ছে। মন্দির কোথায় ? শিউমন্দির ? ওই, ওই যে। অনেক দূরে। এখনো অর্ধেক। ওই বাঁকের মুখে, স্রোত যেখানে পাগলের মতো ছটফটিয়ে উঠেছে।

ওরা সরে যাচ্ছে ক্রমে শুয়োরগুলির কাছ থেকে। শুয়োরগুলি চাক বাঁধা। সেজন্যে ওদের গতির মধ্যে একটা শৃঙ্খলা, সংযম আছে। ওরা দুটিতে ছিটকে যাচ্ছে কুটোর মতো।

জানোয়ারগুলির বিশ্বাস ফিরে এসেছে মানুষদুটোর উপর। ওদের সরে যেতে দেখে ভয় পাচ্ছে। তাই ভীত সন্দিগ্ধ স্বরে ডাকছে বারবার।

আর ওরা স্রোত ঠেলে কাছে থাকতে চাইছে, পারছে না। ওরা যতই ঠেলছে, ততই অবশ হয়ে পড়ছে। কাঁধে আর হাঁটুতে টান পড়েছে।

ওরা দুজনে কাছে কাছে। মেয়েটি মুখ তুলল। জলে ভেজা মুখ। চোখ লাল। বলল, আচ্ছা, আমরা ফিরে আসব কি করে? খেয়া পারের পয়সা দেবে তো?

মেয়েটা মেয়েমানুষ। ও এখন ফিরে আসার ভাবনায় পড়েছে। পুরুষটা বলল, জানি নে।

হঠাৎ আবার নতুন স্রোত। এখানে জলটা ইস্পাতের মতো রেখাহীন অথচ ভয়ংকর বিক্ষুব্ধ। টানে না, যেন ছুঁড়ে ফেলে দেয়।

এক লহমায় মেয়েটা অদৃশ্য হয়ে গেল। আবার ভাসল। সারা মুখ ঢেকে গেছে খোলা চুলে।

কোথায় গেলি?

এই যে!

না, ডোবে নি। পুরুষটি গোঁফের ফাঁকে হাসবার চেষ্টা করল এতক্ষণে। এতক্ষণে মেয়েটাকে হারাবার ভয় হয়েছে! বলল, কি, তখলিফ হচ্ছে?

তখলিফ! এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয়। কিন্তু মেয়েটি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল, না।

মনে হচ্ছে, রাত্রি নামছে। অন্ধকার হচ্ছে। আবার সাপিল বিদ্যুৎ চিক্‌চিক্ করে উঠল। একদিক থেকে নয়, চারদিক থেকে। যেন ছপটি মেরে যাচ্ছে জানোয়ারগুলির জলে ভেজা চকচকে পিঠে, ওদের মাথায়। সোজা ওদেরই মাথার উপর যেন বজ্রপাত হচ্ছে। আকাশের শব্দ যেমনি থামছে জলের শব্দ সেই মুহূর্তেই দ্বিগুণ হচ্ছে। চিৎকার করছে ভীত পশুর দল।

এবার পুরুষটির লাঠিও নেমে গেছে। ক্ষুধার কথা ভুলে গেছে দুজনেই। অনেক ক্ষণ ভুলে গেছে। পার হতে হবে শুয়োরগুলিকে নিয়ে, সেইটেই একমাত্র কথা, একমাত্র ভাবনা।

আবার গতি বাড়ল জানোয়ারগুলির। অর্থাৎ স্রোত আরো বাড়ছে। জল ছুঁতে চাইছে আকাশকে, আকাশ জলকে। জল ঝাপটা দিচ্ছে তলে। তলে তলে, ঠ্যাঙে, পেটে, বুকে। স্রোতের চরিত্র আবার বদলেছে।

ওরা দুটিতে আবার কাছাকাছি হয়েছে। কাছাকাছি হয়েছে জানোয়ারগুলিও। মেয়েটা কি যেন টেনে টেনে তুলছে। কাপড় তুলছে। খুলে যাচ্ছে কাপড়, তাই। দুজনেরই হাতের চেটোগুলি নতুন চালের আসকে পিটের মতো ফুলো ফুলো হয়ে কুঁকড়ে গেছে। মেয়েটার চোখের দিকে চোখ রাখতে পারছে না পুরুষটা। মেয়েটা ডুবছে বারবার, আর এই ঘোলা জলের মতো ঘোলা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে ওর

দিকে।
ওদের বিয়েতে কী বাঁশিটাই বাজিয়েছিল রামুয়া। আর আজকে এই সর্বনাশী দরিয়ায়—
চিক্‌চিক্‌ দুম! চিৎকারের চোটে জানোয়ারগুলির বীভৎস হলদে দাঁত বেরিয়ে পড়ল।
পুরুষটি ঢোঁকে ঢোঁকে জল খেল কয়েকবার। ডাকল, আছিস?
হাঁ। আছি।
আবার বলল মেয়েটা হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে থেমে থেমে, ঊনত্রিশ আনাতে ঠকা হয়ে গেছে, না?
হ্যাঁ।
গংগা বুক বাড়িয়ে ঠেলে ঠেলে, দুলে দুলে যেন হেসে উঠেছে ওদের কথায়।
আবার: আচ্ছা, রাত হয়ে গেলে আমরা থাকব কোথায়?
পুরুষটি নীরব। সভয়ে তাকিয়ে দেখল উত্তরগামী স্রোত অদূরেই বাঁক ফিরে হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়েছে। ভাঁটা পড়ে গেল নাকি। সর্বনাশ! মন্দিরের কাছাকাছি এসে আবার উল্টোদিকে ভাসতে হবে। একটা নৌকা নেই। আর দুটো মানুষের হাতে ঊনত্রিশটা জানোয়ার।
পরমুহূর্তে সে চিৎকার করে উঠল, ঘূর্ণি। ঘূর্ণি।
জানোয়ারগুলিও সে চিৎকারের মধ্যে আসন্ন বিপদের সংকেত পেল। ওরা পুরুষটির দিকেই এগুতে লাগল।
পশ্চিমপাড়টা মাটি খাচ্ছে অদৃশ্যে। দ' পড়ে গেছে। আওড় হয়েছে তাই।
উত্তরগামী জল তাই হঠাৎ দক্ষিণগামী হয়ে বড় ঘূর্ণির সৃষ্টি করেছে।
বড় ঘূর্ণি। মানুষ জানোয়ার, সব খেয়ে ফেলবে। আরে বাপ! হেই মায়ী।
আবার জোর ফিরে এলো দুজনেরই গায়ে। পুরুষটি লাঠি উঁচিয়ে চিৎকার করে ছুটে গেল জানোয়ারগুলির দক্ষিণে। খবরদার। খবরদার।
সে ঘূর্ণির কাছাকাছি চলে গেল জানোয়রেগুলিকে বাঁচাবার জন্য। মেয়েটা পুরুষের জীবন-সংশয় দেখে কাছে আসতে চাইছে। পারছে না। পরমুহূর্তেই মনে হলো, কি একটা ভার নেমে গেল তার শরীর থেকে। কি গেল। কাপড়। দরিয়া কাপড় ছিনিয়ে নিল।
পুরুষটা প্রাণপণ চিৎকার করছে জানোয়ারগুলির দক্ষিণ ঘেঁষে। যাতে ভয় পেয়ে সবাই হুড়মুড় করে উত্তরে ছোটে।
কিন্তু একটা জানোয়ার পড়ে গেল দক্ষিণের টানে। পুরুষটা চিৎকার করে উঠল, গেল, গেল হারামজাদী। সেই গাভিন শুয়োরীটাই। যার সন্দেহ আর অবিশ্বাস বেশি, সে এমনি যায়। এখন উপায়।
শুয়োরীটা দলছাড়া হয়ে চিৎকার করছে। কয়েক হাত মাত্র দূরে। কয়েকটি রেখার বাইরে। কিন্তু সেটুকু ঠেলে আসতে পারছে না। পুরুষটিও যেতে পারছে না কাছে। তাকেও ওইরকম ঠেলাঠেলি করতে হবে। তারপর মরতে হবে ওর সংগে।
কিন্তু উপায়।

মেয়েটা চিৎকার করে উঠল, চলে এসো। ওকে মরতে দাও।
মরতে দেব। মরবে শুয়োরীটা। এতগুলি বাচ্চা পেটে নিয়ে মরবে।
বিদ্যুৎ চমকাল। বৃষ্টি এলো খাপছাড়া বড় বড় ফোঁটায়। এলো শেষপর্যন্ত। হেই আশমান, তোর দরদ নেই।
হঠাৎ পুরুষটি ঝাপটা দিয়ে মাথা তুলল। তার চেহারা শুয়োরের চেয়েও ভয়ংকর দেখাচ্ছে। একটু একটু করে এগুতে লাগল ঘূর্ণিরেখার দিকে। চোখের দৃষ্টিতে মেপে নিল শুয়োরীটার দূরত্ব। তারপর হাতের লাঠি বাড়িয়ে ধরল শুয়োরীটার মুখের কাছে, নে, পারিস তো ধর কামড়ে।
কিন্তু শুয়োরীটা ক্রমে পেছিয়ে যাচ্ছে। পুরুষটি আর একটু বাড়ল। শেষ বাড়া। শুয়োরীটা ঠেলছে। ঠেলতে ঠেলতে চকিতে কামড়ে ধরল লাঠি। ধরেছে। যেন বাঁচবার জন্যে শুয়োরীর মগজেও ঘটেছে বুদ্ধির বিকাশ। নিচের পাটিতে কয়েকটা হলদে দাঁত দেখা যাচ্ছে। থরথর করে কাঁপছে নাসারন্ধ্র, আর ছুঁচলো ঠোঁট। খাড়া হয়ে উঠছে ঘাড়ের শক্ত লোম। পুরুষটি প্রাণপণে টান দিল। বলল, ধর, ভালো করে ধর। না পারলে ছেড়ে দেব।
পুরুষটি টানতে লাগল, শুয়োরীটা চাড় দিতে লাগল। তারপর হঠাৎ লাঠিটা গেল ফসকে। দেখা গেল শুয়োরীটা পুরুষটির মাথার কাছে। দুজনেই ভাসছে উত্তর দিকে। লাঠিটা উত্তরে গিয়ে হঠাৎ বাঁক নিয়ে দক্ষিণের দহে চলে গেল।
মেয়েটা ততক্ষণে বাকি পশুগুলির সঙ্গে ভেসে গেছে অনেকদূর, দাঁড়াবার উপায় নেই জোয়ারের ধাক্কায়।
শুয়োরীটা আরো জোরে চেঁচাচ্ছে তখন। জলের জন্য টানা চেঁচাতে পারছে না। কিন্তু চেঁচাচ্ছে গলা ফাটিয়ে। যেন বলছে, বলেছিলাম, আমাকে তোরা একটা বিপদে ফেলাবি। আমি এখুনি মরতাম, এখুনি।
আর পুরুষটি ভীষণ খিস্তি করে বলছে, চুপ্, চুপ্, কমিনে জানোয়ার। তুই আমার পোষ্য হলে, ডাঙায় উঠে আজ তোকে ঠেঙিয়ে আধমরা করতাম।
দূর থেকে মেয়েটির গলা ভেসে এলো, কী হ—লো?
পুরুষটি জবাব দিল, বেঁচে গেছে।
বৃষ্টিটা চেপে আসছে না। গর্জন বাড়ছে মেঘের, ঝলকাচ্ছে ঘনঘন। গঙ্গা পর্যন্ত বেড়েছে, টাবুটুবু হয়ে গেছে তবু টানছে ভয়ংকর, এই একই রকম।
মন্দিরটার সামনেই নিচের ভিত অনেকখানি ডুবে গেছে জোয়ারের ভরায়। কিন্তু মেয়েটা শুয়োরগুলো নিয়ে ভেসে যাচ্ছে মন্দিরটা ছাড়িয়ে। শুয়োরীটাকে ছেড়ে পুরুষটা ভেসে গেল সেইদিকে।
কাছে এসে দেখল মেয়েটা বারবার ডুবছে। আর শুয়োরগুলি ভেসে যাচ্ছে ওর পাশ কাটিয়ে। ডাঙা থেকে চেঁচাচ্ছে সোনার মাকড়ি, এখানে এই জায়গায় তুলতে হবে।
কিন্তু মেয়েটা তখন ডুবছে। পুরুষটা কাছে এসে দুহাতে জড়িয়ে ধরল ওকে, টান দিল। কিন্তু আশ্চর্য। পায়ে যে মাটি ঠেকছে। তবে মেয়েটা ডুবছে কেন।
মেয়েটার তখন শীত ধরেছে আর ভেজা মুখখানিতে ভরে উঠেছে ব্যথার লজ্জা ও

নিদারুণ ক্লান্তি। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, ডুবে থাকতে হবে আমাকে। একদম নাঙ্গা হয়ে গেছি।

ও, কাপড়টা দরিয়া টেনে নিয়ে গেছে। পুরুষটা বলল, তবে এইখানে দাঁড়া! আমি জানোয়ারগুলোকে তুলি আগে।

তুলে দিল জানোয়ারগুলি। তারপর কোমরের গামছা খুলে সেটা পরল। নিজের ছোট কাপড়টা ছুঁড়ে দিল জলে।

সোনার মাকড়ি দুটি লোক নিয়ে এসেছিল। তারা হাসতে লাগল সবাই। সোনার মাকড়িও। বলল, দরিয়ায় দিল্লেগী।

এদিকে অন্ধকার হয়ে আসছে। বৃষ্টিও এলো জোরে। কাছেই সোনার মাকড়ির বস্তি। শুয়োরগুলিকে ঘিরে নিয়ে সবাই এলো সেখানে।

অনেক রাত হয়েছে। গঙ্গার ধারেই সোনার মাকড়ির বস্তির শুয়োর খাঁচার পাশে একটা চালায় রাত কাটাচ্ছে ওরা দুটিতে। মজুরি দিয়ে আটা আর ভাজি কিনে এনেছে। রুটি করেছে। এখন খাচ্ছে। দুটিতে বসে বসে। উনুনে একটি কাঠ জ্বলছে আপন শিখা তুলে। সেই আলোয় খাচ্ছে।

দরিয়াটা তখন ভীষণ ঢেউয়ে নাচানাচি করছে। অন্ধকারে মেশামেশি হয়ে গেছে সব। বর্ষণ হচ্ছে অবিরত। আর পুবে হ্যাঁচকা বাতাস যেন চাপা গলায় শাসাচ্ছে। জানোয়ারগুলি ঘোঁৎঘোঁৎ করছে আশেপাশে।

পরশু রাতের পর এই আবার খাওয়া হচ্ছে। কিন্তু মেয়েটার চোখ ফেটে জল এসে পড়ছে। ছোট কাপড়টা কোমর পেরিয়ে বুকটা ঢাকতে পারে নি। খাচ্ছে আর চোখের জল মুছছে। পুরুষটা গায়ে হাত বুলিয়ে বলল, না রো! কাঁদিস্‌ নে।

খাওয়ার পরে মেয়েটাকে বুকে নিয়ে সোহাগ করতে লাগল পুরুষটা। এখন সেই তরুণদিনের রাত্রের মতো ওদের দুজনের রক্তেই ভাঁটা ছেড়ে জোয়ার এল। জ্বলন্ত কাঠটা খুঁচিয়ে দিল নিভিয়ে। তারপর দুজনে রক্তে রক্তে যোগ করে অনুভব করতে লাগল বাঁচাটা।

শুধু কাছে ও দূরে কয়েকটি বিজলীবাতি বিচিত্র ঠেকতে লাগল এই প্রাগৈতিহাসিক আবহাওয়ায়।

তারও অনেকক্ষণ পর পুরুষটা গুন্‌গুন্‌ করতে লাগল :

যুগ যুগ পর আয়ীলর্বান পবন-সুত মহাবীর—হই রামো!

তার তার রামা সুখে ঘুমোচ্ছে। নিকষ অন্ধকারে ঝরছে বাতাস ও বৃষ্টি।

আটাত্তর দিন পরে

—মেয়েমানুষ ?
—হাঁ। বল্, সত্যি বল্ ফটিকদা, মেয়েমানুষও তোর ভালো লাগছে না ?
—আমি জানি না।
সেই একই, মোটা ভয়াট সুরহীন চাপা গলায় বলল ফটিক। শুধু রাত্রির বুকে, গোঙানির মতো শোনাল কথাগুলি। তবু, গলাটা বড় বেশী শুকিয়ে ওঠা শ্বাস-রোধী মনে হলো ফটিকের নিজেরই। কার্তিকেরও বোটহয় তাই মনে হলো। অবাক হয়ে ভ্রূ কুঁচকে দেখতে চেষ্টা করল ফটিকের মুখ। কিন্তু কার্তিক পিছনে পিছনে চলছে। তার অন্ধকারও গাঢ়। শক্ত আর নিরেট অন্ধকারকে যেন ঠেলে চলতে হচ্ছে। তাই চোখের কোণ কুঁচকে উঠছে। কিছুই প্রায় দেখা যায় না।
ফটিক তাড়াতাড়ি আবার বলে উঠল, আমি জানি না।
কিন্তু সেই একইরকম শোনাল এবারেও। গহ্বরের স্তব্ধতার চকিত গোঙানির মতো ?
—তুই জানিস না ?
—না। আমি জানি না।
—তবে আজ সকালে তুই বউদিকে চলে যেতে দিলি ?
—বউদি ?
—অই হলো আর কি। আজ কি নতুন বলছি নাকি ? তুই আজ কেমন যেন বেকায়দা মেরে যাচ্ছিস ফটিকদা, মাইরি ?
ফটিক চুপ করে রইল।
কার্তিক আবার বলল, রেগে যাচ্ছিস না তো ফটিকদা ?
—না।
—তোকে ফটিকদা বলি, আর ঝন্টাকে—থুড়ি, ঝন্টি, ধু-শালা, মুখে আমার পোকা পড়ুক। অই যে···কি জানি মাইরি, ভালো নামটা মনে পড়ছে না, তুই যেন রেগে যাস্ নে ফটিকদা। কুঞ্জ পুরুতের মেয়ে ঝন্টিদিদি, তাকে তো আমরা কবে থেকেই বউদি বলে ডাকি। তুই কি ভুলে গেছিস্ ?
ফটিকের মনে হলো, গলাটা যেন তার আরো শুকিয়ে যাচ্ছে। আর এই কুয়াশাতেই বোধ করি কেমন একটা শ্বাসরুদ্ধ ভাব লাগছে। সে বলল, ভুলি নি।
—তো ? সেই তো বল্‌ছি। তোকে যা বলি, তুই বলছিস্ ভালো লাগছে না। তুই বলছিস্, আমি জানি না। তবে তুই তাকে চলে যেতে দিলি কেন ?
—চলে যেতে দিলাম—?

—হাঁ, চলে যেতে দিলি কেন! আমি দেখলাম, বউদি ঘরের পেছনতে, আসশ্যাওড়ার জংগলে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। দেখেই বুঝলাম, কাঁদছিল।
প্রায় আত্মগতভাবে অস্ফুটে বলে উঠল ফটিক, কাঁদছিল?
—কাঁদছিল। মা বোন তো আমার আছে। আর ওরা কেঁদে চোখ মুছে তাকালে কেমন দেখায়, ও আমাকে শালা কেউ ফাঁকি দিতে পারবে না। আমার আবার ওসব ভালো লাগে না।
ফটিকের শক্ত মুখটা আরো শক্ত হলো। সমস্ত শরীর, আর ভিতরটাও নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে শক্ত কঠিন হয়ে উঠল। দাঁতে দাঁত চেপে চুপ করে রইল সে।
কার্তিক বলল, দেখলাম, বউদি চলে গেল। তুই ঘর থেকে বেরুলি না। যা বাবা! কিছুদিন ধরে তোদের যে কী চলছে। আর তোদের এত ভাব—
—ভাব?
—রাগ, না অবাক, না কি ঘৃণায় প্রতিবাদধ্বনিত হয়ে উঠল, ফটিক নিজেও ঠাহর পেল না। কিংবা রাগ ঘৃণা এবং বিস্ময়, সবই ছিল।
কার্তিক বলল, অই হলো আর কি। মানে ভালবাসা…
মোটা ঠোঁট দুটি কুঁকড়ে উঠল ফটিকের। প্যান্টের পকেটের মধ্যে, হাত দুটি নিষ্ঠুর শক্তিতে মুঠি পাকিয়ে উঠল। আর বাঁ কনুই দিয়ে অনুভব করল পিঠে ঝোলানো শক্ত জিনিসটা। অর্থাৎ দেশী গাদা বন্দুকটা। অন্ধকারে এক জোড়া হিংস্র চোখ মেলে, একটি চেনা শরীরের উদ্ধত নিটুট নরম অংশ যেন তাগ্‌ করল সে।
কার্তিকের মুখ থেকে কাঁচা স্পিরিটের গন্ধ এসে লাগল ফটিকের নাকে। কার্তিক বলল, তোমাদের দুটিকে দেখলে, মানে তোদের…অই যাই বলিস্‌, আমরা সবাই রমরমিয়ে উঠি, মাইরি। এই ফটিকদা, রাগ করিস্‌নে যেন। বউদিকে তুই চলে যেতে দিলি কেন?
—চলে যেতে দিলাম—?
কেন, কথাটা যেন কিছুতেই মনে পড়ছে না। কিংবা কথাটা যেন ভয়ংকর দুর্বোধ্য, যা বুঝিয়ে বলতে গিয়ে গলার শির ফুলে উঠল। নিশ্বাস পর্যন্ত পড়ছে না। আর চোখ দুটি যেন, এক মুহূর্তের জন্যে, অসহায় অনুসন্ধিৎসায় বুকের অন্ধকারে খুঁজতে লাগল।
—কার্তিক বলল, হাঁ চলে যেতে দিলি। কিছুদিন ধরে আমি তোদের যেন কেমন দেখছি। তুই বলতিস, বউদির জন্যে তুই সবই…সে যাক্‌ গে। কিন্তু যাকে ছেড়ে থাকতে তোর…সে যাক্‌ গে কিন্তু চলে যেতে দিলি কেন?
—আমি জানি না।
আবার সেই গহ্বরের স্তব্ধতা থেকে, মোটা চাপা স্বরের গোঙানি উঠল। এতক্ষণের অস্ফুট অস্পষ্ট সব ব্যর্থ প্রকাশের বুদ্‌বুদের ওপর চেপে বসল এই একটি কথা।
—তুই জানিস না।
কার্তিক পকেট থেকে ছোট বোতল একটা বের করল। চলকে উঠল ভিতরের

তরল পদার্থ। সে বলল, কী জানি, এসব আমার ভালো লাগে না। একটু খাবি?
—আমার ভালো লাগছে না।
চলতে চলতেই ছিপি খুলে কার্তিক গলায় ঢেলে দিল। তারপর ঢোঁক গিলতে গিলতে, থেমে থেমে বলল, তোর ভালো লাগছে না। এ কি মাইরি! এসব আমি ভালো বুঝি না। ধু—!
আবার গলায় ঢেলে দিল কার্তিক ঢক্‌ঢক্‌ করে। দিয়ে, ছুঁড়ে ফেলে দিল বোতলটা। ঠং করে একটা শব্দ হলো। রেললাইনের ঢালু পথে গড়িয়ে পড়ার শব্দও পাওয়া গেল। তারপরে অন্ধকার আর কুয়াশা যেন হাত দিয়ে চেপে ধরল শব্দটাকে।
অখণ্ড নৈঃশব্দ্য। ঝিঁঝি পোকাগুলিও বোধহয় শীতে চুপ হয়ে গিয়েছে। কাছাকাছি কোনো লোকালয় নেই যে কুকুর ডাকবে। দু'পাশে জলা। আর ধানকাটা মাঠের ওপারে, গ্রাম-শহরে মাখামাখি একরকমের লোকালয় মিশে আছে অন্ধকারে।
কৃষ্ণপক্ষের রাত। কুয়াশা আকাশ পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছে। নক্ষত্রেরা কুয়াশা মুড়ি দিয়ে রয়েছে। বাতাস নেই। বদ্ধ রুদ্ধ ভেজা ভেজা। অনড়-নিশ্চল বাবলা ময়নাকাঁটা ঝাড়। একুশ প্রেতলোকের এই যেন এক। শব্দ নেই, তবু যেন ঠোঁটে তর্জনী চাপা একটা চুপ চুপ ইঙ্গিত। দু'জন ছাড়া দিগন্ত জুড়ে, মানুষ নেই। তবু কাদের অস্তিত্ব যেন রয়েছে।
ফটিকের গায়ে নীল কুর্তা, রেলের ইউনিফর্ম। ওর শক্ত বলিষ্ঠ শরীরে পোশাক এঁটে রয়েছে। একটু বেশী চাপ খেলেই ছিঁড়ে যাবে যেন। মাথা খোলা। পাতলা চুল ভিজে লেপটে গিয়েছে প্রায়। ছোট গাদা বন্দুকটা ওর কোমরের দিকে, কোটের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। নলটা ঘাড়ের পাশ দিয়ে, ঠেকে আছে প্রায় কানের কাছে। ঘাড় ফেরালেই ঠাণ্ডা স্পর্শ লাগছে কানে। আর তখনিই চোয়াল শক্ত হয়ে ওঠে। প্যান্টের পকেটের মধ্যে, উরুতের শক্ত মাংসের ওপর মুঠি চেপে বসেছে। কিন্তু তারপরেই একটা শৈথিল্য আসছে। নিশ্বাস পড়তে চাইছে না। কী যেন বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কথাগুলি দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট, অচেনা, মনেরই অন্ধকারে লুকিয়ে থাকা। আর তখন নিজেকেই নিজের কাছে অসহায় লাগছে। একটা বিহ্বলতা, আজন্ম অননুভূত একটি নতুন অনুভূতিতে মনে মনে দিশেহারা হয়ে পড়ছে যেন। মনে মনে বলছে, কী জানি। তারপরে, গন্তব্যের জন্য চোখ তুলে, অনুসন্ধিৎসু হয়ে উঠছে।
আর কার্তিক ঢলঢলে হাফ প্যান্টে, হলহলে জামার উপরে একটা চাদর জড়িয়ে প্রায় লট্‌পট্‌ করে চলেছে। এক মাথা রুক্ষ চুল। কথা সে অনবরতই বলছে। বলেই থাকে। এখন আরো বেশী বলতে ইচ্ছে করছে।
বলিষ্ঠ ফটিককে যতোটা নিষ্ঠুর আর কঠিন মনে হয়, রোগা কার্তিক ততোটাই করুণ আর নরম।
কার্তিক বলল, আজ আটাত্তর দিন হলো ফটিকদা।
—আটাত্তর দিন?
—হাঁ, গুণে দ্যাখ্‌। আজ আটাত্তর দিন তুই জেলাখারিজ হয়েছিস।

—জেলা খারিজ।
সঠিক গুণে গুণে দেখি নি ফটিক, কতদিন সে তার নিজের জেলা থেকে বহিষ্কৃত। থানা থেকে তাকে বারো ঘণ্টার নোটিশে জেলা থেকে বেরিয়ে যেতে বলা হয়েছিল। নইলে গ্রেপ্তার। এবং গ্রেপ্তারে বাধা দিলে কিংবা পালাবার চেষ্টা করলে, সেই মুহূর্তে গুলি করার হুকুম ছিল।
ওরা রেললাইনের উত্তর দিকে চলেছে। পিছনে, দক্ষিণ দিকে, মাইল দেড়েক দূরেই জেলা-সীমান্ত। সেখানে একটা খাল আছে। ওটা নাকি কোনো এককালে নদী ছিল। গঙ্গার সঙ্গে একান্নবর্তী ছিল। তাই জল ছিল, জোয়ার-ভাঁটা ছিল। ছল-ছলানি ছিল, কলকলানি ছিল। তারপর মাটি কেন উঁচু হয়েছিল, কে জানে। যেন সেই রূপকথার মতো, 'কেন রে মাটি উঁচু হোস্‌?…'পলি কেন পড়ে?'… এমনি করে হয়তো গঙ্গার সঙ্গে বিচ্ছেদ।
এপার ওপারের যোগাযোগ আছে রেলওয়ে ব্রীজ দিয়ে। ওপারে নিজের জেলা, যেখান থেকে ফটিক নির্বাসিত। বিনা অনুমতিতে যেখানে প্রবেশমাত্র জেল নয় মৃত্যু। তাই খালের এপারে এসে তাকে আশ্রয় নিতে হয়েছে। এপারে, খালের একেবারে ধারেই, প্রায় লোকালয়হীন আধা জঙ্গলে। যেখানে আছে মাত্র দু'তিন ঘর আদিবাসী ধাঙড়, পূব-বাংলার বিচ্ছিন্ন কয়েক ঘর ভিক্ষাজীবী বোষ্টম। মাত্র কয়েক ফুট একটা রেল-পুলের ব্যবধান। ওপারের স্টেশন থেকে দশ মিনিট হেঁটে, সাঁকো পেরোলেই আসা যায়। আর ঝন্টু রোজ তাই আসে। কিন্তু—ফটিক যেন অবাক হয়ে গেল। বলল, মাত্র আটাত্তর দিন।
—হাঁ, মাত্তর আটাত্তর দিন। এই দ্যাখ্‌ কার্তিকের মাঝামাঝি তোকে…সে থাক্‌গে। আমি গুনেছি মাত্র আটাত্তর দিন। আবার আজ তুই যাচ্ছিস ফটিকদা।
যেন আনমনে ফটিক শব্দ করল, হুঁ।
—আর আমরা দু'জন মাত্তর।
—দশজন পাবো কোথায়?
—রাগ করছিস ফটিকদা?
—না তুই ভয় পাচ্ছিস।
—মাইরি—!
—পাচ্ছিস, না?
—হাঁ, মিছে বলব না তোকে ফটিকদা। মালটুকুও শালা ফুরিয়ে গেল। আমি ভয় পাচ্ছি।
—কেন?
—তুই এভাবে শুধু আমাকে নিয়ে কোনোদিন আগে বেরিয়েছিস্‌?
—না।
—কোথায়, কোন্‌ ওয়াগনে কী মাল আছে, আগে থেকে খবর না নিয়ে, এভাবে কখনো বেরিয়েছিস?
—না।
—আগে থেকে দলের সবাই মতলব না করে কাজ করেছিস্‌?

—করি নি আর।
—আজ করতে যাচ্ছিস্। আজ তোর কী হলো, হঠাৎ বেরিয়ে পড়লি। আজ আটাত্তর দিন পর···।
—ফটিক মনে মনে বলল, আটাত্তর দিন।
—কার্তিকের গলার স্বর সরু হয়ে উঠল। যেন দূরে থেকে বলল, এই ফটিকদা, এভাবে আজ তুই হঠাৎ ইয়ার্ডে ঢুকতে যাচ্ছিস্। হুকুম ভেঙে···।
—ফটিকের গলার স্বরও যেন গহ্বরের তলায় নেমে গেল। বলল, আর থাকতে পারছি না।
কার্তিকের সরু গলায় কেমন একটা চুপি-চুপি উৎকণ্ঠা নেমে এলো। বলল, ফটিকদা, তুই আজ যেন কী রকম হয়ে গেছিস্।
ফটিকের গলা যেন আরো খাদে নামতে লাগল।—কী জানি।
কার্তিকের গলায় উৎকণ্ঠা ভয়ের রূপ নিল। বলল, আটাত্তর দিন বাদে তুই আজ বন্দুকটা নিয়ে বেরুলি।
প্রায় রুদ্ধশ্বাস মোটা গলায় বলল ফটিক, আমি আর থাকতে পারছি না।
—তুই আর থাকতে পারছিস না। ফটিকদা আমার আজ ভয় লাগছে, মাইরি।
কার্তিকের গলার স্বর হঠাৎ উঁচুতে উঠতে লাগল।
—ফটিক বলল, কেন ?
কার্তিক প্রায় চাপা গলায় চীৎকার করে বলে উঠল, তুই ভুলে গেছিস ফটিকদা, আমি ভুলি নি, আর এক দিন, আর একদিন তুই শুধু আমাকে নিয়ে এভাবে বেরিয়েছিলি।
আর একদিন বেরিয়েছিলাম ?
কার্তিক প্রায় ভয়ার্তস্বরে চীৎকার করে উঠল, হাঁ, তিন বছর আগে, আর একদিন এ ভাবে তুই ইয়ার্ডে ঢুকেছিলি আর ঘণ্টুকে খুন করেছিলি।
—ও!
—হাঁ। সেদিনও তোর কিছু ভালো লাগছিল না। আর তোকে এই রকম লাগছিল।
—ও ?
—হাঁ, ঘণ্টু দলের সঙ্গে ঝগড়া করে আর. পি, এফ্-এর লোকদের বলে দেবার জন্যে ইয়ার্ডে লুকিয়েছিল। আর তুই···ফটিকদা, তুই ওকে ফ্লাই শান্টিং-করা দুটো ওয়াগনের মাঝখানে গুঁজে দিয়েছিলি আঃ···!
যেন যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল কার্তিক। আর হোঁচট খেল জোরে। পরমুহূর্তেই আবার বলল, ইস্!···চোখের সামনে ঘণ্টুর বুকটা চ্যাপ্টা হয়ে গেল, আর ওর শরীরটা ছোট হয়ে গেল। আঃ! ফটিকদা, মালটুকু ফুরিয়ে গেল। আজ আমার ভয় লাগছে।
ফটিকের দাঁতে দাঁত চেপে বসল। অপলক স্থির নিবদ্ধ চোখ অন্ধকারে জ্বলে উঠল। বলল, ঘণ্টু বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল।
—আজ আবার তুই যাচ্ছিস ফটিকদা। আমার ভয় লাগছে।
ফটিকের মোটা চাপা গলা যেন গহ্বরে চাপা পড়ে আবর্তিত হয়ে উঠল, আমি

আর থাকতে পারছি না।
ওর ঘাড় একটি নিষ্ঠুর বক্রতায় আরো উদ্ধত, আর পিছু হটে এলো। গরম কানে, বন্দুকের কনকনে ঠান্ডা নলটা ঠেকল। দু'চোখের আগুন দিয়ে যেন বিদ্ধ করতে চাইল অন্ধকারকে।
সহসা ফটিকের গাটা যেন শিউরে উঠল। কার্তিক তার পিঠে হাত দিয়েছে। ঘন হয়ে এসেছে আর এক পা! আঙুল দিয়ে খোঁচা দিচ্ছে আস্তে আস্তে।
ফটিক বলল, কী?
কার্তিক প্রায় ভীত স্বরে চুপিচুপি বলল, আজ তোর কী হয়েছে ফটিকদা?
আবার যেন সারা শরীর জুড়ে শৈথিল্য নামল ফটিকের। আর বুকের মধ্যে নিশ্বাস আটকে যেতে লাগল। অস্পষ্ট দুর্বোধ্য অচেনা সব কথা দলা পাকিয়ে উঠল মনের মধ্যে। একটা কষ্টের দোলায় যেন দুলতে লাগল। সে বলল, আমি জানি না কার্তিক।
—তুই জানিস না।
জড়িয়ে গেল কার্তিকের গলা।—মালটুকু সব ফুরিয়ে গেল। আজ আমার…।
কথার রেশ ধরে রেখে, চুপ হয়ে গেল কার্তিক। কুয়াশার ভিতর থেকে কয়েকটা আলো জেগে উঠল সামনে। সোঁসোঁ শব্দ এলো কানে। কোথাও একটা ইঞ্জিন দাঁড়িয়ে আছে। দেখা যাচ্ছে না।
আরো কয়েক পা এগিয়ে ফটিক থামল। স্টেশনের টিনের শেড্ দেখা যাচ্ছে এবার। অস্পষ্ট, ছায়া ছায়া, নির্জীব মৃত অতিকায় কোনো জীব যেন। তারপরেই হঠাৎ চোখে পড়ল, সিগন্যালের নীল আলো। আর সোঁসোঁ শব্দটা খুব মন্থরগতিতে এগিয়ে আসছে। ভাবতে ভাবতেই ইঞ্জিনের কপালে আলো জ্বলে উঠল। হুইস্ল বাজতে লাগল দীর্ঘ সময় ধরে।
ফটিক সেই শব্দে গলা ডুবিয়ে বলল, তাড়াতাড়ি পিছু হটে চল্। একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে পড়তে হবে।
দুজনেই আবার পিছন ফিরে দক্ষিণ দিকে পা চালাল তাড়াতাড়ি। খানিকটা গিয়ে, ঢালু জমির জঙ্গলে নেমে পড়ল। উপুড় হয়ে, ঝোপজঙ্গলের গোড়া আঁকড়ে ধরে রইল।
কার্তিক বলল, গুড্স।
ফটিক বলল, ভালোই হয়েছে। এতেই উঠতে হবে।
শব্দ আর ইঞ্জিনের আলো এগিয়ে আসতে লাগল। কার্তিক বলল, এতেই?
—হাঁ।
শীতে যেন জমে গিয়েছে গোটা মালগাড়িটা। কর্কশ যন্ত্রণাকাতর শব্দ করতে করতে গাড়িটা কাছে এলো। ঈষৎ মাটি কাঁপিয়ে, ইঞ্জিনটা এগিয়ে গেল। ড্রাইভার সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। ফায়ারম্যান কয়লা ঠেলছে। আগুনের লাল আলো বিচ্ছুরিত হয়ে পড়ছে বাইরে। তারপরে অন্ধকার। অন্ধকার আর কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে গেল।
ফটিক উঠে এলো। পিছনে কার্তিক। মন্থরগতি গাড়ির চাকায় যেন থেকে থেকে

গর্ভিণী শুয়োরীর চীৎকার বাজছে।
কার্তিক বলল, সব যে সি মার্কা ওয়াগন আর ভরতি। উঠব কোথায় ?
ফটিক বলল, দেখি।
পার হয়ে যেতে লাগল গাড়িটা। একটার পর একটা ওয়াগন। সবই সি। মাঝে মাঝে দু' একটা বি-এফ-ইউ। লম্বা লম্বা ঢালাই লোহার বিম্ রয়েছে তাতে।
কান খাড়া করল ফটিল। উৎকর্ণ হয়ে শুনল একটা শব্দ। তীক্ষ্ন চোখে তাকাল গাড়ির পিছন দিকে।
কার্তিক বলল, কোনো আশা নেই।
—আছে।
—আছে ?
—হাঁ, খালি ওয়াগনের শব্দ পাচ্ছি। পিছনে আছে।
বলতে বলতেই দুটো কে-সি-এক্স এগিয়ে এলো। মাথায় ঢাকনাবিহীন ওয়াগন। শব্দই বোঝা যাচ্ছে ফাঁকা। মাল নিষ্কাশনের বড় ফোকরটা খোলা, হাঁ হাঁ করছে।
ফটিক বলল, তুই ফোকর দিয়ে ওঠ্, আমি বাফার বেয়ে উঠছি।
কার্তিক কিছু বলবার আগেই, ফটিক চলন্ত গাড়ির দুটো ওয়াগনের মাঝখানে চকিতে ঢুকে পড়ল। চোখের নিমেষে লাফ দিয়ে উঠল বাফারে। কার্তিকও তত-ক্ষণে ফোকরের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছে। দুজনে দু'দিক দিয়ে মাথা খোলা ওয়াগনের মধ্যে ঢুকল। তারপরে একটা কোণ নিয়ে দুজনেই বসল। বাইরে থেকে দেখা যায় না তাদের।
ফটিক পকেট থেকে ছোট্ট একটি টর্চ লাইট বের করে জ্বালল। দেখা গেল, কয়লা ছিল ওয়াগনটার মধ্যে। গুঁড়ো ছড়িয়ে আছে। পরমুহূর্তেই একটা অস্বস্তিতে নিভিয়ে ফেলল আলোটা। কার্তিক ওর বড় বড় লাল চোখে, ফটিককে দেখছে। ভ্রূ কুঁচকে উঠল ফটিকের।
কিন্তু কার্তিক চুপ করে রইল। শব্দহীন, অন্ধকার কুয়াশাঘন রাত্রের বুকে মাল-গাড়ির গম্ভীর শব্দ। শব্দ শুনলেই বোঝা যায়, অধিকাংশ ওয়াগন ভরতি মাল। আর মাঝে মাঝে অবাধ্য চাকাগুলি ইঞ্জিনের টানা-হ্যাঁচ্ড়ায় ককিয়ে উঠছে।
হঠাৎ একটা হ্যাঁচকা টান লাগল। গতি বাড়ল একটু গাড়ির।—মালটুকু সব ফুরিয়ে গেল।
কার্তিক যেন ঘুম'ঘুম স্বরে বলল, ফটিক চুপ। শুধু মালগাড়ির শব্দ।
—এ রকম ভাব আমার কোনোদিন লাগে নি। কার্তিক আবার বলল।—এই রকম। কথা নেই, বাত্রা নেই, হঠাৎ বেরিয়ে পড়া—মাইরি, আমি কিছু বুঝি না।—কথাগুলি ফটিককেই বলছে। ফটিক জানে। সেও মনে মনে বলছে, 'হাঁ, হঠাৎ। হঠাৎ আর চুপ করে থাকতে পারলাম না আমি।' কিন্তু সে কথা বলল না।
—ফটিকদা।
কার্তিক আর না ডেকে পারল না। বলল, তুই রাগ করছিস ?
—না।
—আমি চুপ করে থাকতে পারছি না। তুই রাগ করিস না। ক'দিন ধরে তোকে

যেন কেমন লাগছে। আর তুই আজ এভাবে বেরিয়ে পড়লি।

—আমি আর এভাবে থাকতে পারছি না।

—আর থাকতে পারছিস না? হঠাৎ কেন? ঘন্টুর মতন বিশ্বাসঘাতক তো আর কেউ নেই এখন।

ফটিকের বুকের মধ্যে যেন নিঃশব্দ বজ্র হুংকার উঠল, আছে। দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত হয়ে উঠল ফটিক। আর বুকের মধ্যে তালে তালে বাজতে লাগল, আছে! আছে!

সেই মুহূর্তেই গুম্‌গুম্‌ শব্দ উঠল। শব্দটা এগিয়ে আসতে লাগল। গাড়িটা যেন কোনো ভিন্ন জগতে প্রবেশ করছে।

কার্তিক বলে উঠল, ফটিকদা, গাড়ি পুল পেরুচ্ছে।

—হুঁ।

সেই ব্রীজের ওপর দিয়ে গাড়িটা চলেছে। গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌ গুম্‌।…জেলা সীমান্ত পার হয়ে গেল। আজ আটাত্তর দিন পরে, হুকুম অমান্য করল ফটিক। এবার দেখতে পেলেই গ্রেপ্তার। বাধা দিলেই গুলি। কারণ, সে হলো সেই দুর্ধর্ষ ওয়াগন ব্রেকার, ফটিক ভট্টাচার্য যার নাম! নোটোরিয়াস্‌, আনচ্যালেঞ্জড্‌, অ্যান্ড ক্রুয়েল লাইক এনিথিং। এবার নিয়ে তৃতীয়বার জেলা-বহিষ্কারের হুকুম দেওয়া হয়েছে তাকে। আর সব থেকে খারাপ ধরনের হুকুম। গ্রেপ্তারে বাধা দিলে কিংবা পালালে, গুলি করার নির্দেশ এর আগের দু'বারে ছিল না। এবারে পুলিস দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এই খারিজের হুকুম সহজে বাতিল হবে না। জি. আর. পি. এবং ই. এফ. টি-র তীক্ষ্ণ চোখ তার সন্ধানে অতন্দ্র। দেখতে পেলেই হয়।

পিঠে চাপ দিয়ে বন্দুকটা অনুভব করল ফটিক। আজ সে হুকুম ভেঙে ঢুকল। সে আর পারছে না। কী বলছিল যেন কার্তিক? বিশ্বাসঘাতক…।

তার আগেই আগের কথার জের টেনে বলে উঠল কার্তিক, তবে? কদিন ধরে দেখছি, তুই খাচ্ছিস না ভালো করে। বউদি এসে রান্না করে আর তুই…। হাসিস না, পাখি মারতে যাস্‌ না খাল ধারের জঙ্গলে। আর কোথা থেকে ছটকে আনা একটা বুড়ো ঘোড়াকে তোয়াজ করতে আরম্ভ করেছিস! তারপর আজ যেই আঁধার হলো, অমনি বন্দুক নিয়ে…!

ফটিক মনে মনে বলল, আজ আর আমি থাকতে পারলাম না।

কার্তিক আবার বলল, আজকের রাতটা আমার কী রকম লাগছে যেন। তুই বউদির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস, না?

হঠাৎ জিজ্ঞেস করল সে। ফটিক বলল, ঝগড়া— ?

—হাঁ, বউদিও যেন কদিন থেকে কেমন হয়ে গেছে। আজ তোদের কী হলো, বউদি রাঁধলে না পর্যন্ত। তুই নিশ্চয় রাঁধতে দিস নি। বউদি আমাকে দেখল, কথা বলল না। আস্তে আস্তে লাইনের উপর উঠে, পুল পেরিয়ে চলে গেল। ঘরের মধ্যে যে তোদের কী-কথা হলো, তোরাই জানিস। আমি আর…

কী কথা হয়েছিল ঝন্‌টির সঙ্গে? কার্তিকের কথা আর কানে ঢুকল না ফটিকের। সকালবেলা ঝন্‌টির কথা তার মনে পড়ল।…সকাল তখন সাড়ে আটটা। ঝন্‌টি

এলো। ঘড়ি দেখতে হয় না ফটিকের। আটটার আপ গাড়িটা গুম্‌গুম্‌ করে বেরিয়ে যায় পুলের ওপর দিয়ে। তার পরেই একেবারে নিঝুম। খালধারের এই যুদ্ধের সময়ে তৈরি করা পরিত্যক্ত ঘর কয়টি চুপচাপ। বোষ্টমরা ভিক্ষেয় বেরিয়ে গিয়েছে। ধাঙড়েরা কাজে চলে গিয়েছে। প্রত্যহের মতোই, প্রতি মুহূর্তের প্রতীক্ষায় বসে রইল ফটিক। অস্পষ্ট হলেও, সেই পায়ের শব্দ চেনে সে। কখনো বা কাঁচের চুড়ির একটু অস্ফুট ঝনাৎকার। তার পরেই দরজার কাছে একটি ছায়া। ফটিক চোখ তুলে তাকাল।

ঝুনটি। ভালো নাম কী যেন একটা আছে। মনে থাকে না ফটিকের। ওই নামেই বরাবর ডেকে এসেছে। কার্তিক.বউদি বললেও, সত্যি আর শাঁখাসিঁদুর-ঘোমটা পরা বউ নয় ঝুনটি। প্রত্যহের মতোই সেই বাসি চুলের সামনের দিকে কোনোরকমে একটু চিরুনি ছোঁয়ানো। সাদা সিঁথির দু'পাশে ঈষৎ ঢেউ। শান্ত-সুলক্ষণা ছোট কপালে, সে ঢেউ মন্দিরের দরজার খিলানের মতো দেখায়। কালো—হাঁ কালোই বলতে হবে ঝুনটিকে। আর বড় দুটি চোখ, শান্ত কিন্তু কী এক অন্যমনস্কতায় যেন আচ্ছন্ন। ফটিকের তাই মনে হয়। মাটির প্রতিমার মতো। দৃষ্টি যার আপাতত এখানেই, অথচ কোনো এক অচেনা জগতের ছায়ায় যে আবিষ্ট। নাকটি টিকলো-ই এবং মুখের ছাঁদের সংগে সব মিলিয়ে ফটিকের মনে হয়, অনন্যা। দীর্ঘাঙ্গী আর অপ্রতিরোধ্য স্বাস্থ্যের সুঠাম শরীরে একটি ব্রীড়াবর্জিত নম্রতায়, কেমন দুঃখী মনে হয়। একটি চব্বিশ বা ছাব্বিশের দুঃখী আইবুড়ো মেয়ে।

সেই মোটা ফ্ল্যানেলের জামা, চেক-ছাপা শাড়ি আর সাদাটে কাঁচের চুড়িপরা ঝুনটি, দরজায় এসে দাঁড়াল। ফটিক তাকিয়েই ছিল। বুকের মধ্যে তার কী হচ্ছিল, সে জানে না। এখনও যেমন জানে না, তেমনি। রাগ না ঘৃণা নাকি অসহ্য যন্ত্রণা কিংবা সব মিলিয়ে একটা জ্বালা, সে জানে না।

ঝুনটি চোখ তুলল। ফটিকের চোখের দিকে তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল। তার পরে রোজ যেমন ঘরে ঢোকে তেমনি ঢুকে বলল, পাখি মারতে যাও নি।

—না।

ফটিক বুঝতে পারছিল, তার ভিতরটা গর্জাচ্ছে। ঝুনটি ঘরের ওপর দিয়ে হেঁটে, জানালার ধারে যেতে যেতে বলল, কার্তিককে বাজারে পাঠাও নি এখনো?

—না!

—তবে রাঁধব কী?

ফটিক উঠে দড়াম করে দরজাটা বন্ধ করে দিল। ঝুনটি ফিরল। ফটিকের মনে হলো তার নিজের চোখ দুটো যেন আগুনের মতো জ্বলছে। ঝুনটি ওর সেই শান্ত আবিষ্ট চোখ তুলে তাকাল।

ফটিক বলল, অভয় কেমন আছে আজ?

ঝুনটি চোখ নামিয়ে বলল, ভালোই।

ফটিকের মনে হলো, তার প্রত্যেকটি পেশী ফুঁড়ে যেন কতগুলি শাণিত নখ হিংস্র হয়ে উঠল। ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞাসা করল, কী রকম ভালো?

—পড়াশোনা করতে পারে।

—হুঁ।

—এবার নাকি বি-এ পরীক্ষা দেবে ?

—হুঁ।

—আর হাই স্কুলের সেক্রেটারি হীরালালবাবু নিজেই বাড়িতে এসে বলে গেছেন, মাস্টারি চাকরিটা দেবেন। বললেন, তুমি পাড়ার ভালো ছেলে—।

বাধা দিয়ে বলে উঠল ফটিক, আর বললেন না, 'তোমার দাদা ফটিকটা একটা খুনে শয়তান—।

ঝন্টি চোখ তুলে আবার নামিয়ে নিল। বলল, না।

ফটিক বিশ্বাস করল না। সে দু'পা এগিয়ে এলো ঝন্টির দিকে। তার মনে হচ্ছিল, ভিতর থেকে একটা ভয়ংকর শক্তি নিষ্ঠুরভাবে ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছে ঝন্টির ওপর। বলল, তা হলে অভে'র আর ওষুধ খেতে হবে না ?

ঝন্টি বলল, হবে।

—কত টাকার ?

—আজই সাড়ে বারো টাকার ওষুধ কিনতে হবে।

ফটিক তৎক্ষণাৎ প্যান্টের ব্যাক পকেট থেকে একগোছা নোট বের করে ঝন্টির দিকে বাড়িয়ে ধরল। ঝন্টি তাকাল ফটিকের দিকে। তারপর হাত বাড়াল। প্রায় হাতে ঘুষি মারার মতো, ঝন্টির হাতে টাকাগুলি দিল ফটিক। নোটগুলি পড়ে গেল। ফটিক শক্ত হাতে ঝন্টির গাল টিপে ধরে, চাপা স্বরে গর্জন করে বলল, সে ভালো থাকার কথা জিজ্ঞেস করি নি। তোর সংগে জমাবার মতো জুত আছে তো ওর শরীরে ?

ঝন্টি চুপ। টিপে ধরা গালে তার মুখটা বিকৃত দেখাচ্ছে। চোখ নত। ওর সারা শরীরে কোথাও কোনো প্রতিবাদের লক্ষণ নেই।

গাল থেকে হাত নামিয়ে নিল ফটিক। ক্রুদ্ধ আর দিশেহারা হয়ে উঠল যেন। বলল, কী ? বলতে পারছিস না ?

ঝন্টি আশ্চর্য শান্তভাবে বলল, না।

ফটিকের মনে হলো, ঝন্টি যেন পাথরের মতো কঠিন আর দুর্ভেদ্য। অসহ্য রাগে ও যন্ত্রণায় আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল সে। কঠিন থাবার ছোঁ মেরে ঝন্টিকে কাছে টেনে নিল। ঝন্টির মুখটা কাছে আসতেই ওর নিশ্বাস লাগল ফটিকের গালে। আর ঝন্টির চুলের গন্ধ। আর ঝন্টির নিশ্বাসেও একটা গন্ধ। চেনা ফটিকের, তার রক্তের সংগে পরিচিত। মুহূর্তে একটা বিহ্বলতা গ্রাস করল ফটিককে। কিংবা রাগ এবং বিদ্বেষ-ই বোধহয় রাহুর গ্রাসের মতো ঝন্টির ঠোঁটের ওপর লুটিয়ে পড়ল। যেন দুর্দান্ত হয়ে উঠল পীড়নে, শোষণে।

—অ্যাই।…

কার্তিক ধাক্কা দিল ফটিকের গায়ে।—অ্যাই ফটিকদা।

—উঁ ?

—তুই ঘুমিয়ে পড়ছিস্ ?

—না।

—তবে ? তোকে ডেকে ডেকে সাড়া পাচ্ছি না। কেন এরকম করছিস আজ ?
—কী রকম ?
—এই তো, কী রকম করছিস্। বিচ্ছিরি লাগছে আমার মাইরি। কদ্দূর এগিয়ে এলাম দেখেছিস্ ? দুটো ইস্টিশান পেরিয়ে এসেছি। ইয়ার্ড আর দুটো ইস্টিশান আছে। আজ আমার—। ধুর, মালটুকুও ফুরিয়ে গেল। কদিন ধরেই তোর…।
হাঁ, কদিন ধরেই সেই ভয়ংকর সাপটা একটু একটু করে পেঁচিয়ে ধরছিল ফটিককে। সন্দেহের সাপ, বিষাক্ত কুৎসিত আর অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক। আর সেই কথাটির জন্যেই, আজ শেষবারের মতো ঝন্টির মুখোমুখি হয়েছিল সকালে।
কিন্তু তার থাবা থেকে মুক্তি পেয়ে, ঝন্টি হাঁপাতে লাগল। ঠোঁট মুছল আঁচল দিয়ে। তবু প্রতিবাদ করল না। শুধু ছলছলিয়ে উঠল সেই প্রতিমার আবিষ্ট চোখ দুটি। আর ফটিক গিয়ে বসে পড়ল তক্তপোশের ওপর। তখন তার বুকের মধ্যে চাপা আগুন আরো উস্কে উঠে গ্লানি এবং যন্ত্রণাকে বাড়িয়ে তুলল।
কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। ঝন্টি এগিয়ে গেল ঘরের এক কোণে। যেখানে রান্নার হাঁড়ি বাসনপত্র রয়েছে। গত রাত্রের পরিত্যক্ত খাবারসহ এঁটো থালাও রয়েছে। ঝন্টি সেখানে বসে হাত দিতে গেল। ফটিক প্রায় চীৎকার করে উঠল, থাক। আর তোকে ও-সবে হাত দিতে হবে না। আর রোজ রোজ এসে রেঁধে খাইয়ে যেতে হবে না।
ঝন্টি থেমে গেল। সরিয়ে নিয়ে এলো হাত। ফটিক ডাকল, এখানে আয়, বস।
ঝন্টি উঠে এলো কাছে, কিন্তু বসল না। ফটিক বলল, বল্।
ঝন্টি মুখ তুলল। না সে কাঁদছে না। বলল, কী ?
—এ কদিন ধরে যা জানতে চাইছি।
ফটিকের মনে হলো, তার চোখে ছুরি থাকলে, ঝন্টির বুকের অন্ধকার ছিন্নছিন্ন হয়ে যেত। ওর বড় বড় চোখ দুটি অন্ধ হয়ে যেত।
ফটিক বলল, বল্। আজ তোকে বলতে হবে। আজ শেষ দিন। অভয়কে…।
ফটিকের মনে হলো, তার গলার শির ছিঁড়ে যাবে। তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। তবু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, আজ তিন বছর ধরে তুই আমার সঙ্গে ভান করেছিস্ কিনা। তুই অভয়কেই…।
না, শেষ করতে পারল না কথাটা। তার বুকের মধ্যে কোথায় যেন কেঁপে উঠল। কাঁপতে লাগল তার বুকের মধ্যে। কারণ সে জানে, ঝন্টি পাথরের মতো চুপ করে থাকতে পারে, কিন্তু মিথ্যে কথা বলতে পারে না। ঝন্টিকে চেপে ধরার সেটাই যেমন অস্ত্র, তেমনি ফটিকের বিরুদ্ধেও সেটাই আয়ুধ। ঝন্টিকে তার থেকে বেশী কে চেনে ? তিন বছর আগে, সেই রাত্রির কথা ফটিক কি ভুলতে পারে ? তাদের ছোট শহরের কোনো লোক কী আজও ভুলতে পেরেছে ?
সেই রাত্রি, যেদিন মাতাল কুঞ্জ পুরুত, শুধু পয়সার জন্যেই, এক ব্যাধিগ্রস্ত প্রায় বৃদ্ধ জানোয়ারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিচ্ছিল। ফটিকদের প্রতিবেশী, কুঞ্জ পুরুত নয়, চক্রবর্তী। আর প্রকৃতপক্ষে, গঙ্গার ওপারের এক মেয়েমানুষের দালাল বলা যায় যাকে, বেশ্যালয় থেকেই যে সেজেগুজে বিয়ে করতে এসেছিল ঝন্টিকে।

কুঞ্জ পুরুত ছাঁদনাতলাও সাজিয়েছিল। আর পাড়ার লোকেরা হাসাহাসি করছিল। কেউ কেউ উৎকণ্ঠিত হয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করছিল, মেয়েটাকে খুন করছে কুঞ্জ পুরুত। পাড়ায় কি লোক নেই একটা?

ছিল। পাড়ায় যারা ছিল, তারা কারুর ব্যক্তি-স্বাধীনতায় হাত দিতে চায় নি। একমাত্র ফটিক সেই দুর্বিনীত, যার হঠাৎ মনে হয়েছিল, এটা ঘটতে দেব না। সবাই দেখেছিল, সেই ভয়ংকর ফটিক, এক ভয়ঙ্কর জগতের কিংবদন্তীর যে নায়ক। যার বিশাল বুকের দিকে তাকালে মনে হয়, কারুর মাথা সেখানে ঠুকেই ভেঙে ফেলা যায়। যে গিয়ে সোজা বলেছিল, এই ঝুনটি, উঠে আয়।

ঝুনটি চমকে পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। ফটিক আবার বলেছিল, আসবি?

ঝুনটি ঘাড় কাত করে বলেছিল, আসব।

—আমাদের বাড়িতে থাকতে পারবি?

—পারব।

যেন একটা পরম বিস্ময়। ফটিক নয়, ঝুনটি। যে বিয়ের রাতে কনের বেশে কুখ্যাত ফটিক ভটচাজের সঙ্গে তাদের বাড়ি গিয়ে ঢুকেছিল। আর সমস্ত হট্টগোল, দীর্ঘ দিনের নানা অপবাদ আর কলঙ্ক, সব মাথায় করে আজও আছে। ঝুনটি মিথ্যে বলে নি।

আর এই ঝুনটি, যাকে ঘিরে ফটিকের মনের অন্ধকারে একটা অপ্রতিরোধ্য ঢেউ দুলে উঠেছিল। আর, একদিন আচম্বিতে বুকে টেনে ধরেছিল। সেদিনও ঝুনটি প্রতিবাদ করে নি। কিন্তু কেমন যেন দিশাহারা হয়ে উঠেছিল। আজ সকালের মতো এমন নিস্পৃহ ছিল না।

সেই থেকে শুরু।

আজ সকালের মতো, ওই একটি কথার মুখোমুখি দাঁড়াবার বিষয় কোনোদিন ভাবে নি ফটিক। সেই বুকের দুলে ওঠা ঢেউয়ের গ্রাসে কবে সে একেবারে ডুবে গিয়েছে, জানতে পারে নি। এবার জানল। এই নির্বাসনের দিনগুলিতে, যখন সেই ঢেউ বিষের মতো আবর্তিত হয়ে উঠল। রক্তের মধ্যে আক্রোশ ফুঁসে উঠল। কারণ, এই নির্বাসনের অবকাশে যখন সে ঝুনটির গভীরে ডুব দিতে চাইল, তখন মনে হলো, কোথায় যেন একটা দরজা বন্ধ রয়েছে। হাত দিয়ে যে দরজা খুঁজে পাওয়া যায় না।

কিন্তু ঝুনটি নতমুখী নীরব। ফটিক গর্জে উঠল, বল্‌।

ঝুনটির ডানা ঝাঁকুনি দিয়ে দাঁতে দাঁত পিষে বলল, তোকে বলতে হবে।

বলে সে নিজেই উঠে দেয়ালের গায়ে গিয়ে দাঁড়াল। যেখানে, স্বাধীন সশস্ত্র নাগরিকদের মতো তার গুলি-ভর্তি গাদা বন্দুকটা ঝুলছিল। আর তার মনে পড়ল অভয়ের কথা। তার ভাই অভয়, বি. এ. পড়তে পড়তে, যে'ছ' বছর আগে টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়েছিল। শরীরের একটা অংশ অবশ হয়ে গিয়েছিল। তার এক বছর আগে দাদা মারা গিয়েছিল। বউদি বিধবা হয়েছিল চারটি সন্তান নিয়ে। বিধবা মা পাথরের মতো স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। আর ফটিক তখন ব্যায়ামাগারে তৈরি

দেহের, ব্যায়াম প্রদর্শনীর শখ মিটিয়ে, চাকরির খোঁজ করছিল।
সেই সময় ফটিক দলের সঙ্গে, তাদের শহরের পাঁচিল ডিঙিয়ে রেলওয়ে ইয়ার্ডে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তারপরে দেখেছিল, পাথরের মতো স্তব্ধ মায়ের প্রাণ ফিরে এসেছে। শোকময়ী বউদি মৃত সংসারের বুকে হেঁটে হেঁটে আবার জাগিয়ে তুলছে। মৃত্যুর নিশ্চিত কবল থেকে অভয় ফিরে আসছে। আর ফটিক একটা দুর্ধর্ষ ওয়াগন-ব্রেকার। আর ঝন্‌টি এসেছিল তিন বছর আগে, সমাজের একটা উচ্চের কাছে।
—আমি একটা ওয়াগন-ব্রেকার, খুনী।
ঝন্‌টির দিকে তাকিয়ে চাপা স্বরে ফুঁসে উঠল ফটিক। বলল, আর সবাই বলে ঝন্‌টি আর ফটিক—ওরা—ওদের···। আমি সেই দিনের কথা মনে রেখেছি—যেদিন তুই আমাকে প্রথম বলেছিলি 'তুমি কেন লেখাপড়া শিখলে না। ভদ্রলোকের মতো, আর দশজনের মতো স্বাধীন···।'
চুপ হয়ে গেল ফটিক। তারপরে চিবিয়ে চিবিয়ে ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, স্বাধীন। ভদ্র। নটীপনা আমার কাছে, না ?
ঝন্‌টি মুখ তুলল। চোখ তুলে ওর সেই আশ্চর্য ঝংকৃত গলায় বলল, আমাকে ক্ষমা কর ফটিকদা। ওসব বলো না।
—না, ক্ষমা-টমা জানি না। আমি জানতে চাই।
ঝন্‌টির প্রতি স্থির নিবন্ধ চোখে, ফটিক গর্জে উঠল। কিন্তু ঝন্‌টির সেই মুখটা ওর চোখের সামনে ভাসতে লাগল। দিনে দিনে অভয়ের আরোগ্যের কথা, অভয়ের পড়াশুনো আর ভবিষ্যতের কথা বলতে গিয়ে, যে-মুখে আশ্চর্য একটি হাসি চমকে ওঠে। আর প্রতিমার মতো ওর আবিষ্ট চোখে তখন একটি মানবীর ঝিলিক দেখা দেয়।
ঝন্‌টি চোখ তুলল আবার। প্রায় অস্ফুটে উচ্চারণ করল, ভালবাসি।
দুর্জয় শক্তিশালী ফটিকের বুকের মধ্যে কেঁপে উঠল। সে প্রায় স্খলিত গলায় বলল, কাকে ?
ফটিক শুনল ওকে।
ফটিক কোনোক্রমে উচ্চারণ করল, অভয়কে ?
ঝন্‌টির চোখ ফেটে জল এসে পড়ল। সম্মতিতে ঈষৎ ঘাড় দুলে উঠল।
ফটিকের হাত দুটি সাঁড়াশির মতো শক্ত হয়ে উঠল। যেন আক্রমণের আগে সে দেয়ালে সব শক্তি দিয়ে ঠেস দাঁড়াল। গলায় তার স্বর নেই যেন। প্রায় শ্বাসরুদ্ধ ফ্যাসফেসে গলায় বলল, আর—আর আমি, আমার সঙ্গে তা হলে এতদিন···এত···
ঝন্‌টির গলার স্বরও প্রায় বন্ধ। সে চুপি-চুপি সুরে বলল, জানি নে, আমি জানি নে।
—চুপ।
বজ্রের হুংকার ফেটে পড়ল ফটিকের গলা থেকে। বদ্ধ উম্মাদের মতো দেখাল তাকে। ফটিকের নিজেরও মনে হলো, তার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। আত্ম-পর-পরিবেশ, সব ভুলে যাচ্ছে। কী করব, ভাববার আগে, করবার আগে চোখের সামনে

ঝন্‌টিকে সহ্য হলো না। তাকাল না ঝন্‌টির দিকে। হাত দিয়ে দরজার দিকে দেখিয়ে কোনো রকমে বলে উঠল, চলে যা, চলে যা সামনে থেকে। যা!— চীৎকার করে উঠল সে। ঝন্‌টি উঠল আস্তে আস্তে।

…অ্যাই—অ্যাই ফটিকদা, কী করছিস্‌ মাইরি।…

চাপা গলায় বলে উঠল কার্তিক। হাত দিয়ে টেনে ধরল ফটিকের জামাটা। ফটিক দাঁড়িয়ে উঠেছে। ইয়ার্ডের আগে, স্টেশনের ওপর দিয়ে ধীর গতিতে গাড়িটা চলেছে। ঢাকনাহীন সি. এস. এক্স. ওয়াগানের ওপর দাঁড়ালেই বাইরে থেকে দেখা যায়। আর এটা ইয়ার্ডে ঢোকবার আগের স্টেশন। প্রোটেকশন ফোর্স এখানে অতন্দ্র, সশস্ত্র, নিষ্ঠুর। তাদের দুমুখো নীতির বুলি হলো, হয় ধরা দাও, নয় ভাগ দাও। কিন্তু ফটিকের বেলায়, তাদের কোনো নীতি নেই, ক্ষমা নেই।

কার্তিকের টানে আবার বসে পড়ল ফটিক। কার্তিক চুপি-চুপি আর্তস্বরে বলে উঠল, আজ তুই যেন কী হয়ে গেছিস্‌ ফটিকদা!! আজ তোর আগ পিছু জ্ঞান নেই। ঘন্টুকে মারবার দিনও তুই এরকম ক্ষেপে গিইছিলি।

হাঁ, আজও সেই দিন, সেই রকমই একটা রাত্রি। প্রতিশোধের আর এক লগ্ন যেন। ঘন্টুর বিশ্বাসঘাতকতায় কিছুদিনের জন্যে দল ভেঙে যাবার সম্ভাবনা ছিল। আর আজ ঝন্‌টি বিদায় নিয়ে এলো সকালবেলা। তারপর ক্রমাগত একটা অসহ্য ভয়াবহ অনুভূতি ওর বুকের অস্পষ্টতা থেকে আবিষ্কৃত হতে লাগল। পলে পলে তিলে তিলে সেই আবিষ্কারের দিগন্ত এসে যেন থমকে দাঁড়াল শীতের গোধূলি রক্তিম বেলায়। ঘরে ফেরার পাখিরা শেষ ডাক দিল সীমান্তের খাল পাড়ে। গাছ থেকে শুকনো পাতা খসে পড়ছে। ফটিক দেখল, একটা নিঃশব্দ হাহাকার যেন সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আর সেই মুহূর্তে আবিষ্কৃত হলো জীবনটা ভয়ংকর যন্ত্রণাদায়ক নিরর্থকতায় ভরে উঠল।

আবিষ্কৃত হলো আর তম্মুহূর্তেই বন্দুকটা দু' হাত দিয়ে বুকের ওপর টেনে নিল সে।

কার্তিক তেমনি বলে চলেছে, আর মালটুকু সব ফুরিয়ে গেল। আমার শীত ধরে যাচ্ছে, মাইরি। রেগে যাস না ফটিকদা, ঘন্টুকে মারার দিন তবু তোর পেটে মাল ছিল। আর…আজ…দেখছি মাল খাওয়ার থেকেও তোর চেহারা…। আচ্ছা, অ্যাই-অ্যাই ফটিকদা ?

—হুঁ।

—একটা সত্যি কথা বলবি ?

—কী ?

—তুই আজ ধরা দিতে এইছিস, না ? জেলে যেতে চাস্‌, না ?

—জেলে !

—হাঁ জেলে। বউদির সংগে ঝগড়া করে ধরা দিতে চাস্‌।

—না।

গাড়ির গতি ক্রমেই মন্থর হয়ে এলো। ইয়ার্ড সামনে। ইয়ার্ডের আকাশ খোঁচানো অনুসন্ধানী আলোর রেশ দেখা যাচ্ছে।

কার্তিক বলল, তবে? তুই আজ এভাবে বেরুলি, আর এরকম…। টাকা নেই তোর কাছে, না কি? অভয়ের অসুখ বেড়েছে? বউদি টাকা চেয়েছিল? তাই এভাবে বেরুলি?
সেই টাকাগুলির কথা মনে পড়ল ফটিকের। যে টাকাগুলি সে দিয়েছিল ঝন্টিকে, হাত থেকে পড়ে গিয়েছিল। টাকাগুলি এখন তার ব্যাক-পকেটেই রয়েছে। আর বউদি, অভয়,…কার্তিকের কথাগুলি শুনে একটি দুঃসহ ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। যে-ছবি তার চোখে, রক্ত আর নিষ্ঠুরতাকে তীব্রতম করে তুলল। দমকা স্টীমের মতো একটা ভাপ বেরিয়ে এল ফটিকের মুখ থেকে। বলল, না।
—তবে?
ফটিক বলল, চুপ কর।
কার্তিক একটু চুপ করল। কিন্তু থাকতে পারল না। ইয়ার্ডের মধ্যে গাড়ি ঢুকল। সে গলার স্বর আরো নামিয়ে বলল, ফটিকদা ইয়ার্ডে গাড়ি ঢুকল, আর আমরা মাত্তর দুজন।…তোর জেলাখারিজের আগে, লাস্ট যেদিন বেরিয়েছিলাম, সেদিন সাতজন ছিলাম। প্ল্যান করে বেরিয়েও ভুবনেটাকে হারালাম।
মালগাড়ির রাজ্যে গাড়িটা এসে ঢুকল। চারদিকে অনেক আলো। কুয়াশা ভেদ করে বেশী দূরে ছড়াতে পারছে না তার রেশ। কাছেই ফ্লাই শান্টিং-এর, কামান-দাগার মতো শব্দ হচ্ছে। লাইন আর লাইন আর ওয়াগনের মেলা। আশেপাশে অন্যান্য ইঞ্জিনের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। কাঁচা-কয়লা জ্বলছে কোথাও, তার লেলিহান শিখা কুয়াশার মধ্যে রক্তবর্ণ দেখাচ্ছে। সিগন্যালম্যানের গলা শোনা যাচ্ছে, হো-ই।…আর তারপরেই হুইস্‌ল। শুধু প্রহরীদের কোনো সাড়াশব্দ নেই।
কার্তিক বলল, আর পি এফ সেদিন ওৎ পেতে ছিল। সবাই পালালাম, শালা ভুবনেটা পাঁচিলের কাঁটাতারে আটকে গেল! গুলীটা এসে লাগল ঘাড়ে, আর কাঁটাতারেই ঝুলতে লাগল। তারপরে এই আজ…মাত্তর দুজনে…।
—চুপ কর।
ফটিক বাধা দিল। লাইনের পাশে খোয়াপাথরের ওপর জুতোর শব্দ শোনা যাচ্ছে। ফটিক বন্দুকটা তুলে নিল হাতের ওপর। কার্তিকের ঠান্ডা হাত এসে পড়ল ফটিকের হাতে। ফিস্‌ফিস্‌ করে ডাকল, ফটিকদা—
ফটিক কার্তিকের মুখের ওপর হাত চাপা দিল। কেউ কাউকে প্রায় দেখতে পাচ্ছে না। গাড়িটা অন্ধকারের ভিতর, দুটো মালগাড়ির মাঝখানে ঢুকে, রুগ্ন মানুষের মতো চলেছে। ধীরে ধীরে, ঠেলে ঠেলে, যেন কষ্টের সঙ্গে।
পায়ের শব্দ এগিয়ে এল। পার হয়ে গেল ফটিকদের। কার্তিক চুপি-চুপি বলল, 'ফটিকদা, এত দূরে এলাম, সাত মাইল। এ গাড়িটারই এক-আধটা ওয়াগন দেখলে হতো। ইয়ার্ডে এলি কেন?
ইয়ার্ডে এলো কেন ফটিক? ক্রুদ্ধ তীক্ষ্ন চোখে পশ্চিম দিকে তাকিয়ে, উঠে দাঁড়াল। কুয়াশা আর অন্ধকারে কিছু দেখা যায় না। কিন্তু, পশ্চিমে, অদূরেই যে পাঁচিল আর কাঁটাতারের বেড়া অদৃশ্য রয়েছে, তার ওপারেই ওদের শহর। শহরের দু' একটা আলো, স্তিমিত তারার মতো দেখাচ্ছে।

কার্তিক প্রায় শিউরে উঠে বলল, কী করছিস ফটিকদা ?

—নামব। আমার পেছনে আয়।

এ সেই দলপতির গলা, দৃঢ় নির্দেশ। নিঃশব্দে নেমে পড়ল ফটিক। পিছনে কার্তিক। ফটিক দেখল, পর পর কয়েকটা মালগাড়ি দাঁড়িয়ে আছে লাইনের ওপর। গাড়ির তলায় হামা দিয়ে দিয়ে পার হতে লাগল। সেই পায়ের শব্দ আবার এগিয়ে আসছে এদিকে।

ফটিক থেমে গেল একটা গাড়ির তলায়। তার প্রায় ঘাড়ের ওপরে কার্তিক। কথা বলবার শক্তি নেই। তবু বলল, অ্যাই ফটিকদা, এ গাড়িটা যদি সিগনেল পেয়ে চলতে আরম্ভ করে ?

ফটিকের শক্ত থাবা এসে পড়ল কার্তিকের মুখের ওপর। সেই থাবার মধ্যেই কার্তিকের ঠোঁট নড়তে লাগল, শালা ভুবনেটা…।

মাত্র দু' হাত দূরে দিয়ে, দু'জোড়া বুটপরা পা এগিয়ে চলে গেল। শব্দ মিলিয়ে গেল। ফটিক হামা দিয়ে পার হয়ে চলল। মালগাড়িগুলি ছাড়িয়ে, প্রায় হামা দিয়েই পাঁচিলের ধারে চলে এলো। কার্তিকও এলো। হাঁপাতে হাঁপাতে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল কার্তিক, কোন্‌ ওয়াগনের মাল পাচার করবি ফটিকদা ?

ফটিক বলল, পাঁচিল ডিঙোব।

—মাল সরাবি না কিছু ?

জবাব না দিয়ে, বন্দুকটা কনুইয়ের সঙ্গে ঝোলাল ফটিক। চিরাভ্যাস মতোই লাফ দিয়ে উঠল পাঁচিলে। হাত বাড়িয়ে দিল কার্তিকের দিকে, তাড়াতাড়ি আয়।

কার্তিক উঠে এলো পাঁচিলের ওপর। ফটিকই আগে কাঁটাতার ডিঙিয়ে লাফিয়ে পড়ল ওপারে। ঝপ করে শব্দ হলো। কার্তিকও লাফ দিল। তার গলা দিয়ে এবার প্রায় স্বাভাবিক স্বর বেরুল, কোথায় যাচ্ছিস ফটিকদা ?

ফটিক কোনো জবাব দিল না। সে সামনের সোজা রাস্তাটা ধরে এগুলো। বন্দুকটা তার ডান হাতে। রাস্তায় মিটমিটে আলো। ঘুমন্ত মফঃস্বল শহর। ফটিকের পদক্ষেপ ক্রমেই দ্রুত হচ্ছে। কার্তিক এবার গলা খুলে, প্রায় আর্তনাদ করে উঠল, ফটিকদা, তোকে আমি আর চিনতে পারছি না মাইরি। ঘন্টুকে মারার দিনও তোকে দেখে এত ভয় লাগে নি। আমি জানি, লঙ্কা মুখুজ্জের ওপর তোর রাগ আছে। তুই সেই শোধ নিতে—?

ফটিক জবাব দিল না। কথা বলার স্তর সে পার হয়ে এসেছে। কথা সে বলতে পারছে না। শুধু একটা গর্জন তার বুকের মধ্যে এখন আবর্তিত হচ্ছে। তবু লঙ্কা মুখুজ্জের কথা তার মনে পড়ল। ফটিকের ওয়াগন ভাঙা চোরাই মেশিন আর লোহার দৌলতেই লঙ্কা মুখুজ্জে একটা ছোটখাটো ফ্যাক্টরির মালিক হয়েছে। চোরাই লোহার ব্যবসায় ফেঁপে উঠেছে। কিন্তু সে একটা মান্যগণ্য লোক এই শহরের। দাঁতে দাঁত পিষে, মনে মনে উচ্চারণ করল ফটিক, ভদ্র। স্বাধীন।

কার্তিক ঘাড়ে হাত দিল ফটিকের। ফটিক সজোরে ছুঁড়ে ফেলে দিল হাতটা। কার্তিক আর্তনাদ করে উঠল। সহ্য হচ্ছে না, কোনো স্পর্শ আর কথা এ মুহূর্তে আর সহ্য হচ্ছে না। কার্তিকেরও না। যে-কার্তিক তার দলপতির জন্যে প্রাণ

দিতেও পারে।

কার্তিক বলে উঠল, ফটিকদা, তুই আমাকেও মারছিস ? তোকেবাঘের চেয়ে খারাপ লাগছে, তুই নির্ঘাত কাউকে খেতে যাচ্ছিস। ফটিকদা—!

ভাঙা মন্দিরের পাশ দিয়ে, লাইটপোস্টের তলা দিয়ে ছোট সরু গলি পার হলো ফটিক। আর একটা লাইটপোস্ট . তার পাশেই পুরনো একতলা জীর্ণ বাড়ি। ফটিক দাঁড়াল।

—অ্যাই-অ্যাই ফটিকদা, এটা যে তোদের বাড়ি।

কার্তিক ভয়ে বিস্ময়ে বলে উঠল। ফটিক দরজায় শব্দ করল। কার্তিকের দিকে ফিরে বলল, ছুরিটা আছে ?

—আছে।

কার্তিক জামার ভিতর থেকে ছুরি বের করল। কুয়াশা-ঢাকা স্তিমিত আলোয় চিকচিকিয়ে উঠল ধার।

ফটিক বলল, দরজায় দাঁড়িয়ে থাকবি। চীৎকার চেঁচামেচি যাই হোক, কেউ যেন না ঢুকতে পায়।

কার্তিক স্তব্ধ হয়ে গেল। ফটিক আবার দরজায় ধাক্কা দিল। ভিতর থেকে শব্দ এলো, কে ? ফটিক চিনল, বউদির গলা। সে বলল, দরজা খোল।

বউদি দরজা খুলে দিল। ফটিক ঢুকে, কার্তিককে বাইরে রেখে, আবার দরজা বন্ধ করে দিল। দেখল, হারিকেন হাতে বউদি কাঁপছে। শীত এবং ভয়, দুয়েই বোধহয়। ফটিক জানে, তার টাকা ছাড়া, তার ছায়াকেওএ বাড়ির সবাই ভয় পায়। ঘৃণা করে।

কোনো কথা না বলে, ফটিক উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢুকল। দেখল, মা দাঁড়িয়ে আছে দালানে। লম্বা দালানে, দুটো মশারী, দুটো বিছানা। বড়টায় বউদি আর তার ছেলেমেয়েরা শোয়। ছোটটায় মা শোয়।

মা বলে উঠল, এখন এভাবে ? তোকে এরকম দেখাচ্ছে কেন ?

মা আতঙ্কিত চোখে ফটিকের বন্দুক ধরা হাতের দিকে তাকাল। ফটিক তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে দেখল ঘরের মধ্যে। তারপর এগিয়ে গেল দালানের পুব বাঁকে। বাঁকের কাছে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। পুবের দালানপেরিয়েই, সামনে ঘর। ঘরের বাইরে, দরজার পাশে বিছানা, মশারী-ঢাকা। আর ঘরের মধ্যে, পুরনো সেকালের খাট দেখা যাচ্ছে দরজা দিয়ে। খাট দরজা মশারী ঢাকা।

ফটিক এক টানে দরজার বাইরের মশারীটা টেনে তুলল। ঝন্টি। অসুস্থ অভয়ের নিকটতম জায়গা বেছে নিয়েছে নিজের জন্যে। শায়িতা ঝন্টির বোধহয় বাইরের দরজার শব্দেই ঘুম ভেঙে গিয়েছে। কিংবা ঘুমোয় নি। স্থির নিষ্পলক চোখ। প্রতিমার মতো। কেবল সেই আবিষ্টতার মধ্যে যেন একটি শঙ্কার ছায়া। স্খলিত আঁচলটা সে টেনে দিল বুকের ওপর।

ঝন্টির ওপর থেকে চোখ সরিয়ে ঘরের মধ্যে তাকাল ফটিক। তার মুখ ভয়ংকর হয়ে উঠল আরো। এক ঘরে নয়, তবু দুজনে পাশাপাশি, কাছাকাছি। ঝন্টির মশারী ছেড়ে দিয়ে, ফটিক খাটের সামনে এসে, মশারীটা টেনে তুলল। বিছানায়

টান পড়তেই, অভয়ের পাতলা ঘুম ভেঙে গেল। ফটিকের মতোই প্রায় মুখ। অনেকটা শীর্ণ, তাই চোখগুলি বড় দেখায়।

অভয় বলে উঠল, কে ?

ফটিক স্থির, নিশ্চুপ কঠিন। অভয় আধবসা হয়ে বলল, দাদা। তুমি ?

ফটিক সরে এলো মশারীটা ছেড়ে দিয়ে। আর তার ধাক্কা লেগে টেবিলের ওপর থেকে অভয়ের ওষুধের শিশি পড়ে গেল ঝনঝন শব্দে। চেয়ে দেখল না ফটিক। সে দেখল ঝন্টি আলুথালু হয়ে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। ফটিক প্রায় ক্ষিপ্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ল ঝন্টির ওপর। ঘাড়ের কাছে শাড়ি আর ব্লাউজসুদ্ধ মুচড়ে ধরল। আরো উচ্ছৃত হয়ে উঠল বুক, আর বুকের উদ্ধত লজ্জা প্রায় উন্মুক্ত হয়ে পড়ল। ফটিক চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, ভয় লাগছে ?

জীবনে এই প্রথম ঝন্টি শক্ত হলো, প্রতিবাদ ফুটলো দেহের নিঃশব্দ বেঁকে ওঠায়। মা শিউরে বলে উঠল, কি করছিস ফটিক !

—চুপ ! কোনো কথা নয়।

বলেই ঝন্টিকে একটা ঝাপটা দিয়ে, দালানের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে চলল অপর প্রান্তে।

—দাদা !

অভয়ের স্তিমিত শীর্ণ আর্তনাদ উঠল পিছন থেকে। এক মুহূর্তের জন্য ফটিক স্তব্ধ হলো। পরমুহূর্তেই টেনে নিয়ে চলল ঝন্টিকে। ঝন্টির পায়ে শক্তি নেই। সে প্রায় ঝুলছে ফটিকের থাবায়। আঁচল লুটাচ্ছে। চুল খুলে গিয়েছে। ফটিকের গায়ে সে আঁকড়ানো।

দালানের শেষ প্রান্তে ছাদের সিঁড়ির কাছে গিয়ে এক মুহূর্ত থমকাল ফটিক। বন্দুকটা ঝন্টির বুকে আড়াআড়িভাবে চেপে ধরে, তাকাল। না আর প্রতিমার সেই আবিষ্টতা নেই ওর চোখে। আগুনও নেই। অন্য কিছু। যেন ভাবলেশহীন, ঠান্ডা এবং স্থির। ফটিক আর একটা মোচড় দিল জামা ধরে। পড়্‌পড়্ শব্দ হলো, আর ঝন্টির মুখ একটু বিকৃত দেখাল। সিঁড়ির ওপর দিয়ে তুলল তাকে ফটিক। ছাদে এনে, চিলে কোঠার দেওয়ালে পিষে ধরল।

কুয়াশা ভেদ করে যে-আলোটুকু এসেছে রাস্তা থেকে, সেই স্থির ঠান্ডা চোখই দেখতে পেল ফটিক।

ঝন্টি প্রায় শ্বাসরুদ্ধ গলায় বলল, কী চাও তুমি ? কী ?

গহ্বরের স্তব্ধতা থেকে নিষ্ঠুর গোঙানি উঠল, জানতে চাই।

—কী ?

—আমি···আমার সঙ্গে এতদিন ধরে··· ?

—কী তোমার সঙ্গে ?

বন্দুকটা পড়ে গেল মাটিতে। ফটিকের হাত সাঁড়াশির মতো উঠে এলো ঝন্টির গলার কাছে। বলল, কিছু নয় !

ঝন্টির গলায় কষ্ট হচ্ছে। চাপা স্বরে বলল, আমি জানি না ফটিকদা। তোমার যা খুশী, আমাকে তাই করেছ, ফটিকদা—বলতে দাও একটু—ফটিকদা—।

ফটিক চোখ বুজে দাঁতে দাঁত পিষল।। ঝনুটি যেন অনেক দূর থেকে কোনো-রকমে ফিসফিসিয়ে বলল, তুমি আমাকে একটা খারাপ জায়গা থেকে এনে তুলে-ছিলে একদিন।...মারবার আগে শুনে নাও ফটিকদা...তোমার কাছে আমার জোর ছিল না। কিন্তু তুমি কখনো... ।

ফটিকের হাত কাঁপছে থরথর্ করে। শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। ঝনুটির নরম গলায় আর মসৃণ চামড়ায় যেন একটা অসম্ভব শক্তি, ফটিকের দুটো হাতকে অবশ করে দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, ঝনুটির যেন দেহের ঊর্ধ্বে, আর কিছু, যাকে হাত দিয়ে ছোঁয়া যায় না। শক্তি দিয়ে হত্যা করা যায় না। যা ওর প্রাপ্য ছিল, আর না পেলে ভয়ংকর হয়ে উঠতে হয়, সেটা যেন সব প্রতিশোধের বাইরে।

ফটিকের বুকের ভিতরে, একটি নিষ্ঠুর এবং নৃশংসতম বুকের ভিতরে এই প্রথম যেন চুপিচুপি নিঃশব্দ আর্তনাদ উঠল, পারছি না, আমি পারছি না। আমি কী করব...

সহসা সে হাঁটু ভেঙে নত হয়ে পড়ল। ঝনুটি হাঁপাতে লাগল। ফটিকও যেন একটি বিশাল আহত পশুর মতো হাঁপাতে লাগল। তারপর বন্দুকটা তুলে নিল হাতে। আর কোনো দিকে না তাকিয়ে নেমে এলো সিঁড়ি বেয়ে। নেমেই দেখল সামনে অভয়। অসুস্থ অভয়। এখনো পুরো সুস্থ হতে পারে নি। দেয়াল ধরে দাঁড়িয়ে আছে। ফটিক দাঁড়াল। কিন্তু চোখের দিকে তাকাল না। কয়েকবার ঢোঁক গিলল। কিছু বলতে চাইল। বলা হলো না। হাত দিল অভয়ের ঘাড়ে। নিরীহ অভয়। অনেক লজ্জায় আর দুঃখে ও ক্ষোভে সে ফটিকের টাকায় বেঁচে উঠেছে। আর এই যে মা, এই যে বউদি, আর জেগে ওঠা এই সব ভীত ছেলেমেয়েগুলি—এরা যেন কতদূরে। ওরা নিজেরা কত কাছাকাছি।

অভয়ের ঘাড় থেকে হাত সরিয়ে, বেরিয়ে গেল ফটিক। বাইরের দরজা খুলে চলতে আরম্ভ করল। কার্তিক পিছন পিছন চলতে লাগল। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, কাম ফতে ফটিকদা ?

—হাঁ।

—কাকে ? কাকে শেষ করলি ফটিকদা ?

কার্তিক যেন কেঁদে উঠল। ফটিক বলল, জানি না।

—আঃ। মাইরি, তুই আজ কিছু জানিস না। কাল হয়তো শুনবো...আঃ এখনো কাঁপছি। একটু মাল যদি... ।

পাঁচিল ডিঙিয়ে, লুকিয়ে, আবার একটা উজান, মন্থরগতি মালগাড়িতে ফটিক ফিরে এলো। খালের আগে, স্টেশনের সামনেই গাড়িটা থেমে গেল। নেমে এলো দুজনেই। ফটিকের মনে হলো, পৃথিবীটা হাল্‌কা হয়ে গিয়েছে। আর সব ভারটা ওর ওপরে চাপছে।

লাইনের ওপর দিয়ে, প্রায় নির্ভয়ে সে বন্দুকটা নিয়ে চলল। যেন ওর কোনো ভয় নেই। এখন বাতাস দিচ্ছে। শীত আরো বাড়ছে। হালকা হচ্ছে কুয়াশা।

কার্তিক বলল, মাইরি, কী সর্বোনাশ যে করে এলি ফটিকদা, আমি কিছু জানতেও

পারলাম না। ধ্‌র্‌-র।

ফটিক খাল-পুলটার মাঝখানে দাঁড়াল। নিচে জল কাঁপছে। স্রোত নেই, বোধহয় বাতাসের দোলায় কাঁপছে। ফটিকের মনে হলো, তার কিছু বলতে ইচ্ছে করছে। কিছু বেরুতে চাইছে ভিতর থেকে। কিন্তু বের হলো না। ফটিক বন্দুকটা ফেলে দিল জলে।

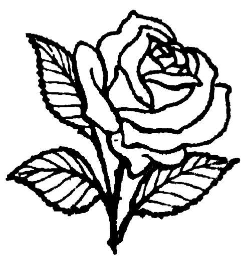
—এ কি করলি ফটিকদা?

ফটিক পুলটা পার হয়ে গেল। কার্তিক বলল, যাঃ। এসব কী মাইরি!

সুখন ধাঙড়টাই বোধহয় জেগেছে। কাঁপা কাঁপা গলায়, গানের সুরে বলছে, হাই রাম রাম রাম, হাই রাম রাম রাম।…

কার্তিক বলল, শালা মরা মরা শোনাচ্ছে, না রে ফটিকদা?

ফটিক কিছু বলল না। তার বুকের মধ্যে যেন কী আটকে আছে।



উত্তাপ

ট্রেনখানা বৃষ্টিতে নেয়ে এসে দাঁড়ালো। আর ঠিক সেই সময়ে মেয়েটা আবার খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠল। আবার ধক্‌ধক্‌ করে উঠলো হরেনের বুকের মধ্যে। তার লিক্‌লিকে শরীরের রক্তে-রক্তে অসহ্য জ্বালা ধরে গেল। গাড়ি থেকে নামতে গিয়ে তার বুকের মধ্যে আরও তোলপাড় করে উঠল। দেখলো, মেয়েটাও ওর লোকজনের সঙ্গে সেখানেই নামছে। কোথায় যাবে এরা ?

ছোট স্টেশন। যাত্রীও খুব অল্প কয়েকজন। কিছু খেত-মজুর মেয়ে-পুরুষ। ভিজতে-ভিজতে এসেছে। যাবেও ভিজতে-ভিজতেই। টোকা, হুঁকো, বোঁচকা, টুকি-টাকি সামান্য জিনিস হাতে, কাঁধে ঝুলছে। কেমন ছন্নছাড়া ভেজা-ভেজা একটা ভাব।

এখানেও বৃষ্টি হয়ে গেছে। হয়ে গেছে নয়, এখনও হচ্ছে। তেমন জোরে নয়। যেন হাওয়ার ঝাপটায় নেমে আসছে ইল্‌শেগুঁড়ি ছাঁট। এর আগের রাস্তায় জল আরো তোড়ে নেমেছে। ট্রেনের ছাদ দিয়ে জল পড়ে কামরাগুলো পর্যন্ত ভেসে গেছে। মনে হচ্ছিলো, গাড়িটাই বুঝি লাইন থেকে হড়কে পড়ে যাবে।

আষাঢ় মাস। কিন্তু যেন শ্রাবণের ধারা লেগেছে। মাঝে-মাঝে থমকায়। একটু আশা দেয়। আকাশ দাঁত খিঁচোয় দূরে-দূরে। ভাবখানা যাব যা, নইলে এলুম বলে।

এসেই আছে। গড়িয়ে গড়িয়ে আকাশটা অষ্টপ্রহর নামছে। মেঘ দলা পাকাচ্ছে উঁচু চড়াইয়ের মাথায়। মনে হয়, চড়াই পেরিয়ে উৎরাইয়ের ঢালু প্রান্তর দলা-দলা মেঘে অন্ধকার হয়ে আছে। কাছাকাছি কোথাও চাষ-আবাদের লক্ষণ বিশেষ দেখা যায় না। যা আছে, খুবই সামান্য। সবটাই লাল কাঁকরপাথরে ভরা। মাঝে-মাঝে কাজল চোখের চকিত চাউনির মতো সবুজের ছিটে লেগেছে। কোথাও হঠাৎ এক-সার ভূতের মতো মাথা তুলেছে সোজা-বাঁকা তালগাছ। তার ঘন বেষ্টনীতে খোঁচা-খোঁচা হয়ে আছে মেঘ অন্ধকার। তারপর দম আটকে চড়াই উঠেছে ঠেলে-ঠেলে, হামা-গুড়ি দিয়ে। এমন সময় আচমকা কয়েকটা শালগাছ। অন্যদিকে চোখ ফেরাতেই হয়তো দেখা যাবে ঝাঁকড়া মহুয়া গাছটা টলছে বাতাসে। কয়েকটা বিক্ষিপ্ত পলাশ-গাছ জলের ফোঁটা-পড়া পাতায়-পাতায় চেয়ে আছে বিষণ্ণ চোখে। তারপর কিছুই নেই, যতদূর চোখ যায়। কেবল কালো কিম্ভূত আকাশটার তলায় এই উঁচু-নীচু বিশাল প্রান্তর যেন গেরুয়া আলখাল্লা-পরা রুদ্র সন্ন্যাসী, পড়ে-পড়ে প্রতি লোম-কূপ দিয়ে তৃষ্ণা মেটাচ্ছে আষাঢ়ের ঢলে।

স্টেশনটা উত্তর বীরভূমের পশ্চিম ঘেঁষে। ক্রোশ-দেড়েক পশ্চিমে গেলে সাঁওতাল

পরগনার সীমানা। পশ্চিমে, দূরে, মেঘের কোলে মেঘের মতো জেগে রয়েছে [illegible]
মহল পাহাড়ের ইশারা। ইশারাটা দূর দিয়ে বেঁকে, অনেকখানি দক্ষিণে এসে হঠাৎ হুমড়ি খেয়ে পড়েছে পূবে।

ট্রেন চলে গেল। হরেন সব ভুলে চেয়ে-চেয়ে দেখতে লাগলো মেয়েটাকে। নিজের যাওয়ার কথা ভুলে, লক্ষ্য করছে ওদের গতিবিধি। যাদের সঙ্গে মেয়েটা আছে, একটা বুড়ো একটা বুড়ি, একটি মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষ। আর ওই মেয়েটা। টোকা, হুঁকো, বোঁচকা, এমনি সামান্য কিছু জিনিস ওদের হাতে, কাঁধে ঝুলছে। চায়ের কাজে মজুরি খাটতে যাচ্ছে কোথাও। প্রথমে মনে হয়েছিল সাঁওতাল। কথা শুনে বুঝলো, সাঁওতাল নয়। বাউরী কিংবা বাগ্‌দী হবে। গাড়িতে উঠেছে ওরা নলহাটি থেকে।

মরদ নেই সঙ্গে মনে হচ্ছে মেয়েটাই ওদের নিয়ে চলেছে। কালো রং মেয়ে। যেন ঝুঁটিওয়ালি একটি কালো মেয়ে-পাওরা। মদ্দা এসে ঠুকরে খুনসুটি করবে। সেই আশায়, বুক উঁচিয়ে, মাথা হেলিয়ে দুলে-দুলে চলেছে। চোখে দীপ্তি, গলায় বকম্-বকম্। কিন্তু যাচ্ছে তো খাটতে, বোঝাই যাচ্ছে। আর সঙ্গেও কয়েকটা বুড়ো-বুড়ি। তবে এতো হাসির ঢুলুনি ঢলানি কিসের।

গাড়িতে কয়েকবার চোখাচোখি হয়েছে। হরেন তার জীবনে অনেক মদ খাওয়া মেয়েমানুষের চোখ দেখেছে, সঙ্গও করেছে। ওই মেয়েটার টানা-টানা চোখ দুটিও যেন মদ-খাওয়া, চোখে একদিন যেমন শান দেওয়া, আর একদিকে তেমনি ঢুলু-ঢুলু। নেশা ধরিয়ে দেয়। নেশা ধরেও গেছে হরেনের। হেসে-হেসে গাড়ির অনেকের প্রাণেই নেশা ধরিয়ে দিয়েছে। বোধহয় বিধবা। আসল বয়সে রং ফুটে বেরুচ্ছে হাতে-পায়ে, কথায়, হাসিতে। রং করার ইচ্ছে আছে প্রাণে। কিন্তু যাবে কোথায় এরা?

—সে ওই দলটার পেছনে-পেছনে এসে দাঁড়ালো, স্টেশনের বাইরে। তার ফিন্‌ফিনে মিলের ধুতি, পপ্‌লিনের চক্‌চকে শার্ট। পায়ে কালো রং-এর বুটজুতো। রংটা ফর্সা কিন্তু যতখানি বেঁটে, ততখানি রোগা। বয়স তিরিশ না হলেও মুখের চামড়ায় ভাঁজ পড়েছে চল্লিশেরও বেশি। শরীরের ক্ষয়টা জামার ভাঁজেও ফুটে উঠেছে। যেন বাঁশ-বাখারীর কাঠামোর উপরে ঝুলছে জামাটি। শাশিকের মতো সরু বুক। তার ওপরে আবার বোতাম খুলে দিয়েছে বুকের। গায়ে এসেন্সের গন্ধ।

বাপের আছে ভালো জমি-জমা—ঘর-পুকুর। ছেলে মাত্র হরেন। কুল কুনুটি বংশ কুলিন রায়ের ছেলে। আট বছর ধরে শহর সিউড়িতে ছেলে পড়ছে কলেজের এক ক্লাসে। বাপ টাকা পাঠায় নিয়মিত। হরেন টাকাটা সরস্বতীর পায়েই দেয়। তিনি হলেন দুষ্টু সরস্বতী। বিদ্যের প্রকৃতিটা একটু অন্য রসের। আজকে যে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে মেয়েটা, এ নেশা আট বছর ধরে রপ্ত করেছে সে। এখন দর্শনেই নেশা হয়. আর নেশার মতো বস্তুও বটে।

সামনে এসে মেয়েটিকে ভালো করে দেখলো সে। গায়ে জামা নেই। নিভাঁজ গ্রীবার নিচে দিয়ে রূপোর বিছে-হার বুকের টান-টান কাপড়ের ঢাকায় হারিয়ে গেছে। কানের ফুটোয় গোঁজা দুটি পেতলের মাকড়ি। সিঁথেয় সিঁদুরের আভাস দেখা গেল

এবার। জলে ধুয়ে অস্পষ্ট হয়ে গেছে।
মেয়েটা তাকালো হরেনের দিকে। তাকিয়ে হঠাৎ একটু ঠোঁট টিপে হেসে সরে গেল মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষটির কাছে। ঠোঁট বেঁকিয়ে কি যেন বলল ফিস্‌ফিস্‌ করে। মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষটি ফিরে তাকালো। তারপর তাকালো বুড়ো-বুড়ি। কেমন যেন ছেলেমানুষের মতো চাউনি বুড়ো-বুড়ির।
বুড়ো বলল হরেনকে, 'কুথাকে যাবেন গো, বাবু?'
যাক, মুখ খোলা গেল। এবারে জানা যাবে গতিবিধি। হরেন বলল, 'কে, আমি? যাবো তো রলাটি, কিন্তু—'
রলাটি? ওরা সবাই একসঙ্গে ফিরে তাকালো ওর দিকে। বলল, 'অলাটি যাবেন। আপনি। আরে বাপ! গাড়ি নাই, দুস্তর রাস্তা, ম্যাঘ-বিষ্টি, কি করে যাবেন গো?'
সেইটেই এতক্ষণে হুঁশ হলো হরেনের। তাই তো! চিঠি দিয়েছিল বাড়িতে গরুর-গাড়ি পাঠাবার জন্যে। কিন্তু কাকপক্ষীও তো নেই। সে ফিরে জিগ্যেস করলো, 'তোমরা কোথায় যাবে?'
'অলাটি।'
'রলাটি?'
'হুঁ। ফি বছরে যাই। মজুরি খাটতে যাই গো। ইবারে এট্টুস আগে-আগে বেরোলম। দেখেন ক্যানে, আকাশের ভাব। সব ভাসায়ে লিবে মনে হচ্ছে।'
হরেনের প্রাণে রস নামলো আরও। রলাটি যাবে তাহলে? একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে চাইলো সে। বলল, 'কার ঘরে কাজ করতে যাচ্ছিস্‌?' কথা বলে এদিকে। নজর থাকে মেয়েটার দিকে। জবাব বুড়োই দিলো, 'ইন্দির চাটুজ্যেমশায়ের ঘরে। অলাটির কুন ঘর আপনাকাদের?
'গদাই রায়, মানে গদাধর—'
'হুঁ হুঁ, বুঝলাম গো। তা, আপুনি—'
কথার মাঝেই সেই মেয়েটি কপট রোষে ফুঁসে উঠল, 'আ, কী যন্তনা গো, গল্প করছো, ইদিকে যে দিন যায়।'
সবাই নড়েচেড়ে উঠল। বুড়ো বলল হরেনকে, 'চলি গো, বাবু। সাত কোশ রাস্তা যেতে-যেতে বাতি জ্বলবে ঘরে।'
হরেনকে এই সময়ে হঠাৎ কেমন বোকা-বোকা মনে হতে লাগলো। সে কিছু স্থির করতে পারছে না। এতটা রাস্তা হাঁটবার সাহস নেই তার। তার ওপরে জল। ফিট্‌ফিট্‌ করে পড়ছেই। একটা ছাতাও নেই সঙ্গে। সে অসহায়ের মতো হাঁ করে তাকিয়ে রইলো মেয়েটির দিকে।
চোখাচোখি হতে মেয়েটা আবার হেসে উঠল খিল্‌খিল্‌ করে। সারা শরীরের সঙ্গে রুপোর বিছে হারটিও কালো মেঘের বুকে বিদ্যুতের মতো চমকে উঠলো। হাসির মধ্যে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ ছুঁড়ে দিয়ে গেল পেছনে। খোঁপার উপর দিয়ে ঘোমটা তুলে, মাথায় বসিয়ে দিলো টোকা। বুকে কেটে-কেটে-বসা হাসিটা নিয়ে হৃৎপিণ্ডহীনের মতো দাঁড়িয়ে রইলো হরেন। ভাবলো, হুঁ। রং চায় মেয়েটা।

সামনের চড়াইয়ের গা বেয়ে-বেয়ে মেঘ নামছে। লাল মাটির বুকে জল যেন ঢল নামিয়ে দিয়েছে রক্তের। বিদ্যুৎ ঝিলিকে টাটকা রক্ত ক্ষতের মতো ভয়ংকর দেখাচ্ছে লাল পাঁক। ক্রুদ্ধ খ্যাপা কুকুরের মতো দূরে আকাশ গরগর করছে থেকে থেকে। থেকে থেকে দূরের রাজমহলের ইশারাটুকু হারিয়ে যাচ্ছে একেবারে। আবার যেন কেউ পেন্সিল টেনে দাগ বসিয়ে দিচ্ছে।

ওদের চারজনকে ছাড়া লোক দেখা যায় না একটিও। সামনের রাস্তাটা গরু আর মানুষের পায়ের দাগে এবড়ো-খেবড়ো কর্দমাক্ত হয়ে উঠেছে। ক্রোশ-দেড়েক পশ্চিমে গেলে বীরভূমের সীমানা পার হয়ে সাঁওতাল পরগনা পড়বে। তারপর একটু দক্ষিণে এসে আবার খাড়া পশ্চিমে, সাঁওতাল পরগনার মধ্যে পাঁচ ক্রোশ রলাটি। দূরে দূরে কিছু সাঁওতাল গ্রাম, মাঝখানে হঠাৎ বাঙালী গ্রাম। কয়েকঘর ব্রাহ্মণের বাস। সেই পাঠান যুগ থেকে এমনি আছে।

আকাশের দিকে তাকিয়ে থমকে রইলো হরেন। আবার ফিরে তাকালো দলটির দিকে। সেই মেয়েটা সবচেয়ে পেছনে। তাকিয়েও বুকটা রনরন করে উঠল। মেয়েটার বলিষ্ঠ ঋজু পেছনটা যেন সমস্ত দলটিকে সাপটে হস্তিনীর মতো দুলে-দুলে চলেছে। দেখতে দেখতে আবার কানে এসে পৌঁছুলো অস্ফুট নিক্কণ।

আর দেখতে-দেখতে, শুনতে শুনতে মন্ত্রমুগ্ধের মতো পা বাড়ালো হরেন। সঙ্গে সঙ্গে পূবে-পশ্চিমে আকাশটা চিড় খেয়ে গেল বিদ্যুৎ-কণায়। মাটি যেন রক্তাক্ত হাঁ করে হেসে উঠল। বাজ হানলো আকাশে। হঠাৎ বাতাসে মরকুটে বাবলা ঝাড় নুয়ে-নুয়ে পড়লো। সামনের নেড়া তালগাছে সভয়ে কা-কা করে উঠল একটা কাক। হরেন চিৎকার করে ডাক দিলো, 'ওহে, ও বুড়ো শুনো ক্যানে।'

ওরা দাঁড়ালো চারজন। মাটিতে পা দিয়েই বুঝলো হরেন, বুট জুতো কামড়ে-কামড়ে ধরছে কাদা। ওইটুকুনি যেতে হাঁফ ধরে গেল। কাছে গিয়েই আগে মেয়েটির দিকে তাকালো সে।

মেয়েটি তার দিকেই নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রয়েছে। চোখে তার সেই মাতাল হাসি, একটু যেন ধারালো। ঠোঁটের কোণ তেমনি বেঁকে। বিদ্রূপ না মসকরা, সহসা বোঝা যায় না। কালো পাথর-চড়াই বুকের বাস কিছু শিথিল হয়েছে।

বুড়োর দিকে ফিরে বলল হরেন, 'গাড়ি আসে নি, আসবে কিনা কে জানে! চ তোদের সঙ্গেই হাঁটা দিই।'

বুড়ো বললো, 'আরে বাপ! ই হয় না। আমরা জন-মজুর মানুষ, তাতেই আলা-মরা হয়ে যাই। আপুনি ক্যানে পারবে।'

বুড়ি সস্নেহ গলায় বলল 'হঁ। না, না, ই হয় না।'

মেয়েটি হঠাৎ ধারালো ছুরির মতো চকিতে হেসে বলল, 'প্রাণ চেয়েছে হাঁটতে।' বলেই আবার চড়াইয়ে প্রতিধ্বনি তুলে হেসে উঠল।

বুড়ি বলল, 'আঃ, ই কি হাসি। বড়ো বেহায়া তু, বউ।'

মাঝ-বয়সী মেয়েমানুষটি মুখে আঁচল চেপে একেবারে চুপচাপ। বুড়ো আবার বলল, 'আকাশের গতিক ভালো না। আপুনি থাকেন গো। অলাটি কি এখানে? আমরা যেছি গাড়ি পাঠিয়ে দিতে বুলবো।'

হরেন মেয়েটির দিকে তাকিয়ে বললো, 'না, যাবো। এই তোরা ক'জনা রইছিস্। দুটো সুখ-দুঃখের কথা বলতে-বলতে চলে যাবো।'

আবার চিক্‌চিক্ বিদ্যুৎ হানলো। মেয়েটাও হাসলো বিদ্যুতের মতো। আবার এক ঝলক্ বাতাস নামলো হুস্ করে। মেয়েটা দ্রুতগতি মেঘের মতো চকিত বাঁকে চড়াইয়ে পা বাড়ালো।

বুড়ো বুড়ি খানিকটা অসহায়ের মতো চুপচাপ রইলো। তারপর হাঁটা ধরলো। এবার মেয়েটা সকলের আগে। চড়াইয়ের পরে মেঘ। যেন মেঘে-মেঘে হারিয়ে যাবে, সেই দিকে নিশানা।

বাতাস এলে ছাট বেশি আসে। নইলে মন্থর ফিস্‌ফিসে। আর এই জলে পিছল মাটি পায়ে ধরে হ্যাঁচকা দেয়। দশ পা হাঁটলে পাঁচ পা এগুনো যায়। পা নেমে আসে হড়কে।

হরেন একদিক ঘেঁষে চললো। যেখান থেকে মেয়েটাকে পুরো দেখা যায়। দেখতে গান মনে পড়লো। মনে পড়তেই গুন্‌গুন্ করে গেয়ে উঠল, 'সখি, আমা পানে চাও ফিরিয়া দাঁড়াও···ওদিকে চোখাচোখি হলো মাঝ-বয়সীর সঙ্গে মেয়েটির। আবার হাসি। বুড়ো-বুড়ি নির্বিকারভাবে উঠছে ঠেলে-ঠেলে।

ওরা যতো ওঠে, আকাশ ততো ওঠে। উপরের বাতাসের জোর বেশি। বড়ো চড়াই। সময় নিচ্ছে উঠতে। তারপরে উৎরাই। সেখানে দশ পা নামতে, বিশ পা ঠেলে নিয়ে যায়। নিয়ে যায় মুখ গুঁজড়ে ফেলতে। উৎরাইয়ে এসে, ঘাসের ওপর দিয়ে চললো সবাই। ঘাসে পেছলায় কম। কিন্তু ঘাসের তলে-তলে পাঁক। টেনে-টেনে ধরে। যতো না ধরে খালি পা, তার চেয়ে বেশি জুতো। উৎরাইয়ের ধাপে-ধাপে হঠাৎ মাথা তুলছে কয়েকটা তালগাছ। কোথাও কিছু নয়, যেন হঠাৎ কতক-গুলো দত্যি মাথা নেড়ে নেড়ে কানাকানি করছে। খস্‌খস শব্দে হাসছে মানুষ দেখে। আর কিছু নেই। শুধু উঁচু নিচু উঁচু। মেঘ বসছে চেপে-চেপে।

মেয়েটাকে শুনিয়ে হরেন জিগ্যেস করলো বুড়োকে, 'ওই বউ দুটো কে হয়, বটে ?'

বুড়ো টোকার তলা থেকে বলল, 'বিটার বউ। দুটো বিটার বউ। বিটারা গেলছে সক্কালবেলা, আগে-আগে। ইয়াদের লিয়ে এখন আমি চল্‌ছি।'

সাবধানে সাবধানে নামছে হরেন। নজর আছে আগে-আগে। যেখানে জলের মতো তর্‌তর্ করে গড়িয়ে চলেছে মেয়েটা। ওর কালো পায়ের শক্ত গোছা দেখে মনে হয়, মাটিতে বসলে আর উঠবে না। কিন্তু অমন পা দু'খানি যেন পাঁকে বসছে কি না বসছে। ছিট্‌কে যাচ্ছে রক্ত পঙ্ক। লালে লাল হয়ে গেছে সকলের পা। হরেনের কালো জুতো লাল হয়ে এসেছে। কাপড়ে লেগেছে চাপ-চাপ রক্তের মতো।

হরেন ভাবছে, বুড়োর সঙ্গে ভাব করা যাক আগে। রলাটির ছোকরা-বাবুদের মন চেনে ওরা। কথার ভাবে বোঝে, কি চায় বাবুরা। বলল, 'তবে ই বয়সে তুমার, দুটো বুড়ো বুড়ির তো বড়ো কষ্ট, হে ?'

বুড়ো হাসলো টোকার তলায়। বৈরাগীর আত্মভোলা হাসির মতো। বলল, 'কস্‌ট ? কস্‌ট কি গো, বাবু। ই কি রোগ-ব্যামো যে, কস্‌ট হচ্ছে ? সম্‌সারে যাবৎ মানুষ খাটে, খাটতে হয়। সি কুনো কস্‌ট লয়। ইটা খাটুনি। যখন লারবো, তখন মনে

কস্‌ট হবেক্‌।'
হরেনের মন বিগড়ে উঠলো বুড়োর কথা শুনে। এর মধ্যেই তার বুকে হাঁফ লাগছে, গলায় উঠছে সাঁই-সাঁই শব্দ। কোমরের গাঁটে গাঁটে কন্‌কনানি। আর ওর বুড়ো-হাড়ে কোনো কষ্ট নেই। ব্যাটা বজ্জাত, বৌশদুর হরেনকে এগুতে দিতে চায় না।
হরেন আবার বলল, 'তা, বউ-বেটা সব চলেছে, লাতিলাত্‌কুর্‌ নাই?'
বুড়ো খালি বলল, 'নাঃ!'
বলতে গিয়ে বুড়োর বুকে যেন একটা দীর্ঘশ্বাস আটকে রইলো। আটকে রইলো যেন সকলের বুকেই। বুড়ো-বুড়ি, মাঝ-বয়সী আর···না, মেয়েটার ভাব দেখে কিছু বোঝা যায় না। ঝুঁটি-পায়রার মতো বুক এগিয়ে নেমেই চলেছে। তবু কেমন একটা স্তব্ধতা।
কেবল পাঁকে-পাঁকে থপ্‌-থপ্‌ চপ্‌-চপ্‌। কালো-কালো কতকগুলো থ্যাবড়া পা, আর লাল কাদা। আকাশের ডাক বাড়ছে? ডাকছে ওই সামনের চড়াইটার মাথায়। চড়াইয়ের গা দিয়ে নামছে হিলিবিলি বিদ্যুৎ, চিক্‌চিক্‌ করছে তালবনের মাথায়। দগ্‌দগিয়ে উঠছে লাল পাঁক। তরল পাঁক গরুর গাড়ির লিক বেয়ে-বেয়ে গড়াচ্ছে আঁকাবাঁকা সাপের মতো। তরল কিন্তু আঁটালো। অন্ধকার নামছে। কে বলবে, এখন ভরদুপুর, যেন সাঁঝের শাঁখ বাজানোর সময় হলো।
আস্তে-আস্তে ওদের চারজনের গতি কমছে না। বাড়ছে। বাড়াতে হচ্ছে হরেনকেও। তারপর অনেকক্ষণ বাদে হঠাৎ বুড়ো হুঁশ করে একটা নিশ্বাস ফেললো। যেন এত-ক্ষণ ধরে চেপে ছিল দম। আর সেই মুহূর্তেই আকাশটা জলের তোড় নিয়ে গলে গলে পড়তে লাগলো। পট্‌পট্‌ ফুটতে লাগলো ওদের তালপাতার টোকাগুলোতে। তার মধ্যে গোঙানির সুরে বুড়ো বলল, 'হুঁ, ছোটো বিটার এট্টা ছেল্যা হয়ে-ছিলো। তা, পরে মরে গেল গো, বাবু। এই সিদিনে, ছ'মাসের ছেল্যা!···'
বুড়ির গলা দিয়ে শব্দ বেরুলো, 'হুঁ-হু-হু···।'
'ও! ওই মেয়েটারই ছ'মাসের ছেলে মরে গেছে। কিন্তু···'
'দুর!' বিরক্ত হয়ে উঠল হরেন। বৃষ্টিটা বেড়েছে। জুতো ভিজে ঢোল। কাপড়ের কোচা দিয়েছে মাথায়। কিন্তু সব সপ্‌সপে হয়ে উঠেছে। বুড়োও যেন বৃষ্টির মতো ঘ্যানঘ্যানানি শুরু করলো।
সে লাফিয়ে-লাফিয়ে আগে গেল। আগে, মাঝ-বয়সীটিকে পার হয়ে তার আসল-টির কাছে। হুঁ। গালের পাশে এখনো সেই হাসিটি লেগে রয়েছে। আড়চোখে দেখছে, আর কেঁপে-কেঁপে উঠছে ভ্রু দু'টি। মন্দার খুনসুটি চায়।
পাশাপাশি দু' হাত ফারাকে এসে পড়লো হরেন। হাঁপিয়ে পড়ছে আসতে। বলল 'কির‍্যা বউ, তু যে ঘোড়ায় জিন দিইছিস্‌!'
মেয়েটি চকিত চোখে একবার তাকিয়ে দেখলো হরেনের আপাদমস্তক। দেখে আরো হাসি পেলো। পাওয়ার মতো চেহারাই দেখাচ্ছে হরেনের। ভেজা জামা লেপটে, একটুখানি শরীরটা দুমড়ে গেছে যেন। কিন্তু চোখ জ্বলছে দপ্‌দপ্‌। জ্বলছে রক্তের মধ্যে। পথচলা আর দুর্যোগকে কাবু করে দিচ্ছে। তবু নিজের রক্তে-রক্তে মেয়েটার হাসির কাঁপুনিটা অনুভব করছে। পশ্চিমে ছাট জলের। টোকার

তলা দিয়ে জলের ছাটে এক বুকের কাপড় ভিজিয়ে দিয়েছে। ভিজে-ভিজে যেন আরো তীব্রভাবে সব খুলে দিয়েছে রেখায় রেখায়। রেখার বাঁকে-বাঁকে অস্পষ্ট বিদ্যুতের মতো রুপোর বিছে-হারটির শেষ দেখা যাচ্ছে। খেয়াল নেই, টানা-গোছার সময়ও নেই। শুধু টেপা ঠোঁটের কোণে-কোণে, টানা-চোখের আঙিনায় কী যেন খেলে বেড়াচ্ছে। রং খেলছে। রং চায়। কিন্তু মেয়েটার সঙ্গে পাল্লা দেওয়া শক্ত। দু'হাত ফারাক। দেড়-হাত ফারাক করলো হরেন। ওই আকাশের মেঘের মতো মেয়েটার নিটোল পেশী দুলে-দুলে যেন নেমে আসছে হরেনের চোখের সামনে। চোখের সামনে, বিদ্যুৎ ঝিলিক দিচ্ছে শরীরের উঁচু নিচু বাঁকে।

দারুণ বাতাস এলো পলাশবনের মাথা দুলিয়ে। আকাশে আচমকা বিদ্যুতের কাটাকাটি ধাঁধিয়ে দিলো চোখ। যেন অনেকগুলো খ্যাপা কুকুর তীব্র চিৎকারে মাতামাতি শুরু করলো। চোখের নজর হারিয়ে গেল হরেনের। সামনে শুধু জলের ধারা। সেই সঙ্গে অস্ফুট হাসির শব্দ।

বুড়োর গলা শোনা গেল, 'সামলে গো। সামলে চলো। আবার জোর লেমেছে। সামনে কিন্তুক লদী।'

নদী আছে। হরেন দেখলো, সে সকলের পিছনে। ছায়ার মতো চারজনের দলটা তার আগে-আগে। সে মনে-মনে বললো, 'এঃ শালা, মরতে হবে নাকি? বৃষ্টির ঝাপটা তাকে যেন বুকে চেপে ঠেলে দিচ্ছে পিছনে।

পরনের কাপড়টি সে হাঁটুর চেয়েও এক বিঘৎ ওপরে তুলে ফেললো। তার সরু পায়ে জুতো-জোড়া যেমন বড়ো, তেমনি ভারি দেখাচ্ছে।

রাস্তা বদলে গেছে। পাথর ছড়ানো রাস্তা। বড়ো-বড়ো চাংড়া, খোঁচা-খোঁচা হয়ে ছড়িয়ে আছে। তারই আশপাশ দিয়ে যেতে হবে। হরেনের চেয়েও বড়ো-বড়ো পাথর। যেন হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়ে থমকে আছে। মাথা ঠুকলে রক্তপাত নিশ্চিত। আর এরই তলে-তলে পাঁক।

সামনে নদী। ছ'হাত চওড়া নদী। এখন কোমর জল। অন্য সময় পায়ের পাতা ডোবে না। কিন্তু কোমর-জলেই যা টান। ব্যাং ছানার মতো টেনে নিয়ে যেতে চায়। তোড়ের মুখে হাসছে খল্‌খল্‌ করে।

মেয়েটাও হাসছে। জলের নিচে পাথরে হোঁচট্ খেয়ে একেবারে ডুব দিয়ে উঠেছে, তাই হাসছে। সে হাসিতে নদীর হাসিও চাপা পড়ে যায়।

হরেন পার হলো। বুড়ি তখন ছোবড়া পাকাচ্ছে। বুড়ো টোকার তলায় কলকে সাজাচ্ছে।

হরেনের চোখ তখন আধ-খোলা। দেখলো মেয়েটার গায়ে কাপড় নেই। রক্তের জ্বালায় না জলের ঝাপ্‌টায়, কে জানে, তার কাঁপন ধরলো। কাপড় নেই নয়, আছে। না থেকে আছে। জলে ডুবে উঠেছে। কালো শরীর ছাপিয়ে উঠে ঝিলিক্ হানছে। কাপড় উঠেছে হাঁটু অবধি, পিঠ গেছে খুলে। কাছে যাবার জন্যে ব্যাং-এর মতো লাফাতে লাগলো হরেন। মাঝ-বয়সীকে কী যেন বলছে মেয়েটি। ফিরে ফিরে দেখছে হরেনকে আর বৃষ্টিধারার মতো মরছে হেসে।

আবার, আবার আসছে মুষলধারে। হরেন তবু কাছে গেল মাঝ-বয়সীকে জিগ্যেস

করলো. 'তোরা হাসছিস যে ?'

মাঝ-বয়সী এতক্ষণে বলল, 'ক্যানে ? তুমাকে দেখে, ক্ষ্যামতা।নেই, আসতে ক্যানে গেলে।'

হরেন হাঁপিয়ে-হাঁপিয়ে জবাব দিলো, 'ক্যানে, এই তো চলছি।'

তার হাঁপ-ধরা দেখে ওরা দু-জনেই হেসে উঠল। মেয়েটা আবার কাছাকাছি; চোখে বিদ্যুৎ হেনে হেসে বলল, 'সামনে লিদেন আসছে যে।'

নিদেন। বুকেরমধ্যে ঠক্‌ঠক্‌ করে কাঁপতে লাগলো হরেনের। মরণ আসছে তার সামনে। তার পিঠের শিরদাঁড়ার কাছে কি যেন নামছে হিল্‌হিল্‌ করে।

মেয়েটা আরও কাছে। ওর বৃষ্টি-ধোয়া গায়ের গন্ধ লাগছে তার নাকে। ওর নিচে-ওপরে, বিশাল শরীরের প্রতিটি পেশীর পেষণ-শব্দও যেন কানে আসছে হরেনের। যেন রং চায় ওর প্রতি অঙ্গ।

কিন্তু রংটা ঘোলা হয়ে উঠেছে হরেনের চোখে। পাঁক বাড়ছে। নিশিরাইয়ের কাছে আসা গেল। বুড়োও চেঁচিয়ে বলল, 'নিশিআই আসলো, গো। আর একটু পা চালাও।'

নিশিরাই। হরেনের দাঁতে দাঁত লাগছে ঠক্‌ঠক্‌ করে। শীত ধরেছে হৃৎপিণ্ডে। বিদ্যুৎ-কষায় লাল তেপান্তর দগ্‌দগে ঘায়ের মতো লাগছে চোখে। তালের পাতায় চাপা তীব্র সুরে গোঙাচ্ছে বাতাস। যেন পেত্নী কাঁদছে।

ওরা মুখ বুজে চলেছে এবার। ওদেরও নিশ্বাস হয়েছে ঘন-ঘন। থ্যাবড়া পায়ে মাটি থ্যাঁতলাচ্ছে।

মেয়েটা কোথায় উধাও হয়ে গেল। ওই, ওই যাচ্ছে। পায়রা নয়, নাগিনীর মতো লক্‌লক্‌ করে চলেছে। আর মনে হচ্ছে, তার হৃৎপিণ্ড উঠে আসছে গলা দিয়ে। উঠে আসছে আর নিচের থেকে অবশ হয়ে যাচ্ছে শরীর। অবশ, অবশ একেবারে। আবার বাজ হানলো কক্কড় শব্দে। একেবারে অন্ধকার হয়ে গেল হরেনের চোখ। শালিকের প্রাণ খাবি খাচ্ছে। পাঁকে মুখ থুবড়ে পড়লো সে।

'আ হা হা···'

বুড়োটা সস্নেহে সভয়ে চিৎকার করে উঠল। বুড়ো-বুড়ি ছুটে এলো। তারপরে মাঝবয়সী। তার পেছনে সংশয়ান্বিত পায়ে-পায়ে এলো মেয়েটা।

বুড়ো বসে ডাক দিলো, 'আ-হা-হা। উঠো, উঠো গো বাবু। বলছিলাম তখন।'

ওঠে না হরেন। জলে ভিজে-ভিজে, হাড় কেঁপে অচৈতন্য হয়েছে। বুড়ো বলে উঠলো, 'হে ভগবান। ইয়ার জ্ঞান লাই যে গো।'

জ্ঞান নেই। কে টেনে তোলে ? বুড়ো-বুড়ি কাহিল। মাঝ-বয়সী রুগ্ন। মেয়েটাই টেনে তুললো। তুলে নিয়ে গেল একটা মহুয়ার তলায়। বুড়ো অসহায়ের মতো তাকালো পশ্চিমে। এখনো দেড় ক্রোশ। উই দূরে, পাহাড়টা গেছে আরো সরে। তার নিচে একটি কাল্‌চে রেখা। ওইটে অলাটি। অর্থাৎ রলাটি।

হরেন কাঁপছে থর্‌থর্‌ করে। কাঁপছে আর লালা গড়াচ্ছে ঠোঁটের কষ দিয়ে।

বুড়ি বলল, 'বউ, নোকটার কাঁপন লেগেছে যে ? বাঁচবে তো ? মেয়েটির চোখেও অসহায়তা। তার টানা চোখে ভয় ও ব্যথা। বলল, 'তা—ই তো। আগে শুখ্‌না

কাপড় একখান দেও এখন।'

বুড়ি তাই দিলো বোঁচকা খুলে। মেয়েটি তার কোলে টেনে নিয়ে বসেছে হরেনকে। ভেজা জামা ছাড়িয়ে, মাথা মুছিয়ে শুকনো কাপড় জড়ালো তাকে। নিজের টোকাটি দিল হরেনের মাথায় ঢেকে। মাঝ-বয়সী তার টোকাটি দিল হরেনের গায়ে। বৃষ্টি তো বন্ধ নেই।

তারপর কোলের ছেলেকে যেমন করে বলে তেমনি সস্নেহ গলায় বলল, 'ইয়ার বড়ো বাড়াবাড়ি। আমরা যেছি অলাটি, তো খবর দিতুম নি? তা ই নোকের বড়ো বাড়াবাড়ি।' বলতে-বলতে হেসে ফেললো মেয়েটি। স্নেহ-করুণ হয়ে উঠল চোখ। সেই চোখে সে দেখলো হরেনের আপাদমস্তক। চোখাচোখি করলো মাঝ-বয়সীর সঙ্গে।

বুড়ো বলে উঠলো, 'হুঁ। নোকটাকে তু বাঁচা গো, বউ। ই বুড়োহাড়ে তো ক্ষ্যামতা লাই।'

মেয়েটা বললো, অ মা! তবে কি মেরে ফেলছি নাকি গো। বাপ-মায়ের ছেল্যা তো এট্টা।'

'হুঁ। বাপ-মায়ের ছেল্যা।'

হঠাৎ এই বর্ষণ মুখরিত রুক্ত তেপান্তরের খাড়াই-উৎরাই কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। তালপাতার বাতাসে গুমরে-গুমরে উঠল কান্না। বাবলা ঝাড় বাতাসে মাটির বুক ভরে নুয়ে-নুয়ে পড়তে লাগলো।

'ছোটো বিটার ছ' মাসের ছেল্যাটার শোক চারুটে বুকে পাথর হয়ে জমে আছে। সে তো বাপ-মায়ের ছেলে ছিলো।'

মেয়েটা দুহাত দিয়ে সাপটে ধরলো হরেনের অচৈতন্য মুখ, 'ই কি বাড়াবাড়ি বাপু তোমার, অ্যাঁ? মানুষের জীবন, সে কি ছেলেখেলার জিনিস। ছেলেখেলা করতে এসে মানুষ এমনি করে মরণ ডাকে!'

হঠাৎ আবার কেঁপে উঠল হরেন। হাত-পা খিঁচিয়ে থরথরিয়ে উঠল সর্বাঙ্গ।

'এ্যাই, এ্যাই দেখো ক্যানে, কান্ডো।'

সভয়ে বলতে-বলতে মেয়েটি বুকের কাছে আরো আঁকড়ে নিলো হরেনকে।

বুড়োও কাঁপছে। যতো না জলে, তার চেয়ে বেশি ভয়ে। বলল, 'তোরা থাক ইখেনে। আমি যেছি। যেয়ে গাড়ি পাঠায়ে দিই।'

মেয়ে বলে উঠল, 'হুঁ, তুমি যাও গো, বাবা, ই তো ভালো বুঝি না।'

বুড়ো চলে গেল। মাঝ-বয়সী বললো মেয়েটিকে, 'গরম করতে হবে। শরীরে কিছু নাই।'

মেয়েটি আরো বুকে চেপে ধরলো। মাঝ-বয়সী বলল 'আ, দুর মরণ। বুকের ভিজা কাপড়টা ক্যানে চাপছিস। আরো জল নাগছে যে মুখে! কাপড় সরা। লজ্জা কিসের? বাপ-মায়ের ছেল্যাটা। বুকের ওম্ পেলে গরম হবে।'

মেয়েটি কাপড় সরিয়ে দিলো। কড় কড় করে বাজ হানলো। সাপিনীর মতো বিদ্যুৎ ঝিলিক দিয়ে নেমে এলো মাটিতে। কিন্তু আকাশের সব ভয় সমারোহ এখানে কেমন শান্ত ও দৃঢ় হয়ে উঠেছে। তাকে আড়াল করে মানুষ মানুষের

মৃত্যু-শীতকে তপ্ত করছে। মেয়েটার বুকে ওর ছেলেটার দাগ রয়েছে এখনো। হরেনকে ওর উত্তাপের চাপে-চাপে গরম করতে লাগলো। একটু-একটু করে অনেক-ক্ষণ ধরে।

যেন একটুখানি ছেলে, সবটুকু কোলে ধরা যায়।

এবার সত্যিকারের অন্ধকার নামছে। মেঘ তাকে গাঢ় করছে। এখনো গরাইয়ের সেই মানুষডোবা রক্ত-পাঁক পার হতে হবে।

হঠাৎ মেয়েটা চমকে উঠল। বিছের মতো সুড়সুড় করে কি যেন উঠে এসেছে তার বুকে, কোমরের আশপাশে। দেখলো চোখ চেয়েছে হরেন। যেন স্বপ্ন দেখছে, এমনি বিস্ময়। যেন সেই বিস্ময়ের ঝোঁকেই আর একবার কেঁপে উঠল সে বিস্ফারিত চোখে আর একবার দেখে হিংস্র চোখে হেসে উঠল সে। মুহূর্তে সরু-সরু দুটো হাত দিয়ে মুঠো করে আঁকড়ে ধরলো মেয়েটাকে।

মেয়েটা প্রথমে হরেনের জ্ঞান দেখে হেসে উঠল। হাত দুটো সরিয়ে দিলো গায়ের ওপর থেকে। পরমুহূর্তেই হরেনের সেই রুগ্ন ছোটো মুখটার হিংস্রতা দেখে থমকে গেল। রক্তের মধ্যে সেই আগের দর্প পেয়ে হরেন প্রাণপণে হাত প্রবেশ করিয়ে দিলো মেয়েটার দু হাতের তলা দিয়ে। মুখ তুলে আনতে চেষ্টা করলো ওপরে।

দপ্‌দপ্ করে জ্বলে উঠল মেয়েটার টানা চোখ। তার বলিষ্ঠ নিটোল হাতের এক ঝট্‌কায় ছিট্‌কে ফেলে দিলো হরেনকে। বললো, 'আ মরণ, কেন্নোর মরণ গো!' বলে, সেই ক্রুদ্ধ মুখেও হেসে উঠল মেয়েটি, 'ই আর বাঁচবে নি দেখছি, গো।'

বিদ্যুৎ চমকে, দিকে-দিকে, উঁচু-নিচু তেপান্তর যেন হাসছে রক্তাক্ত মুখে। আর তালের সারি যেন অশরীরী ছায়ার মতো পায়ে-পায়ে আসছে এখানে এগিয়ে।

হরেনের গায়ে এমনিতেই কাদা মাখামাখি। আবার কাদা লাগলো। পাঁক থেকে মুখ তুলে কিছু একটা বলার উদ্যোগ করলো। চোখ তার তখনো মেয়ে-বুকের উত্তাপে চক্‌চক্ করছে।

এমন সময় ওপরের চড়াই থেকে হাঁক শোনা গেল বুড়োর। বলদের ঘণ্টা শোনা গেল। গাড়ি আসছে।

গাড়ি এলো, গদাই রায়ের ছেলেটাকে তুললো। তুলে চললো।

এতক্ষণে শরীরের যন্ত্রণায় হরেনের চোখে একটি নোনা-ধরা চোঁয়াচ্ছে।

বৃষ্টি তখনো তেমনি। ওরা চারজন গাড়ির আগে চললো। মেয়েটির চোখ যেন হঠাৎ রুদ্ধ অভিমানে দুরন্ত হয়ে উঠল। বুকের কাপড়টি কষে টেনে দিলো সে। ওদের পেছনে বৃষ্টির শব্দের মধ্যে গাড়ির চাকা দুটো ক্যাঁকাচ্ছে। ক্যাঁকিয়ে কাঁদছে।

প্রাণ পিপাসা

এক কৃষ্ণপক্ষের দুর্যোগময়ী রাতের কথা বলছি।

দুর্যোগটা হঠাৎ মেঘ করে হাঁক ডাক দিয়ে বিদ্যুৎ চমকে মুষলধারে দু-এক পসলা হয়ে যাওয়ার মতো নয়। একঘেয়ে রুগ্ন গলার কান্নার মতো কয়েকদিন ধরে অবিরাম ঝরছেই বৃষ্টি, তার সঙ্গে পুব হাওয়ার একটানা ঝড়। শহরতলির বড় সড়কটি ছাড়া আর সব কাঁচা গলিপথগুলো সুদীর্ঘ পাঁক-ভরা নর্দমা হয়ে উঠেছে। দুর্গন্ধ আর আবর্জনায় ছাওয়া। অসংখ্য বাড়ির ভিড়, ঠাসা, চাপাচাপি।

পথ চলছিলাম রেল-লাইনের ধারে মাঠের পথ দিয়ে। কিন্তু ভিজে ভিজে শরীরের উত্তাপটুকু আর বাঁচে না। হাওয়াটা মাঠের উপর দিয়ে সরাসরি এসে কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল শরীরটা। রীতিমত দাঁতে দাঁতে ঠোকাঠুকি হচ্ছে। বেগতিক দেখে বাঁয়ে মোড় নিয়ে শহরের মধ্যে ঢুকে পড়লাম। অন্তত হাওয়ার ঝাপটাটা কম লাগবে তো!

একটা নিস্তব্ধ ঝিমিয়ে-পড়া ভাব চটকল-শহরটার। যেন কাজ এবং চাঞ্চল্য সবটুকু এই অবিরাম বৃষ্টি ভিজিয়ে ন্যাতা করে দিয়েছে। কুকুরগুলো অন্যদিন হলে বোধহয় তেড়ে এসে ঘেউ ঘেউ করত। আজ দায়সারা-গোছের এক-আধবার গরর গরর করে গায়ের থেকে জল ঝাড়তে লাগল। গেরস্তদের তো কোনো পাত্তাই নেই। কোনো জানলা-দরজায়, একটি আলোও চোখে পড়ে না। রাস্তার আলো-গুলো যেন কানা জানোয়ারের মতো স্তিমিত এক চোখ দিয়ে তাকিয়ে আছে, কিন্তু অন্ধকার তাতে কমে নি একটুও।

রাস্তাটা ঠিক ঠাওর করতে পারছি না, তবে উত্তর দিকেই চলেছি তা বুঝতে পারছি। একটা ধার ঘেঁষে চলেছি রাস্তার। নিচু রাস্তা, জল জমেছে। কোনোও বারান্দায় যে উঠে রাতটা কাটিয়ে দেব তার কোনো উপায়ই নেই। কারণ বারান্দা বলতে যা বোঝায়, এখানে সে-রকম কিছু ঠিক চোখেও পড়ছে না আর বস্তিগুলোর অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে, ভেতরের ঘরগুলোও বোধহয় শুকনো নেই। তা ছাড়া, অবস্থাটা তো নতুন নয়। জানা আছে, সেখানে শুয়ে পড়লে লোকজনেও নানান কথা বলতে পারে। পুলিসের বেয়াদপি তো আছেই তার উপর।

যেতে হবে নৈহাটি রেল-কলোনির এক বন্ধুর কাছে। অন্তত কয়েকটা দিনের খোরাক, শুকনো কাপড় একখানি আর এমন বিদঘুটে প্যাচপেচে ঠান্ডা রাতটার জন্য একটু আশ্রয় তো পাওয়া যাবে। কিন্তু এখন দেখছি আড্ডা ছেড়ে না বেরুনোই ভালো ছিল। তবে উপায় ছিল না। বিশেষ করে, কয়েকদিন আগে আমাদের আড্ডার হা-ভাতে বন্ধুদের মধ্যে একজন মরে গেল, তখন থেকেই একটু নিশ্বাস

নেওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়ব ভাবছিলাম। বন্ধুটির মরা হয়তো ভালোই হয়েছে। তা ছাড়া আর কী হতে পারত ; আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না। বাঁচার জন্য যা দরকার তার কিছুই তো ছিল না, তবু বুকটার মধ্যে···যাক। ওটা কোনো কথা নয়। কিন্তু সে আমাকে একটা জিনিস দিয়ে গেছে, ছোট্ট জিনিস অথচ মনে হয় পর্বতপ্রমাণ তার ভার আর কষ্টকর। বোঝাটা হলো···

আরে বাপ রে, হাওয়াটা যেন শিরদাঁড়াটার ভিত ধরে নাড়া দিয়ে গেল। জলটাও বেড়ে গেল হঠাৎ। এতক্ষণ পরে মেঘের গড়গড়ানিও যাচ্ছে শোনা। এবার আর দাঁত নয়, রীতিমতো হাড়ে ঠোকাঠুকি লাগছে। গাছের মরা ডালের মতো ভিজে একেবারে ঢোল হয়ে গেছি। এসে পড়লাম একটা চৌরাস্তার মোড়ে, চটকলের মাল চালানের রেল সাইডিংয়ের পাশে। জায়গাটা একটু ফাঁকা। কাছাকাছি একটা মোষের খাটাল দেখে ঢুকব কি না ভাবতে ভাবতে আর-একটু এগোতেই হঠাৎ একটা ডাক শুনতে পেলাম, এই যে, এদিকে।

না, অশরীরী কিছু বিশ্বাস না করলেও ভয়ানক চমকে উঠলাম। আমাকে নাকি ? জলের ধারা ভেদ করে গলার স্বরের মালিককে খুঁজতে লাগলাম। ডান দিকে একটা মিটমিটে আলোর রেশ চোখে পড়ল আর আধ-ভেজানো দরজায় একটা মূর্তি। হ্যাঁ, মেয়েমানুষ। তা হলে আমাকে নয়। এগুচ্ছি। আবার : কই গো, এসই না।

দাঁড়িয়ে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, আমাকে ?

জবাব এলো, তা ছাড়া আর কে আছে পথে ?

কথার রকমটা শুনে চমকে উঠলাম। ও! এতক্ষণে ঠাওর হলো পথটা খারাপ। ঠিক বেশ্যাপল্লী নয়, তবে একরকম তাই, মজুর-বস্তিও আছে আশেপাশে ধার ঘেঁষে।

আমি মনে মনে হাসলাম। খুব ভালো খদ্দেরকে ডেকেছে মেয়েটা! তাই ভেবেছে নাকি ও ? কিন্তু সত্যি, এ সময়টা একটু যদি দাঁড়ানোও যেত ওর দরজাটায়। তবু আমাকে যেতে না দেখে মেয়েটা বলে উঠল, কী রে বাবা, লোকটা কানা নাকি ?

মনে মনে হেসে ভাবলাম, যাওয়াই যাক না। ব্যাপার দেখে নিজেই সরে পড়তে বলবে। আর কোনোরকমে বৃষ্টির বেগটা কমে আসা পর্যন্ত যদি মাথার উপরে একটু ঢাকনা পাওয়া যায়, মন্দ কী! এমনিতেও নৈহাটি দূরের কথা, মোষের খাটালের বেশী কিছুতেই এগোনো চলবে না। আপনি বাঁচলে বাপের নাম-প্রবাদে যারা বিশ্বাস করে না তারা এ রকম অবস্থায় কখনও পড়ে নি।

উঠে এলাম মেয়েটার দরজায়। একটা গতানুগতিক সংকোচ যে না ছিল তা নয়, বললাম, কেন ডাকছ ?

কোন্ দেশী মিন্‌সে রে বাবা!—হাসির সঙ্গে বিরক্তি মিশিয়ে বলল সে, ভিতরে এস না।

আমি ভিতরে ঢুকতেই সে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বৃষ্টির শব্দটা চাপা পড়ে গেল একটু। হাওয়া আসবার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু দেখলাম, এ ঘরের মেঝেও

টালির ফাঁক দিয়ে জল পড়ে ভিজে গেছে। তক্তপোশের বিছানাটা ভেজে নি।
ঘরের মধ্যে আছে দু-চারটে সামান্য জিনিস, থালা গেলাস কলসি।
কোথায় মরতে যাওয়া হচ্ছে দুর্যোগ মাথায় করে? এমনভাবে বলল সে, যেন আমি তার কতকালের কত পরিচিত।
বললাম, অনেক দূরে, কিন্তু—
বুঝেছি।—মুখ টিপে হাসল সে: ঘরটা তুমি একেবারে কাদা করে দিলে। এগুলো ছেড়ে ফেলো জলদি।
ঠান্ডায় আর আচমকা ফ্যাসাদে রীতিমতো জমে যাওয়ার যোগাড় হলো আমার। বললাম, কিন্তু এদিকে—
সে বলে উঠল, কী যে ছাই পরতে দিই! ভেজা জামাটা খুলে ফেলো না।
ফেলতে পারলে তো ভালোই হয়। কিন্তু…গলায় একটু জোর টেনে বলেই ফেললাম, মিছে ডেকেছ, এদিকে পকেট কানা।
এবার মেয়েটা থমকে গেল। যা ভেবেছি তাই। হাঁ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল সে খানিকক্ষণ। যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। জিজ্ঞেস করল, কিছু নেই?
তার সমস্ত আশা যেন ফুৎকারে নিবে গেছে, এমন মুখের ভাবখানা।
বললাম, তা হলে আর দুর্যোগ মাথায় করে পথে পথে ফিরি?
মেয়েটা অসহায়ের মতো চুপ করে রইল। এ তো আমি আগেই জানতাম। কিন্তু মেয়েটা এখানে ব্যবসা করতে বসেছে, না, ভিক্ষে করতে বসেছে! আমি দরজাটা খুলতে গেলাম।

পেছন থেকে জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাবে এখন?
বললাম, ওই মোষের খাটালটায়। দরজাটা খুলে ফেললাম। ইস! হাওয়াটা যেন আমাকে হাঁ করে খেতে এলো। পা বাড়িয়ে দিলাম বাইরে।
মেয়েটা হঠাৎ ডাকল পেছন থেকে, কই হে, শোন। রাত্তিরটা থেকেই যাও, ডেকেছি যখন। একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, কপালটাই খারাপ আমার।
বললাম, কেন, কপালটা ভালো থাকুক তোমার, আমি খাটালেই যাই।
যা তোমার ইচ্ছে। হতাশভাবে বসে পড়ল সে তক্তপোশে: আজ তো আর কোনো আশাই নেই।
ভাবলাম, মন্দ কী? এই দুর্যোগে এমন আশ্রয়টা যখন পাওয়াই যাচ্ছে, কেন আর ছাড়ি। কিন্তু মেয়েমানুষের সঙ্গে রাত কাটানোটা ভারি বিশ্রী মনে হলো। কেননা, এটা একেবারে নতুন আমার কাছে। অবশ্য মেয়েমানুষ সম্পর্কে আমার আগ্রহ এবং কৌতূহল তোমাদের আর-দশজনের চেয়ে হয়তো একটু বেশীই আছে। তা বলে এখানে? ছি-ছি! সে আমি পারব না।…তবে ওর সঙ্গে না শুয়েও রাতটা কাটিয়ে দেওয়া যায়। ভেতরে ঢুকে দরজাটা আবার বন্ধ করে দিলাম।
লম্বা ছেয়ালো গড়ন মেয়েটার। মাজা মাজা রঙ। গাল দুটো বসা, বড় বড় চোখ দুটো অবিকল কচিঘাস-সন্ধানী গরুর চোখের মতো। ওই চোখে মুখে আবার

রঙ কাজল মাখা হয়েছে। মোটা ঠোঁট দুটোর উপরে নাকের ডগাটা যেন আকাশ-মুখো।

খুঁজে খুঁজে সে আমাকে একটা পুরনো সায়া দিল পরতে, বলল, এইটে ছাড়া কিছু নেই।

সায়া! হাসি পেল আমার। যাক, কেউ তো দেখতে আসছে না, কিন্তু—ধক্ করে উঠল আমার বুকটার মধ্যে। তাড়াতাড়ি পকেটে চাপ দিলাম আমি। মরবার সময় আমার বন্ধু যে ছোট্ট জিনিসটা পর্বতের বোঝার মতো চাপিয়ে দিয়ে গেছে সেটা দেখে নিলাম। জিনিস নয়, একটা রক্তের ডেলা। হ্যাঁ, রক্তের ডেলাই। ভীষণ সংশয় হলো আমার মনে। তীক্ষ্ন দৃষ্টিতে মেয়েটার দিকে তাকালাম। সে তখন পিছন ফিরে জামার ভিতরের বডিস্ খুলছে। বললাম, কিছু কিন্তু নেই আমার কাছে, হ্যাঁ!

কবার শোনাবে বাপু আর ওই কথাটা?—সে হতাশভাবে বলল।

হ্যাঁ বাবা।—বললাম, বলে রাখা ভালো। তবে আমার কোনো ইচ্ছে নেই কিছু। খালি মুসাফিরের মতো রাতটা কাটিয়ে দেওয়া।

মেয়েটা ওর গরুর মতো চোখ তুলে একদৃষ্টে দেখল আমাকে। বলল, কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে?

তা বটে। আমি সায়াটা পরে নিলাম। কিন্তু খালি গায়ে কাঁপুনিটা বেড়ে উঠল। বাইরে জল আর হাওয়ার শব্দ দরজাতে বেশ খানিকটা আলোড়ন তুলে দিয়ে যাচ্ছে।

মেয়েটা আমার দিকে তাকিয়ে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে একপ্রস্ত হেসে নিয়ে একটা পুরনো শাড়ি দিলে ছুঁড়ে। নাও, গায়ে জড়িয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

বলে আমার জামা কাপড় দড়িতে ছড়িয়ে দিল। বলল, একটু আসিয়ে যাবে'খন।

আরাম জিনিসটা বড় মারাত্মক, বিশেষ এ-রকম একটা দুরবস্থার মধ্যে। আমি প্রায় ভুলেই গেলাম যে, আমি একটা বাজারের মেয়েমানুষের ঘরে আছি। বললাম, পেটটা একেবারে ফাঁকা দুদিন ধরে, তাই এত কাবু করে ফেলেছে জলে।

সে কোনো জবাব দিল না। হাঁটুতে মাথা গুঁজে বসে রইল। বললাম, তা হলে শোয়া যাক!

সে মুখ তুলল। মুখটা যন্ত্রণাকাতর, তার সুস্পষ্ট বুকের হাড়গুলো নিশ্বাসে ওঠানামা করছে। বলল, খাবে? ভাত চচ্চড়ি আছে।

ভাত চচ্চড়ি? সত্যি, এটা একেবারে আশাতীত। ভাতের গন্ধেই যার অর্ধেক পেট ভরে, তার সামনে ভাত! জিভটাতে জল কাটতে লাগল আর পেটটা যেন আলাদা একটা জীব। ভাত কথাটা শুনেই ভেতরটা নড়ে চড়ে উঠল। কিন্তু—

সে ততক্ষণ এনামেলের থালায় ভাত বাড়তে শুরু করেছে। দেখে আমার মনের সংশয়টা আবার বেড়ে উঠল। আমি দড়ির উপর থেকে জামাটা তুলে নিলাম তাড়াতাড়ি। গতিক তো ভালো মনে হচ্ছে না। সন্ত্রস্ত হয়ে বললাম, ভাতের পয়সা-টয়সা কিন্তু নেই আমার কাছে।

গরুর মতো চোখ দুটোতে এবার বিরক্তি দেখা গেল। বলল, মোষের খাটালই

তোমার জায়গা দেখছি। কবার শোনাবে কথাটা!

সুখের চেয়ে স্বস্তি ভালো। হতভাগা মরবার সময় এমন জিনিসই দিয়ে গেল, এখন সেই বোঝা নিয়ে আমার চলাই দায়। রাখাও বিষ, ছাড়াও বিষ। বাইরে পড়ে থাকলে এ বোঝাটার কথা হয়তো মনে থাকত না। সে আবার বলল, মানুষের সঙ্গে বাস কর নি তুমি কখনও?

শোন কথা! তাও আবার জিজ্ঞেস করছে কারখানা বাজারের মেয়েমানুষ! বললাম, করেছি, তবে তোমাদের মতো মানুষের সঙ্গে নয়।

সে নিশ্চুপ তাকিয়ে রইল আমার দিকে খানিকক্ষণ। তারপর বলল, রয়েছে যখন খেয়ে নাও, নইলে নষ্ট হবে। ভেবে দেখলাম তাতে আর আপত্তি কী? বিনা পয়সার ভাত। আর দেখছেই বা কে! জামাটা হাতে গুটিয়ে নিয়ে গপ-গপ করে ভাত খেয়ে নিলাম, তারপর এক ঘটি জল। এ-রকম বাড়া ভাত খেয়ে ব্যাপারটা আমার কাছে চূড়ান্ত বাবুগিরি বলে মনে হলো আর সেই জন্যই সংশয়টা বাঁধা রইল মনের আষ্টেপৃষ্ঠে।

তারপর শোয়া। সে এক ফ্যাসাদ। আমি শুয়ে পড়ে জিজ্ঞেস করলাম, তুমি শোবে কোথায়? সে নিরুত্তরে আমার দিকে তাকিয়ে খসা-ঘোমটাটা টেনে দিল। তা হলে তুমি শোও আমি বসে রাতটা কাটিয়ে দিই।—আমি বললাম।

সে পাশতলার দিকে বসে বলল তুমিই শোও, আমি তো রোজই শুই। একটা রাত তো। ডেকেছি যখন···

বলতে বলতে আমার হাতের মুঠির মধ্যে জামাটা দেখে সে দড়ির দিকে দেখল। তারপর আমার দিকে। আমিও তাকিয়েছিলাম। বলল, জামাটা ভেজা যে।

হোক তাতে তোমার কী?

চুপ করে গেল সে। শরীরটা আরাম পেয়ে আমার মনে হলো সিটনো তন্ত্রীগুলো স্বাভাবিক সতেজ ও গরম হয়ে উঠেছে। বাইরের যে জল হাওয়া আমাকে এতক্ষণ মেরে ফেলতে চেয়েছিল, তারই চাপা শব্দ যেন আমার কাছে ঘুমপাড়ানি গানের মতো মিষ্টি মনে হলো। চোখের পাতা ভারী হয়ে এলো বেশ।

ওর দিকে তাকিয়ে দেখলাম। তেমনি বসে আছে। চোখের দৃষ্টিটা ঠিক কোন্ দিকে বোঝা যাচ্ছে না! অত্যন্ত ক্লান্ত আর একটা চাপা যন্ত্রণার আভাস তার চোখে। কী জানি! এদের নাকি আবার ঢঙের অভাব হয় না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়ব তখন—

নাঃ, হতভাগার এ জিনিসটার একটা ব্যবস্থা আমি কালকেই করে ফেলব। কী দরকার ছিল মরবার সময় আমাকে এটা দিয়ে যাওয়ার? একটা রক্তের ডেলা। রক্তের ডেলাই তো! ঘামের গন্ধে ভরা ছোট্ট ন্যাকড়ার পুঁটলিটা। একটা রাক্ষুসে খিদে-খিদে গন্ধও আছে। ছোঁড়া মরতে মরতে মুখের কষ-বওয়া রক্ত চেটে নিয়ে বলে-ছিল, এটা তুই রাখ্।

এমনভাবে বলেছিল কথাটা যে, আজও মনে করলে বুকটার মধ্যে—যাক সে

কথা।
মেয়েটা তখনও ওইভাবে বসে আছে দেখে হঠাৎ বলে ফেললাম, তুমিও শুয়ে পড়ো খানিকটা তফাত রেখে।
সে আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। বলল, ছিষ্টিছাড়া মানুষ বাবা!
তারপর শুয়ে পড়ল।
আমার শরীরটা তখন আরামে রীতিমতো ঢিলে হয়ে এসেছে। আর মেয়েমানুষের গা যে এত গরম তা মেয়েটার কাছ থেকে বেশ খানিকটা তফাতে থেকেও আমি বুঝতে পারলাম। কী অদ্ভুত রাত আর বিচিত্র পরিবেশ। লোক দেখলে কী বলত! ছি-ছি! কিন্তু এতখানি আরাম, আমার দুস্থ ক্লান্ত শরীরে এতখানি সুখবোধ আর কখনও পেয়েছি কি না মনে নেই। ঘুমে ঢুলে আসছে চোখ। কিন্তু—
নাঃ, তা হবে না। সেই বন্ধুটির কথা বলছি। হতচ্ছাড়া মরবার সময় বলে গেল পুঁটলিটা দিয়ে, আমার রক্ত।
বললাম, রক্ত কিসের?
চোখের জল আর কষের রক্ত মুছে বলল, আমার বুকের। না খেয়ে খেয়ে রোজ—
বলতে বলতে রক্তশূন্য অস্থির আঙুলগুলো দিয়ে হাতড়াতে লাগল পুঁটলিটা।
আমি রাগ সামলাতে পারলাম না। বললাম, কিসের জন্য র‍্যা?
বলল, ঘর বাঁধার আশায়।
এমনভাবে বলেছিল কথাটা ফের গালাগালি দিতে গিয়ে আমার গলাটার মধ্যে···
যাক সে কথা।
মেয়েটা একটা যন্ত্রণাকাতর শব্দ করে উঠল।
জিজ্ঞেস করলাম, কী হয়েছে?
সে তাকাল। চোখ দুটো যেন যন্ত্রণায় লাল আর কান্নার আভাস তাতে। বলল, কিছু না।
তার গরম নিশ্বাসে এত আরাম লাগল আমার গায়ে। ঠান্ডা-জমে-যাওয়া গায়ে যেন কেউ তাপ বুলিয়ে দিচ্ছে। মনে হলো হঠাৎ, খুব খারাপ নয় দেখতে। ঠোঁট আর নাকটা যা একটু খারাপ। বোজা চোখের পাতা, বুকে জড়ানো হাত দুটো আর তার নমিত বুক বিচিত্র মায়ার সৃষ্টি করল। সে জিজ্ঞেস করল আমাকে, ঘুম আসছে না তোমার?
আমি ঘুমুব না।—বললাম। মনে মনে ভাবলাম, তা হলে তোমার বড় সুবিধে হয়, না? সেটি হচ্ছে না বাবা। কথা বললেই তো সংশয়টা বাড়ে আমার মনে। তার চেয়ে চুপ করে থাকুক না।
বাইরের তান্ডব তখনও পুরো দমেই চলেছে। টালি-চোয়ানো জলের ফোঁটার শব্দ আসছে মেঝে থেকে, সঙ্গে ছুঁচোর কেত্তন।
সে আবার ককিয়ে উঠল।
কী হয়েছে?

তোমা একটু চুপ করে থেকে বলল, রোগ।
রোগ! কিসের রোগ।
স
সে নীরব।
বল না বাপু।
তবুও নীরব।
আমি হঠাৎ খেঁকিয়ে উঠলাম, বল না কেন রোগটা! যক্ষ্মা কলেরা-টলেরা হলে তাড়াতাড়ি কেটে পড়ি। রোগের সঙ্গে পীরিত নেই বাবা।
সেও হঠাৎ মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল: কার সঙ্গে আছে তোমার পীরিত, শুনি?
তা বটে, পীরিতের কথাই তো ওঠে না এখানে। বললাম, তা বললই না কেন রোগটা।
যা হয় এ লাইনে থাকলে—সে বললে।
লাইনে থাকলে? সর্বনাশ! ভীষণ সিঁটিয়ে গেলাম। ভয়ে ঘৃণায় জিজ্ঞেস করলাম, এর পরও সন্ধ্যারাত্র।
নিশ্চয়ই।
পাঁচজন—সে বলল।
ইস্! কী সাংঘাতিক! বললাম, চিকিচ্ছে করাও না কেন?
পয়সা পাব কোথায়?
কেন, নিজের রোজগার?
সে তো মনিবের পয়সা!
মনিব? এটা কি চাকরি নাকি?
নয় তো কী। মনিবের ব্যবসা, ঘর-দোর জায়গা জিনিস। আমরা আসি খাটতে।
ভয়ানক দমে গেলাম কথাগুলো শুনে। এরা বেশ মজায় থাকে না তা হলে? এও চাকরি! বললাম, মনিব শালাই বা কেমন, চিকিচ্ছে করায় না কেন?
যখন মর্জি হয়। কলের মানুষ রাতদিন কত মরছে, কলের মালিকরা তাদের চিকিচ্ছে করায়?
ঠিক। তার বেদনার্ত শান্ত চোখের দৃষ্টি এবার আমাকে সত্যই দিশেহারা করে তুলল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈনিক প্রাণ দেয়, কিন্তু জীবনের এ কী প্রতিরোধের লড়াই? বললাম, তা হলে…
সে বলল, তা হলে আর কী। মনিবের চোখে ধুলো দিয়ে যেটা রোজগার হয়, তাতে চিকিচ্ছে করাই।
বাঁচতে?—হাসতে গিয়ে মুখটা বিকৃত হয়ে গেল আমার।
সকলেই বাঁচতে চায়।—সে বলল যন্ত্রণায় ঠোঁট টিপে।
ঠিকই। ডাঙায় বাঘ আছে জেনেও মানুষ এ ডাঙাতেই তার বাস ও জনপদ গড়ে তুলেছে। বন্যা, ঝড়, ক্ষুধা, কী নাই। তবু। আর সেই হতচ্ছাড়া চেয়েছিল ঘর বাঁধতে। হ্যাঁ, তবু পুঁটলির প্রতিটি পয়সা রক্তের ফোঁটা! রক্তের ডেলা একটা—এই পুঁটলিটা।
সে বলল, ঘুমবে না?

না, ঘুম নেই চোখে। ওর নিশ্বাস লাগছে। যন্ত্রণার গরম নিশ্বাস। মিঠে ভাপ, তেপে তেপে গনগনে আগুনের মতো মনে হলো। শক্ত করে পুঁটলিসুদ্ধ জামাটা চেপে ধরে উঠে পড়লাম। বাইরে ঝড়-জলের দুর্যোগ তেমনই। রাত প্রায় কাবার। নিজের জামা কাপড় পরে নিলাম।

সে উঠল। হাসতে চাইল : চললে?

পকেটে হাত দিয়ে শক্ত করে পুঁটলিটা চেপে ধরে বললাম, হ্যাঁ।

হতভাগা মুখের কষ-বওয়া রক্ত চেটে নিয়ে বলেছিল মরতে মরতে, এটা তুই রাখ! কেন? কেন?

মেয়েটা বলল, যন্ত্রণায় চাপা গলায়, আবার এসো।

মেয়েটার কী চোখ! সমস্ত মুখটি লাঞ্ছনার দাগে ভরা, আকাশমুখো নাক, মোটা ঠোঁট। কিন্তু এমন মুখ তো আর কখনও দেখি নি।

ভীষণ রেগে ওর দিকে ফিরে পুঁটলিটি ওর হাতে তুলে দিলাম। ওর নিশ্বাস লাগল আমার গায়ে। মুহূর্তে চোখ নামিয়ে একটা অশান্ত ক্রোধে দাঁতে দাঁত ঘষে বেরিয়ে এলাম পথের উপরে।

সে কী একটা বলল পেছন থেকে। হাওয়ায় ভেসে গেল সে কথা। বললাম, পিছু ডেকো না।

বোঝামুক্ত আমি উত্তর দিকে এগিয়ে চললাম। বানপ্রস্থ নয়, বন্ধুর বাড়িতে পুবে হাওয়া ঠেলে দিতে চাইল পশ্চিম গঙ্গার ঘাটের দিকে! পারল না।

